পরিচারিকা।

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

(নব পর্য্যায়)

রাণী শ্রীনিরুপমা দেবী সম্পাদিত।

সহঃ সম্পাদক—শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

চতুর্থ বর্ষ।

প্রথম খণ্ড।

১৩২৬ অগ্রহায়ণ—১৩২৭ বৈশাখ।

কোচবিহার।

কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে

শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

পরিচারিকা।

চতুর্থ বর্ষ।

১৩২৬ অগ্রহায়ণ—১৩২৭ বৈশাখ।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

—:*:—

পরিচারিকা—সূচী।

পরিচারিকা সূচী।

লেখক লেখিকার নামানুক্রমিক সূচী।

পরিচারিকা—সূচী।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

। } অগ্রহায়ণ, ১৩২৬ সাল। } ১ম সংখ্যা।

নিবেদন।

—:•:—

'পরিচারিকা'র জীবনের আর একটা বৎসর কেটে গেল। ভাল ভাবে কি মন্দ ভাবে—উন্নতিপথে না অবনতিতে তার বিচার, এ জন্মদিনে করবেন তিনি,—যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, যাঁহার ইচ্ছায় জগতে জন্ম-জাগরণ, গতি-স্থিতি, লয়-বিলয় সকলি। তিনিই জানেন তাঁর কার্য্যে কিসে উন্নতি, কিসে অবনতি, উদ্দেশ্য তাঁর কি—লক্ষ্য কোথায়? সেবক যে—কর্ম্মকর্ত্তার মধুর আহ্বানে যে আপনার শক্তি তুলনায় না এনে কর্ম্মানন্দে কেবল হৃদয়ের প্ররোচনায়, আনন্দ-আস্বাদ লাভের আশায় কর্ম্মক্ষেত্রে ছুটে এসেছে, প্রভুর ইচ্ছাকে সকলের সার মেনে তাতে আত্মসমর্পণ করেছে—কাজ কি তার কর্ম্মের ফলাফল বিচারে? কর্ম্মানন্দের অনুভূতি যাতে অক্ষয় হয়, কর্ম্মপ্রবৃত্তি যাতে বৃদ্ধি পায়—কর্ম্মকৌশল যাতে সহজ সুগম হয়ে ওঠে, সেই আনন্দ নিয়ে সে আপনাতে আপনি বিভোর হোক্। ক্রীতদাস নয় সে, আনন্দের দাস, প্রভুর স্নেহের প্রসাদে পুষ্ট। তাঁর আশীর্ব্বাদে তার জীবনের অবশ্যপ্রতিপাল্য লক্ষ্য হউক—প্রভুর ইচ্ছা, ইঙ্গিত

নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন। তার অন্তরের অন্তস্তম তার, ঋকের মহাপ্রাণ ঋষির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে, বেদ-মন্ত্রের অনুরণনায় ঝঙ্কৃত হোক—

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসিজানতাং।
দেবাভাগং যথা পূর্ব্বে সং জানানাহ উপাসতে॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃসহচিত্তমেষাং।
সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়েবঃ সমানো নবোহবিষা জুহোমি।
সমানীবহ আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানিবঃ।
সমান মস্তু বো মনোরথাবঃ সুহাসতি॥"

'হে জগজ্জন! তোমরা অভিন্ন হৃদয় হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, তোমাদের বাক্য অবিরোধ ও অভিন্ন হউক, তোমাদের মন অবিরোধে পরম জ্ঞান লাভ করুক; সমান মন্ত্র, সমান মন, সমান সমিতি, সমান চিত্ত হইয়া তোমরা কার্য্য কর; তোমাদের আকূতি (মনোভাব—আশা আকাঙ্ক্ষা) এক হউক, হৃদয় এক হউক, অন্তর এক হউক; আর তোমাদের সেই একত্ব-প্রভাবে তোমাদের সাহিত্য সুশোভন হইয়া উঠুক।'

মনের গান।

—:*:—

কণ্ঠ এবার হার মেনেছে
মন মানে নি হার
মনের তারে রাত্রি দিবা
চল্‌ছে যে ঝঙ্কার।
প্রকাশের তীরে আসি
হারিয়ে যে যায় শব্দ রাশি
অপ্রকাশে ঢাল্‌ছে তাহা
মধুর সুধা-ধার
কণ্ঠ এবার হার মেনেছে
মন মানে নি হার।

যে সুর উঠে তরঙ্গিয়া
এই মোহনার কূলে
কল্পলোকের ছায়ায় ছায়ায়
হাওয়ায় দুলে দুলে
সে সুর আরো মধুর তানে
অমৃত-ধার-বন্যা আনে,
প্রাণের মাঝে বাজুক সে সুর
থামুক নাক আর
কণ্ঠ এবার হার মেনেছে
মন মানে নি হার !

অপরাধ ?

———:*:———

(১)

সে এক নিদাঘ-মধ্যাহ্ন ; অসহ্য গরম। আকাশে বাতাসে অগ্নির জ্বালা। কাহারও প্রাণে সোয়াস্তি নাই ; ক্লান্তি অবসাদে সকলেই মুহ্যমান,—সকলেই স্তব্ধ নীরব। কেবল একটা ঘুঘু, বৃক্ষপত্রান্তরালে আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়া অতি করুণ-কোমল কণ্ঠে সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিত। আবেগ-আবেশে কম্পিত তাহার কণ্ঠস্বর জাগাইয়া দিত কত হৃদয়ে কত দিনের কত পুরানো কথা ! তপ্ত বায়ুর সহিত কত প্রাণের তপ্ত-শ্বাস মিলিত হইয়া কি একটা বিরাট ব্যথার সৃষ্টি করিত !

বৃক্ষপাদদেশে একটা তটিনী ঘুঘুর কণ্ঠে সায় দিয়া কুলু কুলু নাদে ছুটিত—অভিসারে। আরো কত হৃদয় নীরবে অনুভব করিত তার ব্যথা ! এরূপে একটা সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া, ঘুঘুর প্রাণে একটু শান্তি আসিত কি না কে জানে !

(২)

একটা কাঠঠোকরা, এহেন প্রেম-ঝঙ্কার মাঝখানে, কেবল প্রাণের প্রেম-নীতিকে অগ্রাহ্য, অবমাননা করিতেই যেন ঘুঘুর পার্শ্বেই একখানা শুষ্ক নীরস শাখায় অবিরত চঞ্চু-আঘাত করিত—ঠক্—ঠক্ ঠর্‌র্-র্ ! কি কর্কশ শব্দ ! অসহ্য ! এমন সময়ে এ কি ! কর্ম্ম ? মর্ম্মের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া—কর্ম্ম ? প্রাণে যা'র মায়া দয়া নাই—করুক্ সে এমন কর্ম্ম—আত্ম-নির্য্যাতন ! সকলেই,—কর্কশ শব্দ যার কর্ণে পৌঁছিত,—সেই ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া কাঠঠোকরাকে অভিসম্পাৎ করিত। সে এক বিন্দুও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে নাই কাহারও। তাহার অক্লান্ত শ্রম যে কি অপরিমেয়—কর্ত্তব্য-অনুরোধে—তাহা কেহই উপলব্ধিতে আনে নাই। রিক্তের অন্তরালে কি অন্ত নিহিত আছে—তাহা কি কেহ বুঝিতে চায় !

(৩)

বর্ষা-অন্তে ধরা যখন শরৎ-শ্রীতে শোভিতা, স্নিগ্ধ প্রকৃতির মিষ্ট হাস্যে সকলেই শীতল! মিলনের আনন্দে হর্ষ ফুল্ল সফল হৃদয়,—তখন সে ঘুঘু কোথায়? তার চির-অভ্যস্ত বিরহ-গাথায় কে আর কর্ণপাত করে! সকলেই সজীব; প্রিয়ের প্রতীক্ষায়—অভ্যর্থনার আয়োজনে ব্যস্ত। কেবল সেই শুষ্ক শাখা,—শুষ্ক শাখাই! মৃত যে, তাহার শোভা আর কোথা হইতে ফিরিয়া আসিবে?—হের কাঠঠোকরা—সেই নীরস হৃদয়-হীন (?) অক্লান্তকর্ম্মী,—আজও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। শুষ্ক শাখার অন্তস্তলে সে শরীর মনপ্রাণের যত্ন, চেষ্টা, অধ্যবসায় নিয়োজিত করিয়া যে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়াছে, আজ তাহা তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর আত্মজ-আত্মজার মধুর কণ্ঠ-কাকলিতে মুখরিত। যে সুধা তাহার প্রাণে আজ ঢালিয়া দিয়াছে তাহার তুলনা জগতে কোথা? সে বিস্মৃত হইয়াছে সকলই,—তাহার হৃদয়ধনের মুখ চাহিয়া। সে আজও নিজের যোগ্যতা জানে না; আজও—সে অক্লান্তকর্ম্মী; বাছাদের জন্য, আহার যোগাইতে চঞ্চুপুটে 'আধার' বহিয়া আনিতেছে। সে আগেও চায় নাই, এখনও চায় না—কেহ তাহার নিন্দা প্রশংসা করিল কি না ফিরিয়া দেখিতে।

(৪)

নধর সুন্দর বালক একটি মাতার সঙ্গে ঘাটে আসিয়াছে সেই দিন। অন্যের চক্ষু সেই অবজ্ঞায়িত শুষ্ক শাখায় আকৃষ্ট না হইলেও বালক, পক্ষী-শাবকের কল-কণ্ঠে আকৃষ্ট হইয়া বলিল "মা, পাখীর ছানা পাড়ি?" মা বলিলেন "কোথা,—কোথায় দেখ্‌লি পাখীর ছানা?" বালক শুষ্ক শাখার প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "ঐ দেখ।" মাতা বলিলেন "ছিঃ! কাঠঠোকরার বাচ্চাকে কখনো মানুষে পোষে? পড়্‌তে ওরা পারে না, তোকে একটা তোতা কিনে দেব।" ছেলে বায়না ধরিল, মাতা কত বুঝাইলেন—না, শিশুর মন মানে না, ভয় দেখাইলেন,—না, তাহাতেও না। অবশেষে উত্তম-মধ্যমে মাতা বালককে লইয়া গৃহে ফিরিলেন।

শিশুর মন কি সহজে শান্ত হয়! সহজে কি ভুলিতে পারে তাহার তরুণ হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা! তাহার কর্ণে কেবল বাজিতেছিল পক্ষী-শিশুর মধুর কাকলি।

সন্ধ্যা আগত প্রায়, বালক কোথায়? গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত মাতার প্রাণ চমকিয়া উঠিল, ছেলেকে ত তিনি অনেক্ষণ দেখেন নাই! কোথায় গেল সে! খোঁজ হইল কত স্থানে—বালক কোথাও নাই! পাখীর ছানা চুরি করিতে যায় নাই ত!

মাতৃ-হৃদয় তখনও অনুভব করিতে সমর্থ হয় নাই—তাঁহার বাছা কি মহা অপরাধ করিতে—কাহার স্নেহের কুলায় লুণ্ঠন করিতে গিয়াছে। আপনার আবেগে আকুলিতা মাতা বলিলেন "হতভাগা গিয়েছে বুঝি সেই ছাই কাঠঠোক্‌রার বাচ্চা পাড়্‌তে!" ভয়ে প্রাণ শিহরিয়া উঠিল,—শুক্‌না ডালে যে বাসা!

ছুটিয়া গিয়া মাতা দেখিলেন,—তাঁহার আশঙ্কা নির্ম্মম ভাবে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে! শাখা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—নদীর বক্ষে! মাতা হাহাকার করিয়া বৃক্ষ তলে আছাড়াইয়া পড়িলে—কি হৃদি বিদারক ধ্বনি!

পূর্ণতোয়া রাক্ষসী তটিনী বিকট লাস্যে উথলিয়া উঠিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল—'প্রাণের অধিক প্রাণ যদি সে তোর,—আমার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়।'

মাতা তখন বৃক্ষমূলে মাথা ঠুকিয়া কাঁদিতেছেন। সেই গভীর শোকের মধ্যেও—করুণ ক্রন্দনেও—কাঠঠোক্‌রা অপরাধী; তাহার প্রতি তীব্র অভিসম্পাৎ!

—কাঠঠোক্‌রা।

ইস্‌লাম ধর্ম্মের সত্য।

বর্ত্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার দিনে এই যে হিন্দু মুসলমানের মিলনের একটি ক্ষীণ অরুণালোক ভারতের পূর্ব্বাকাশে দৃষ্ট হইতেছে ইহার মত শুভসূচনা আর কিছুই হইতে পারে না। মুখে যদিও আমরা বহুদিন হইতে শেখাবুলি 'কপচাই' যে হিন্দু মুসলমান আমরা সকলেই "ভাই ভাই এক ঠাঁই" কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই পরস্পর বিরোধী দুই সমাজের মাঝে যে একটি অলঙ্ঘনীয় রেখা টানা আছে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার কোন চেষ্টাই আমরা এতদিন করি নাই। ধর্ম্মের বিরোধের মত কঠিন বিরোধ আর কিছুই হইতে পারে না। এই ধর্ম্মের (ইসলামের) প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য কোন প্রয়াস হয় নাই। হিন্দুরা, বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্টানধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম ইত্যাদির সম্বন্ধে যতটা পরিজ্ঞাত আছেন ইস্‌লামধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহা নহেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অন্যান্য ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবার জন্য তাঁহাদিগের মাঝে যে ঔৎসুক্য পরিলক্ষিত হয় ইস্‌লামধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহা নাই। কেবলমাত্র দু একটি বাহ্যিক প্রথার পার্থক্য দেখিয়াই তাঁহারা ঐ ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি ধারণা বদ্ধমূল করিয়া বসিয়া থাকেন। আমরা পুস্তকে যে কথা লিখি হৃদয়ে তাহা বিশ্বাস করি না। সকল ধর্ম্মেরই এক লক্ষ্য ও এক সত্য; একই ঈশ্বর যে সকলের ধর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছেন ইহা যদিও আমরা প্রচার করি কিন্তু মনে যে প্রকৃত পক্ষে তাহা বিশ্বাস করি না তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। বিশেষভাবে যখন মুসলমানগণের সংস্পর্শে আসিতে হয় এবং তাঁহাদিগকে লইয়া ধর্ম্মসম্পর্কীয় কোন কার্য্য করিতে হয়। এত বড় একটি উচ্চ আদর্শবান উদার ও সত্যজ্ঞানের ধর্ম্মকে যে আমরা এরূপ ভাবে উপেক্ষা করিয়া থাকি ইহা কম পরিতাপের বিষয় নহে। যাঁহারা অনুসন্ধিৎসু হইয়া ইসলামধর্ম্ম সম্বন্ধে যৎসামান্য তথ্য জানিতে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহারাও মুসলমান প্রতিবেশীর নিকট হইতে না শুনিয়া অথবা ইসলাম ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণাদি হইতে তাহা না পাঠ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণের মুখ হইতে বিকৃত ভাবে শুনিয়াছেন, ইহাও কম দুঃখের কথা নহে। ইহা হইতে এই প্রশ্ন উঠিবার সম্ভাবনা যে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ কেন ইহাকে বিকৃতভাবে প্রচার করিবেন, তাঁহাদের আক্রোশের কারণ কি? সত্যই আক্রোশের কারণ থাকিবার কথা নহে, কারণ খৃষ্টধর্ম্ম যেরূপ 'সেমেটিকধর্ম্ম', ইস্‌লামধর্ম্মও সেইরূপ সেমেটিকধর্ম্মেরই সর্ব্বশেষ সংস্করণ এবং উভয় ধর্ম্মই একেশ্বরবাদী ও সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের পোষণকারী; তবে বিরোধের কারণ কি? বিরোধের কারণ শুধু এইটুকু যে হজরৎ মহম্মদ খৃষ্টধর্ম্মের সহিত সম্পূর্ণরূপে একাত্ম হইলেও বাইবেলে লিখিত Trinity (ত্রিত্ববাদ) স্বীকার করিতে পারেন নাই; তিনি বলিতেন খৃষ্টের মত ভগবৎভক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঈশ্বর বিশ্বাস এইরূপ তিন ভাগে বিভক্ত হইতেই পারে না, ইহা তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বীগণ কর্ত্তৃক তাঁহার পরে বাইবেলে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। (১)

হজরৎ মহম্মদ যে পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণকে সম্পূর্ণ স্বীকার করিতেন তাহার প্রমাণ কোরাণে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে "আমরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি এবং যাহা কিছু এব্রাহাম, ইস্মাএল, ইয়াকুব এবং সেই সম্প্রদায়ের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহা কিছু মুসা, ঈশা এবং অন্যান্য প্রেরিত পুরুষগণকে প্রদত্ত হইয়াছিল,

(১) কোরাণ সরিফ সুরা মায়দা ১০, ৭৩।

ইঁহাদিগের মধ্যে আমরা কোনরূপ প্রভেদ দেখি না; এবং ঈশ্বরের নিকট আমরা আনুগত্য স্বীকার করি।" (২)

হজরৎ মহম্মদ স্বয়ং এই সকল মহাপুরুষগণকে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং সকল মুসলমান ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য বটেন, কিন্তু ইঁহাদিগের মাঝে কাহাকেও ঈশ্বর এবং মানবের মধ্যবর্ত্তী গুরু অথবা ঈশ্বরের নিকট গমন করিবার সোপানরূপে স্বীকার করেন না; ইঁহারা পয়গম্বর মাত্র, পয়গম্বর অর্থে বার্ত্তাবহ। যদিও ইঁহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় পীর (গুরু) স্বীকার করেন, কিন্তু কোরাণ ও হদিসে গুরুবাদের কোনরূপ উল্লেখ নাই। এমন কি ধর্ম্ম সম্পর্কীয় কোন অনুষ্ঠানে পুরোহিত নিয়োগের ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয় না। আপনাপন ধর্ম্মানুষ্ঠানে স্বয়ং কর্ম্মকর্ত্তার প্রতিই পুরোহিতের কার্য্যসম্পাদনের আদেশ আছে। অক্ষম পক্ষে সে অন্যের উপর ভারার্পণ করিতে পারে।

ইসলাম ধর্ম্মমতে হজরৎ মহম্মদ শেষ পয়গম্বর অথবা ঈশ্বরের শেষ প্রেরিত পুরুষ। কোরাণের মতে ভবিষ্যতে নূতন পয়গম্বরের আবির্ভাব না হইলেও যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্কারকদিগের (মোজদ্দদ) আবির্ভাব হইবে, তাঁহারা সকল আবর্জ্জনা দূর করিবেন (৩)। ইসলাম ধর্ম্ম যে সেমেটিকধর্ম্মেরই (এব্রাহামের ধর্ম্ম) অন্তর্গত ইহা হজরৎ মহম্মদ আপন মুখে স্বীকার করিয়াছিলেন। মক্কার কাবা মসজিদ তখন লাৎ মানাৎ ইত্যাদি নানাবিধ বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ ছিল, হজরৎ মহম্মদ যখন একেশ্বরের উপাসনা প্রচার করিতে লাগিলেন তখন পূর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বীগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমাদের এতদিনের ধর্ম্ম বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া আপনি এ সকল কি নূতন কথা বলিতেছেন? তাহাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন "আমি ত নূতন কথা কিছুই বলিতেছি না; এব্রাহাম যাহা বলিয়া গিয়াছেন আমিও তোমাদের তাহাই বলিতেছি।" এব্রাহামের ধর্ম্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে যে বিবরণ মুসলমান শাস্ত্রে লিখিত আছে তাহা এইরূপ,—

এব্রাহামের জন্মকালে তদ্দেশে নমরুদ নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি অহঙ্কারে পরিপূর্ণ হইয়া প্রজাদিগের নিকট হইতে ঈশ্বররূপে পূজা গ্রহণ করিতেন। একদা তিনি এক জ্যোতিষী কর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত হইলেন যে তাঁহার রাজ্যে এমন এক ব্যক্তির জন্ম হইবে যে তাঁহার সংহারক হইবে। এই দুঃসংবাদে বাদসা একান্ত ভীত হইয়া রাজ্যের সমুদয় গর্ভবতী নারীকে হত্যা করাইতে আরম্ভ করিলেন। আজর নামে সেখানকার মন্দিরের পুরোহিতের পত্নী গর্ভবতী হইলে আজর তাহাকে প্রাণভয়ে এক দূরবর্ত্তী পর্ব্বত গহ্বরে লুকাইয়া রাখেন, সেই গহ্বরেই এব্রাহামের জন্ম হয়। এদিকে প্রকাশ হইবার ভয়ে মাতা তাঁহার পুত্রকে পর্ব্বত গহ্বর হইতে বাহির করিতে পারিতেন না। এইরূপে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইলে বালক এব্রাহামকে তাঁহার মাতা এক নিশীথে পর্ব্বত গহ্বর হইতে বাহির করেন, তখন জ্যোৎস্নায় চতুর্দ্দিক পরিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে। এব্রাহাম নির্ব্বাক হইয়া চন্দ্রের শোভা দর্শন করিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা সিন্নি আমাদের জীবনদাতা তিনি কে?" মাতা বলিলেন "নমরুদ বাদসাই সেই ঈশ্বর।" এব্রাহামের হৃদয় কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে পারিল না; তিনি বলিলেন "এই জ্যোতিষ্মান্ চন্দ্রই নিশ্চয় আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, ইনিই ঈশ্বর!" এইরূপে আর একদিন দিবালোকে গহ্বরের বাহিরে আসিয়া সূর্য্যমণ্ডল দর্শন করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব বিশ্বাস দূর হইল তিনি বলিলেন "না, না, চন্দ্র কখনই ঈশ্বর নহেন, সূর্য্য যখন এত তেজোময়,

(২) কোরাণ সরিফ সুরা বকর ১৮, ১৩৬।

(৩) কোরাণ সরিফ সুরা নার ৭, ৫৫।

বীর্য্যশালী তখন সূর্য্যই ঈশ্বর!" কিন্তু সূর্য্যাস্তের পর তাঁহার সে বিশ্বাসও ভাঙ্গিল, তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন। তখন সহসা তাঁহার স্বভাবদত্ত জ্ঞানের উদয় হইল, তিনি বলিয়া উঠিলেন "চন্দ্রও ঈশ্বর নহে, সূর্য্যও ঈশ্বর নহে, যিনি চন্দ্রসূর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনিই ঈশ্বর!" তাঁহার এই ধর্ম্ম বিশ্বাসের কথা মনে করিয়াই হজরৎ মহম্মদ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। (৪)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইসলাম ধর্ম্ম একেশ্বরবাদীর ধর্ম্ম; ইহা অদ্বৈতবাদীর ধর্ম্ম নহে, অর্থাৎ ইহা সোঽহং স্বীকার করে না; মানব মানব, ঈশ্বর ঈশ্বরই, ইহাই এই ধর্ম্মের বিশ্বাস। অদ্বৈতবাদের প্রকৃত উচ্চ অর্থ উপলব্ধি না করিয়া জগতের অজ্ঞ ব্যক্তিগণ পাছে অহঙ্কারের পক্ষপাতী হইয়া পড়ে এবং ধর্ম্মের নামে অহং পূজা আরম্ভ হইয়া অনর্থের সূত্রপাত হয় তাই বোধকরি হজরৎ মহম্মদ দ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি এত অধিক দৃঢ় ছিলেন যে ঈশ্বরকে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য নামে সম্বোধন করিতেও নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, এমন কি পিতা কিম্বা মাতা বলিতেও নিষেধ আছে, যদি দৈবাৎ বিভিন্নভাবের উদয় হয়।

তারপর ইসলাম ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব, ইহার কথাও পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। মুসলমানেরা ধর্ম্মের এই ভাবটিকেও যথেষ্ট উচ্চাসন দিয়া থাকেন। শুধু যে ইঁহারা মুখেই এ কথা স্বীকার করেন তাহা নহে, মসজিদে ইহার আদর্শ রক্ষা করিয়া থাকেন। মসজিদে যদি একাধিক মুসলমান উপস্থিত হ'ন তবে সকলে পৃথক পৃথক ভাবে নমাজ না পড়িয়া একজনে পড়েন এবং অন্য সকলে তাহাতে যোগদান করেন। ইহাতে তাঁহাদের নমাজ পাঠের অধিক ফল হয়, এ কথা শাস্ত্রানুসারে তাঁহারা বিশ্বাস করেন। যদিও সমাজে উচ্চ নীচ ভেদ প্রবেশ করিয়াছে তথাপি ধর্ম্মক্ষেত্রে পূর্ব্বের সাম্যভাবই রক্ষিত হইয়া থাকে।

ইসলাম ধর্ম্ম দার্শনিকতা অথবা শব্দ বা ভাব রহস্যের আবরণে আবৃত নহে, ইহার শিক্ষা এত সুস্পষ্ট যে পণ্ডিত মূর্খ নির্ব্বিশেষে ইহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। ইহা স্বভাবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ইহাকে বাক্যের আড়ম্বরে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই, আকার দিয়া রূপ দিয়া সাজাইতে হয় না; চোখের সম্মুখে ইহাকে নানারূপ সাজসজ্জার চাকচিক্যে ভূষিত করিয়া দেখাইতে হয় না; ইহা সরল প্রাণের সরল ধর্ম্ম; স্বাভাবিক ধর্ম্মজ্ঞানের অকপট বিকাশ। মুসলমানগণ ধর্ম্ম বিশ্বাসকে "ইমান" বলিয়া থাকেন, তাহার অর্থ এক নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস ও হজরৎ মহম্মদকে সত্য ধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া স্বীকার করা। যাঁহারা ইমানদার অর্থাৎ এই ধর্ম্ম বিশ্বাসে বিশ্বাসী তাঁহারাই মুসলমান; সেইজন্য ইসলাম ধর্ম্মের দীক্ষায় কোনরূপ আড়ম্বর নাই, আয়োজন নাই, যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থায় ঐ দুটি কথা স্বীকার করিয়া হৃদয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিলেই ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষা সম্পন্ন হয়। ইসলাম ধর্ম্ম মতে পুনর্জ্জন্মবাদ নাই। খৃষ্টানদিগের ন্যায় মুসলমানগণের বিশ্বাস মানবাত্মাগুলি মৃত্যুর পর একস্থানে প্রতীক্ষা করিবে, পৃথিবীর মহাপ্রলয়ের পর একটি মহা বিচারের দিন আসিবে তখন স্বয়ং ঈশ্বর ইঁহাদিগের বিচার করিয়া পাপপুণ্যানুসারে ব্যবস্থা করিবেন। প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে পুরাতন ইহুদি ধর্ম্মের সহিত ইহার সর্ব্বাংশে ঐক্য রহিয়াছে, স্থানে স্থানে অতি অল্প পরিবর্ত্তন করিয়া ইসলাম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পৃথিবীতে অন্যান্য প্রায় অধিকাংশ ধর্ম্ম যেরূপ স্বর্গ নরকের বিশ্বাস হইতে মুক্ত নহে, ইসলাম ধর্ম্মও তাহাই। ইহাতেও পাপ পুণ্য ভেদে স্বর্গ নরকের ব্যবস্থা আছে। ইহা ভিন্ন ঈশ্বরদ্রোহীর জন্য অনন্ত নরকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের বিশ্বাস যাহাই হউক, এই স্বর্গ নরকের দৃঢ় বিশ্বাস যে মানব হৃদয়কে পুণ্যলোভাতুর ও ধর্ম্মভীরু করিয়া

(৪) কোরাণ সরিফ সুরা এমরাণ ৬৭ আয়েৎ, আনাম ১৬২।

কর্ণধারের মত সংসারের পাপসঙ্কুল পথে চালনা করে তাহাতে সন্দেহ নাই। যে সকল ব্যক্তি ইমানদার হইয়া মুসলমান হন্‌ তাঁহাদের পক্ষে পাঁচটি আদেশ অবশ্য পালনীয়। ইহাকে ফরজ বলা হয় অর্থাৎ এ সকল আদেশ অলঙ্ঘনীয়। এই আদেশগুলি যথাক্রমে এইরূপ,—'কলেমা' অর্থাৎ মূলমন্ত্রে বিশ্বাস, 'সলাত' (নমাজ) অর্থাৎ ঈশ্বরের উপাসনা, 'সওম' (রোজা) অর্থাৎ মাসব্যাপী উপবাস, 'হজ' অর্থাৎ বক্‌রিদ উপলক্ষে মক্কায় গমন ও 'জকাৎ' অর্থাৎ দান।

ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণের সময় যে বিশ্বাসে ভিত্তিস্থাপন করা হয় তাহাই নামান্তরে কলেমা। এই কলেমার বিশ্বাস প্রত্যেক মুসলমান আজীবন দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিতে বাধ্য।

দিবারাত্রির মধ্যে পাঁচবার সলাত পাঠের আদেশ আছে। প্রথম 'ফজর' সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, দ্বিতীয় 'জহর' মধ্যাহ্নের পর, তৃতীয় 'আসর' অপরাহ্ন কালে, চতুর্থ 'মগরেব' সূর্য্যাস্তের পর, পঞ্চম 'এসা' সাধারণতঃ রাত্র এক প্রহরের পর। ইহা ভিন্ন শুক্রবারে জুমার নমাজ পাঠ হইয়া থাকে। নমাজ নিম্নলিখিত চারি ভাগে বিভক্ত যথা 'ফরজ', 'ওয়াজেব', 'সুন্নৎ' ও 'নফল'। ফরজ—দিবা রাত্রে উপরোক্ত পাঁচবারে এবং জুমার নমাজে পঠিত হইয়া থাকে। ওয়াজেব কেবল মাত্র নৈশ উপাসনার শেষে ও বৎসরের দুই ইদে পাঠ করা হয়। সুন্নৎ—দৈনিক পাঁচবার ও জুমার দিন পঠিত হয়। নফল,—জহর মগরেব এসা ও জুমায় পঠিত হয়। ফরজ কোরাণের দ্বারা স্থাপিত, ইহা মুসলমান মাত্রের অবশ্য পালনীয়। ওয়াজেবও কোরাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং মুসলমানগণের পালনীয় বটে কিন্তু ফরজের অনুরূপ নহে। হজরৎ মহম্মদ স্বইচ্ছায় যে সকল অতিরিক্ত নমাজ পাঠ করিতেন সেইগুলিই সুন্নৎ নামে পরিচিত, ইহাও অবশ্য করনীয় নহে। নফল—উপাসকগণ ইচ্ছানুসারে যে সকল নমাজ পাঠ করিয়া থাকেন তাহাই।

মুসলমান ধর্ম্মকর্ম্ম চান্দ্রবৎসরে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে সম্পূর্ণ রমজান মাস রোজার জন্য নির্দিষ্ট; এই রোজার সময় প্রতি দিন প্রভাত হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত জলগ্রহণের আদেশ নাই। প্রতিদিন সূর্য্যাস্তের পর রোজার উদ্‌যাপন হয়। দৈহিক উপবাসের সহিত পঞ্চেন্দ্রিয়েরও সংযম করা কর্ত্তব্য, সকল প্রকার রিপুর দমন ও তৎসঙ্গে সেই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ইহা সকলের দ্বারা সম্ভব নহে স্বীকার করি, তবে সাধ্যানুসারে করিবার বিধি আছে। দ্বাদশ বৎসর বয়স হইতে স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে ইহা পালনীয় রোজা ইসলাম মত প্রচারের পূর্ব্বে ইহুদিদিগেরও ব্রত ছিল।

প্রতিবৎসর বক্‌রিদের সময়ে মক্কার নিকট আরফৎ প্রান্তরে 'খত্‌বা' পাঠ হইয়া থাকে, এই পাঠে যোগদান করার নামই "হজ।" স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে বয়স্কদিগের মধ্যে যাঁহারা সক্ষম, তাঁহারা এই হজ করিতে বাধ্য; হজ করিলে সমাজে "হাজি" উপাধি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অঋণী অবস্থায় ও আপনাপন অন্ন বস্ত্রের ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া বার্ষিক আয়ের যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহার শতকরা ২৸০ টাকা হিসাবে দান করিতে মুসলমান মাত্রেই বাধ্য—ইহাই জকাৎ।

হজরৎ মহম্মদ জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ঘটনায় ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহাই "কোরাণ সরিফ" নামে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন তিনি তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধিতে যে সকল কথার মীমাংসা করিয়াছিলেন, যে সকল কর্ম্ম স্বয়ং সম্পাদন করিয়াছিলেন ও তাঁহার সাক্ষাতে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল তাহাই হদিসে সংগ্রহ করা হইয়াছে, এই দুই ধর্ম্ম গ্রন্থের মাঝে ইহাই প্রভেদ। কোরাণ ও

দিগের দ্বারাই মুসলমান সমাজ চালিত হইয়া থাকে। কোরাণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রত্যেক মুসলমান বাধ্য। শাস্ত্রানুসারে প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষের বিদ্যাশিক্ষা অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। এমন কি আপনাপন সন্তানদিগকে অশিক্ষিত রাখিলে ঈশ্বরের কাছে অপরাধী হইতে হইবে বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহা উচ্চ ধর্ম্মেরই আদর্শ। মুসলমানগণের মধ্যে অন্ন বিচার নাই। খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধে অনেক স্থলে বাঁধাবাঁধি আছে। ইঁহারা কোরাণের মতে চারখানি 'কেতাব' (ঈশ্বরের বাণী) স্বীকার করেন। বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কথিত হইলেও তাহা যে ঈশ্বরের বাণী তাহাতে ইঁহাদের সংশয় নাই। প্রথম কেতাব 'তওরাত' (তালমুদ) ইহা মুসার (Moses) নিকট; দ্বিতীয় জব্বুর ইহা দাযুদের (Devid) নিকট, তৃতীয় ইঞ্জিল (বাইবেল) ইহা ঈশার (Christ) নিকট ও চতুর্থ কোরাণ ইহা হজরৎ মহম্মদের নিকট প্রেরিত হয়। এই সকল ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি প্রত্যাদিষ্ট হইয়া যাহা কিছু ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহাই ঐ চারিটি কেতাবে লিপিবদ্ধ আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে দিল্লীর জুমামসজিদে হিন্দুদিগকে প্রবেশাধিকার দেওয়া সম্বন্ধে আন্দোলন ও আলোচনা উপস্থিত হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে এই প্রবেশাধিকার নূতন নহে। হজরৎ মহম্মদ স্বয়ং সকল জাতীয় অতিথি অভ্যাগতদিগকে মসজিদে অভ্যর্থনা করিতেন সুতরাং ইহা ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যই হইয়াছে।

ইসলাম ধর্ম্ম একপক্ষে যেমন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম, অপর পক্ষে তেমনি সার্ব্বজনীন ধর্ম্মও বটে। অনেকে মনে করিতে পারে যে ধর্ম্মে কোরাণে ও পয়গম্বরে বিশ্বাস না করিলে ধার্ম্মিক হওয়া যায় না, সে ধর্ম্মে উচ্চ ভাব কোথায়? কোরাণেই ইহার উত্তর লিখিত আছে; "যে কোন ব্যক্তি এক নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সৎকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিবে সেই মুক্তিলাভ করিবে।" ইহাতে কোন দেশ কোন জাতি অথবা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উল্লেখ নাই।

ইসলাম ধর্ম্মে নারীজাতির স্থান ও তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে বারান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

কালের ভাণ্ডার।

ধরণীর বহুদিন হারা দিনগুলি
সুবিশাল ভাণ্ডার ঘরে,
সখি সেই গৃহ দ্বার দেখাইল খুলি।
সজ্জিত আছে থরে থরে।

২

কোনোটী গোমেদ যেন, কোনোটী বা নীলা
কোনোটী প্রবাল পোখরাজ,
কোনোটী বিদুর, হীরা, কোনোটী বা শিলা
বুকে কারও সোণালীর কাজ।

৩

রক্ত একখণ্ড হীরা হস্তে তুলে ধরি
দেখি এক ভীম রণভূমি,
শোণিতের ঢেউ ছুটে দুই কূল ভরি
আকাশ পাতাল সব চুমি'।

৪

পীত-বসনের দ্যুতি নব ঘনে মিশি,
মাঝে তার কান্ত মনোহর,
'এই কুরুক্ষেত্র দিন' সখি বলে হাসি,
ভক্তি ভরে কাঁপি থর থর।

৫

দলিত অঞ্জন সম শিলা তুলি করে
বলে 'দেখ প্রভাসের দিন',
আঁধারি ধরণী যবে সাগরের তীরে
কৃষ্ণে কৃষ্ণ হয়ে গেল লীন।

৬

শুভ্র এক স্নিগ্ধ দিন কিবা তার শোভা
মুকুতার মত ঢলঢল,
কবিতার জন্ম দিন বড় মনোলোভা
বাল্মিকীর নয়নের জল।

৭

দেখি আষাঢ়ের সেই প্রথম সে দিন
উঠিয়াছে ঢুলঢুলে মেঘ,
হেরি তপোবন বালা আভরণহীন
মধুপের ব্যাকুলিত বেগ।

৮

খুঁজি খুঁজি এর মাঝে চোখে গেল পড়ে
আমারি হারাণো এক দিন,
অতি ছোট টুক টুকে দূরে আছে সরে
দেখে মোরে লাগিল নবীন।

৯

হাসিয়া বলিনু তারে রে সুন্দর দিন
তুই এসে রয়েছিস্ হেথা,
বুকে লয়ে আজও কাঁদি তোর স্মৃতি ক্ষীণ
ধরা মাঝে খুঁজে পাব কোথা।

১০

ওরে সখি হারাবে কি সব আছে জমা
তবে আর বল কিসে ভয়,
গোলাপা সে দিনগুলি না থাকুক কাছে
দূরে যে অমর হয়ে রয়।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

আত্মহত্যার-অপরাধী।

—:*⊕*:—

বড় সুখে, বড় আনন্দের মধ্যে জীবন-বৃন্তে ফুটে উঠেছিলাম। মাবাপের একমাত্র আদরী মেয়ে আমি, তাঁদের যেন প্রাণ! আমাকে অদেয় তাঁদের কি ছিল! স্নেহ-অমৃত সিঞ্চন করে' পিতামাতা আমাকে জান্‌তে দেন নি যে, জীবনের আবার অন্য আর একটা দিক্ আছে! মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহস্থালী, কত কাজ! মা আমায় শত কাজের মধ্যেও ভুল্‌তে পার্‌তেন না, কারণে-অকারণে নিকটে ডাক্‌তেন! হতভাগী আমি, মনে পড়ে তাতে কত বিরক্তই হতেম, খেলার যে তাতে ব্যাঘাত হ'ত। এখন হাসি পায়;—জীবনের সুখ যত ছিল সেই খেলার ঘরে, পুতুলে,—আর প্রিয়তম সঙ্গীটিতে আমার! কি প্রাণভরা ভালবাসা দিয়েই না তাকে ভালবাস্‌তেম। আলি! নামটা মনে আস্‌তেই প্রাণটা আনন্দে দুলে উঠ্‌ত! আলী ছিল যেন আমার সর্ব্বস্ব, বাল্য-জীবনের জীবন-কেন্দ্র!

বয়স তখন আমার পাঁচ ছয়, আলীর বয়স বোধ হয় বছর দশ এগার; কি বুদ্ধি তার! কথার ফোয়ারা, উৎসাহের অবতার। রোজ রোজ সে কত প্রকার নূতন নূতন খেলার উদ্ভাবন করত, সে সকলের সাফল্য দিতে কোন কিছু গড়তে ভাঙ্গতে তার একটুও আটকাত না। সে যা দু'চক্ষে দেখ্‌ত, তখনি তার হুবহু নকল করতে তার মত আর কাউকে দেখলাম না। কলের গান শুনে এসে, সে দেশলাই-এর বাক্সে কাগজের চোঙ্গ জুড়ে নকল কল গড়ে তুলত, কাগজ কাঁচিতে কেটে তাতে রেকর্ড বসিয়ে কত ভঙ্গীতে গানের ধুম লাগিয়ে দিত। গলাটা তার খুব মিষ্টি—তার গানের কাছে কলের গান মনে হ'ত তুচ্ছ! বসে বসে খেলার ঘরকন্না করতেম, আর গান

শুন্‌তেন—মনে হ'ত তার কি বুদ্ধি—অমনটি কি কেউ পারে! মাবাবা পর্য্যন্ত কান ফেলে ওর গান শুন্‌তেন, আর ওর কাণ্ড দেখে হাস্‌তেন,—প্রশংসা করতেন। প্রাণটা আমার ওর গর্ব্বে ভরে উঠ্‌ত! কখনো ও গড়্‌ত রেলগাড়ী। লাইন, ষ্টেশন, সিগ্‌নেল, তার কিছুই বাদ যেত না। সোয়ারী হ'ত তাতে আমার পুতুল—কি আনন্দ!

(২)

এমনি করে শৈশব-জীবন আমার সংসারের শ্রেষ্ঠতম সুখে পুষ্ট হয়ে উঠ্‌ছিল। বয়স যখন আমার এগার বারো, ফজলুর মা বিধবা হয়ে এসে আমাদের বাড়ীর পাশে বাড়ী কর্‌লেন। ফজলু বিনে সংসারে তাঁর আর কেহ ছিল না। সম্বলও ছিল না কিছু,—বাঙ্গলার নিঃস্ব কৃষকপত্নীর অদৃষ্টে যা নিত্য ঘট্‌ছে তাঁরও হয়েছিল তাই! ফজলুর মা আলীর পিসী হতেন। আলীর বাবা ছিলেন দূর সম্পর্কীয় আমার মেসো। আমার মাসীর মৃত্যু হ'লে তিনি আলীর মাকে নিকা করেন,—আলী তাঁর প্রথম পক্ষের পুত্র। মেসোর নিজের জোতজমা কিছু ছিল না, আমাদের সংসারেই কাজকর্ম্ম করতেন,—সংসারের একজন ছিলেন, বাহির হ'তে কারো বুঝ্‌বার যো ছিল না—বাবা ও তিনি প্রায় নিঃসম্পর্ক,—মনে হ'ত ভাই ভাই। আলীর পিতার মুখে তাঁর ভগিনীর দুরদৃষ্টের কথা শুনে পিতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে বাড়ীর পাশে আশ্রয় দিয়াছিলেন। "দুঃখ-ধান্দা" কর্‌লে মাপুতের দুটা পেট চল্‌বার মত আয় হওয়া অসম্ভব নয়। ধান ভেনে চা'ল বেচে, চিঁড়ামুড়ী ভেজে আমাদের কৃষকদের মধ্যে দিনরাতের পরিশ্রমে আধ পেটা শাক অন্নের সংস্থান শত শত বিধবা করছে।

ফজলুর মা ফতেমা বিবি আশ্চর্য্য লোক। আমাদের এখানে আসার পর একটা মাস যেতে না যেতেই তিনি সবাকে আপন করে নিলেন, মা'র মুখে তাঁর প্রশংসা ধর্‌ত না। সেই নিঃস্ব বিধবার গতিবিধিতে এমন একটা গাম্ভীর্য্য ছিল,—সাধারণ কাজকর্ম্মের মধ্যে এমন একটা সুনিপুণতা প্রকাশ পেত যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করে উপায় ছিল না। তাঁর হাতের চিঁড়া যেমন পাতলা তেমনি অটুট,—মুড়ীগুলো বোতলের টোপের মত। সকলেই তাঁর তৈয়ারী জিনিষের তারিফ করে কিন্‌তে ব্যগ্র হ'ত। এ-সকল কাজ তাঁকে বেশী দিন করতে হয় নি। ফজলু এখানে এসেই আমাদের বিঘা ছয় জমী আমাদের হালে বর্গা আবাদ করেছিল। মার উপযুক্ত পুত্র সে; পরিশ্রমে জমীতে সোনা ফলিয়ে অবস্থার অনেকটা উন্নতি করে ফেলেছিল,—ছ'মাসেই। এত কাজকর্ম্মের মধ্যেও তারা মায়েপোয়ে আমাদের সংসারের কত কাজ করে দিত। মা তাতে কত খুসী হতেন, অনেক সময় যেন লজ্জিতও হতেন। এক দিন তাঁকে বাবার নিকট বল্‌তে শুনেছি—"তোমার ক্ষেত তাতে কত খরচ হচ্ছে, ওঁদের না হয় এক সঙ্গে খেতে বল্লেই হয়—এই সংসারেই ত ওঁরা খাট্‌ছেন।"

বাবা কেবল একটু হেসে বল্লেন—"ইচ্ছা হয়, তা বল্লেই পার।"

মা অমনি তাড়াতাড়ি বল্লেন "না—না আমি তা নিজে বল্‌তে পারব না,—অত সাহস আমার হয় না; এমনি ওঁর অভাব দেখে কিছু দিতে গেলে, সেটা নেন বটে কিন্তু মুখে তাঁর এমন একটা কাতরতা ফুটে ওঠে যাতে মনে হয় সে সাহায্যটুকু না করলেই ভাল ছিল!"

বাবা বল্‌লেন—"তবেই—ওরা নিজের মত নিজে আছে সেই ভাল—নিজের সংসারে অভাবের মধ্যেও যে একটুকু সুখ আছে, পরের সংসারে তা নাই,—আপনার পরিশ্রমের ধন যে সব চেয়ে মিষ্টি!"

(৩)

প্রশংসা শুনেই বুঝতে পারছ আমি তাদের কি চোখে দেখেছিলেম। তাদের মাতাপুত্রের কার্য্যকলাপ আমার সম্মুখে এক নূতন অনাস্বাদিত আনন্দের সংসার ধরে দিয়েছিল,—বারো বছর বয়সেই আমার সাধ হ'ত—ফজলুর মার মত গৃহিণী হ'তে—আর.........!

এতদিন দেখেছি আলীময় সংসার,—বুদ্ধির তার তুলনা ছিল না ; স্বীকার করতে কি,—ফজলুর আবির্ভাবে আমার মনের আর একটা দ্বার খুলে গিয়েছিল। আলী চঞ্চল, বাক্যবাগীশ, সুবক্তা, তরল আনন্দে প্রাণ তার ভরপুর। ফজলুর স্বভাব তার বিপরীত হয়েও আনন্দের আধার। সে ধীর,—গম্ভীর,—কথা বলে অল্প কিন্তু যা বলে তার তুলনা হয় না। তার কথায় এমন ভাব মনে আসে যা পূর্ব্বে কখনও ভাবতে পারি নি। সুখ দুঃখের ধারণাটাও যেন ওরা কেমন বদলে দিচ্ছিল,—তাদের মাতাপুত্রের হাবভাব দেখে মনে হ'ত—ঐ অভাবের সংসারটুকুতেও যেন ওরা কত সুখী।

ফজলু বেশ লিখতে পড়তে জানত। সে সন্ধ্যার পর হাত পা ধুয়ে খড়ম দুটি পরত। একখানা মাদুর বিছিয়ে, একটা অতি সাধারণ ল্যাম্পের সামনে পড়তে বসত। আমাদের ঘরের জানালা দিয়া তাকে বেশ স্পষ্ট দেখা যেত : আমি দেখার সুযোগ ছাড়তে পারতেম না ; কিন্তু মন আমার তিক্ত বিরক্ত হয়ে উঠত,—ফজলুর কাণ্ড দেখে! মাঠের পরিশ্রম কি সাধারণ, সারাদিন রোদে তেতে-পুড়ে মাঠের কাজে কি কষ্ট! সে কথা আগে মনে আসে নি—ফজলুর দিকে তাকিয়ে সেই কথাই কেবল মনে হ'ত। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর আবার পড়ায় কাজ কি বাপু!

বাবা একদিন বল্লেন "অফিরাণ, লেখাপড়া শিখবি ?"

আমি না ভেবেই বলে ফেললাম, "না, ওটা একটা নেশা!"

বাবা হেসে বল্লেন "তাই। কিন্তু ভাল নেশা। দেখতে পাস্ না কি,—এত খেটেখুটেও ফজলুর ওটা রোজই চাই। কথায় কথায় ফজলু এমন সব কথা বলে, যা শুনে কত আনন্দ, কত শান্তি পাই,—পড়ে শুনেই ও সব শিখেছে,—চাষার ছেলে নৈলে কি এত বুদ্ধি হ'ত। ওর কথা শুনে আমার নিজেরই লেখাপড়া শিখতে ইচ্ছা হয়,—তা ত এ বয়সে সংসারের খেজালতে হ'বার নয়—সে সাধ মিটাতে ইচ্ছা হয় তোকে পড়ায়ে মা—তুই আমায় কোরাণ সরিফ পড়ে শুনাতে পারবি। আলীও পড়বে। ফজলুকে বলেছি,—তার কোন্ কাজে আপত্তি আছে!"

বল্লেম "পড়বো তবে।"

মনটার মধ্যে তোলপাড় করছিল। অকপটে বলছি দোষ নিও না,—ফজলুরা এখানে আসার পরই আমার মনের এই অবস্থা,—কথায় না-কথায় তুচ্ছ বিষয়ে প্রাণে কেমন একটা তুফান তুলে দেয়,—কিছু ঠিক করতে পারি নে—ভাবের পর ভাব, চিন্তার পর চিন্তা। আমি ছাই অত কি বুঝতে পারি—না ধরতে পারি। যেটাকে এক চোখে দেখি সুবিধা,—আবার মনে হয় সেটাতে কত বাধা! ফজলুর কাছে পড়তে কত আনন্দ হবে, তার কথা শুনতে কত ভাল লাগে! না—না সেটা ঠিক হবে না, ছি! কেমন হবে,—হাজার হ'ক ওরা এসেছে সবে সে দিন! আলীও যে পড়বে—দোষ কি—আলী আমার নিকটে থাকলে আবার কিসের লজ্জা।

আলীর কৃষিকাজে মন যেত না ; সে ছোট বেলা হতেই অন্য কাজ করতে চাইত। তার বাবা তাকে তার জন্য কত বকৃতেন, বৃথা। সে মিস্ত্রীর অড্ডায় গিয়ে সাক্‌রেত হয়েছিল, আবার কবে যে তা ছেড়ে দিয়ে খলিফার দোকানে ঢুকেছিল, আমিও তা জানতেম না। সে সব কথা আমায় বল্‌ত—কেবল তার খেয়াল কাউকে জানতে দিত না।

আলী সে দিন সন্ধ্যার আগে আমার কাছে এসে বস্‌ল। সে বাড়ীতে থাকলে এ সময়টা আমরা প্রায়ই একসঙ্গে কাটাতেম। এ দিন আলীর মুখে চোখে কেমন একটা ভাব ফুটে উঠেছিল,—বড় আদরের ভাব,—চোখ দুটা যেন স্নেহে ডগমগ করছে।

বিলম্বিত কণ্ঠে আলী বল্লে "অকিরাণ !"

উত্তর দিলাম "কি ভাই !"

আলী, একটা ছোট্ট পুলিন্দা বুকের কাছ থেকে বের করে বল্লে "কিছু না,—হাই,—একটা জামা, তোর জন্যে নিজ হাতে তৈরী করেছি,—সেটা কি পরবি ?"

ছিটের একটা জ্যাকেট। কি সুন্দর কাজ, আলীর হাতেরি উপযুক্ত,—সে এর মধ্যে এমন কারিগর হয়েছে ! জামাটা তুলে নিয়ে মাথায় ছোঁয়ায়ে বল্লেম "তোমার উপহার—নিজ হাতের তৈরী জিনিষ আমি পরবো না ? তোমার মত নিজের আর আমার কে আছে আলি !"

কোন্ উচ্ছ্বাসে কথা কটা বের হয়ে গেল, নিজেই জানি না। আলীর মুখ চোখে ভাবান্তর উপস্থিত হ'ল ; আমি তখন যেন নতুন করে আমারি কথার একটা অর্থ দেখতে পেলাম। আমার মাথার মধ্যে কেমন ঝিমঝিম করে উঠল, যন্ত্রচালিতের ন্যায় সহসা উঠে 'চম্পট' দিলেম, তুলে নিতে ভুলে গেলাম প্রিয়তম বন্ধুর সাধের উপহার।

কেন তার উপহার নিয়ে এলেম না,—মনটা বড় 'বিশ্রী' হয়ে গেল,—ভারি অন্যায় হয়ে গিয়েছে ! আলীর উপর আবার রাগ ! ধীরে ধীরে আবার ফিরে গেলাম। আলী তখন কোথা চলে গিয়েছে। জামাটা তেম্‌নি পড়েছিল। তুলে নিলাম,—একবারে গায়ে পরলেম। বাস্তবিক বড়ই আনন্দ হ'ল,—সেটা যে আমার আলীর দান !

আলী কোথা হতে এসে উপস্থিত ; হেসে বল্লে "তবেই !"

বল্লেম, "কি ?"

"না,—রাগ করিস্ নি ?"

"কেন কিসে ? কার উপর আবার রাগ !"

আলীতে আমাতে আবার কত কথা হ'ল। যেমন রোজ হয় তেম্‌নি,—তার আবার বল্‌বার মত কি আছে ? তবে সেও যেন সেদিন জোর করে স্ফূর্ত্তিটা আন্‌ছিল ; আমার মনও কেমন ভারি হয়ে গিয়েছিল,—যত্ন করেই তাকে বেশী আত্মীয়তা দেখাচ্ছিলেম। মনটার কোন এক কোণে দ্বিধা যেন মাথা তুল্‌তে চাইছিল। ছি, তাকে আমি প্রশ্রয় দেব ?

আমি বল্লেম "আলী, তুমি নাকি লেখা পড়া শিখবে ?"

আলী উদাস ভাবে উত্তর করলে "কি জানি !"

বল্লেম "তোমার কথা তুমি জান না, জানে কে ?"

আলী বল্লে "আমার ও-সব সাজে কি ? ও-সব ফজলুর সাজে,—আমরা চাষা মানুষ!"

স্বরে তার অভিমান!

আমি হেসে বল্লেম "তুমি আবার চাষা হবে, ওসব সাজে যদি তোমারি! বিদ্যে নিয়েই ত তুমি আছ। পাকা খলিফা তুমি, অমন 'হুন্নারী' বুদ্ধি তোমার,—লেখাপড়া তোমার কাছে কি বড় বেশী ?"

সে খুশী হয়ে বল্লে "পড়তে হবেই ত,—খালুছাহেব বলেছেন পড়তে, তুইও সঙ্গে সঙ্গে ফজলুর পাঠশালে ভর্ত্তি হয়ে যা না!"

আমি দুষ্টুমীর হাসি তুলে বল্লেম "নাম ত আমি লিখিয়েছিই,—আমিও যে পড়ব, বাবা বলছিলেন তুমিও পড়বে, আমি ভাবলেম আমিও এ সুযোগ ছাড়ব কেন!"

আলী বল্লে "সুযোগ! দু'জনে পাল্লা দেবার মন বুঝি ?"

বল্লেম "তাই ত!"

আলী কার্য্যান্তরে চলে গেল। মনটা তখন বেশ হালকা,—বন্ধুর উপহার তখনও অঙ্গে,—আনন্দে প্রাণ ভরপুর—আলীর ভালবাসা কি গভীর! ভাবছি,—জানিনা কখন সে সমস্ত ভুলে জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেম,—মনে হচ্ছিল কেবল ফজলুর পাঠশালের কথা,—একই কথা—না না—আলী থাকতে লজ্জা কি!

মা ডাকলেন "অফিরাণ!"

চমকে চাইলাম।

মা হেসে বল্লেন "পাগলী মেয়ে, এমন মন দিয়ে দেখছিস কি? খেতে ডাকছি কতক্ষণ সাড়া দিতে কি নেই ?"

লজ্জায় মরে গেলাম। ছি!

কিন্তু কেন!

(৪)

পাকাপাকি রকমের পাঠশালা আমাদের হয়ে দাঁড়াল। রোজ রাতে ফজলু পড়াতে আসত;—ফাঁকি দেবার যো ছিল না, বাবা এসে বসতেন। ছাত্র ছাত্রী মাষ্টারের চেয়ে তাঁর আগ্রহই বেশী প্রকাশ পেত। প্রথমে অক্ষর পরিচয়ের পালা। ফজলু একই কথা বার বার বলে যেত। আলী দুবার শুনে নিয়েই আপন মনে আবৃত্তির চেষ্টা করত। আমায় নিয়ে ফজলু বইয়ের প্রত্যেক অক্ষর আঙুল দিয়ে ধরে ধরে তোতাকে বুলি পড়ানের মত পড়তে থাকত। আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতে চাইত না। বাবা আগ্রহে ফজলুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অক্ষরগুলোর নাম আউরে বলতেন—"দু'বার বল্লেই ত হয়ে যায় অফিরাণ—অ, আ!" ভারি উৎসাহ হ'ত আমার। ফজলু বলত—আমাদের দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। দ্বিতীয়ভাগ যখন পড়ি,—আলীর আগ্রহ কমে গেল, সে নানা অছিলায় প্রায়ই পড়া কামাই করত, বাবাও কেন যেন তার জন্য পীড়াপীড়ি করতেন না। তিনি নিয়মিত বসতেন। ফজলুকে ত আর তখন আগের মত আমাকে নিয়ে বকতে হ'ত না; পড়াটা বলে দিয়ে সে কখনো নিজে পড়তে বসত, বাবা এলে তাঁকে কোরাণের হদিস, আরও কত কি শোনাত, মধ্যে মধ্যে সে-সকল প্রসঙ্গ নিয়ে কত

আলোচনা হত, সেগুলো শুন্‌তে আমার বড় ভাল লাগত—কান ফেলে শুন্‌তেম। বাবা কখনও তা লক্ষ্য করে বল্‌তেন "এসব শুন্‌ছিস্ বুঝি! না—এখানে আর আমার বসা হবে না, পড়ার তোর ক্ষতি হয়।"

তা শুনে ফজলু যেন লজ্জিত হ'ত। তার পর আর গল্প তেমন জম্‌ত না। আমার মুখ রাঙা হয়ে উঠ্‌ত! রাগ হ'ত আলীর উপর,—সে কেন এমন কামাই করে, সে উপস্থিত থাক্‌লে কি এমন 'অভ্রম' হ'তে হয়?

আলীর উপর এক দিন রাগ করেই বল্লেম "তুমি বুঝি পড়্‌বে না, কেবল ফাঁকি!"

সে হেসে বল্লে "পড়ি আর কি ক'রে বল্। তুই যে আমায় ছেড়ে গেলি! এক, মৌলভী-সাহেবের জ্বালাতেই অস্থির—তুই আবার কবে বা মৌলভী-সাহেবানা ব'নে পড়াতে বস্‌বে—কাজ নাই বাপু!"

বড় রাগ হ'ল, বল্লেম "ঠাট্টা—পড়-পড় না-পড় না-পড়, আমার ত ভারী! আমিও আর পড়্‌ব না!"

আলী বল্‌লে "না—না রাগিস্ নে, আমি ত পুরাদস্তুর পড়ছি।"

"ছাই!"

"মাফ্ করিস, ও-পাঠশালে পড়া আমার 'কর্ম্ম' নয়, আমি ত নিজে নিজেই পড়্‌ছি।" শুন্‌লাম সে ও-পাড়ার নায়েব নিবারণ বাবুর কাছে পড়ে,—তৃতীয়ভাগ শেষ করে ফেলেছে,—ইংরাজীও ধরেছে!

আনন্দ হ'ল।

কিন্তু পরে যখনি আলীর অনুপস্থিতির কারণ মনে মনে আলোচনা করেছি—মনে উঠেছে অন্য কথা—ফজলুর সঙ্গে তার ব্যবহারটা ক্রমে যেমন দাঁড়াচ্ছিল, তাতে সেটাকে আর সন্দেহ কর্‌বার আমার কিছু ছিল না; তবু জোর করে ভাবতেম—"না—বৃথা সন্দেহ তুচ্ছ আমি,—আমাকে উপলক্ষ্য করে কি এতটা হ'তে পারে! আলি! ভাই আমার—শৈশবের সঙ্গী—আমারি ভুল, কিছুতেই তার মন অত ছোট হ'তে পারে না।

(৫)

সেবারে আশ্বিনের শেষে মহরম। হিন্দুর দুর্গা পূজা হয়ে গিয়েছে। পূজার ঢাক থাম্‌তে না-থাম্‌তে মহরমের কাড়াদামামা বেজে উঠেছে কিন্তু কোনটাতেই স্ফূর্ত্তি তেমন জমে উঠতে চাইছে না। আমাদের জল-ডুবো দেশ, ডাঙ্গার জল তখন নেমে গেছে, কাদা শুকোয় নি। নালা ডোবার জলে হলদে সর ভাসছে—জল বিবর্ণ। সকল জায়গাই প্যাচপ্যাচে—স্যাঁতসেঁতে আর্দ্র—পা দিতে ইচ্ছা হয় না। পাতাপাশ পচে কেমন একটা দুর্গন্ধের সৃষ্টি করেছে। ম্যালেরিয়ার তখন পূর্ণ প্রকোপ,—ঘরে ঘরে জ্বর—লোকের স্ফূর্ত্তি আসবে কোথা হতে! আমাদের বাড়ীতেও বাদ যায় নি। মার জ্বর, খালু-ছাহেবের জ্বর, জনমজুর প্রায় সকলেই পড়েছে। বাপজান বড় সাবধান, তাঁর শরীরটাও ম্যাজম্যাজ করছে—তখনো জ্বর প্রকাশ পায় নি। আমি আর আলী বেশ ভাল আছি। একা আলীই তার আড্ডার যুবকদের নিয়ে মহরমের আমোদ জমিয়ে তুলতে চেষ্টা করছিল। লাঠিখেলায় সে ভারি ওস্তাদ। এ কয় দিন রাতেও তাকে বাড়ীতে দেখা যায় না, বছর বছরই তার এম্‌নি ধারা। মাঝে মাঝে এসে বাড়ীর সব রোগীদের খোঁজ নিয়ে যায়, মুখে বলে "রোগীর বিছানায় বসে থাকা আমার কর্ম্ম নয় বাপু,—শুশ্রূষা-টুশ্রূষা আমার আসে না।"

ফজলুর মনের জোয়ার-ভাটা সহজে টের পাবার উপায় নাই। আয়োজনে যত না, কাজের বেলায় অনেক সময় তাকে যোগ দিতে দেখা যায়। সে কোন্ যাদু-মন্ত্রবলে সকলের প্রীতিসম্মান আকর্ষণ করে' প্রাণমন দিয়ে

কাজে লেগে যায়, সকলেই তাকে আপনার ভাবে। তার মত পরও কিন্তু কাউকে আমি দেখি নে—সে অত মেশামিশির মধ্যেও নিজকে কেমন একটু পৃথক করে রাখে,—কচুর পাতের জলটুকুর মত !

এ ক'দিন সে তার মামার (ফজলুর পিতার) রোগশয্যার পাশে কাটিয়ে দিচ্ছে। ম্যালেরিয়া জ্বর যখন জোর দেয় এক দম ১০৫, যখন নাই তখন নাইই ! ফজলু একটু চিকিৎসা ও জানে, যখন যেটীর দরকার তেমন শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে, আমিও তাতে যোগ দি, বাবাও সেখানে থাকেন। বাবাকে ফজলু কেমন পেয়ে বসেছে, তিনি বুঝি ওকে চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী করে রাখতে চান। মার জ্বর সামান্য, ফতেমা বিবি তাঁর কাছে থাকেন ;—আবশ্যক হলে আমরা যাই। খালু-ছাহেব যখন একটু ভাল থাকেন, ফজলু কথায় কথায় কত কথা পাড়ে, বাবা কিনা সে সব শুন্‌তে ভালবাসেন ! মহরমের কথাই হচ্ছিল। ফজলু সতী সখীনার কথা কেমন জ্বলন্তভাবে বলে যাচ্ছিল,—কি মেয়ে ! ভালবাসা তার কি গভীর, সে কেমন জেনেশুনে প্রেমের গরবে মরণকে বরণ করে নিলে, কি ভয়ানক বিবাহ ! শুন্‌ছিলেম আর ভাব্‌ছিলেম,—কল্পনায় ধর্‌তে পার্‌ছিলেম না,—সখীনার প্রাণ কত বড় ! বাবা সহসা আমায় সেইটাই প্রশ্ন কর্‌লেন,—"অকিরাণ বল্‌ ত সখীনা কেমন মেয়ে ? কাজটা কি তার ভাল হয়েছিল !"

চম্‌কে উঠলেম, উত্তরটা মনে এসেও মুখ ফুটে বের হল না। বাবার উপর বড় গোসা হল।

বাবা নিজেই বলে যেতে লাগ্‌লেন "হাঁ বীরের বিবি হবার উপযুক্ত মেয়ে বটে ! বিয়ে ত ওখানেই ; যাকে সে মনে প্রাণে বরণ করেছে, মৃত্যু তার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে বলেই কি সে তাকে ত্যাগ করতে পারে ! মহাবীর হোসেনের চেয়ে কি সখীনার মনের বল কম !"

সেই সাদাসিধে কথা কটায় সখীনার পূর্ণ পরিচয় প্রাণে আমার জাগিয়ে দিয়ে গেল ! বুক ভরে নিশ্বাস নিলাম,—শরীর মন কেঁপে উঠ্‌ল। মনে মনে আদর্শ-সতীকে শত সহস্র প্রণাম কর্‌লেম।

ফজ্‌লু একেবারে চুপ্‌ ; কিছুক্ষণ পরে সে উঠে গেল। বাবা বারান্দায় বেরিয়ে আমায় ইসারা করে ডাক্‌লেন ; মাথায় হাত দিয়ে আদর কর্‌লেন। সহসা সে সোহাগের কারণ খুঁজে পেলেম না। বল্লেন "মা, অকিরাণ।" স্বর থেমে গেল ! কতক্ষণ পরে আবার বল্লেন "এত কথাও আমাদের বই কেতাবে আছে ! এ সব কথা সকলকে শোনাবার মত লোক চাই মা। আমরা—চাষা—চাষার ছেলেমেয়ে তাই বলে আর লেখাপড়াকে অবহেলা কর্‌লে চল্‌ছে না,—সবাইকে পড়াতে হবে,—শিখ্‌তে হবে, কি বলিস্‌ অকিরাণ ! একটা ইস্কুল হলে না গ্রামের মঙ্গল।"

কতকক্ষণ কি ভাব্‌লেন, বল্‌লেন "হাঁ শুধু তা' হলেই হবে না,—ফজুর মত পণ্ডিত চাই ! কত কথা জানে ! না পড়্‌লে কি ওর অত বুদ্ধি হ'ত ! কিন্তু ওর ত অত ফুরসুত হবে না। হালচাষ ছেড়ে ও পণ্ডিত হতে চায় না ! সত্যিই ত,—পড়াশুনা কর্‌লেই কি ক্ষেতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্‌তে হবে। ফজু বলে ওইটাই হচ্ছে,—আজকালকার লেখাপড়া শেখার দোষ,—সবাই "বাবু" হতে চায়, —চাষ আবাদ ছাড়্‌লে চাষার আর রইল কি !"

ফজ্‌লুর প্রশংসায় বাবা তন্ময়। আমি তাঁর ডগমগ চক্ষে বিভোর হয়ে আত্মহারা হয়ে গেছি,—কি স্নেহপ্রবণ পিতৃ হৃদয়,—পরের ছেলেকে তিনি কত ভালবাসেন !

বাবা বল্লেন "সে অন্যত্র গুরুগিরী করুক আর নাই করুক, তোর শিক্ষার ভার সে নিয়ে,—আমায় কত খুসী করেছে। ছেলের মত বাধ্য ও আমার। ওর প্রতি আমাদের যেন কর্ত্তব্যের ত্রুটী না থাকে।

গুরু ও তোর,—এবারে মহরমের শুভদিনে তোকে ওকে গুরুদক্ষিণা দিতেই হবে,—বাহিরেও ত একটু কৃতজ্ঞতা দেখাতে হয়।”

ওগো, বুক আমার দুরু দুরু কেঁপে উঠ্‌ল;—মাথার আমার ঠিক ছিল না,—বাবা যা এর পর কি বল্লেন! বাঁচ্‌লেম—বাবা বল্লেন “শুভ মহরম—এবারের ধুতি চাদর তুই ফজুকে নিজ হাতে দিবি—ছাত্রীর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন,—কত খুসী হবে ও।”

কাজেও হ'ল তাই। ‘মঞ্জিল মাটী’র দিন, দুপুরে আলী তখন বাড়ী এসেছে। বাবা তাকে নিকটে ডাক্‌লেন। নতুন ধুতি কোর্ত্তা উষ্ণীষ তার হাতে দিয়ে, পিঠে হাত রেখে আদর করে বল্লেন, “এবারে বুঝি বাপজানের আখড়া বেশ জমে উঠেছে। বেশ বেশ, মহরমে লাঠি খেলাটা চাইই ত,—আমাদের সময়,—ওঃ কি খেলাই হ'ত। যা হ'ক তুমি ওটার নাম রেখেছ। কোর্ত্তাটার লাল রংটা আমি নিজে পছন্দ করেছি,—দলপতির বেশে ওটা মানাবে ভাল, ঠিক্ হয় নি কি আলি!”

আলীর মুখের ভাবেই বলে দিচ্ছিল, প্রশংসায় সে খুসী হয়েছে; সে তাঁকে সেলাম করে' সম্মতি জানাল; বাবা খুসী হয়ে বল্লেন, “আলীকে আমাদের সত্যি বড় সুন্দর মানায়। ফজু, তুমি খেল না?”

ফজ্‌লু মাথা চুল্‌কাতে চুল্‌কাতে বল্লে, “আজ্ঞে, খেলি কালেকস্মিনে কখন।”

আলী বল্লে “সবারই ত তাই। আখড়ায় যে শুন্‌লেম তোমার নাম খুব ফুটে বেরিয়েছে,—শনিবারে নাকি খুব এক হাত খেলে এসেছ!”

ফজ্‌লু হেসে বল্লে “খুব এক হাত আর কি ভাই। ফতেপুর থাকতে ও-বিদ্যাটার যৎকিঞ্চিৎ আয়ত্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেম। জমীদারের অত্যাচার ত ওখানে কম নয়। লুটেপুটে যখন নিতে আসত,—তখন লেঠেলের বিরুদ্ধে একটুখানি মাথা তুল্‌বার বল না রাখ্‌লে কি রক্ষে ছিল! ও-বিদ্যাটা সময়ে অনেকে বাঁচিয়েছে, আবার দুঃখ দিতেও কম করে নি; ওর জন্যেই জমীদারের অত্যাচারে কপর্দ্দকহীন হতে হয়েছিল আমাদের! সে দিন সবাইকে খেল্‌তে দেখে সখ হ'ল—অত করে শিখেছিলেম সেটাকে, তার মরচে ময়লা একটু মুছে ফেলি,—বছর-কার দিন, মান ইজ্জতের মালেক ও,—লাঠীখানা ত ছুঁতেই হয়।”

বাবা উৎসাহে বলে উঠলেন “ওই ত চাই ফজু, তোমার সব দিকেই সমান দৃষ্টি বাবা! আজ ‘কারবালায়’ তোমায় খেল্‌তেই হবে, দুই ভায়ে গ্রামটার নাম রাখ। আলি, কি বল!”

আলী কোন উত্তর করলে না; তার মুখখানা কাল হয়ে গেছে। বাবা সেটা লক্ষ্য না করে বল্‌তে লাগ্‌লেন “ফজুর কোর্ত্তাটার রংটা পছন্দ করেছি, ফিকে সবুজে। গৌরবর্ণে মানবে বেশ! বলি, আজ পরীক্ষা হবে কে কার গুরু। আলি, আজ কিন্তু আমি তোমাদের গুরু দক্ষিণার বন্দোবস্ত করেছি, বুঝলে,—আজকার ‘রণ-সজ্জা’ ফজু পাবে তার ছাত্রীর হাত থেকে। ঠিক হবে না কি আলি? কাপড় চোপড়গুলো আন্‌ত অঙ্কিরাণ!”

আমি একটুকুও দ্বিধা না করে সেগুলি এনে তখনি হাজির করলেম। আলীর মুখের ভাবটা দেখে আমার ভারি ‘বিশ্রী’ লাগ্‌ছিল। ছি! সে কেন এত ছোট হবে! তাকে আঘাত করতে আমার মন তখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল,—হ'ক না সে আমার প্রিয়তম বাল্যসঙ্গী,—তার সে ঈর্ষা দৈন্য ক্ষমার অযোগ্য!

ফজ্‌লুর পদপ্রান্তে কাপড়গুলো রেখে সেলাম করতেই সে দু'হাত সরে গিয়ে বলে উঠ্‌ল—“আ—ও—কর কি—কর কি!”

বাবা হেসে বল্লে "ও ঠিকই করেছে,—ওটা তোমারি প্রজা।"

মাথা তুলে দেখি আলী সে স্থান পরিত্যাগ করেছে।

বড় রাগ হ'ল,—দুঃখও হ'ল,—বছরকার দিনে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে একি খেলা খোদা!

(৭)

খেলার আসরে আলীর গোস্তাকি দেখে একবার মরমে মরে গেলাম। সে আমার বাবার, অমন স্নেহের অপমান করতে সাহস করেছে। আলি কোর্তা কাপড় কিছুই পরে নি। বারে বারে নতুন বস্ত্র পরে এসে, সে তার বাবাকে, আমার বাবাকে সেলাম করে' তবে গিয়ে লাঠি ধরত, এবারেও তার বাবা সেখানে উপস্থিত ছিলেন—আলী তাঁর আশীর্বাদ নেওয়া আদবেই দরকার মনে করে নি!

খেলার উৎসাহ তার একটুও কম দেখলেম না; ঘুরে ঘুরে ক্ষিপ্র গতিতে লাঠির অপূর্ব্ব কসরৎ দেখিয়ে দর্শকগণের সে আন্তরিক প্রশংসার উদ্রেক কর্‌ছিল, সকলে উৎসাহে আত্মহারা হয়ে উচ্চৈস্বরে তাকে 'বাহবা' দিচ্ছিল। অমন পুষ্ট সুন্দর দেহ, 'ব্যাসন' দিয়ে ঘসা ফুরফুরে বাবরি তার দেহ গতির তালে তালে উঠ্‌ছিল, পড়ছিল, কি সুন্দর! আমার চোখদুটো পড়েছিল আলীর উপর।

বাবা বলে উঠ্‌লেন। বাহবা বেটা, সুন্দর মানিয়েছে, তুমি তবে পরেছ........।"

চেয়ে দেখি, ফজলু বাবার দেওয়া জামা-কাপড় পরে তাঁকে সেলাম করছে! এর পূর্ব্বে বাবার মুখের পানে চাইতে পারি নাই,—তাঁর মুখের গম্ভীর ভাব দেখে মনে হচ্ছিল,—তিনি আলীর ব্যবহার লক্ষ্য করে ক্ষুন্ন হয়েছেন। ফজলু তাঁর ইচ্ছাকে মান্য করেছে দেখে তাঁর স্বাভাবিক প্রসন্নতা ফিরে এসেছে দেখলেম,—একজন তাঁকে দিয়েছে—অবিশ্বাস অনাস্থা,—এ ত তাঁকে অগ্রাহ্য করে নি!

ফজলু আমার সামনে এসে হেসে বল্লে, 'তোমার দানকে আমি শ্রেষ্ঠ বলে মেনেছি। মামুর (বাবার) ইচ্ছা আমি খেলি,—তাঁর ইচ্ছা আদেশের বেশী, খেল্‌তেই হবে, কি বল?"

বলা কহার প্রবৃত্তি তখন আমার ছিল না। আলীর পানে ফিরে চাইলেম,—সে স্থির দৃষ্টিতে ফজলুর দিকে চেয়ে আছে!

ফজলু আসরে দাঁড়াতেই কাড়া দামামা বেজে উঠ্‌ল——দর্শকগণ হো হো শব্দ করে উঠ্‌ল! ফজলু সহৃদয় কৃষক,—চেহারা তার লম্বা চওড়া—নিটোল—দেখ্‌বার মত,—লাঠি, ঢাল হাতে করে' সে যে ভঙ্গীতে আসরে দাঁড়ালে,—তাতে উৎসাহ দিতে মন আপনি চায়! আলী ফজলু মাণিক জোড়, দুই ভাই—তাদের মনের মিল সেই শুভদিনে ঘটিয়ে দাও খোদা!

ফজলু কুর্ণিশ করে' বল্লে "আদায় ভাই চাহেব, সেলাম সদ্দার জি—আলী মহম্মদ আলেকম!"

দর্শকগণ আবার হাঁকল। আলী এগিয়ে এসে,—লাঠি বাগিয়ে 'পাঁইতারা' করে' সেলাম জানাল। ফজলুও উত্তর দিল লাঠিতে। দু'জনে খেলা আরম্ভ হ'ল। চমৎকার শিক্ষা। দু'জনে কি ক্ষিপ্র গতিতে নৃত্য ভঙ্গীতে লাফিয়ে লাফিয়ে কত রকমে লাঠির কসরৎ করে' একে অন্যকে আক্রমণ কর্‌ছিল; সম্পূর্ণ মানুষটাকে দেখা যাচ্ছিল বটে,—হাত পা তাদের পৃথকভাবে নজরে ধর্‌বার সাধ্য ছিল না; লাঠি অদৃশ্য-প্রায় হয়ে বোঁবোঁ শব্দে ঘুরছিল,—লাঠিতে লাঠিতে, ঢালে লাঠিতে আঘাতের শব্দ উত্থিত হচ্ছিল। খেলার একটা 'পাঁচ' হয়ে গেলে

প্রতিরোধকারী মুহূর্তে আক্রমণকারী হয়ে অগ্রসর হচ্ছিল ;—তাদের লম্ফঝম্ফ দেহগতি দর্শকের প্রাণেও উৎসাহ তরঙ্গ তুলে এ পক্ষে, ও পক্ষে সহানুভূতি, অনমুরক্তির সৃষ্টি কর্‌ছিল,—দর্শকগণ ওদের জয় পরাজয় কল্পনা করে' থেকে থেকে চীৎকার করে মনের মত খেলয়াড়কে তারিফ কর্‌ছিল। আলী এক একটা 'প্যাঁচের' কস্‌রৎ,—'চা'ল' চেলেই হুঙ্কার ছেড়ে দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ কর্‌ছিল,—ফজ্‌লুও প্যাঁচের শেষে, সশব্দে বায়ু মুখ গহ্বরে টেনে নিয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বীর নতুন প্যাঁচের কসরতকে প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত হবার জন্য, কি অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে পেছু হটে আস্‌ছিল,—সকল সময়েই দু'জনের মুখ সামনা সাম্‌নি—আলীর এক একটা আক্রমণ ব্যর্থ করে' সে অনুচ্চ বিলম্বিত স্বরে উচ্চারণ কর্‌ছিল—বাঃ-আঃ! বহু চেষ্টাতেও আলীর লাঠি ফজলুর কেশ স্পর্শ করতে পার্‌ল না। ফজ্‌লুর সে চেষ্টা বড় দেখা গেল না, তার আক্রমণ প্রবৃত্তি অপেক্ষা নানাপ্রকার 'প্যাঁচ' কসরৎ দেখাবার চেষ্টাই যেন অধিক ; সে কেবল আত্মরক্ষা করেই চল্‌ছিল। অনেক চেষ্টায় আলী একবার ফজ্‌লুকে বাগে পেল বলে' মনে হ'ল,—সে ফজ্‌লুর শির লক্ষ্য করে শরীরের সমস্ত জোরে লাঠি ঝাড়্‌লে,—ফজ্‌লু ঝাঁ করে' বসে পড়্‌লো,—সরে দাঁড়াল নিমেষ মধ্যে! আলীর লাঠি বোঁ শব্দে ঘুরে যেতেই সে আর নিজের দেহগতি সাম্‌লে নিতে পার্‌লে না,—হুঁচোট খেয়ে পড়ে যাবার মত হ'ল। ফজ্‌লু সে সুযোগে এক লাফে তার পিঠ্ ডিঙ্গিয়ে একটা কুর্ণিশ করে দাঁড়িয়েই হুঙ্কার ছাড়্‌লে,—আলী সোজা হয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই তার সম্মুখে এসে খেলার কস্‌রতে দস্তুর মত কায়দা করে' সেলাম জানাল,—দর্শকেরা নানা শব্দে চেঁচাল ; ফজলু সেলাম দিতে দিতে দর্শকের সম্মুখে এক চক্র দিয়ে তড়িৎ গতিতে এসে দাঁড়াল বাবার সামনে,—হাতের লাঠি তাঁর পায়ের কাছে রেখে কুর্ণিশ করল। আলী উঠেই যেন একটু থম্‌কে দাঁড়াল। রোষ কষায়িত নেত্রে চকিতে ফজ্‌লুর কাণ্ডটা দেখে নিল। বাঘের মত লাফিয়ে এসে পড়্‌ল ফজ্‌লুর সামনে,—আবার প্রাণপণে লাঠি ঝাড়্‌লে ফজ্‌লুর শির লক্ষ্য করে'। ফজ্‌লু ঢাল দিয়ে লাঠিটা ঠেকিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে "একি বন্ধু! ফজ্‌লু দুধের ছেলে নয়, সে তোমার জন্যে প্রস্তুত ছিল,—লাঠি মামুর পায় লুটিয়ে দিয়াছি,—ঢাল হাতেই আছে তোমার জন্যে! আর কোন বিদ্যা না থাক, ঠেকাবার বিদ্যাটা অর্জ্জন করতে হয়েছিল আমাকে বিধি মতে। জমীদারের পাইকদের গায়ে আমার লাঠি পড়েছে কমই,—তাদের লাঠি ঠেকিয়ে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে অনেক বার। এ হাতে ঢাল, লাঠি থাকলে অজস্র ঢেলা বৃষ্টিও ব্যর্থ হয়ে গেছে—একটিও তার ফজুর অঙ্গ স্পর্শ কর্‌তে পারে নি।"

আলী ফুল্‌ছিল ; সে বল্লে "বীরের লক্ষণ বটে! খালুর পা ধরে আজ বেঁচে গেলি!"

ফজলু বল্লে "তাই!"

বাবা গর্জ্জে উঠ্‌লেন ; ধমকে বল্‌লেন "চুপ কর আলী, যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়েছিস্। আর জাহির করিস্ না। গায়ে জোর থাক্‌লেই বীর হয় না। তোর লজ্জা হচ্ছে না,—আমি তোর ব্যবহারে লজ্জায় মরে গেছি!"

সত্যিই আলী সে দিন লজ্জার মাথা খেয়েছিল, সে সেদিন গুরুজনের সম্মান রাখ্‌তেও ভুলে গেল,—সামনে সামনে বাবাকে মুখে মুখে উত্তর দিল "এখন কত কথাই শুনব—যাকে দেখ্‌তে পারি না তার চলন বাঁকা।"

বাবার মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল। তিনি কিছু বল্‌লেন না। ফজলু বল্লে "শতবার ঘা'ট হয়েছে আমার ভাই, ওঁকে কেন ওসব কথা বলছ।"

বাবা বল্‌লেন "বল্‌বে না,—ওর মুখে এখন অমন কথাই শোভা পায়। যে লোক কোন কাজের নিয়ম দস্তুরের মান রাখে না,—সে সংসারে কারো মান্ রাখ্‌তে পারে না—নিজেরও না। আমরাও ত এক সময়ে খেলেছি,—

খেলার নিয়ম কানুন হ'তে এক চুল এদিক ওদিক হ'লে নিন্দার অবধি থাকত না, মুখ দেখান দায় হ'ত। আর আজ কিনা আলী সেই অপরাধ করে' তা নিয়েই গর্ব্ব করছে!"

আলী ব্যর্থমনোরথ হয়ে তখনো রাগে ফুলছে। দর্শকেরা সব সে দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আলী একবার তাদের দিকে চাইল। সে উচ্চৈস্বরে কান্নার—না রাগের সুরে বল্লে "আমি এমন কি অপরাধ করেছি যে আমায় এত লোকের মাঝে অপমান করছেন!—যেন খুনে আসামী আমি!"

বাবা বল্লেন "খুনে আসামী নও ঠিক কিন্তু ফজলুর ঢালখানা হাতে না থাকলে একটা খুন হ'তে কিছুতেই আটকাত না! কি অপরাধ করেছ? কোন্ নীতিতে তুমি, হাতে যার লাঠি নাই, রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে তার মাথায় ৮২ শিক্কা ওজনে এমন জোরে লাঠি হাঁকালে? ঢালখানার অবস্থা হয়েছে কি দেখ ত—চামড়াটা একবারে ফেটে গেছে,—ভাব ত ওটা ওর হাতে না থাকলে এখন এখানে কি দেখতে হ'ত!"

আলী কোন উত্তর দিল না, পিছু হটে দাঁড়াল। বাবা একটু উত্তেজিত হয়েছিলেন; তিনি বলতে লাগলেন "রাগের কথা নয় আলি! তোমার অনেক গুণ! অমন খেলতে পার—আখড়ার উপযুক্ত ওস্তাদ তুমি—তুমিই যদি খেলার নিয়ম ভঙ্গ কর তবে কি আর "সর্দ্দার" "সেঠেল" বলতে চাষার প্রাণ যে গর্ব্বে ভরে ওঠে, সেটার গৌরব থাকবে? ওটা হয়ে দাঁড়াবে—খুনখারাবং, দাঙ্গাহাঙ্গামা, লুটতরাজ ডাকাতির কসরৎ—জেহাদ হবে পৈশাচিক মানুষ মারার জাহান্নম!"

ফজলু বল্লে "মামু, আলী অত ভাবতে পারে নি—খেলার ঝোঁকে একটা কাজ করে বসেছে,—ওকে ক্ষমা করুন।"

বাবা বল্লেন "অই ঝোঁকটাই খারাপ। ঝোঁকে যে নিজকে ভুলে যায়, পরের কথা মনে রাখতে পারে না—সে কি মানুষ! খোদা না করুন, ওর যদি এ স্বভাব না শোধরায়, দেখো—তাহ'লে এই এক দোষে সব গুণকে ওর ঢেকে ফেলবে! ও আজ আপনার গর্ব্বে কতদূর অন্ধ—বুঝতে পারছে না, সবাই যা বুঝছে,—আজ তুমি ওকে কি ক্ষমাটাই করেছ! যে শিরের গরমে ও-তোমার শির নিতে ব্যস্ত, আজ যদি তুমি ও-হতে তবে এতক্ষণ ওর সেই উদ্ধত মাথা থাকত কোথা? যখন ও হুঁচোট খেয়ে পড়ল, তুমি যদি ওর শির লক্ষ্য করে ৮২ ওজনে ঝাড়তে তবে? তুমি ওর আক্রোশটা একদম ক্ষমা করে' কসরৎ দেখিয়ে ওকে লাফিয়ে পার হলে, হেসে সেলাম করে দাঁড়িয়ে বুঝিয়ে দিতে চাইলে ওর গোঁয়ারতুমি,—ও বুঝল অন্য—বিধিমত বাগে পেয়ে যে ক্ষমা করলে, আর ও এসেছে অবিধিতে তারি মাথা ফাটাতে!"

দর্শকগণ হাঁকল "তোবা তোবা!"

শরীর আমার তখন ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে—বাবা কেন আর ওকে বৃথা রাগাচ্ছেন! আজ এত লোকের সামনে.........

ফজলু ঝাঁ করে আলীর সম্মুখে এসে দাঁড়াল, বল্লে "ভাই আলি! মাফ কর ভাই, আমি খেলতে না এলে ত আর ও সব হ'ত না। মামু, এককালে ওস্তাদ খেলয়াড় ছিলেন, তাই তাঁর ওটা এমন বেঝেছে। কিছু মনে কর না ভাই। তাঁর ওটা বকুনী নয়—উপদেশ বলেই নিও। ভাই ভাই আমরা আমাদের মধ্যে আবার বিবাদ কি! ও একটা খেলার কসরৎ। এস আজ বছরকার দিনে দু ভাইয়ে মিলে এঁদের সেলাম করি।"

আল্লা! ভাবছিলেম—আলী, ফজলুর কথা বা কি ভাবে গ্রহণ করে। পাছে না ভাবে এটাও তাকে অপমান করবার আর একটা কায়দা। কিন্তু ফজলুর স্বরে এমন একটা সুর ধ্বনিত হচ্ছিল, সেটা আলী ও-অবস্থাতেও ভুল করলে না; সে নরম হয়ে বল্লে "ভাই ফজলু, তোমার খেলাকে আমি ত তারিফই করেছি, খেলে যদি সুখ তবে তোমার মত খেলয়াড়ের সঙ্গে খেলেই! কিন্তু খালুছাহেব ত আমার দুঃখ বুঝলেন না। তুমি খেলতে এসে আমায় রেহাই দিতে গেলে কেন! ওসময় আমার শিরে লাঠি ঝাড়তেও যদি সেই ছিল আমার সুখ!"

আলীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। তার মনোভাব ফজলুর বুঝতে বাকী রইল না। সে আলীর হাত ধরে বল্লে "চল ভাই, আর এক হাত খেলা যাক্।"

আলী তাতে আপত্তি করল না। কতক্ষণ কি খেলা হ'ল আমার সে সব দেখবার প্রবৃত্তি ছিল না। মনে প্রাণে আমার প্রার্থনা জাগছিল—"হে আল্লা, আজ এ মজলিস-মাটীর দিনে, ওদের সকল দ্বন্দ্ব-কলহের শেষ হক।"

(৭)

স্নান আহারের সাবধানতা বাপজানকে জ্বরের হাত হতে রক্ষা করতে পারল না। বাবার এক দিন জোর জ্বর এল। সর্দ্দি, সর্ব্ব শরীরে অসহ্য ব্যথা! ইদানীং ফজলুর রোগী দেখে অবকাশ ছিল না। সে সংসারের কাজের অবসর করে কেবলি রোগী দেখে ফিরত। বাবা অনেক সময় তার সঙ্গে যেতেন। সে ফিরে এসে বাবার জ্বরের অবস্থা সব শুনেই বল্লে "হয়েছে! বোধ হয়—'সমর-জ্বর!" পরীক্ষাতেও প্রমাণিত হ'ল তাই। ফজলু দু'দিন ঔষধ দিয়ে তিন দিনের দিন বল্লে "নাঃ, ডাক্তার ডাকতে হচ্ছে। বুকে অত ব্যথা—আমার হাতে রাখতে আর সাহস হয় না।"

শুনে বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল, তবে কি বাবা আমার বাঁচবেন না! সমর-জ্বরে রোজ রোজ কত লোক মারা যাচ্ছিল!

ডাক্তার আনা বল্লেই আমাদের দেশে ডাক্তার আনা নয়! দু'ক্রোশ দূরে একটী মাত্র ডাক্তার! সময় মত তাঁকে পাওয়াই দায়।

আলী গিয়ে নৌকায় করে ডাক্তারকে নিয়ে এল। ডাক্তার কি বল্লেন আমাকে জানতে দেওয়া হ'ল না। তবে বুঝলেম বাবার এবারের অসুখ শক্ত! ভিজিটের টাকা গুণে নিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন। অমন ডাক্তার আমার কি ফল? তাঁকে বাঁধা-বাঁধি রাখতে না পারলে—তিন দিনেও একবার তাঁর দেখা পাবার উপায় নাই। অবস্থা ব'লে ঔষধ আনতে কখনও দিনটা কেটে যায়, তিনি বাড়ী থাকলে-না ব্যবস্থা হবে?

বাবা বল্লেন "কেন বাবা তোমরা ব্যস্ত হচ্ছ! খোদাতালা ভরসা। অমন ডাক্তার এনে আর বেশী কি হবে বল? একবার দেখে গেলেন, ভাল, ফজু তুমিই আমায় দেখ বাবা, কত লোক ত তোমার হাতে ভাল হয়েছে। রোগী না দেখে চিকিৎসার চেয়ে তোমার চিকিৎসাতেই বেশী ফল হবে—আয়ু যদি থাকে!"

নিওমনিয়া—একটা বুকে ছিল—দুটোতে ধরল। ফজলু বল্লে "না—আবার ডাক্তারকে ডাকতে হয়।"

আবার ডাক্তার আনার কথা শুনে বাবা আলীকে, খালুকে ডাকলেন। মা, আমি, ফতেমা বিবি, ফজলু সব সেই ঘরে। সকলে একত্র হলে, বাবা আলীর দিকে চেয়ে বল্লেন "আলি, বাপজান আমার! তোমাকে আমি

নিজের ছেলের মতই দেখেছি,—তুমিও আমাকে সেই চোখে দেখ। অফিরাণ তোমার খেলার সাথী, তোমার নিজের বোন্। ওকে তেম্নি দেখো বাবা!"

আলী উতলা হয়ে উঠ্ল, তাড়াতাড়ি বল্লে "ও-কথা কেন বল্‌ছেন খালু-ছাহেব, আপনার এমন কি হয়েছে?"

বাবা হাস্‌লেন, বল্লেন সময় যদি হয়েই থাকে, তাহ'লে আট্‌কাবে কিসে? দুঃখই বা কি? বাঁচি ভাল,—সময় থাক্‌তে কর্ত্তব্য যা ক'রে যাই!"

ওগো, বুক আমার তখন ফেটে যাচ্ছিল; বাবা আর কা'কে কি বল্লেন আমার কানে পৌঁছায় নি।

তিনি যখন আমার হাতখানা বুকের উপর টেনে নিলেন, তখন চমক ভাঙ্গল। বাবা ডাক্‌লেন—"মা অফিরাণ!"

"বাবা!"

বাবা আমার মুখের পানে চেয়ে বল্‌লেন "ওকি কাঁদছিস্ কেন? বাবা কি সকলের চিরকাল থাকে মা যদি নাইই থাকি তবে এখন থেকেই কাঁদবি! আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি মেয়ে মানুষের যাতে জীবন সার্থক হয়,—তোর চিরজীবনের সঙ্গী তেমনি হ'ক। ফজলুর গুণের সীমা পাই নি আমি,—আমি তোকে ওর হাতে সঁপে দিয়ে যাচ্ছি মা! কনেকে আমাদের সমাজে কবুল হতে হয়,—তুই বল্ মা, ফজুকে তুই গ্রহণ কর্‌লি?—লজ্জা করিস্ নে, ফজুর অসম্মতি নেই।"

মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লেও বোধ হয় আমি তখনকার মত অত বিস্মিত, কম্পিত, অপ্রকৃতিস্থ হতেম না! কপাল ফুটে ঘাম বেরুতে লাগ্‌ল।

ভুলে গেলাম সব!—ফিরে চাইতেই আলীর মুখের উপর দৃষ্টি পড়্ল! রক্তহীন—পাংশুর! কি যেন কেন আমি বলে ফেল্লাম "না, আমি বিয়ে করব না,—আজীবন কুমারী রইব।"

বাবা বল্লেন "ছি, ও কি কথা মা, ওটা মেয়ে মানুষের ধর্ম নয়!" বুক হ'তে আমার হাতখানি উঠিয়ে ফজুকে নিকটে ডাক্‌লেন, তার পাণিতে আমার পাণি যুক্ত করে বল্‌লেন "ফজু, অফিকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম, দেখো—বিবির সম্মান সকলের ওপরে—সেটা অক্ষুণ্ণ রেখ!"

ফজুর নয়নের জল গড়িয়ে এসে আমাদের যুক্তপাণি স্পর্শ কর্‌ল।

বাবা ডাক্‌লেন "আল্লা, মালেক!"

তখন বাষ্পে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ, চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপ্সা হয়ে গিয়েছে!

(৮)

মোল্লাকে প্রকাশ্যে সাক্ষী করে, দান কর্‌বার পূর্ব্বে অন্তর্যামী আল্লাকে সাক্ষী করে যাকে আত্মোৎসর্গ করেছিলেম, বাবা আমাকে তার চরণে উৎসর্গ করে জগতের শ্রেষ্ঠতম সুখ দিয়ে গেলেন কিন্তু প্রাণের হাহাকার থাম্‌ল না। বাবার কথা মনে হয়ে জগৎ যে অন্ধকার দেখি। ওরও সেই অবস্থা। দুরন্ত সময়-জ্বর শাশুড়ীকেও অনন্তধামে নিয়ে গেছে! দু'জনেই সম দুঃখী,—চক্ষের জলে গলে মিলে এক হই—মরণের আঘাতে সুখ আমাদের সেইটুকু!

সংসারে এমনও হয়। তুচ্ছকে বড় করে এত কোলাহল! আলীর অত গুণ, অমন প্রাণ ভরা স্নেহ—এক ঈর্ষায় সব ঢেকে ফেলে দিল। সে প্রতি পদেই ওকে অপদস্থ কর্‌বার সুযোগ খুঁজত। ও যেন উড়ে এসে যুড়ে

বসেছে—আমাদের সংসারে সকলেরি সেই ভাব, আশ্চর্য্য, মা পর্য্যন্ত ভাবতে পারেন না আমি যেমন তাঁর, ওও যে তেম্‌নি আমার আপনার—ও তবে এ সংসারে পর কিসে? বোধ হয় মার ইচ্ছা ছিল অন্য—আলীর তুলনায় ওকে যেন তিনি দূরেরই বলে ভাবতেন। বল্‌বে আমি এক চোখো! হ'তে পারি—অকপটে বল্‌ছি—ওর এত অনাদর আমার আদবেই ভাল লাগে না অথচ আমাদের সংসারের চেষ্টাই ওকে অপমান করা। ও চাষা,—আলী জমীদারের সরকার। লিখতে পড়তে শিখে নিবারণ বাবুর অধীনে একটা মহালের তহশিলদারী করে, ওদের ত আর তা করলে চলে না; ওর সে ইচ্ছাও নয়। আগে বর্গায় জমী আবাদ করে যে সন্তুষ্ট ছিল, এখন নিজের জমী পরকে দিয়ে আবাদ করাতে কি তার পরিতৃপ্তি হ'তে পারে,—লাভই বা কি তাতে? পরিশ্রমের তাতে লাঘব হ'তে পারে, লক্ষ্মীর কৃপা বেশী কি আর চাকুরীতে? দশ টাকার তহশিলদারী লোক ঠকিয়ে উপরি-পাওনা নাহয় পঞ্চাশ টাকা! নিজকে অতখানি হেয় করে টাকা! কিন্তু সংসারের বুঝ ত অন্য রকমের, তাঁদের চক্ষে তহশিলদার ভদ্র;—চাষী—চাষা,—চাষার ছেলে চাষা নামে এত ঘৃণা, অপমান বোধ! শুধু এ টুকু হলেও ওদের গায়ে বাধত না। লোকের কথায় ও টল্‌বার নয়। আলীর বাবা এখন বল্‌তে আরম্ভ করেছে,—জোতজমা সংসারে অর্দ্ধেক ভাগ তার। মাকে তার কথার প্রতিবাদ করতে শুনিনি! 'ওবা' বলে তা' হয়ই যদি ক্ষতি কি? আলীকে যখন সর্দ্দার (বাবা) পুত্রের মতন পালন করেছিলেন আমাদের বিয়ের পূর্ব্বে সে কথা বলেও ছিলেন,—শাশুড়ীর যদি আপত্তি না থাকে অর্দ্ধেক ওদের দিতে পারেন।"

কার্য্যতঃ ভাগাভাগি হয়ে গেলে ভালই হ'ত। সেটা আলীদের ইচ্ছা ছিল না, তারা চায় ষোল আনা। ওর কাছে সেটা হবার উপায় ছিল না, অন্যায় আব্দারের প্রশ্রয় দেবার লোক ও নয়। ফলে রেষারেষি ক্রমেই চরমে উঠছিল। এমন সংসারে কি সুখ-শান্তি থাকে,—না লোকের কাছে মানসম্ভ্রম বজায় রাখা সম্ভব হয়! সর্দ্দার-পরিবারের নামে গ্রামের লোক চিরকাল সম্ভ্রম করে এসেছে; তারাই অসাক্ষাতে আমাদের কুৎসা রটাতে আরম্ভ করলে—যা ঘটে তাও—যা ঘটে নি তাও অনুমান করে নিয়ে পরনিন্দার বিকট আনন্দ-রসে মাতবার সুযোগ লোক ছাড়বে কেন? ও যেটাকে সব চেয়ে ভয় করত তাকে এড়িয়ে চল্‌তে চাইলে কি হবে, বাড়ীর লোকেরাই যে তাতে ধোঁয়া দিচ্ছিল! বর্ব্বর আলী বুঝত না সে সংসারটাকে ছারখার করতে বসেছে! বাল্যসখা প্রিয় আলীকে বর্ব্বরই বল্লেম—বর্ব্বর সে পূর্ব্বে ছিল না—লেখাপড়া শিখে সে বর্ব্বর ব'নেছে! বিদ্যায় দিল শেষে পাটোয়ারী-বুদ্ধি, এই জন্যই না আমরা চাষারা পড়াটাকে এত ঘৃণা করি—অগাধ সমুদ্রের বিন্দুমাত্র জলে এত লোনা, রত্নাকর অগাধ সাগরে—তার বারি-বিন্দুতে নয়!

আলী প্রথম প্রথম নিজে দূরে থেকে লাঠি দিয়ে সাপ খেলতে আরম্ভ করে দিলে। নায়েব নিবারণ বাবু ওকে এক দিন কাছারীতে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে বল্লে "ভাল হে-চাষা-পণ্ডিত! ওসব কি করা হচ্ছে? লোকগুলোকে 'বক্তিমা' দিয়ে যে বেশ টন্‌টনে করে তুললে? বলি ভেবেছ কি? সেদিন একটা প্রজাকে ক'কাঠা যব দিতে বল্লেম,—চিরকালই ত ছাতু সংক্রান্তিতে প্রজারা যব জুগিয়ে আসছে,—এবারে কিনা বল্লে—নিজেরাই এবারে যব দেখি নি ত আপনাকে দেব। দেখেছ সাহস! নিজের খাবার নেই বলেই মনিবকে দিতে হবে না, তবে ত বল্লেই চলে ঘরে খাবার নাই জমীদারের খাজনা আবার কিসের? ভাল বিচার! নিজের নাই বলে জমীদারের মাটী খাবেন বিনা খাজনায়—নায়েব খাবেন সব পয়সা দিয়ে জিনিষ কিনে? তা'হলে নায়েবী করা হয়েছে আর কি! শুনেই সন্দেহ হচ্ছিল—এর মূলে কেউ আছে,—নৈলে চাষার মুখে এমন কথা! যা ভেবেছিলাম সত্যিই তাই—

অনুসন্ধানে স্পষ্ট প্রমাণ পেলেম এসব চাষা-পণ্ডিতের বক্তিমার ফল! এবারে সাবধান করে দিচ্ছি,—চাষার ছেলে চাষার মত থাক, নৈলে শ্বশুর বাড়ীর বিনে পয়সার ভাত খেতে বেশী দেরী হবে না।"

ও-বল্লে —"লোকে যদি নিজের সাধ্যাতীত জেনে অসাধ্য-সাধনে.........."

নিবারণ ক্রোধ সামলাতে পারল না—সে বলে উঠ্‌ল "অসাধ্য! কেবল লেক্‌চার! অসাধ্য-সুসাধ্য সবই দেখছি—ওসব চাষা-পণ্ডিতি করো চাষাদের কাছে, এখানে চাষার মুখে ও বড় কথা খাট্‌বে না!"

ও বল্লে "যে আজ্ঞা—চাষা আমরা, আমাদের বল্‌বার যা কিছু চাষাদের সঙ্গেই হওয়া উচিত,—মশায়রা যে তাতেও বিরূপ! চাষা পশু—তারা কেন মুখ খুল্‌বে!"

নিবারণ বল্লে "বটে। এত তেজ তোমার,—মুখে মুখে উত্তর,—লোকে মিথ্যা বলে না,—তোর বার্‌টা বড়ই বেরেছে!"

"এই জন্যেই আমায় ডেকেছিলেন—এখন তবে যেতে পারি!"

"কি ঠাট্টা হচ্ছে! স্বাধীন শিক্ষিত চাষা তুমি,—তোমায় আট্‌কায় কে! জমীদারী কাচারীর আইন জানা আছে ত,—এখনো সাবধান কর্‌ছি,—আমার কথামত চল্—নৈলে শ্রীঘরে জামাই হ'লে কি সুখ হবে?"

ওরা বল্লে "সেটা আপনাদের অনুগ্রহ,—জ্ঞান বুদ্ধিতে নিজ হ'তে ওটা এ পক্ষ হ'তে হবে না!"

"আচ্ছা দেখা যাবে—যে পক্ষ হতেই হ'ক—এ গ্রামে তোমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, ভিটামাটী হ'তে উৎসন্ন যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাক,—তোমার এখন শনির পূর্ণ দশা!"

"তা ত দেখতেই পাচ্ছি।"

"অপমান হবার ইচ্ছা হয়েছে বুঝি?"

"আজ্ঞে! আদবেই না,—সেলাম, তবে আসি।"

ও ঝড়ের মত সে কুস্থান পরিত্যাগ করে এল। বাড়ীতে যখন পৌছিল, আমি ওর মুখের ভাব দেখেই এতটুকু হ'য়ে গেলাম। কিবা বিষম ঘটেছে। কতক্ষণ কোন কথা কইল না। বল্লে যখন বুঝ্‌লাম—কি ঝড়টা সে দিন ওর ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। নিজে নিজেই বল্লেম—"কি অত্যাচার!"

ও বল্লে "অত্যাচার ব'লে অত্যাচার! শুধু আমার একার উপর অত্যাচার হ'লে, না হয় কথা ছিল না! কিন্তু এ যে হয়ে দাঁড়িয়েছে জমীদারী কাচারী দস্তুর! প্রজাকে অপমান ক'রে কথা না কইলে যেন ওদের মান থাকে না,—কথায় কথায় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য—ঐটাই যেন পৌরষ? ওর প্রতিকার রাগারাগিতে নয়,—নৈলে যে শক্তিটুকু এ দেহে আছে তাতেই নায়েবীয়ানা ঘুঁচিয়ে দিতে পারতেম—কিন্তু নিজের সমস্ত রাগ সাম্‌লে নিলেম;—অমন একটা নায়েবকে শিক্ষা দিয়ে লাভ! অমন কত শত নায়েব অত্যাচার কর্‌ছে—মূলে প্রতিকার যাতে হয় তাই চাই! হায়! সেটা কিসে,—বই কেতাব পড়ায়? না শুধু তাতেও না যেন,—দৈহিক শক্তিতে? না তাতেও না! হ'ত যদি তা—তবে চাষার দেহে কি বলের অভাব? না—চাই প্রাণের বল,—সেটার প্রতিষ্ঠা করতে ক, খ, গ, শিক্ষার চেয়েও আদর্শের আবশ্যক বেশী দাঁড়িয়েছে।"

ওর মনের ক্ষোভ বুঝতে আমার বাকী রইল না। আলী কেন এমন হ'ল; সে আমার কত বড় আশা, আদর্শকে মাটী করতে বসেছে!

(৯)

অত্যাচারের অবধি নাই। পাঁচটা বছর যে কি ভাবে কেটেছে, উপরের মালেকই জানেন। ওর অমন-ধৈর্য্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। আগে বলত 'অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে নাই; সহ্য করেই এদের যত অত্যাচার অগ্রাহ্য করতে হবে, মানুষের রক্ত একবিন্দু যাদের দেহে আছে, তাদের কি এক মুহূর্ত্তের জন্যেও মানুষের প্রাণ ফিরে আস্‌বে না।' এখন কিন্তু ওর মুখে শুনতে পাই অন্য কথা, বলে—'আর কেন,—কিসের জন্যে এত কচ্‌কচি, শরীরটা ভাল থাক্‌লে দিন চল্‌বেই, অন্যত্র না হয় যাই। একটা ছেলে হয়েছে, এদের মধ্যে থাক্‌লে, এদের আদর্শে তার ভবিষ্যৎ কিছুতেই শুভ হবে না।"

ও-কথাটা যে আমার মনেও না জাগে তা নয়; কিন্তু বাপের ভিটা, আমি কি ছাড়তে পারি! কোন অপরাধে? অপরাধটা আমার নয়,—আমাদের,—সকলের,—সমাজের, তার জন্যেই আমাদের, নিরপরাধীর নির্ব্বাসন! নির্ব্বাসনেও যদি এ সকলের শান্তি হ'ত,—না হয় তাতেই মত দিতাম কিন্তু তুচ্ছ এ বিষয়ের কলঙ্ক সহজে যে মুছ্‌তে চায় না। বড় দুঃখ হয় বল্‌তে—আরও চরমে উঠেছে ওটা। শুন্‌ছি মার নাকি নিকা,—আলীর বাবার সঙ্গে! প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে এ 'নিকা' কখনই ধর্ম্মের জন্য নয়,—প্রেমের জন্য নয়,—বিষয় সম্পত্তি রক্ষার জন্য। কার বিষয় কে রক্ষা করে! আমাদের মুসলমানের সম্পত্তি—বাড়ীর মোরগটার পর্য্যন্ত এক ভাগ! সবই তার জমা জমী,—জমীদারের অধীনে,—নায়েব বাবুর শাসনে! শাসনেই বলি, ন্যায্য খাজনা দিয়াও যেখানে দায় মেটে না,—জমীদারের কাচারীর শনি মঙ্গল গ্রহগণের সেলামী পর্ব্বে পর্ব্বে দিতে হয়। ওরা সেটাতে নারাজ তাই আরও এত! জমীদারের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়েও তাই এত দিনেও 'নামজারী' হ'ল না—কথায় কথায় উচ্ছেদের ভয় এখন আলীই দেখায়! সে যে এ ডিহির তহশীলদার মশায়, তার প্রতিপত্তিও কম নয়। তহশীলদারকে হাতকরবার উপায় কি অবশেষে মা এইটাই স্থির করলেন। লজ্জায় মাটীর সঙ্গে মিশে গেলাম। আলীর উপর বড় ঘৃণা হ'ল,—আমার বাবা কি ওদের কিছুই করেন নি—তিনি আশ্রয়দাতা, পালক তাঁর সংসারের সুনামটা এমনি ক'রে নষ্ট করে! পরে বুঝেছি এ বিষয়ে আলীকে বৃথা দোষ দিয়াছি! শুন্‌লাম, আলী এ নিকার ঘোরতর বিরোধী,—মানে? মানে খুঁজতে গিয়ে প্রাণে যে সন্দেহ অস্তিত্ব লাভ করল, উঃ সে যদি সত্য হয় তবে কি ভয়ানক! আলীর একদিনের কথার আভাসে সেটাকে আর ঠেলে ফেলবার উপায় রইল না। কি কথায় যেন বল্‌ছিলেম, "ভাই, বোনের দোষ মনে রেখ না।" সে তাতে উত্তর করেছিল—"স্বপ্নের কথা ভুলে যাও অফিরাণ, সংসারে নিজের সহোদর সহোদরার মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারছে না,—আর পরে পরে! কে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে জানে! সমাজের চোখে আর পাকা ভাই বোন হয়ে আমি আর পাপের বোঝা বৃদ্ধি করতে পারব না।"

শেষের কথাটা তার কি তীব্র! কি ভীষণ ভাব তার প্রাণে জেগেছে! উঃ মনপ্রাণ জ্বলে গেল! আতঙ্কে শিহরে উঠ্‌লেম, অন্তরাত্মা কাঁপ্‌তে লাগল! তাইতে এত! লালসা মানুষকে এমন করে পশু করে, চক্ষের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠ্‌ল,—যেন ওর ওপর আলীর এমন বিজাতীয় আক্রোশ! আল্লা! আজীবন কুমারী থাক্‌লেম না কেন! মনে পড়ল আর এক দিনের কথা! আলীর মুখের পানে চেয়েই আমার সে ইচ্ছা মনে জেগেছিল! প্রিয়তম ফজলু, তোমায় প্রকাশ্যে গ্রহণ না করলে দোষ ছিল কি—পরিত্যাগ ত তুমি করতে না—তবে কেন তোমায় এ রোষের মধ্যে ফেল্‌লাম!

মন ক্ষুণ্ণ। আকাশ বাতাস সব যেন আমার আঁধারে আচ্ছন্ন; মাতার স্নেহ অমৃত হলেও বিষ! স্বামীর প্রেম সেও অসহ্য— ওগো ঐ বাঁধনে বেঁধেই ত ওকে যত ভোগাচ্ছি। সন্তান, প্রাণের দুলাল—তাকেও ভার মনে হয়,—তার কি আর অন্য স্থান ছিল না; সংসারে ত কত সুখের যায়গা রয়েছে—এমন অনাদরের মধ্যে সে কেন এল—তাকে নিয়ে যাই কোথা! কি করে মান ইজ্জত বাঁচাই! মৃত্যু হ'ক আমার, তাই দাও খোদা,—প্রাণের বাবা যে মান!

মৃত্যুই একটা দিক রক্ষা করলেন। নিকার কথা রটতে না রটতে মাকে তাঁর ক্রোড়ে টেনে নিলেন। পিতৃমাতৃ বিয়োগ! সন্তানের বুকে বাজে কতখানি! আমি কিন্তু একবিন্দু অশ্রুও ফেলি নাই। বুকটা জমাট হয়ে গিয়েছিল। একেবারে স্পন্দনহীন হ'য়ে গেল না কোন্ পাপে!

(১০)

আরও একটা বৎসর কেটে গেল,—এই সংসারে! অশান্তির আগুন বাড়্‌লই বৈ কম্‌ল না। বেশ বুঝ্‌তে পারলেম, আলীকে আমি যত আপন করতে চাচ্ছি,—ও ততই দূরে সরে যাচ্ছে। আলী আমাকে যে ভাবে আপন করতে প্রাণপাত করতে প্রস্তুত, আমি প্রাণপাত না করলে তার শেষ নাই। সে অবস্থায় আর আমাদের একসঙ্গে থাকা চলতে পারে ক'দিন! আলীর ভাবটা ওরও অজ্ঞাত নাই কিন্তু তাতে ওর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই একটুকুও,—আমায় বরং তাতে আপন করেছে! আমাতে ওর কি অচল বিশ্বাস,—স্ত্রীর সেইটাই যে স্বর্গ সুখ,—এ হলাহলের সংসারে অমৃতই ঐটুকু—তাতেই বাঙ্গলার মেয়ে বেঁচে থাকে!

এ সংসারে স্ত্রীলোক বল্‌তে আমি। সত্যি বল্‌ছি,—বড় ইচ্ছা হয় আলী একটা বিয়ে করে! কেন সে তুচ্ছকে অবলম্বন করে দেওয় না থাকতে চায়! শত শত সুন্দরী রয়েছে,—তেমন একটা বৌ এলে অবিশ্যি ওর মন খাঁটি হয়ে সংসারে বস্‌বে। সে কথা তাকে বলতে আমার ভরসা হয় না। একদিন সাহস করে' বল্‌লাম, "একা আর এমন করে ক'দিন থাকা যায়! কথা বল্‌বার আর একটি দোসরা মেয়ে মানুষ নাই,—একটা বিবি এনে এ কষ্ট দূর কর না ভাই?"

কি স্নেহমাখা উদাস দৃষ্টিতে সে আমার মুখপানে চাইলে, সত্যই যেন ভাই আমার সে! কোন কথা বল্‌লে না। পরক্ষণেই দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বল্লে "ও কি কথা অফিরাণ! আমার আবার বিয়ে? বিবি? সে কি করে' হ'তে পারে!—এক সংসারে দু কর্ত্রী কিছুতেই সম্ভব নয়!"

সে উত্তরের অপেক্ষা না করে' চলে গেল। দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করতে পারলেম না। ঈর্ষার কথা ভুলে গেলাম। আমার মনে হ'ল। হায়, আমি আলীর সুখের কতখানি অন্তরায় হয়ে রয়েছি! কবে সরে যেতে পারবো, দূরে—দূর হতে দূরান্তরে! সে উপায় আর কোথা! স্বামী পুত্র—তারা যে এ সংসারের!

(১১)

সেবার মন্বন্তরার বৎসর!—সমস্তই জিনিষের দর আগুন! কোন মতে পেটে খেয়ে, ছেঁড়া নাকড়ার লজ্জা নিবারণ করতেও মানুষে পারছে না—এমন দুরবস্থা! আমাদের গোলায় কিছু পুরাণো ধান মজুত ছিল, আলী বল্লে "বেচে ফেলি,—অনেক টাকা হবে।" ওরা বল্লে "বল কি? চাষ আবাদের যে অবস্থা, সামনের সনে শস্যের আশা নেই—বেচ্‌লে বাঁচবো কি খেয়ে?"

আলী সে কথায় কান দিলে না, খদ্দের এসে হাজির,—ও কিছুতেই ধান বেচতে দেবে না।

প্রথমে নরমে শেষে গরমে, কথায় কথায় দু'জনে বেশ লেগে গেল,—আলী বল্লে "ধান আমার,—যা খুসী কর্‌বো।" ও বল্লে "কে বল্লে ধান তোমার, জমী আমার, আবাদ করেছি আমি, তোমার ভাগ অর্দ্ধেক ধরেও যদি নি—বর্গার ভাগে আমার অর্দ্ধেক ত, তাতে হাত দেবার তুমি কে!"

আলী বল্লে বটে, জমীদারের কাছারীতে গিয়ে দেখে এস আগে—জমী কার নামে—পরে আস্ফালন করো!"

ও বল্লে "এতদূর হয়েছে! অনেক সয়েছি আর না। আলী সাবধান,—জমীদার বা যিনিই হন—জমী, আমার! অপমান করে' প্রাণ থাক্‌তে কেউ নিতে পার্‌বে না। জমীদারের উপরের জমীদার যিনি, তিনি জানেন—জমীর অধিকারী কে, এ অধিকার হতে বঞ্চিত কর্‌তে কাঠখড়ি লাগ্‌বে আলি!"

আলী তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বল্লে "বঞ্চিত ত হয়েছই, কাঠখড়ি লাগ্‌বে আর কবে! দাখিলে দেখ্‌বার ইচ্ছা আছে না কি?"

স্বামী বল্লে "নিজের নামে দাখিলে লেখিয়ে সে আর বেশী কি হবে—দখল যাবে কোথা?"

আলী বল্লে "ওইটাই আর পার্‌বো না—রোজ রোজ কত লোককে উচ্ছেদ করে', কত জনকে পত্তন কর্‌ছি,—তোমার পক্ষে কি ওটা এমনি অসম্ভব হবে?"

ও রাগে লাল হয়ে উঠ্‌ল। বল্লে "জানি—জানি ওইটাই তোমাদের পৌরুষ; দুর্ব্বলকে পীড়ন করেই তোমাদের বাহাদুরী. নিজে চাষার ছেলে,—আর রোজ মার্‌ছ চাষাকে, লজ্জা হয় না বল্‌তে—আবার মুখ বাড়িয়ে তাই নিয়ে গর্ব্ব কর্‌ছো! শুনেছি সব—সহ্য করে আছি তাই, সেদিন বেরামের বিধবাটাকে কাছারীতে নিয়ে কত অপমান করেছ,—তাতেও তোমাদের মন ওঠে নি,—অবশেষে বেচেছ তাকে জাহাজের সর্দ্দার আব্বাশের কাছে!"

আলী যেন আকাশ হতে পড়্‌ল, কত গোপনে তারা মেয়েটাকে গুম্ করেছিল; ও জান্‌লে কি করে? সে বল্লে "কে বল্লে আমরা তাকে দেশান্তরি করেছি। ওর স্বামী চিরকাল জমীদারের অনিষ্ট চেষ্টা করেছে, বিদ্রোহী ছিল, জানি না সরকার যদি কিছু করেই থাকেন জমীদারের শান্তিরক্ষার জন্যই করেছেন। জমীদার ত তোমার মত খেলো জমীর মালেক নন, মানুষ নিয়েই তাঁদের কারবার—মাঝে মাঝে আগাছা তুলে না ফেল্‌লে ধান ক্ষেতও বাঁচে কি?"

"থাম্—থাম বেশ যুক্তি! এতখানি বিদ্যা হয়েছে তোমার! সরকারের উপযুক্ত কর্ম্মচারী বটে!"

আলী বল্লে "চোপ র' ফজলু—মনিবের টিট্‌কারী আমি সইতে পার্‌বো না।"

ও মুখ হতে কথা কেড়ে নিয়ে বল্লে "আর বলো না, নিমকের মান রাখ্‌তে খুব জান—বাড়ীতে যে ব্যবহার কর্‌ছ তা ভুলে যাচ্ছ আলি!"

"কি ব্যবহার কচ্ছি আমি,—অফিরাণকে কোন দিন কোন কথা বল্‌তে শুনেছ! এখনো তার মান বাঁচিয়ে চল্‌ছি! হয় ত এমন দিন আসবে আমি পশুর অধম হয়ে দাঁড়াব,—কিন্তু যতক্ষণ সে দুর্দ্দশা না হচ্ছে ততক্ষণ তোমার চুপ্ করে অপেক্ষা করাই ঠিক,—এটাও বোঝ না—তুমি না বিদ্বান! তোমার সঙ্গে ব্যবহারের কথা? প্রতিদ্বন্দ্বীকে কে কবে ছেড়ে কথা বলেছে, ছেড়ে দেওয়াই কাপুরুষতা, তুমিও কি আমার কম অনিষ্ট

করেছ ? কোথাকার তুমি কে ? কেন উড়ে এসে আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়েছ আমার সকল সুখ শান্তি কেড়ে নিয়ে সাধু সেজেছ এখন ! বলতে লজ্জা হয় না ! নিমকহারাম আমি ? নিমকের মান রক্ষা করতে সাধ ক'রে নিমক খেতে তোমাকে কে নিমন্ত্রণ করেছিল ? ভিখারীর মত এসেছিলে,—তাতেই সন্তুষ্ট থাকলে না কেন ! এখনো সময় আছে সরে পড়, নৈলে স্পষ্ট বলছি, জমী কেন জান পর্য্যন্ত কবুল !"

ও উন্মত্তের মত বল্লে "স্বামীর সামনে স্ত্রীর অপমান ! কুত্তা আমি ? আমি সইব ? তোমার মনে কি—তা কি আর বুঝিনি ! প্রস্তুত হও,—আজ তোমারি, এক দিন না আমারি একদিন !" আলী হাতের লাঠি ঘুরিয়ে বল্লে "তবে এসেই দেখ না।"

ঘরের মধ্যে বসে কাঁপছিলাম। আর বসে থাকা চলে না। আলীর সামনে এসে বল্লেম "লক্ষ্মী ভাই আমার, তুমিও পাগল হলে নাকি। নিজেদের মধ্যে রাগারাগি।"

আলী গর্জ্জে উঠল; বল্লে "তোর নিজের হতে পারে,—আমার নয়,—ও শত্রু-শত্রু-শত্রু, ওর জন্যে তুই আমার পর হয়ে গেছিস্। বুঝবি না অকিরাণ ! ও আমার কি অনিষ্ট করেছে, জায়গা জমী নিতে এসেছিল, নিক্। ও কেন আমাকে......"

সে কথাটার শেষে কি আসছে সেটা শুনবার ধৈর্য্য আমার হ'তে পারে কি ! দ্রুত ঘরে ফিরে এলেম আসবার সময় ওকে বল্লাম "কেন লোক হাসাচ্ছ,—সরে যাবে কি ?"

গৃহাভ্যন্তর হ'তে দেখলেম, —ও স্থান পরিত্যাগ করেছে ! বাঁচলেম !

(১২)

শুক্‌না খড়ের গাদায় আগুন,—সমস্ত ছারখার না করে কি তার নির্ব্বাণ ! কথায় কথায় খুঁটীনাটী নিয়ে অশান্তির এক শেষ। দোষ দেব কার—সবের মূলে আমি ! মৃত্যু বল্লে 'তাই !' সে অট্ট অট্ট হেসে, অঙ্গুলী নির্দ্দেশ ক'রে আমাকে একটা ছুশ্ছেদ্য মহা অন্ধকার গহ্বর দেখিয়েছিল, —সকল অশান্তির শেষ সেখানে,—এ-পারের শেষ,—সমস্তরই,—সে গোতটা সাম্‌লে ওঠা কি সহজ ! ভয় হ'ল যদি সে মহাঅন্ধকারে এর চেয়ে আরও যন্ত্রনা নিহিত থাকে। আমি গেলে ওদের শান্তি আসবে,—ঠিক কি,—কেন তবে,—মরা হবে না,—মৃত্যুর আহ্বান এবারেও অগ্রাহ্য করলেম কিন্তু তার আহ্বান প্রাণে যে একটা সুর ঝঙ্কৃত করে গেল সেটার অনুরণনা একেবারে থামল না যেন !

শুনলেম একদিন সাংঘাতিক হ'য়ে গেছে, কপাল আমার পুড়েছে—ওদের আর জমীদারের মধ্যে দস্তুর মত দাঙ্গা; কারি জখম হয়েছে দুটা ! খোদা ওকে এবারে বাঁচাবে কে। পুলীস ওকে পাকড়েছে। শান্তিরক্ষকের হাত হতে রক্ষা করবার মত বল আমার কোথা ? কে আমার হয়ে তদারগ করবে।

আমাদের জমী নিয়ে বিবাদ। এই মন্বন্তরার দিনে, ও কি পরিশ্রম করে, কুয়োর জল নিজে দোনায় করে ছেঁচে আবাদটা সফল ক'রে তুলেছিল; মাঠে কেবল সোণা ফলেছিল ওরই। জমীর ধান ও যেদিন কাটতে যাবে,—আলী তাতে বাধা দিল, বল্লে "জমীদারের দোহাই,—শস্য ছুঁয়োনা—জমী আমার—ধান আমার।"

এ সব ক্ষেত্রে সচরাচর কৃষকের ভাগ্যে যা হয় তাই হ'ল। ও নিজের পরিশ্রমের ধন ছেড়ে দেবে ? আলীর কথা অগ্রাহ্য করে জমীতে হাত দিতেই জমীদারের লেঠেল আক্রমণ করলে; নিরস্ত্র তখন ও, লাঠীর অজস্র চোট

খেয়ে একজনের লাঠি কেড়ে নিলে! কি ভীষণ দাঙ্গা হ'ল! একা ও আর জমীদারের লেঠেল কতজন,—ও যে কি করে আত্মরক্ষা করেছে ওই জানে,—খুন জখম কে হ'ল না হ'ল তা দেখ্‌বার কি ওর তখন হুঁস ছিল! জমীদারের পক্ষ হ'তে পূর্ব্বেই পুলীসে খবর দেওয়াছিল,—সরেজমীনে তারা ওকে পাকড়াও করলে। একবারে সদরে চালান হ'ল। শ্রীঘরে বাসই হ'ল সত্যি সত্যি,—হাজতে! ধর্ম্ম! হাকিম হাজার টাকা জামিনে খালাস দিতে চাইলেন; কে হবে ওর জামিন। ওর পরিশ্রমের পুরস্কার হাজত!

নিজে গাড়ী করে সহরে গেলাম। বুভুক্ষু উকীল মোক্তারের উদরের কান্নার কাছে আমার কান্নাকাটি কোথায় ভেসে গেল। জমীদার পক্ষের যথারীতি তদ্‌বিরে মোকদ্দমার দিন, ওর হাজতের দিন বৃদ্ধি ক'রে দিনের পর দিন বদ্‌লাতে লাগ্‌ল। আমি ভূতের কড়ি যোগাতে যা ছিল তা বেচে, বন্ধক দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হলেম! ফল কিছুই হ'ল না। ও নিজেই সব স্বীকার করলে,—জখম করেছে ও নিজেই!

ওর উপর তখন কি অত্যাচার হয়েছিল—সেটা বুঝি বিচারে তুলনায় আনা হ'ল না। জমীর সত্বের কথা,—অন্য আদালতের বিচার্য্য! ও কেন নিজে সরকারের আইন হাতে নিল,—লেঠেলের আঘাতে জখম হলে ওরই জয়ের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ ছিল! সরকারী উকিল হাকিমকে বুঝালেন,—অন্য লোক নিশ্চয়ই পাঁচজনের বেশী তখন ওর সঙ্গে ছিল—নতুবা কি একার পক্ষে নিজে অক্ষত থেকে এতগুলো জখম করা সম্ভব! সঙ্গীদের বাঁচাতে ও মিথ্যা বল্‌ছে। পুলিস ঠিক প্রমাণ এখনো সংগ্রহ করতে সমর্থ না হলেও, তারা বিশ্বাস করে—ওদিকে যত ডাকাতি হচ্ছে,—তার মূলে ও আছে!

সে কথায় ও নাকি গর্জ্জে উঠে বলেছিল—"অত বড় মিথ্যা অপবাদটা আমার নামে চালাবেন না,—কজ্‌লু আর কিছু হতে পারে, মিথ্যাবাদী চোর নয়। কাপুরুষের মত আত্মগোপন করে' যে কখন কাহাকেও পীড়ন করে নি।"

সরকারী উকিল হেসে বল্লেন "সাধু!" আদালত সুদ্ধ হাসির হড়্‌রা পড়ে গেল! হা অদৃষ্ট!

হাকিম ওর দিকে চেয়ে বল্লেন "এ সময় কথা বল্‌বার তোমার অধিকার নাই।"

হুকুমের উপর কথা নাই।

ধর্ম্মাবতারের সূক্ষ্ম বিচারে ওর দু' বৎসর মেয়াদ হ'ল। সে সংবাদ শুনে বুক ফেটে মলেম না কেন,—মৃত্যু সত্যই সে দিন ডেকেছিল। ছেলের মুখ পানে চেয়ে সেবারেও মরণের আহ্বান অগ্রাহ্য করলেম। বাড়ীতে আর ফিরলেম না,—এক দূরাত্মীয়ের বাড়ীতে,—জমীদারের ভয়ে কেউ কি আশ্রয় দিতে চায়,—নিজের মত পড়ে থাকি,—পরের ধান ভেনে খাই।

আলী একদিন লোক পাঠিয়ে অনুরোধ করলে—বাড়ীতে ফিরতে।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা, ভগবান।

সহ্য যে আর হয় না। আত্ম-সম্মানের মর্য্যাদা রাখতে জেলে তুমি! প্রিয়তম, আমি তোমায় অপমান করব। তার পূর্ব্বে মরণের আহ্বানে যেন আমার মতি হয়।

(১৩)

দু'টা মাস যেতে না যেতে দেশে কি নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, হাহাকারে দেশ ডুব্‌ল। আহারীয় আর জোটে না; শত ছিন্ন বস্ত্রে আর লজ্জা রক্ষা হয় না। ক'দিন উপোষে কাটিয়ে, অবশেষে সত্যি সত্যিই পথে

বেরুতে হল। বাছার আমার আহার হয় নি দু দিন! কে কাকে ভিক্ষা দেয়। শুন্‌লেম সরকার থেকে ভিক্ষা দিচ্ছে! কি ভিড় সেখানে,—অনেক কষ্টে সেখানে একদিন পৌঁছালাম,—না খেয়ে মর্‌লেও ওখানে আর না,—কর্ম্মচারীরাই সেখানে অতিমাত্রায় ক্ষুধিত,—লজ্জা নিবারণ করতে এসে লজ্জাকেও লজ্জা দিচ্ছে,—সেখানে এমন প্রায় নগ্ন বেশে কি করে আর দাঁড়াব! গাছতলে পথের ধারে পড়ে দুটা দিন কেটে গেল। বাছার আমার অদৃষ্টে এতও ছিল!

এক বৃদ্ধা সদয় হয়ে ক'দিন অন্ন যোগালেন। তাঁর দয়ায় গলে গেলাম,—শরীর খাটিয়ে তাঁকে সাহায্য করা বিনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আমার আর পথ কি ছিল। কত কথা মনে জাগ্‌ত! আজও জেলে,—কি করছে,—এতটা কি দেখ্‌তে পার্‌ত!—আলী দুর্ভিক্ষের ভাত ওর জেলে রেখেছিলে!

আলী একদিন রাতে এসে উপস্থিত। এসেই বল্লে "আর কেন, যথেষ্ট ভুগেছ,—বাড়ী ফিরে চল।"

কার বাড়ী?—কোথায় ফিরে যাব? আমার জন্মভিটা,—পিতার কবর,—মক্কার অধিক তীর্থ,—তা' কি আমার আছে! স্বর্গের অধিকারে এখন পিশাচ! সেখানে, আমি আপনার স্থান ভেবে ফিরে যাব!

বল্লেম "আলী, আর কেন যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছ ভাই! অনেক হয়েছে, জেলে পচছে ও,—আমাকে এখানে মরতে দাও, অনেক অনুগ্রহে এতটা করেছ,—আর কেন?"

আলী বল্লে "বৃথা দোষ আমায়! আমিও কি কম সইছি অফিরাণ! আমার কি ইচ্ছা তুমি দুঃখিনীর মত এত কষ্ট পাও। ও-সংসার ত তোমার, তুমি তার কর্ত্রী,—তোমার অভাবে সেটা ছারখার হতে বসেছে। ফিরে চল অফিরাণ!"

বড় দুঃখে আমার হাসি পেল। পাগলের মত হেসে মুখ ফিরালেম। তীব্র ঘৃণায় মনে হল ছুটে পলাই; ও-এসেছে আমায় ঘরের লক্ষ্মী করতে! ক্রোধে ঘৃণায় বাক্য স্ফূর্ত্তি হ'ল না।

ও বলে যেতে লাগল "ছেলে বেলার কথা স্মরণ করেও কি আমায় একটু স্নেহ করতে নাই এতই পর আমি?"

"পরের চেয়েও তুমি শত্রু! পবিত্র শৈশবের কথা তুল না তুমি, ভাই হয়ে ভগ্নীর ধর্ম্মচ্যুত করতে এসেছ! এই যদি ভালবাসা হয় লালসা তবে কি? পায়ে পড়ি এখুনি এস্থান পরিত্যাগ কর,—আর অনুগ্রহ করতে এস না কখনো।"

আলী দ্বিরুক্তি না করে—সে স্থান পরিত্যাগ করল। ভূতের মত এসেছিল, ভূতের মত অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আমার প্রাণে জেলে দিয়ে গেল কি অসহ্য ভীষণ বহ্নি! অন্ধকারাচ্ছন্ন সে আগুনের দেখলেম,—আলীর বদন কি করুণ,—তার সমস্ত ব্যবহার ভুলে যেতে ইচ্ছা হ'ল, কিন্তু সাধ্য ছিল না আমার! আমার বাল্য সঙ্গীর সকল অপরাধ ক্ষমা করতে পারি কিন্তু পাপের প্রশ্রয় দিয়া তাকে আর জাহান্নমে ঠেলে দিতে পারব না! ফজু! প্রিয়তম স্বামী, তুমি এসে ওকে ক্ষমা কর—তোমার ক্ষমা না পেলে আমিও যে সমস্ত করুণা দিয়েও ওর দোষ মুছে ফেল্‌তে পারি না। আমার আর পথ কোথা,—নিজকে মুছে ফেল্‌তে হবে আমাকে, তোমাদের উভয়েরই জন্য, তুমি ফিরে এসো,—তোমার ধন তোমার কোলে দিয়ে আমি রাক্ষসীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি।

তার পূর্ব্বে তোমায় একবার না দেখে মরতে পারব না।

(১৪)

বক্ষের ধন সম্বল করে আবার পথে এসে দাঁড়ালেম। বৃদ্ধার গৃহে আমার স্থান নাই। তার কথাবার্ত্তায় জেনেছিলেম সে আলীর লোক; আমাকে সাহায্য করে কৃতার্থ হচ্ছিল। আলীর সাহায্য আমি নেব? বৃদ্ধার দেওয়া পুরাণো কাপড়খানা পর্য্যন্ত ত্যাগ করে শত গ্রন্থি লজ্জা নিবারণের অনুপযুক্ত জীর্ণ বস্ত্রে কদম পাতায় পটী দিয়ে তাই পরে বেরুলেম। তখন কি বাঁচবার সাধ ছিল? কেবল বুকের ধনে শীতল হয়ে, ওর দর্শন আশায় বাঁচব বলে ঝাঁপ দিলাম মরণ-সাগরে। প্রাণের কোন এক শুষ্ক ডালে কালপেঁচা কাল রব করে উঠল। জগৎ ডুবে গেছে তখন ঘোর অন্ধকারে; শৃগালের প্রাহরিক চীৎকার প্রাণের রক্তভুফানে যোগ দিল, ছুটে চল্লেম দেশান্তরে। বুকে বাছা আমার শৃগালের চীৎকার শুনে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আমি রাক্ষসী—সেই তালে তালে আমার প্রাণ কাঁপিয়ে কেবলি ছুটছিলেম আনন্দে মুক্তি পাবার আশায়;—কোথায় কে জানে।

সত্যই দেশটা তখন শ্মশান। ঘরে ঘরে রোগীর চীৎকার। অনশন অনাহারে কঙ্কালসার, নামমাত্র জীর্ণ চীর পরিহিত নরনারীর কি ভীষণ চেহারা। জীবনমরণের আহবে জীবনেই তাদের মরণ আধিপত্য বিস্তার করেছে; কত শত মরছে। ভয় হয় আমায় নিলে বাছা আমার দাঁড়াবে কোথা? ছয় দিন অনাহার। ছেলেটাকে খেতে দিতে পেরেছি, মোটে চার রাতে ভাত নয়—ভাতের মাড়। গৃহস্থ এক, গরুর জন্য টিনে ফেন রাখে, আঁধার রাতে চুপে চুপে গিয়ে চোরের মত তারি একটু ঢেলে আনি শেয়ালকুকুরের সঙ্গে। হা জীবন!

অন্ধকারে গাছ তলে পড়ে আছি। দূরে জ্বলছিল যেন আলীর বড় বড় দুটা চোখ। এখানে এমন অবস্থাতেও তুই! চীৎকার করে উঠলাম। ছেলেটা ভয়ে—না ক্ষুধায় কেঁদে উঠল। এত সয়েও এখনও বেঁচে আছি! তিলে তিলে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে কেন নিচ্ছ,—এস এস করালী, সকল যন্ত্রণার শেষ হয়ে যাক্! তুমিই আমার একমাত্র বরণীয়! অন্ধকার! উপরে নীচে আশেপাশে হৃদয়ে বাহিরে অন্ধকার! কার্ত্তিকের অমানিশা, হিন্দুর কালী পূজা! এশ্মশান দেশে শ্মশানের দেবীর পূজাই উপযুক্ত! দূরে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে ঢাকের বাজনা বাজছিল। বলির বাজনা বুঝি! পশুত্ব বলী দিতে না পেরে মানুষ পশুত্ব বৃদ্ধি করতে পশু বলী দিচ্ছে! পশুত্বে আজ আমার বলি! বুঝি পশুর অধম আমি; নারী দেবী—মিছা কথা! এ পিশাচের দেশে দেবী কে? পিশচী শ্রেষ্ঠা যে! আমি এদেশের দেবী! কালী নৃমুণ্ডমালিনী! অৰ্দ্ধনগ্ন উলঙ্গ আমি—অন্ধকার আমার বসন। সমাজের পাপে আমার দেহমন ঘিরে ধরেছে, আজ আমাকে রক্তবীজের রক্ত—নিজ জিহ্বায় লেহন করে' শোণিত-তর্পণে সকল অকল্যাণের বীজ নিঃশেষ করতে হবে! অশুভের জীবন্ত মূর্ত্তি আমি—এ-দেহের প্রতি অণু পরমাণুর পূর্ণাহুতি না হলে ওদের শুভ নাই!

বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, সমাজ দেশের অবস্থা ব্যবস্থা, মন্বন্তর সকলেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে দেখিয়ে দিচ্ছে—ঐ পথ! আমি তাদের আদেশ মান্য করলেই কি অপরাধ! অপরাধ-টপরাধের কথা তখন মনে জাগে নি। দেখেছি কেবল,—অসিতা আঁধার কোলে কি শান্তি! জ্যোৎস্নাহীন, জ্যোতিহীন, আলোকহীন, উত্তাপহীন, আঁধার কী শীতল,—সংসারে সন্তাপদগ্ধ প্রাণটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে! মিছা এতদিন বাছাকে আমার এত কষ্টের মধ্যে বেঁচে রাখতে চেয়েছি! এদেশে শান্তি কোথা?—অনশনে? উন্মুক্ত আকাশতলে? নিবস্ত্র হয়ে? বন্ধুবেশী শত্রুর আদরে? তার চেয়ে মৃত্যু অনেক শান্তির! বুকের ধনের,—কচিছেলের এত কষ্ট চোখে দেখতে পারে কে? পাষাণী আমি, মা হয়ে তাই আজও ওর মুখের দিকে চাইতে পারি! আর না, বুকের ধন বুকে করে

পরপারে চলে যায়,—এম্‌নি ত তিলে তিলে ও টেনে নিচ্ছে—কেন আর অপেক্ষা করে অসীম যন্ত্রণা সাধে মাথায় তুলে নিচ্ছি? বলির ঢাক বেজে উঠেছে; রোগীরা চীৎকার করে, কেঁকিয়ে তার সঙ্গে যোগ দিয়াছে, দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী তাণ্ডব নৃত্যে তার তালে মিশিয়াছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মরণের ডাকে উতলা হয়ে উঠেছে,—রাহুর গ্রাস হতে কে আর রক্ষা পাবে? আগে আর পিছে!—এতদিন জীবনে যে মান রক্ষা করতে ছেলেটার মত যে ছোরাটাকে বক্ষের মধ্যে অতি সঙ্গোপনে লুকিয়ে রেখেছিলেম, আজ মরণ অবলম্বনে সে মান ইজ্জত বজায় রাখতে সেই ছোরা নিষ্কাসিত করে আমিও মৃত্যু আহ্বানে উন্মত্ত হয়ে উঠলেম! বুকে রক্ত টক্‌ বক্‌ করে ফুটছিল, মনে হচ্ছিল—এ অমানিশা যেন প্রভাত না হয়,—কে কোথায় আছ দুঃখী এ মহানিশায় মহাকালের কোলে আশ্রয় নাও। ছেলেটা কোথা! তাকে ছেড়ে মনের ঝোঁকে কোথায় চলে এসেছি! বাছা কি আমার এতক্ষণ আছে? অনাহার অযত্নে বুঝি আমার আগেই চলে গেছে? তার কাছে ছুটে গেলাম, সে কি এত নির্ম্মম হবে যে আমায় ছেড়ে যাবে—আমি তাকে ছেড়ে যাব?—নাঃ, এত নির্ম্মম আমরা নই! মায়ে পোয়ে গতি আমাদের এক! উঃ, কি মতি হ'ল, ওগো! ক্ষমা কর,—সে সময়ের মনের কথা আমি বলতে পারব না;—আবার তা'হলে পাগল হয়ে যাব যে। ফিরে গেলাম বাছা শুয়েছিল যেখানে,—সেই ছোরা,—মান রক্ষার অস্ত্র,—অন্ধকারে চোখ মুদে,—অঙ্গ তার স্পর্শ করলেম কি করলেম না,—উঃ—শরীরের সমস্ত জোর একত্র করে আঘাত করলেম বাছার নবনীত কোমল অঙ্গে! একটা কুকুর ছানা কেঁউ ক'রে উঠল, দ্বিতীয় বার শব্দ করতে সাহস করলে না। আমার বিকট চেহারা দেখে পালিয়ে গেল বোধ হয়! বাছাকে আমার শব্দটা করতেও অবসর দিলাম না। প্রাণ হতেও প্রিয়তর যে আমার বুকের মানিক, কত কষ্ট পাচ্ছিল, উদরের জ্বালায় অস্থিচর্ম্মসার হয়েছিল, আমি স্নেহময়ী মা তার তাকে নিজ হাতে মরণের হাতে ঠেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেম! তাও কি হয়? তাকে ছেড়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'ব? দেরী সইল না, তৎক্ষণাৎ ছোরাখানা উর্দ্ধে তুলে প্রাণপণ শক্তিতে বসিয়ে দিলেম এ পাষাণ বক্ষে! পাষাণে সেটা বুঝি তেমন প্রবেশ করতে পারল না। আপনা হতে একটা চীৎকার বেরিয়ে গেল! ফিনিক্‌ ফুটে রক্ত ছুটবার পূর্ব্বেই, রক্ত-লোলুপ পিশাচ আমার হাত দু'খানা ধরে ফেল্লে! সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারেও মনে হ'ল—না, ঠিকই বুঝতে পারলেম,—সে হেয়তম আলা! এতদূর! এ দশায় ফেলেও সাধ মেটে নি! এখনও মৃত্যু-অমৃত পানেও বাধা।

তার পর কি হয়েছিল জানি না। সন্তানহন্ত্রীর চেতনা আর কতক্ষণ থাকে? খোদা!

(১৫)

যমের অরুচী আমি,—জীবনে আবার ফিরে এলাম। জ্ঞান সঞ্চার হ'ল যখন, পড়ে আছি তখন একখানা গোযানে। রক্তরঞ্জিত বস্ত্রের দিকে চোখ পড়তেই মনে পড়ল বাছার কথা। এত রক্ত! বুকটা ফেটে গেল যেন,—মাথা ঘুরে উঠল,—জানি না তার পর কি!

আমাকে ডেকে বল্লে "দুধ খা!"

চেয়ে দেখি অপরিচিতা, ভদ্র ঘরের মেয়ে; বল্লেম "কে আপনি,—কেন,—দুধ কেন খাব?"

"মরে যাবি যে,—দু দিন অজ্ঞান,—নল দিয়ে পথ্য দেওয়া হয়েছে,—হুঁস হয়েছে আজ, এটুকু খেয়ে নে।"

মনে পড়ল সকল কথা! "কাকে বাঁচাতে চাও তোমরা,—কে বাঁচতে চায়,—মরতে দা'ও আমায়,—মরতে দাও!"

আবার মূর্চ্ছা হ'ল।

প্রাণপণ করে' ওরা আমার প্রাণ দিল! নার্শটি আমার কে ছিল জানি না,—শত্রু না আত্মীয়া,—অন্য নার্শরা 'ডিউটি' করত, আর সে আমায় কত রকমে সান্ত্বনা দিতে চাইত,—সেবার ত সীমা ছিল না,—বড় রাগ্ হ'ত তার ওপর,—বাছার কথা কত জনকে জিজ্ঞাসা করেছি সবাই নিরুত্তর!

সেরে উঠ্‌লেম। দু মাসে। বুকের ক্ষত শুকিয়ে গেল,—প্রাণের ক্ষত দ্বিগুণ করে'।

শুন্‌লেম যেতে হবে আমায় হাজতে,—খুনী আমি,—আত্মহত্যার অপরাধী আমি—আমি তাই চাই,—ফাঁসী দাও আমাকে!

হাজত! এইখানে সেও বুঝি কটা মাস কাটিয়েছে। স্বর্গ আমার,—সেই মন্দিরে আমি! হাজত হ'তে দেখা যায় কয়েদীদের আনাগোনা যাতায়াত—ওর মধ্যে কি সে নাই! দেখা কি পাব না! সে আজও জানে না,—প্রাণের ধনকে তার, রাক্ষসী শেষ করেছি,—দেখা হয় যদি,—বলব কি তার!

কোথা তুমি মৃত্যু,—নাও নাও—অদৃষ্টের দোষে তুমিও এত দুর্লভ!

বিচার হ'ল,—যেমন হয়! আমি হাকিমের কাছে কত কেঁদে মৃত্যু দণ্ড প্রার্থনা করলেম! বাছাকে আমি কি ক'রে নিজ হাতে শেষ করেছি হাকিমের সাম্‌নে, অত লোকের সাম্‌নে অকপটে বল্লেম। সরকারী উকীল আমাকে দয়া করলেন। আমাকে রাক্ষসীর সঙ্গে তুলনা করে, সন্তানহন্ত্রী জেরতমা পিশাচী বলে,—দয়ার অযোগ্যাপাত্রী প্রমাণ করে, মৃত্যু দণ্ডই যে আমার উপযুক্ত তা' প্রমাণ করতে কত কি বল্‌লেন,—ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা করে পাঁচটার কাছে কাছারীর সময় সাড়ে পাঁচটায় ক্ষান্ত করলেন! আমার পক্ষের উকিল,—কে তাঁকে নিযুক্ত করেছিল জানি না, সরকারী উকিলের বিপরীত কথাই হাকিমকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন। সেই প্রথম শুন্‌লেম—বাছার আমার লাস পাওয়া যায় নাই, আমি যে তাকে হত্যা করেছি তার প্রমাণ নাই, ছেলেটা হয় ত দুর্ভিক্ষের তাড়নে অর্দ্ধমৃত হয়ে গিয়েছিল—অন্ধকার রাত—মাটা অনাহারে নানা কষ্টে উন্মত্তা প্রায়,—ছেলেকে কে দেখে?—কোথায় গিয়ে পড়ে মরেছে; ওরও প্রায় সেই দশা—মনঃকষ্টে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছে—বিশেষ দুর্ব্বল মস্তিষ্কে ঢুকেছে ওই ওর ছেলেকে মেরে ফেলেছে! ফলে তার প্রমাণ নাই!

শেয়াল কুকুরে খেয়েছে আমার ধনকে—অসহ্য,—চীৎকার করে কেঁদে উঠলাম। হাকিম বল্লেন "থাম—থাম!"

বল্লেম—"ফাঁসী দাও আমাকে! আমার বাছাকে কি তবে শেয়ালে খেয়েছে—হত্যা করার পরে বুঝি!"

হাকিম বার বার জিজ্ঞাসা করলেন—"ছেলেকে মেরেছিস্—কে বল্লে?"

"বল্‌বে আবার কে,—আমিত জানি। সব মনে আছে। সব মনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। আলীর কথাটা আদালতে বল্লেম না, তাকে ত আঁধারে স্পষ্ট দেখি নি!

দয়া হ'ল না—উকিলের মত বুঝি হাকিমেরও ভ্রান্ত একটা বিশ্বাস। মেয়াদ হ'ল মাত্র তিন মাস, বিনা পরিশ্রমের। হাকিম হুকুম শুনাতেই চীৎকার করে কেঁদে বল্লেম—"কোন্ অপরাধে আমাকে এ গুরু দণ্ডে দাণ্ডিতা করলেন? পলে পলে মৃত্যু-যন্ত্রণার চেয়ে, আমার মৃত্যু-দণ্ড হ'ল না কেন!"

খুনী অপরাধের ক্ষমা হ'ল, আর অপরাধ আমার—আত্মহত্যার চেষ্টা,—তার ক্ষমা নেই! মানুষে যে বিনা চেষ্টাতেই সেই আত্মহত্যার দিকে দিনরাত অগ্রসর হচ্ছে—অনশন, অচিকিৎসা—সে কি আত্মহত্যা নয়? সে বিচার কে করে!

(১৬)

কি হবে বলে আর কেনো কথা। ধরায় যদি নরক থাকে সে জেল। পাপে তাপে অনাচার অত্যাচারে বাঙ্গলার জেল নরককে মূর্ত্ত করে তুলেছে,—পশুত্ব পূর্ণ মাত্রায় প্রকট হয়েছে জেলে। পশুর অধিক অধীনতা পশুর শাসনে পালিত, নিপীড়িত, পশুর অধম সঙ্গীর সংসর্গে কি আর মানুষ—মানুষ থাকতে পারে? সংশোধন ওখানে? নরকে? তবুও ঐটাই আমার স্বর্গ! মহা নারকী, পুত্রহন্ত্রীর প্রায়শ্চিত্ত যে হওয়া উচিত আরও যন্ত্রণার,—কৈ কোথায় তা? বিচারক আমার একি বিচার করলেন! এই যে পিশাচের দল এরাও আমার তুলনায় দেবদেবী। এদেরও প্রাণে দয়া মায়া আছে, কত প্রকারে ওদের অন্তরের টানের পরিচয় পাই। পরিবার পরিজন আত্মীয়ের কথা কত প্রকারে বলে কত জন,—স্বামী, পুত্রের জন্য চিন্তা করে, চোখের জল ফেলে, আর আমি সেসবে রেখেছি কোন্ অধিকার! ইচ্ছা হয় নিজকে টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলি,—কি শান্তি তাতে!

একটা মাস মরণের বিকট চিন্তায় প্রকৃতই উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেম, লোকে বলত পাগলী। আমার ছায়া কেহ স্পর্শ করতে চাইত না; আমারও মানুষের সঙ্গ মনে হ'ত অসহ্য!

ক্রমে সকল কথা ভুলতে বসলেম। প্রাণের কেমন মায়া এল। এত দিন মানুষ হয়ে মানুষকে দেখে শিউরে উঠেছি—এখন মনে হতে লাগল,—মানুষ ছাড়া কি মানুষ বাঁচে!

ঐ নরকেও জেগে উঠ্‌ল সুখের সাধ! হাসি কান্নার অতীত কথা, স্মৃতি, কখনও মনে আসে—আগের মত অত উতলা হই না—কেমন একটু মিষ্টি লাগে শেফালির গন্ধের মত। বড় মনে হয় ওর কথা! ভয় হয় রাক্ষসী বলে, পাছে যদি পরিত্যাগ করে, কি হবে! নিজকে ভুলতে ইচ্ছা করে,—আগ্রহ করে সঙ্গী কয়েদী রমণীদের কাজে সাহায্য করি। ওয়াডারণী বলে পাগলীর পাগ্‌লামী এখন ছুটেছে।"

একরকম সুখেই আছি। ওরা ত আমায় আদরই করে,—ওয়াডারণীর দয়ার শেষ নাই।

হায়! জীবন! সুখ দুঃখের জ্ঞান! কি দিয়ে কাকে কোথায় ভুলিয়ে রাখ্‌ছ তুমি জ্ঞান খোদা;—জীবনে যে মৃত—তারো প্রাণে জাগিয়ে তোল বাঁচবার সাধ, সুখের ইচ্ছা!

এখানের,—এ কারার দিন যে আমার ফুরিয়ে এল। রাত প্রভাত হলে আমার খালাস! আমার পক্ষে সেটা কি জীবন দিন! এ কয় দিন কেবল সেই চিন্তাই! দিনে সোয়াস্তি নাই, রাত্রে নিদ্রা নাই। এখান হ'তে এ নরক হলেও এ নিশ্চয়তার মধ্যে হ'তে গিয়া কোথায় আবার দাঁড়াব! সংসারে কি আমার স্থান আছে? অন্যে ত বল্‌বেই সন্তানহন্ত্রী পিশাচী, ও শুনে কি বল্‌বে। ভাগ্যে আমার,—আজও ও জেলে—দীর্ঘ দুটী বছর আজও পূর্ণ হয় নি! কি করে ও এলে মুখ দেখাব!

কি ভয়ানক ঝড় উঠেছে, তখন আমার বুকে! তুফানের তাণ্ডব লীলা, সাধ্য কি আমার বর্ণন করি,—তার সকলি যে অপার্থিব, অমানুষী, বুঝি অস্বাভাবিক!

ভোরের পাখী ডেকে উঠ্‌ল! সেই মিঠে সুরে শুন্‌তে পেলেম, মহাকালের কাল রব! এখনি আমায় উঠ্‌তে হবে, আজ আমার মুক্তির দিন। মুক্তি হবে সেই দেশে যে দেশ হতে মুক্ত হতে মৃত্যু আমার এক দিন শ্রেয় হয়ে উঠেছিল। যার নাগালের অতীত হতে জীবনাতীত দেশে চলেছিলেম, আজ জেল প্রাচীরের বাহিরে সেই হয় ত অপেক্ষা করছে! জেল রক্ষা করেছে আমায়, নরকে বাহিরে ও-স্বর্গেও আমার সুখ নাই!

পশুরা তাদের রাত্রিবাস ত্যাগ করবার পূর্ব্বে জেল কয়েদীর কোটর ত্যাগের ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। সাধ্য কার আর শয্যায় অপেক্ষা করে, পশুর বাড়া দণ্ড তাতে! আমরা বের হলেম। ওয়াডারনী হেসে বল্লে "রক্ষা পেলি। আজ খালাস তোর,—আর যেন এখানে আস্‌তে না হয়!"

তার শুভ ইচ্ছার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থান হৃদয়ে নাই। কলের পুতুলের মত খালাসের দিনের করণীয় যা যা আদেশ মত করে গেলাম। ডাক্তার সাহেব দেখা দিলেন। আমার খালাস। জেল হতে ক'গণ্ডা পয়সা হাতে দিয়ে আমার সকল দায় দেনা চুকিয়ে দেওয়া হ'ল। জেলের ফটক,—লোহার কপাট খুলে গেল। সে দিনে খালাস হবার আর আর যারা ছিল—তাহাদের মুখের পানে চেয়ে দেখ্‌লেম,—হাসি মুখ!

হুকুম হ'ল—"বাহির!" তখ্‌নি মলেম না কেন! কি করে' সহ্য করব বাহিরের আলো! আপনার কেহ,—পরিচিত,—বাহিরে এসে অপেক্ষা কর্‌ছে যদি!

ভয়ে ভয়ে চক্ষু নত করে বের হয়ে এলাম। দেহ কাঁপছে,—মন প্রাণ যে কি করছে,—দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাঁফিয়ে ডাকলেম—"আ—ল্লা!"

এ স্পর্শে ওর স্পর্শই! ও এসে আমার হাত ধরে ফেলেছে; একি! বাছাও যে আমার......এখানে,—বেঁচে আছে!—মানিক আমার, মার কয়েদ খালাস দেখ্‌তে এসেছ! অদূরে লাঠি ধরে দাঁড়িয়ে আলী!

অত কি আর সহ্য হয়। মূর্চ্ছিত হলেম। চেতনা পেয়ে দেখি,—পড়ে আছি, স্বামীর অঙ্কে। প্রাণের দুলাল আমার চোখের জলে ভাস্‌ছে! দু হাত বাড়িয়ে ছেলের গলা জড়িয়ে ধরলেম। রুদ্ধ কণ্ঠে বল্লেম "প্রাণের ধন আমার,—কে আমার প্রাণ দিল প্রাণ রে!"

স্বামী বল্লেন "কেন তুমি কাঁদ্‌ছ। কোন অশুভ কখনও ওর হয় নি! জেল আপিল করে বৎসর পরে যখন খালাস পেলাম, এসেই শুন্‌লেম আমার পোড়া কপালের জের কাহিনী! সতী তুমি জেলে গেছ,—ছেলে খুন করে,—বিশ্বাস হ'ল না, কিছুতেই তুমি অত নির্ম্মম হতে পার না। শুনলেম শেষে, আলীও দেশ হতে কোথা' চলে গেছে। মনের সন্দেহটা আমার তাতে আরও দৃঢ় হল। আলীর খোঁজে বেরিয়ে পলেম,—ওর হয় ত অনেক রহস্য জানা আছে মনে করে!'

মুখ পানে ওর ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলাম। ও বলে যেতে লাগল—"কত চেষ্টায় আলীকে খুজে বের করলেম। আলী দেখি অন্ধ হয়ে গেছে,—আর অন্ধের যষ্ঠি হয়েছে তোমার প্রাণের দুলাল! স্বর শুনেই আলী চিন্‌ল। বল্লে 'ওঃ কি মহাপাপই আমি করেছি,—জেল দিয়েছি দেবীকে, ফল দেখ তার হাতে হাতে! ও অনাহারে অনশনে উন্মত্ত হয়ে, ছেলের কষ্ট চোখে দেখ্‌তে না পেরে ছেলে বলে এনেছিল আঁধারে একটা কুকুর ছানা, সেটা সরিয়ে দিয়ে, ছেলেকে গুম করে, আমি হতভাগা ওকে প্রতিপন্ন করতে চেয়ে ছিলেম—সন্তান-হন্ত্রী রূপে,—তার শাস্তি আমার হয়েছে! তবু ভাল মোকদ্দমাটা শেষ না হতে, আমাকে অনুতাপে দগ্ধ করেছিল,—উকীল নিযুক্ত করে তলে তলে তখন চেষ্টা করেছিলেম। ভাগ্যে হাকিম, হত্যার কথা বিশ্বাস করলেন না—তাই রক্ষা! ও জেলে গেল, আমি ছেলেটাকে নিয়ে দেশত্যাগী হলেম। তারপর এই দশা!' অনুতাপে আলী দগ্ধ। আর কি ওর ওপর রাগ থাকতে পারে! ওকে আমি জীবনের সঙ্গী করেছি! ও যে আমার ভাই!"

বল্লেম "দেবতা......"

বাধা দিয়ে বল্লে "ও কি ছাই বকৃছ !"

বাধা মান্‌লেম না, বল্লেম "দেবতা,—মাপ ওকে করেছ,—তোমারি উপযুক্ত হয়েছে প্রিয়তম! স্বর্গের সুখ আজ পেলাম,—এ ক্ষমা যে আমাকেই করা হয়েছে,—ছেলে বেলায় সঙ্গী,—সহোদরের অধিক ও আপনার !"

অশ্রু রুদ্ধ স্বরে বল্লে "অফিরাণ,—ভগ্নি, কি শান্তি.—ক্ষমা তবে তুমি করেছ,—আজ আমি ভাগ্যবান। যে দৃষ্টি আমায় বিপথে ঠেলে দিয়েছিল,—আল্লা, তোমারি পুণ্যে,—তা কেড়ে নিয়ে অন্তরের স্নিগ্ধ দৃষ্টি আমায় ফিরিয়ে দিয়ে ধন্য করেছেন! দেবী তুমি জানি—ক্ষমা তুমি করেছ,..... তবু ভয় ছিল,—আজ তোমার স্নেহ লাভ করে' জগতের শ্রেষ্ঠ সুখী আমি—ওঃ আমার ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ!"

আলীর চরণে মাথা রেখে বল্লেম—"কিসের অপরাধ ভাই,—কার অপরাধ? আমি যে সকল অপরাধের মূলে।"

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

সে কি জানে।

[গান]

আজ আমি যে বসে আছি
চেয়ে তাহার পথের পানে,
আমার এমন আকুল-করা
আঁখির ধারা সে কি জানে ?

কাঁদন আমার বাঁধন-হারা
ফেনিয়ে ওঠে বুকের মাঝে,
ভুলায় সে মোর সকল কথা
ভুলায় সে মোর সকল কাজে ;

এমন আঁখি পলকহারা,
এমন নীরব নয়ন-ধারা,
এমন অধীর পাগল-করা
আকুল ব্যথা গোপন প্রাণে.
—সে কি জানে ?

না জানি সে কোন্ বিজনে
আমার তরে আছে জাগি,
এমনি কোন্ সাঁঝের আলোয়
আছে আমার পরশ মাগি;

বুঝি গো এই বিজন সাঁঝে
তারি ব্যথার পরশ বাজে,
পরাণ যে তাই মুখর হল
অধীর হল ব্যথার গানে;
—সে কি জানে?

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

বাঙ্গলা ভাষা।

(সাধুভাষা ও প্রাকৃতিক ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা।)

শ্রাবণ মাসের পরিচারিকায় সাধুভাষা শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন যে চলিত ভাষায় প্রাদেশিকতা বর্জ্জন করিলেই সাধুভাষা হয়। এ বিষয়ে বোধ হয় মত দ্বৈধ নাই এবং হইতে পারে না। এই মতানুবর্ত্তী হইয়াই বঙ্গীয় লেখকগণের শতকরা নিরানব্বই জন লিখিয়া থাকেন। কিন্তু কতিপয় মহা প্রতিভাশালী লেখকের ইচ্ছা এই যে বর্ত্তমান সময়ে সাধুভাষা নামে যাহা অভিহিত হয় তাহার উচ্ছেদ করিয়া তৎস্থলে প্রাদেশিকতাপূর্ণ চলিত-ভাষার প্রবর্ত্তন করা উচিত। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঠিক্ এই মত কোন স্থানে লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন কিনা তাহা জানিনা বরং তাঁহার বিদ্যাসাগর চরিতে সাধুভাষার অনুকূল মতই ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হইতেছে। কিন্তু সেই পুস্তক লেখার পর তাঁহার অনেক গভীর চিন্তা, পাণ্ডিত্য ও কবিত্বপূর্ণ পুস্তক ও প্রবন্ধে কলিকাতা অঞ্চলে প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যেরূপে ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যে তিনি সাহিত্যে প্রাদেশিক ভাষা প্রচলনের পক্ষপাতী। তবে তিনি মধ্যে মধ্যে এখনও সাধু ভাষায় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন ইহাতে বোধ হয় যে সাহিত্যে সাধুভাষার প্রচলনই ভাল কি চলিত ভাষার প্রচলন ভাল এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ আছে। যদি কলিকাতার প্রাদেশিকতাই তাঁহার অভিমত হয় তাহা হইলে কিন্তু তাঁহার মতের সহিত তাঁহার লেখার কিছু কিছু অসামঞ্জস্য আছে। কলিকাতায় এবং অন্যত্র সাহিত্যিক "করিতেছি" ও "করিতে" শব্দের পরিবর্ত্তে লোকে "কোচ্চি" ও "কোত্তে" বলে কিন্তু তিনি "করছি" ও "করতে" লেখেন। তাঁহার রচনা সম্বন্ধে আর একটা কথা এই যে তাঁহার সাধুভাষা

সুগম কিন্তু প্রাদেশিক ভাষা অনেক স্থলেই দুর্ব্বোধ। তাহা যে কেবল আমার মত অল্প শিক্ষিত নগণ্য লোকেই দুর্ব্বোধ মনে করে তাহা নহে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনিও রবীন্দ্র বাবুর ভাষা সব বুঝিতে পারেন না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ৺শারদাচরণ মিত্র মহাশয় ভারতবর্ষ পত্রিকায় এক প্রবন্ধে রবীন্দ্র বাবুর দুর্ব্বোধ ভাষা কিছু কিছু অধ্যাহৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ইহা কি বোলপুরের ভাষা না জোড়াসাঁকোর ভাষা?"

চলিত ভাষা সাহিত্যে প্রবর্ত্তনের আর একজন পক্ষপাতী ছিলেন মহামহিম ৺বিবেকানন্দ স্বামী। "ভাববার কথা" নামক পুস্তকে "বাঙ্গলা ভাষা" শীর্ষক একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন "যদি বল ·····বাঙ্গলা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টা গ্রহণ ক'রব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কল্‌কেতার ভাষা। পূর্ব্ব পশ্চিম, যে যেদিক থেকেই আসুক না একবার কল্‌কেতার হাওয়া খেলেই দেখ্‌ছি সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে কোন্ ভাষা লিখ্‌তে হবে। যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা, তত পূর্ব্ব পশ্চিমি ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হ'তে বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত ঐ এক কল্‌কেতার ভাষাই চল্‌বে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতের বেশী নিকট, সে কথা হচ্ছে না— কোন্ ভাষা জিৎছে সেইটি দেখ। যখন দেখ্‌তে পাচ্ছি যে কল্‌কেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গলা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা কওয়া ভাষা এক ক'র্‌তে হয়, ত বুদ্ধিমান্ অবশ্যই কল্‌কেতার ভাষাকে ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ ক'র্‌বেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে।" ইত্যাদি।

এই অধ্যাহৃত অংশে আমরা দেখিতে পাই যে লেখক কলিকাতার ভাষা লেখা উচিত বলিয়াও সর্ব্বত্র কলিকাতার ভাষা লেখেন নাই। তিনি হচ্ছে, পড়ছে, দেখ্‌ছি, দিচ্ছেন, জিৎছে, পাচ্ছি লিখিয়াছেন কিন্তু কলিকাতায় সর্ব্বশ্রেণীর লোকে এই সকল শব্দের ছ স্থানে চ উচ্চারণ করিয়া থাকে। সুতরাং বিবেকানন্দ স্বামীর মত যাহাই হউক কার্য্যত তিনি দেখাইয়াছেন যে কলিকাতার ভাষা ও লিখিবার সময়ে কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয়।

অধ্যাহৃত অংশ বিশ্লেষিত করিলে দেখা যায় যে লেখক উহাতে এই কয়টী মত প্রকাশ করিয়াছেন—

(১) কলিকাতার ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ যেহেতু তাহাই ছড়াইয়া পড়িতেছে।

(২) বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র কলিকাতার ভাষাই চলিবে।

(৩) সুতরাং কলিকাতার ভাষাতেই পুস্তক লেখা উচিত।

(৪) যে ভাষা সংস্কৃত ভাষার অধিক নিকটবর্ত্তী, লোকে সেই ভাষাকেই সাহিত্যের উপযোগী বলিয়া মনে করিয়া থাকে। তাহা না করিয়া যে ভাষার শক্তি অধিক সেই ভাষাই সাহিত্যে অনুসৃত হওয়া উচিত।

৫। কলিকাতার ভাষাকে সাহিত্যিক ভাষারূপে প্রবর্ত্তনের প্রস্তাবে অন্য স্থানের লোক অসন্তুষ্ট হইতে পারে কিন্তু এই অসন্তোষ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

এখন এই মতগুলি পরীক্ষা করা যাউক।

১। অবিমিশ্র কলিকাতার ভাষা নিশ্চয়ই ছড়াইয়া পড়িতেছে না। কলিকাতা, বর্দ্ধমান, নদীয়া প্রভৃতি নানা স্থানের ভাষা একত্র হইয়াই বর্ণসঙ্কর করিয়া সমস্ত দেশের শিক্ষিত সমাজে বিস্তৃত হইতেছে। কলিকাতার

বিনুন ছিনুম, দিনু, ছিনু অন্য স্থানের লোক শতকের মধ্যে ৯৯ জনও বলে না। কলিকাতারও অনেক শিক্ষিত এই শব্দগুল ব্যবহার করেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেম, দিলেম বলিতেন। ইহা আমরা তাঁহার কথার লিখিত আত্মচরিতে দেখিতে পাই। কলিকাতার বাহিরের লোক কলিকাতার লোকের মত নৌকাকে নৌকো, লম্বাকে লম্বা, আনকে আঁব, তামাককে তাবা বলে না। বর্তমান সময়ে কলিকাতার লোকেও তামাককে তবাক বলে না, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তবাক বলিতে শুনিয়াছি। নারিকেলকে নারকোল বোধ হয় অন্য স্থানের লোক বলে না। সুতরাং একথা ঠিক নহে যে কলিকাতার ভাষাই অপরিবর্তিতভাবে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

২। বাঙ্গালা দেশে যে সর্বত্রই কলিকাতার ভাষা চলিবে এই ভবিষ্যদ্বাণী মানিয়া লওয়া কঠিন। অদ্যাপি লণ্ডনের ভাষা সর্বত্র প্রচলিত হয় নাই।

৩। যদি কখনও কলিকাতার ভাষাই সমস্ত বঙ্গের ভাষা হয় তাহা হইলে তখনই কলিকাতার ভাষায় পুস্তক লিখিলেই হইবে। এখন হইতেই সে চেষ্টা কেন? এক দিন মরিতে হইবে বলিয়া মৃত্যুর পূর্বেই ভূত হইতে চেষ্টা করাটা কিছু নহে।

৪। কেবল সংস্কৃত ভাষার নিকটবর্তী বলিয়াই কোন ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা রূপে অবলম্বন করা উচিত নহে তাহা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু যদি এমন কোন ভাষা থাকে যাহা বাঙ্গলা দেশ প্রচলিত প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষার নিকটবর্তী তাহা হইলে কি সেই ভাষারই সাহিত্যিক ভাষা হওয়া উচিত নহে? সাধুভাষাই সেই ভাষা। চট্টগ্রাম রঙ্গপুর বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানের চলিত ভাষা হইতে সাধুভাষা যতদূর, কলিকাতার ভাষা তাহা অপেক্ষা বহু অধিক দূরে। ইহা আমি ইতঃপূর্বে একাধিক প্রবন্ধে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কলিকাতার ভাষার শক্তি [illegible] বিবেকানন্দ স্বামী যাহা বলিয়াছেন তাহা দৃষ্টান্ত দিয়া না বলিলে অনুভব করিতে পারি না। আমার [illegible] শক্তি, সৌন্দর্য্য, লালিত্য, সাধুভাষার নিকট চলিতভাষা দাঁড়াইতেই পারে না। ১৮৭১ অব্দে [illegible] এক সভায় একজন বাঙ্গালা বক্তা বাঙ্গলা সাধুভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত [illegible] বক্তার নাম এখনও জানিতে পারি নাই। তাঁহার কথা কয়েকটা ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া যে [illegible] তাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম—এখনও উদ্ধৃত হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন ;—"Already a Vi[illegible] with the aid of the pliant S[illegible] and under the guidance of a taste improved and [illegible] by English culture has shown how the erewhile [illegible] Bengali can be made complete in polish, elegance and grandeur with the learned language of Europe, a P[illegible]ra lal how it can be made a vehicle of common learning, an Aksay Kumar how it can be made a language of science and eloquence." রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিবেকানন্দ স্বামীর মত এই যে চলিতভাষা প্রাকৃতিক ভাবেই সাহিত্যে ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু কোন প্রাকৃতিক বস্তুকেই polish না করিলে তাহার elegance হয় না। প্রাকৃতিক বনস্পতির হয় ত grandeur আছে কিন্তু উদ্যানের তরুগুলিকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া না দিলে তাহার সৌন্দর্য্য ফুটিতে পারে না। এখনও সাধু ভাষায় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় যেরূপ বক্তৃতা করেন সেই বক্তৃতার সৌন্দর্য্যের সহিত, কি কেশবচন্দ্র সেন, কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চলিত ভাষার বক্তৃতার তুলনাই হইতে পারে না।

৫। কলিকাতার চলিতভাষা সাহিত্যে গ্রহণ করিবার প্রস্তাবে যে অন্য স্থানের লোকের মনে ঈর্ষ্যার উদয় হয় ইহা ঠিক কথা এবং স্বাভাবিক। আমি পূর্ববঙ্গের এবং বাঁকুড়া বর্দ্ধমান প্রভৃতি

পশ্চিমবঙ্গের অনেক লোককে দেখিয়াছি যাঁহারা কলিকাতার ভাষায় কথা কহিতে অনিচ্ছুক এমন কি সেরূপ প্রস্তাব করিলে উত্তেজিত হইয়া উঠেন। ৺দুর্গামোহন দাস মহাশয় এইরূপ একজন লোক ছিলেন। জীবিত কাহারও নাম করিবার প্রয়োজন নাই। অবস্থা যখন এইরূপ তখন সাধুভাষাকেই সাহিত্যিক ভাষারূপে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে কি?

প্রাদেশিক ভাষা সাহিত্যে প্রবর্ত্তিত করিবার আর একজন পক্ষপাতী নানা ভাষায় সুপণ্ডিত মহাকবি শ্রীযুক্ত নবকুমার কবিরত্ন। তিনি স্বপ্ন দর্শনে বররুচির মুখ দিয়া বলাইয়াছেন সাধুভাষাটা পিতামহের সময়ের বস্তু—পুরাতন ও অচল হইয়া গিয়াছে, সুতরাং চলিত ভাষায়ই পুস্তকাদি লেখা উচিত। কিন্তু কোন্ প্রদেশের ভাষা অবলম্বন করিতে হইবে তাহা কবিরত্ন মহাশয় বলেন নাই বলিয়া আমি তাঁহার মতের সমালোচনা করিতে পারি না। তবে সাধুভাষাটা পৈতামহিক পুরাতন বস্তু বলিয়া পরিত্যাগ করার সম্বন্ধে আমার এইমাত্র বক্তব্য যে তিনি যখন পৈতামহিক স্বপ্ন দর্শন ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হইয়া সেই ক্ষমতার ব্যবহার করিতে পারেন তখন অন্য লোকে পৈতামহিক সাধুভাষা ব্যবহার করিলে দোষ কি?*

প্রাদেশিক ভাষার আর একজন পক্ষপাতীর নাম করিব। ইনি শ্রীযুক্ত বীরবল মহাশয়। তাঁহার বীরোচিত বল আছে কিনা সেই জন্য তিনি যেন সাধুভাষা ব্যবহারকারীরা কিছুই জানে না ও বোঝে না বলিয়া তাহাদিগকে ধম্‌কাইয়া কলিকাতার প্রাদেশিক ভাষা সাহিত্যে প্রচলন করিতে চাহেন। কিন্তু আমি তাঁহার প্রবন্ধ হইতেই একাধিকবার দেখাইয়াছি যে অন্য স্থানের লোক কলিকাতার ভাষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারে না। তিনি হয় কলিকাতার ভাষা সম্যক্ জানেন না বলিয়াই তাহা অবিকল লিখিতে পারেন নাই অথবা ইচ্ছা করিয়া তাহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিয়া থাকেন। যদি তাঁহার মত অসাধারণ মনীষাশালী লোকও কলিকাতার ভাষা আয়ত্ত করিতে না পারে তাহা হইলে কলিকাতার বাহিরের মধ্যবর্ত্তী (average) লোক কেমন করিয়া তাহা আয়ত্ত করিবে। যে ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় না তাহাতে কলিকাতাবাসী ভিন্ন অন্য লোকে পুস্তকই বা লিখিবে কেমন করিয়া? আর যদি তিনি ইচ্ছা করিয়া কলিকাতার ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন তাহা হইলে কলিকাতার ভাষার নাম করেন কেন?

প্রাদেশিকতা-বাদীদিগকে আমি ইহাই বিনীত ভাবে জানাইতে চাহি যে তাঁহারা যত ইচ্ছা তত পুস্তক ও প্রবন্ধ প্রাদেশিক ভাষায় লিখুন, তাহাতে কেহই কিছু বলিবে না, যাহার ইচ্ছা সেই সকল পুস্তক ক্রয় করিবে বা না করিবে, কিন্তু তাঁহারা যেন প্রাদেশিকতাবাদ প্রচার করেন না। তাহা করিলেই দেশ মধ্যে দ্বেষাদ্বেষির উৎপত্তি হইবে। কলিকাতার বাজারে সর্ব্বপ্রকার খাদ্য বিক্রীত হয়—যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই কিনিয়া থাকে। কিন্তু গব্য মাংসবিক্রেতা† ও বরাহ মাংস বিক্রেতা যদি নিজ নিজ পণ্যকে আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য বিবর্দ্ধক, রস্য, স্নিগ্ধ, স্থির, হৃদ্য সুতরাং ভগবদ্গীতার সম্মত সাত্ত্বিক আহার বলিয়া যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমানকে ক্রয় করিতে বলে তাহা হইলে কেবল দ্বেষাদ্বেষি নহে, ফৌজদারী হইবারও সম্ভাবনা হইবে। এখনও ওয়েল্‌শ্ ভাষা উঠাইয়া ওয়েল্‌স্ প্রদেশে

* যে চারুপাঠে স্বপ্নদর্শন শীর্ষক একাধিক প্রবন্ধ আছে, সেই বিখ্যাত চারুপাঠ প্রণেতা অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় নবকুমার কবিরত্ন নাম ধারণ করিয়া স্বপ্নদর্শন শীর্ষক এক প্রবন্ধে বররুচির কথা লিখিয়াছেন।

† আয়ুঃ সত্ত্ব বলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ। রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ॥

ইংরেজী প্রচলনের প্রস্তাব হইলে তদ্দেশবাসীরা উত্তেজিত হয়। এখনও সেই দেশে এমন বহু লোক আছে যাহারা ইংরেজী জানে না অথবা জানিলেও ইংরেজীতে কথা কহে না বলিয়া গর্ব্ব করে। বাঙ্গলা দেশেও মানুষের প্রকৃতি অনারূপ নহে।

বাঙ্গলা নাম, বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণের অনেক সংস্কৃত শব্দের পরিবর্ত্তে প্রাদেশিক ভাষায় সম্পূর্ণ পৃথক শব্দ প্রচলিত আছে যথা বদরীকে কুল, উত্তমকে ভাল এবং শীঘ্রকে তাড়াতাড়ি বলে। এই প্রাদেশিক শব্দগুলি সাহিত্যে পবিত্র না হউক অনেক স্থলেই চলিতে পারে। কিন্তু কতকগুলি শব্দ সংস্কৃত শব্দের অশুদ্ধ উচ্চারণ মাত্র, যথা নারিকেলকে নারকোল বা নারকুল, মিষ্টকে মিষ্টি, শীঘ্রকে শিগ্‌গির, নৌকাকে নৌকো, নূতনকে নতুন বলে। এইগুলিকে সংস্কৃত রূপেই লেখা উচিত কেন না তাহা না হইলে ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধ বলিয়া একটা কথাই থাকিতে পারে না।

আমাদিগকে, তোমাদিগকে, তাহাদিগকে, সাধুভাষায় প্রচলিত এই সকল সর্ব্বনাম কলিকাতার প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত নাই—আমাদের, তোমাদের এবং তাদের দিয়া কাজ চালান হয়। বাল্যকালে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মুখেও আমাদের ঘরে, তোমাদের ঘরে, তাদের ঘরে শুনিয়াছি। এখনও বোধহয় অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর লোকে এই শব্দ কয়েকটা ব্যবহার করে। কিন্তু সাধুভাষার শব্দগুলি কি সাহিত্য হইতে বর্জ্জন করা উচিত?

কোচ্চি, কোত্তে, খেয়েচি, কোরবার প্রভৃতি কলিকাতাপ্রচলিত প্রাদেশিক শব্দের পরিবর্ত্তে, সাধুভাষার করিতেছি, করিতে, খাইয়াছি, করিবার প্রভৃতি শব্দই সাহিত্যে গ্রহণীয় যেহেতু এই শব্দগুলি বাঙ্গলার প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষার সেই সেই অর্থ জ্ঞাপক শব্দের নিকটবর্ত্তী এবং তাহাতে দেশ মধ্যে দ্বেষের সঞ্চার হইবে না। ইহা আমি প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

সতীস্বরগের দেশে।

——:✳⊕✳:——

(Lady Nairn's Land o' the Leal হইতে)

ফুরায়ে আসিছে জীবনের লীলা, প্রিয়,
গলিয়া আসিছে হৃদি হিমশিলা, প্রিয়,
সতীস্বরগের দেশ যথা রমনীয়
তথায় আজিকে চলিয়াছি আমি ভেসে।

নাহি তাপজ্বালা তথা কোন দুখ, প্রিয়,
জ্বালা যন্ত্রণাহারা হয় বুক, প্রিয়,
বাসর রজনী মধুময় কমনীয়,
আহা সেই শুভ সতীস্বরগের দেশে।

সুখে থাক সেথা সুখে আছ বেশ, প্রিয়
তোমাদের লীলা হয়নিক শেষ, প্রিয়
তোমরাও তথা হবে হবে বরনীয়
একদিন এই ইহ স্বপনের শেষে।

আমাদের 'মনু' রূপেগুণে ভালো, প্রিয়,
আগে হতে তাহা করিয়াছে আলো, প্রিয়
হয়ে আছে তার পাশে ঠাঁই লোভনীয়
কতদিন হতে সুখ স্বপনের দেশে।

মুছ তবে ঐ জলভরা আঁখি, প্রিয়
পিঞ্জর ছাড়ি চলে তব পাখী, প্রিয়
দেবদূতগণ উড়ায়ে উত্তরীয়
লইতে এসেছে চলে যাই হেসে হেসে

বিদায়—বিদায় ওগো প্রেমময়, প্রিয়
জীবন সমরে এই ত বিজয়, প্রিয়
তথা তোমা সনে চিরতরে স্বরগীয়
হইবে মিলন সতীস্বরগের দেশে।

শ্রীকালিদাস রায়।

পঞ্চভূত।

গভীর বনে বৃষ্টির প্রথম আঘাতটা যেমন ঘন পাতার ওপর দিয়েই কেটে যায়, ভিতরে এসে পৌছায় না, সেই রকম আমরা আমাদের ঘরের ভিতরকার স্তব্ধতার অন্তরালে তাকিয়া, বই এমন কি দেওয়াল পর্য্যন্ত আশ্রয় ক'রেও বেশ শান্তভাবেই বাদ্‌লার সন্ধ্যাটি কাটাচ্ছিলাম, কিন্তু আর বেশীক্ষণ তেমন করে থাকা চল্‌ল না। বনের বাইরের বর্ষণ শেষ হ'লে বনের ভিতরকার বর্ষণ সুরু হয়। আমাদের অদূরের সেই করোগেটের চালের ওপর হ'তে যখন জল পড়ার শব্দ একেবারে থেমে গেল, গগন কোলের ওপর তাকিয়াটাকে বেশ একটু স্নেহভরে তুলে নিয়ে আপন মনে ব'লে উঠ্‌ল—'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে।'.........তারপর ভাবের আবেগেই হোক্ আর স্মৃতি-শক্তির অভাবেই হোক্ তার মেঘদূত আর বেশীদূর এগুল না। একটা প্রকাণ্ড হাই তুলে বিশ্রী একটা শব্দ ক'রে বল্‌ল—'কি কথাই বলে গেছে চণ্ডীদাস!'

অবনী এতক্ষণ সাড়েতিন পায়া ওয়ালা একটী চেয়ারে কাৎ হয়ে বসে ঝিমচ্ছিল, গগনের সাড়া পেয়ে সে সোজা হয়ে উঠে বসে, মাথায় একটা ভীষণ জোরে নাড়া দিয়ে বলে উঠ্‌ল—'ওটা চণ্ডীদাস নয়, কালিদাস ; আর আজ আষাঢ় মাসের প্রথম দিন নয় ভাদ্র মাসের সাত তারিখ।'

দিব্য নিশ্চিন্ত ভাবে গগন বল্‌ল—'তা ও কালী চণ্ডী একই কথা, কিন্তু ওটা মেঘদূত তা'ত আর অস্বীকার করবার উপায় নেই।' বিরক্ত হয়ে অবনী বল্‌ল—'আমি বুঝ্‌তেই পারি না তোমরা কেন এত পিছনের দিকে তাকিয়ে থাক! এই ভাদ্র মাসের সাত তারিখে যে কিছু হ'চ্ছে বা হ'তে পারে তার কোনই খোঁজ রাখ না। বর্ত্তমানটা যেন কিছুই নয়, সেটা একেবারেই শূন্য! মানুষের ভালবাসা বা বিরহ ব্যথা সমস্তই যেন ঐ আষাঢ়ের প্রথম দিনেই শেষ হ'য়ে গেছে। বলি মশায় এই মুহূর্ত্তে যদি কোন বিরহীর মনটা একটী বিশেষ নম্বর বিশিষ্ট লভলক্ রাস্তার কোন একটীর বাড়ীর উদ্দেশে আকুল হ'য়ে ওঠে তা হ'লে সে কথাটী কি অম্‌নি তোমার ঐ সংস্কৃত শ্লোক্ দিয়ে তাড়াতাড়ি চাপা দিতে হবে? এই সন্ধ্যার বুকখানি কেউ যদি তার বুকের ব্যথা দিয়ে ভরিয়ে বল্লে—'আমি ভালবেসেছি' তা হ'লে আর ঐ আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের দিকে ফিরে যেতে হয় না, ভাদ্রস্য সপ্তম দিবসটীও সার্থক হ'য়ে ওঠে।'

গগন বল্‌ল—'কি জান অবনী, আসল কথাটা হচ্ছে, ঐ আষাঢ়ের প্রথম দিনে যক্ষের বুকে যে বেদনা জেগেছিল।..........'

অবনী চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—'সেটা কি তুমি আজ নিজের বুকে অনুভব করছ নাকি? আহা দাদা আমাদের লজ্জাবতী লতা তাই ইঙ্গিতে জানাচ্ছেন! বিংশ শতাব্দীর কি মহিমা, প্রেমেও ডিপ্লোমেসী!'

গগন এর কোন প্রতিবাদ না ক'রে চুপ্ ক'রে বসে রইল। একটু একটু করে ঘরের ভিতরকার স্তব্ধতা আবার বেড়ে উঠ্‌ছে। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। বাতাস আমাদের ঘরে প্রবেশের পথ না পেয়ে নিষ্ফল আক্রোশে জানালার বার বার আঘাত করে যাচ্ছে। অবনী আবার তার চেয়ারে কাৎ হয়ে পড়্‌বার আয়োজন করতেই অনীল বলে উঠ্‌ল—'অবনী আজ তুমি আমাদের কিছু বল।' আফিমের নেশায় মস্‌গুল্ মানুষ যেমন চম্‌কে ওঠে অনিলের কথায় ঘরের ভিতরকার স্তব্ধতা তেম্‌নি করেই ছুটে গেল। অবনী চেয়ারে একটু চাপ দিয়ে উঠে বসে বল্‌ল—'কি শুন্‌তে চাও?' সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারটীও ক্যাঁচ করে উঠ্‌ল—'কেন জালাও দিব্যি আছি,' নির্ব্বোধ মানুষ তার ভাষা বুঝ্‌ল না। অনিল বল্‌ল—'যা শোন্‌বার জন্যে আমাদের সমস্ত দেহ কান পেতে আছে।' গগন তার স্বাভাবিক উচ্চ হাসিতে ঘরখানি কাঁপিয়ে বলে উঠ্‌ল—অনিলের প্রাণে কবিত্ব জেগেছে দেখ্‌ছি! বলে সমস্ত দেহ কান পেতে আছে! দেহে কান, কি বিশ্রী!'

অবনী বল্‌ল—'বেশ আমি বল্‌তে রাজী আছি কিন্তু পাত্রপাত্রীর নাম স্থান কাল ইত্যাদি কিছুই বল্‌ব না!'

গগন প্রতিবাদ কর্‌ল সেকি! তা হ'লে তাদের মনে রাখ্‌বে কি করে?

অবনী বল্‌ল—'কিছুই মনে রাখ্‌বার দরকার নেই শুধু জেনো তারা ভালবেসেছিল তা হ'লেই হবে। অতএব তোমাদের অনুমতিক্রমে আমি এখন আরম্ভ করি।—

—'একটী ছেলে আর একটী মেয়ে ছিল।'.........

খুসী হয়ে সলিল বল্‌ল—'চমৎকার!'

'একটী ছেলে আর একটী মেয়ে! তারা কে, কোথায় বাড়ী, কার ছেলে মেয়ে এসব কিছুই জানবার দরকার নেই, শুধু জানলাম একটী ছেলে আর একটি মেয়ে। ঐ তাদের পরিচয়। এত বড় পৃথিবীর বুকে আর কিছু না শুধু একটী ছেলে আর একটী মেয়ে।' অবনী বলতে লাগল—'তাদের মুখভরা হাসি, চোখ ভরা জল, বুকভরা ভালবাসা। তাদের স্নেহ-কোমল হাতগুলি পরস্পরকে কাছে টেনে নেবার জন্যে ব্যাকুল। জগতের আর কিছুরই প্রতি তাদের দৃষ্টি নেই; —জগৎ তাদের কাছে মিথ্যা।'

গগন বলল—'কষ্ট মুস্কিল হচ্ছে ত ঐখানেই দাদা; ছেলেটী আর মেয়েটী দুজনই জগতকে মিথ্যা ভাবুক, জগৎ মিথ্যা মোটেই নয়, সে ভারি সাঁচা। কিন্তু তোমার কথায় আমি যথার্থই মুগ্ধ হয়েছি।'

অবনী বলল—'ওটা খুব ঠিক কথা গগন, তুমি আমার গল্পটাকে অনেকখানিই এগিয়ে দিলে। তারপর দিনে দিনে ছেলেটী আর মেয়েটী জগতের চোখের ওপর বড় হয়ে উঠল। তারা কিন্তু আজও জগৎকে চিনতে পারল না। সূর্য্যমুখী ফুল যেমন সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে সমস্তদিন কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা মাথাটী নীচু করে দাঁড়ায়, আবার সকাল বেলা রবির আলো যখন তার শিশির ভেজা মুখখানিতে এসে পড়ে সে মাথাটী তুলে হেসে ওঠে ঠিক তেমন করেই এরা দুজনের দিকে তাকিয়ে দিনগুলি কাটিয়ে দিত।'

অনিল বলল—'এবার আমি বলতে পারি তারপর কি হ'ল।'

—'কিন্তু আমি আমার বলার সুবিধার জন্যে মেয়েটীর নাম দিলাম 'পুষ্প' আর ছেলেটীর নাম দিলাম 'রবি'। একদিন পুষ্পের মনে হ'ল যেন অনেক বেলা হয়ে গেছে তবুও রাত আর পোহাচ্ছে না! সে আর চুপ ক'রে না থাকতে পেরে মুখটী তুলে ওপরের দিকে তাকাল, কিন্তু প্রতিদিনের মত রবির স্পর্শ তার মুখখানির ওপর সেদিন আর পড়ল না! পুষ্প ভাবল হয় ত এখনও প্রভাত হয়নি। কিন্তু পরক্ষণেই শুনতে পেল মেঘ ডাকছে। তবু পুষ্প মুখটী উঁচু করেই রইল সমস্ত দিন। কখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, পুষ্প তেমনি স্থির হ'য়েই দাঁড়িয়ে আছে! তারপর ধীরে ধীরে তার শ্রান্ত মাথাটী নত হ'য়ে পড়ল, ক্রমে রাত্রির গভীর অন্ধকারে সমস্তই ঢাকা পড়ল।'

অবনী বলতে থাকল—'হাঁ ঢাকা পড়ল কিন্তু রইল সবই। কিছুই হারাল না। রবিও আছে পুষ্পও আছে, কিন্তু তারা তাদের মাঝের এই অন্ধকারের ব্যবধানটি কিছুতেই আর সরিয়ে ফেলতে পারল না।' সলিল একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল—'ঐ অন্ধকারই হচ্ছে জগৎ।'

ঘরের এক কোণ হ'তে ভীষণ ক্রোধের গর্জ্জন হ'ল—'ভারি অন্যায় জগতের। নির্ব্বোধ মানুষ অনাচার করবে, জগৎ তাই স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখবে, তোমরা এই চাও। তোমাদের মত লোকই যদি জগতের হর্ত্তা....।' তেজেশের কথা শেষ না হ'তেই অনিল বলে উঠল—'তা হলে আমরা নিশ্চয় বুক ভরে ভালবাসতাম। চীৎকার করে বিরহের কবিতা পড়বার অবসর পাওয়া ভার হ'ত। প্রিয়তমার কানের কাছে মুখ এনে.....।' 'ওকি! তেজেশ উঠছ যে?' অস্থির হয়ে তেজেশ বলল 'নাঃ, এখানে আর ভদ্রলোকের থাকা চলে না। কি হে গগন, তুমি যে এখনও বেশ ঠাণ্ডা হয়ে ব'সে আছ?' গগন তাকিয়াটী ঘুরিয়ে নিয়ে—'কি জান তেজেশ, এই ছোটলোকগুলো যে বিকারগ্রস্ত রোগীর মত ভুল বকছে সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই। তবে কিনা, ওটার ভিতর কেমন যেন একটু যাদু আছে, সেটা এই আষাঢ়মাস—ওর নাম কি ভাদ্রমাস সপ্তম দিবসে বেশী বেমানান হ'চ্ছে বলে ত মনে হয় না। দেখাই যাক না কোথায় গিয়ে এদের গল্পটা ঠেকে। আর বেশী যদি বাড়াবাড়ি করে তা হলে এদের ঘর হ'তে তাড়িয়ে দিলেই চলবে, ঘরত আমার।—বলহে বল।'

—'তারপর একদিন কেমন করে জানি না অন্ধকারের আবরণটী একটুখানি স'রে গেল। পুষ্প দেখ্‌ল পশ্চিম আকাশ বুকের রক্তে রঙিয়ে নির্নিমেষ নয়নে রবি তার দিকে তাকিয়ে আছে! পুষ্প কেঁদে বল্‌ল—'এই কি শেষ রবি?'

তেজেশ বলে উঠ্‌ল—'হাঁ গো হাঁ এই শেষ। এখন রবি তুমি লক্ষ্মী ছেলেটীর মত দিন কতক রাত জেগে ব্যর্থ প্রেমের কবিতা লেখো গিয়ে। পুষ্পের জন্যে বেশী ভেবো না, তার উপায় জগৎ ঠিক্ করেই রেখেছে। জগৎ তোমায় পুষ্পের উপযুক্ত বর মনে করে না, অতএব তুমি তোমার যোগ্য একটী কনের সন্ধানে থাক চাই কি আমরাই তোমায় সাহায্য কর্‌তে পারি। তবে যদি একান্তই প্রেমে পড়্‌বার জন্যে তোমার মন ঝুঁকে থাকে, তা হলে দোহাই তোমার স্থান বুঝে প'ড়ো, জগৎ তাতে আপত্তি কর্‌বে না। এটা তোমার প্রথম প্রয়াস, কৃতকার্য্য হতে পারনি বলে অনুশোচনা করে সময় কাটাবার চেয়ে দ্বিতীয় বার চেষ্টা কর সফল হবেই। অবনী এই আমি তোমার গল্প শেষ করে দিলাম।'

অবনী বল্‌ল—'তুমি যা বল্‌লে তেজেশ তা যদি হ'ত তা হলে ত কোনই গোল থাক্‌ত না, কিন্তু.........।'

'আবার কিন্তু কি? না-না অবনী একটা অন্যায়কে এমন ভাবে প্রশ্রয় দিলে চল্‌বে না।' অবনী বল্‌ল 'তুমি যকে অন্যায় বলছ তেজেশ সে জিনিষটা অতি বেয়াড়া, কারো মানা শোনা তার ধাতে নেই। তাকে প্রশ্রয় না দিলেও তার বেশী ক্ষতি হয় না।

একদিন খুব ভোরে তখনও কোকিল ডাকেনি, মাধবীলতার সুগন্ধ ফুলগুলি অসময়ে জেগে উঠ্‌ল! তারা শুনতে পেল কে কাঁদছে—রবি, রবি কি হবে রবি? পাতার আড়ালে ফুলগুলি স্তব্ধ হয়ে রইল, তাদের চোখের পাতাগুলি বিস্ময়ে ঔৎসুক্যে আস্তে আস্তে খুলে গেল। তারা দেখ্‌ল রবি পুষ্পের হাত দুটী ধ'রে বল্‌ল—'পার্‌বে পুষ্প একটী কাজ কর্‌তে?' কিন্তু বড় কঠিন সে কাজ থাক্ দরকার নেই, আমাকে ভুলে যাও পুষ্প।" মাধবীলতার গুচ্ছে গুচ্ছে সাড়া পড়ে গেল। তারা একসঙ্গে মাথা দুলিয়ে বলে উঠ্‌ল—'পার্‌বে রবি পার্‌বে, তোমার জন্যে ও সব সইতে, সব করতে পারবে, ও যে নারী। পুষ্প তা'র নিটোল হাত দুটী দিয়ে রবির গলা জড়িয়ে ধরল। তারপর তা'রা ঐ রকম ক'রেই মাধবী বিতানের ভিতর দিয়ে, মালতীর ঝাড়ের পাশ দিয়ে, মেহেদির বেড়া পার হ'য়ে আমগাছের ঘন ছায়ার মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। সেদিন ভ্রমরগুলি ফুলবালাদের ঘুম ভাঙ্গাতে এসে দেখ্‌ল সকলেই জেগে আছে। অবনীর গল্পে বাধা দিতে যাওয়া বৃথা জেনে তেজেশ আপনার মনের আগুনে আপনি পুড়ে বল্‌ল—'ধিক্, ধিক্ অনাচারী। কিন্তু সব চেয়ে লজ্জার কথা যে গগনটাও দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে এই জঘন্য আলোচনায় যোগ দিয়েছে! গগন একবার আধবোজা চোখে তেজেশের মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা ক'রে বল্‌ল—'চোপ্‌রাও বাঙ্গাল, ফের যদ.........।' অবনী বলতে আরম্ভ করল,—

—'তারপর কাক, চিল, ফিঙে, গাঙ্‌শালিক, কাট'ঠাক্‌রা ইত্যাদি একসঙ্গে ডেকে উঠ্‌ল, অর্থাৎ কিনা জগতের নিদ্রাভঙ্গ হল। ঘুম ভাঙ্‌তেই জগৎ বুঝ্‌তে পার্‌ল যে তার ঘরে মস্ত বড় একটা চুরি হ'য়ে গেছে। অমনি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত তার মুখ হতে অবিশ্রান্ত ভাবে বেরিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল—আমি যদি ওকে আমার বিষয়ের এক কাণা কড়ি দিই তবে আমি......ইত্যাদি। আমি যদি হাইকোর্ট এমন কি পার্লামেন্ট পর্য্যন্ত কেস্ না চালাই তবে আমি......ইত্যাদি। আর খবরের কাগজের সাহায্যে এই চুরির বিবরণটী যে কত রঙ্গে রঙিন্ হয়ে চারিদিকে প্রচারিত হয়ে গেল তা আর......থাক্ সে কথা।'

'সলিল এইবার তুমি একটী বেশ মানান্ সই নাম তৈরী করত দেখি।' সলিল বল্‌ল 'চেহারার কিছু আভাষ পেলে এখুনি বলে দিতে পারি।' অবনী বল্‌ল—'ফর্‌সা হৃষ্টপুষ্ট, বড় বড় চোখ, চাহনি বড় স্নিগ্ধ, তাতে কেমন একটু যেন বেদনা মাখান আছে; ঠোঁট দুটী পাত্‌লা কিন্তু নক্সীর দিকে তাকালেই একটু খট্‌কা লাগে! তখন আর তাকে অতটা নিরীহ ভদ্রলোক বলে মনে হয় না।' সলিল বল্‌ল—'তাইত নাকটাত তাহলে বেজায় গণ্ডগোল বাধাল দেখ্‌ছি! যাই হোক আমি ওর নাম দিলাম সৌম্য। অবনী আরম্ভ করল—

—'তখন বেলা প্রায় সাড়ে আট্‌টা হ'বে। সৌম্য চা পান ইত্যাদি শেষ ক'রে ক্রিসেন্‌থিমস্ আর ডেলিয়া ফুলে ভরা বাগানে ম্যাগনোলিয়া গাছের তলায় টেবিলের ওপর কতকগুলি আধফোটা চাঁপা রেখে বসেছিল। এমন সময় দু'জন মানুষ আইভি দিয়ে মোড়া থামের আড়াল হ'তে বেরিয়ে তার পিছনে এসে দাঁড়াল। সেই দু'জন মানুষের মধ্যে একজন একটু কুণ্ঠিত ভাবে বল্‌ল—'আমরা এসেছি সৌম্য'।

সৌম্য কিছুক্ষণ তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বড় মিষ্টি একটু হেসে বল্‌ল—'চল তোমাদের স্নানের আর কিছু খাবার যোগাড় করে দিইগে।' সৌম্য একটু এগিয়ে যেতেই নবাগতদের মধ্যে একজন অপরের হাত ধরে বল্‌ল—'কোথা যাব রবি? যতক্ষণ পথে চলছিলাম, ভাব্‌ছিলাম তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, আর কোন কথা মনে হয় নি; কিন্তু এখন কেন জানিনা বড় ভয় করছে। কোথায় এলাম রবি?' রবির উত্তর দেবার পূর্ব্বেই সৌম্য পিছিয়ে এসে বলল 'তোমার বাড়ীতে এসেছ পুষ্প। আমি রবির বন্ধু সুতরাং তোমারও বন্ধু।' সৌম্য দুজনের আগে চল্‌তে চল্‌তে বলল—'দেখ্‌ছ ঐ ক্রিসেন্‌থিমস্ এর পাশে ডেলিয়াটী কি চমৎকার মানিয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা রবি আর পুষ্প দু'জনে দু'জনের কাঁধের ওপর মাথা রেখে কেবলই কাঁদ্‌ছিল—পুষ্প। রবি; আমার চোখের আলো। আমার সর্ব্বস্ব। পুষ্প, প্রিয় আমার। এমন সময় পিছন হ'তে কে একজন একগাছি বেলফুলের মালা দিয়ে তাদের বেঁধে অন্ধকারে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।'

তেজেশ আর সহ্য করতে না পেরে রেগে বল্‌ল—'ওদের বিয়ে এবার দেবে কিনা বল? কেলেঙ্কারি হ'ল ঢের। সমাজ বলে ত একটা জিনিষ আছে তার সম্মান.........।'

অবনী বল্‌ল—'আমিত পূর্ব্বেই বলেছি জগৎ এদের কাছে মিথ্যা।' তেজেশ চীৎকার করে উঠ্‌ল—'ওরা অকৃতজ্ঞ। ঐ জগতই এতদিন ওদের বুকে করে রেখেছিল।' অবনী শান্ত ভাবে বল্‌ল—'পুষ্প আর রবি বলে আমাদের ভালবাসার রাজ্যে আমরা রাজা এবং রাণী। এই ভালবাসার রাজ্যই আমাদের জগৎ। শ্লেষের সঙ্গে তেজেশ বল্‌ল—'এই ভালবাসার রাজ্যে একটী দুটী নূতন প্রজার সৃষ্টি হ'লেই রাজা রাণী হওয়ার মজা বুঝ্‌বেন।'

গগন ভয়ানক চীৎকার করে উঠ্‌ল—'এই তেজেশটা সব মাটি করে দিলে! চোখ ভ'রে যখন রূপসীর রূপ-সুধা পান করছি তখন দার্শনিকপ্রবর এক কঙ্কাল চোখের সামনে ধরে বল্‌লেন—যা দেখছ তা স্বপ্ন, সত্য হচ্ছে এইটী। কে দেখতে চায় হে বাপু তোমার সত্য? আমরা দেখব না। যতদিন বাঁচব ততদিন ঐ স্বপ্নের মধ্যেই ডুবে থাক্‌ব। তুমি তোমার সত্য কঙ্কাল নিয়ে নিকালো হিঁয়াসে। অবনী কি করা যায় বল ত?' অবনী বল্‌ল 'কিছুই কর্‌তে হবে না তোমায়: তুমি শুধু ঐ তাকিয়াটীকে কোলে নিয়ে চুপ করে শুনে যাও ভাল-

বাসার রাজ্যটা এত পুড়ে আর ঘা খেয়ে তৈরী যে ওকে আর কোন আঘাত বা আগুন কিছুতেই টলাতে পারে না।

—'কিছুদিন কেটে গেছে, কতদিন বলা বড় শক্ত। কেন না এত সহজে এদের দিনগুলি কেটে গেছে যে এরা আজও বুঝতে পারে নি সেই প্রথম দিনের সকালের সঙ্গে আজকের এই সন্ধ্যার দূরত্বটা কতখানি। আজও তেমনি করে তারা বলে উঠ্‌ছে—'পুষ্প'। 'রবি'। কিন্তু তাদের মনে হচ্ছে যেন আজ এই প্রথম তারা পরস্পরের নাম ধরে ডাক্‌ল! তার পর একদিন……।'

সলিল আর অনিল এক সঙ্গে বলে উঠ্‌ল—'অমন করে থামলে কেন অবনী?' অবনী বল্‌ল—'ভালবাসার রাজ্যের সিংহাসনটা শূন্য করে রাজা যে কোথায় চলে গেল তার আর উদ্দেশ পাওয়া গেল না!' গগন কোল হ'তে তাকিয়াটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্‌ল—'তুমি আবার এ কি কাণ্ড করলে অবনী?' অবনী বল্‌ল—'কাণ্ড করবার ভার যিনি নিয়েছেন তিনিই করছেন সব। আমি শুধু বল্‌ছি যা দেখেছি। পুষ্প শূন্য ঘরের মাটীতে মাথা ঠুকে ঠুকে ডাকতে লাগ্‌ল—'রবি—রবি', কিন্তু আজ আর পুষ্পের নামটী তারই কানের কাছে বার বার করে কেউ বলে উঠ্‌ল না।

—'আরো কিছু দিন কাট্‌ল। এবার কিন্তু দিনগুলি পুষ্পকে বেশ করেই জানিয়ে দিয়ে গেল যে আমরা কাটছি। সেদিনও সন্ধ্যা বেলা বড় ভয় পেয়ে, বড় ব্যাকুল হয়ে পুষ্প ডাক্‌ছিল—'রবি—রবি'। চাঁদের আলো বন্যার মত আকাশ হ'তে ছুটে নেমে আসছে। যে বিরাট অন্ধকার সমস্ত জগৎ জুড়ে তার দেহখানি বিছিয়ে দিয়েছিল সে যেন আর কোথাও জায়গা না পেয়ে পুষ্পের এই একটী মাত্র ঘরে ভরে উঠেছে! নিদাঘতাপক্লিষ্ট ধরণীর নিঃশ্বাস পতনের মত সেই গভীর অন্ধকারের বুক হ'তে বড় অবসাদে ভরা কথা মাঝে মাঝে বেরিয়ে আস্‌ছে—'রবি—রবি'।

জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে কে একজন এই আকুল আহ্বান শুনছিল। সে আস্তে আস্তে ঘরে এসে পুষ্পের মাথাটী আপনার বুকের ওপর তুলে নিয়ে তারই ওপর মুখ রাখ্‌ল। পুষ্প ব্যাকুল ভাবে তাকে জড়িয়ে ধরে বল্‌ল—'রবি—রবি আর আমায় কাঁদিও না রবি'। তারপর কি মনে করে হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌ল—'কে তুমি?' বড় আস্তে কান্নায় ভেজা কথা শোনা গেল—'আমি সৌম্য। বিস্ময় এবং ঘৃণায় ভরা দুটী কথায় এর উত্তর সে পেল—'তুমি? এত নীচ্! সৌম্য কোন উত্তর না দিয়ে চুপ্ করে দাঁড়িয়ে রইল। পুষ্প জ্বলে উঠে বল্‌ল—'কেন তুমি এমন করলে?' এবার সৌম্য আস্তে আস্তে বল্‌ল—'কেন' এর উত্তর হয়ত তোমার কাছে আপনা হ'তে একদিন এসে পৌঁছাবে। একটা কথা আছে পুষ্প আর একটু দাঁড়াও। তুমি কি আবার ওদের কাছে ফিরে যেতে চাও?' পুষ্প দু'হাত দিয়ে একটা চেয়ার শক্ত করে চেপে ধ'রে বল্‌ল—'আমি শুধু এই খানটীতে পড়ে থাকতে চাই এ সব ছেড়ে আমি বাঁচ্‌ব না।'

সৌম্য বল্‌ল—'আমিও তোমায় এত বড় পৃথিবীতে একা ছেড়ে দিতে পারব না পুষ্প। থাক এইখানে; ভালবাস তোমার রবিকে, আমাকে শুধু তোমার পথের সাথী করে নাও পুষ্প। তোমার দুঃখের বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে আমায় ধন্য কর পুষ্প।' পুষ্প আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌ল—'সে কি ক'রে হবে! আমার মাথার ভার তোমায় কি ক'রে দেবো?' সৌম্য বল্‌ল—'আমায় বিয়ে কর পুষ্প।' পুষ্প মূর্চ্ছিত হয়ে সৌম্যের পায়ের কাছে পড়ে গেল। তার যখন জ্ঞান হ'ল সে দেখ্‌ল সৌম্য তার মাথাটা কোলে নিয়ে বসে আছে। তার চোখ দিয়ে

অশ্রুধারে জল ঝরে পড়ছে। পুষ্প কেঁদে বল্‌ল—'কেন তুমি একাজ করছ সৌম্য, এতে তোমার কি লাভ হবে?' সৌম্য বল্‌ল—'লাভ? সমস্ত লাভের আশায় আগুন লেগে গেছে পুষ্প, পুড়েও ছাই হয়ে গেছে সব। পুষ্প আমি তোমায় ভালবেসেছি।'

অবনী চুপ্ কর্‌তেই ঘরের ভিতর কতকগুলি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ার শব্দ শোনা গেল, কিন্তু কেহই কোন কথা বল্‌তে সাহস করল না। এমন সময় অবনী আবার বল্‌তে আরম্ভ করল,—

—'আমি তোমায় ভালবেসেছি পুষ্প', এই কথাগুলি যেন একটা গোপন রাজ্যের দরজা খুলে দিল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে পুষ্পের মনে পড়ে গেল, যুগযুগান্তর ধ'রে তারই পায়ের কাছে এই কথার অর্ঘ্য সৌম্য নীরবে দিয়ে এসেছে। ঐ কথাগুলির সুর এত হাল্কা, পূজা এত স্বাভাবিক ছিল যে সর্ব্বদা চোখের সাম্‌নে ভেসে বেড়ালেও পুষ্প তার অর্থ বুঝ্‌তে পারেনি। অন্তরের এবং বাইরের এই বিরাট অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে প্রথম আজ সৌম্যকে দেখ্‌ল।

—দিনের পর দিন কেটে যায়; পুষ্প আপনার নিরালা ঘরের কোণে প'ড়ে শুধু ভাবে,—কি করে এ সম্ভব হ'ল! কান্নায় তার বুক ভেসে যায়। নিজের জন্যে নয়, সৌম্যের জন্যে।—জানালার ধারে কালো ছায়া ফেলে সৌম্য দাঁড়িয়ে থাকে পুষ্প দু'হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে বলে ওঠে—কেন মানুষ ভালবাসে? ইচ্ছা করে' কেন সে আগুনের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে? ক্রমে তার নিজের দুঃখ মন হতে কমে গিয়ে সৌম্যের দুঃখ বড় হয়ে উঠ্‌ল। জানালার ধারে যে দিন পুষ্প সন্ধ্যা বেলা সৌম্যকে দেখতে পেত না সে দিন সে অস্থির হয়ে উঠ্‌ত, ভাবত আমার জন্যে হয়ত সে কোথাও চোখের জল ফেল্‌ছে। 'তোমায় ভালবাসিয়াছি পুষ্প' যেন একটা মহাপ্রলয়ের বার্ত্তা। সুখশান্তি, আশাভরসা, প্রাণের সমস্ত সরসতা যেন তার এই কথার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। 'তোমায় ভাল বেসেছি পুষ্প', কি বুক ভাঙ্গা কান্না! পুষ্পের সমস্ত হৃদয় হাহাকার করে ওঠে, কঠিন পাথরের ওপর মাথা চেপে ধরে, কেঁদে বলে—'কেন এত অশান্তি, কেন এত আগুন।' তার কানের কাছে আবার সেই করুণ সুর বেজে ওঠে—'তোমায় ভালবেসেছি পুষ্প'। পুষ্প বলে 'ওগো ভালবাসা',—আমার যৌবনের প্রথম প্রভাতে তুমি আমায় যে রূপে দেখা দিয়ে আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে সেই রূপ নিয়ে কোথায় লুকালে? তোমার বুকে মাথা রেখে চল্‌তে চল্‌তে মাঝ পথে এসে তোমায় আবার এ কোন্ রূপে দেখ্‌লাম! আর যে চিন্‌তে পারি না! ফিরে এস তোমার সেই রূপ নিয়ে। আমি আর সইতে পারি না, ওগো ফিরে এস। তার কানের কাছে আবার কে বলে ওঠে—'তোমায় ভালবেসেছি পুষ্প।'

সলিল বল্‌ল—'বসন্তে প্রকৃতি রাণীর কানে কানে মলয়ানিল যে কথাটী বলে যায়, বর্ষার ঝোড়ো হাওয়াও কি ঠিক্ সেই কথাই বলে অবনী?' অবনী বল্‌ল—'একই কথা সলিল একই কথা। দু'জনেই বলে 'ওগো রাণি, আমি তোমায় ভালবাসি', কিন্তু রাণী ঠিক্ দুজনকে সমানভাবে নিতে পারে না। কি করে নেবে? তখনও যে অনিলের সুখস্পর্শে তার কান দুটী রাঙ্গা হয়ে রয়েছে।' সলিল বলল—'সে স্পর্শ কি রাণী ভুলতে পারে না!' অবনী বল্‌ল—'না কিন্তু ঝোড়ো হাওয়ার আকুল কান্নায় ওর বুক ভরে ওঠে।'

—সেদিন সন্ধ্যা বেলা সৌম্য যখন কতকগুলি শ্বেতচাঁপা নিয়ে পুষ্পের ঘরে এসে একটা চীনে মাটীর পাত্রের ওপর রেখে, আলনায় টাঙ্গান তার একখানা শাড়ীর এক প্রান্ত ছুঁয়ে নিঃশব্দে ঘর হ'তে বেরিয়ে গেল, পুষ্প আর

সহ্য কর্‌তে না পেরে কেঁদে উঠ্‌ল। সৌম্য ফিরে এসে পুষ্পের কাছে বসে তার দিকে হাতটী বাড়িয়ে দিল। সৌম্যের মাথাটী দুহাত দিয়ে নিজের চোখের সাম্‌নে ধরে সেই অন্ধকারের ভিতর পুষ্প যেন কি দেখবার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল! তারপর আস্তে আস্তে বলে উঠ্‌ল—'সৌম্য!' এইবার আমার কথাটী ফুরাল এখন অধম অর্দ্ধচন্দ্রের অপেক্ষায় আছে, শুভ কাজটা একটু হাত চালিয়ে করে নাও। গগন বলল—'তোমায় গল্প বলতে বলা ঝক্‌মারি। থামকা এটাকে মারলে, ওটাকে কাঁদালে, সেটাকে জ্বালালে; এত বড় একটা প্রেমের গল্প বল্লে কিন্তু নায়ক নায়িকার মুখে হাসির চিহ্নটী দেখা গেল না!' অনিল বল্‌ল 'ভালবাস্‌লে হাসি চোখের জল হয়েই ঝড়ে পড়ে।' বিরক্ত হয়ে গগন বল্‌ল—'আচ্ছা থাম, তোমায় আর পণ্ডিতি করতে হবে না।' পঞ্চভূতের আসর আবার জমে উঠ্‌তেই আমি সবার অলক্ষ্যে, পথে বেরিয়ে পড়্‌লাম। আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নাম্‌ল।

শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ।

একতারা।

—:*:—

ক্ষ্যাপা চলিয়াছে গেয়ে দীর্ঘ পথ বেয়ে
আপন প্রাণের গান আপনার মনে;—
শুনিল কে—না শুনিল, না দেখে সে চেয়ে,
গেয়ে যায় মিলাইয়ে কণ্ঠ যন্ত্র সনে।
পথিক ডাকিয়া কহে,—"শুন, ওহে গুণি,
কণ্ঠ তব মন্দ নহে বটে; অন্য তারে
বাঁধ সুর, আর কিছু গাও দেখি শুনি;—
ধৈবত ছাড়িয়া ধর কোমল গান্ধারে।"
থমকি বিরাগী পথে থামে একবার,
চমকিল ক্ষীণ হাসি শুষ্ক পাণ্ডু মুখে,
কথা না কহিল, শুধু যন্ত্রখানি তার
বারেক তুলিয়া ধরে পথিক সম্মুখে।
হতাশ হইল পান্থ হেরি যন্ত্র তার,—
যন্ত্রে শুধু রহিয়াছে একগাছি তার।

শ্রীদ্বিজচরণ মিত্র।

মণিপুর চিত্র।

—:○:—

(সমাজ)

(৪)

সভ্যই হউক আর অসভ্যই হউক সমস্ত জাতির মধ্যে বংশমর্য্যাদা একটা মর্য্যাদা এবং এ মর্য্যাদা সমস্ত মর্য্যাদার উপর। এ বংশ মর্য্যাদার জন্য পৃথিবীময় সকলেই ব্যস্ত। ভারতবর্ষের কথা বলিতে গেলে বংশমর্য্যাদা একটা বিশেষ ঈপ্সিত বিষয়। এ মর্য্যাদা রক্ষার্থে হিন্দুসন্তান প্রাণপণ করে। হিন্দুরাজাগণ বংশ মর্য্যাদার অহঙ্কারে রাজ্য পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। রামায়ণ এবং মহাভারত পবিত্র গ্রন্থ। এই গ্রন্থ উল্লেখ করিয়া কত হিন্দু কত রাজাগণ চন্দ্র সূর্য্য বংশের দোহাই দিতেছেন এবং গৌরব বোধ করিতেছেন। এ অভিমান অস্বাভাবিক নহে; এবং এই অভিমানের জোরে কত বংশ রাজ্য স্থাপন ও রাজ্য বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। তাহার সাক্ষী রহিয়াছে, ভারতের ইতিহাস। মণিপুর হিন্দুরাজ্য এবং মণিপুরাধিপতি মহাভারতের নায়ক অর্জ্জুনের বংশধর বলিয়া খ্যাত।

যদি রাজপুতনার রাজপুতগণ ক্ষত্রিয় এবং সূর্য্যবংশীয় রাজা বলিয়া বর্ত্তমান ভারতবর্ষে হিন্দুকুলতিলক রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন এবং ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট Proud Udaypur বলিয়া উদয়পুরাধিপতিকে সম্মান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তুল্য কারণে ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তবাসী মণিপুরাধিপতিকে সেই গর্ব্বের এক টুকরা দান করিলে ভারতবর্ষের এমনই বা কি ক্ষতি? জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ যে কথাই বলুন না কেন এবং যে উপায়ই অবলম্বন করুন না কেন,—জাতিবিচারের মাপের ফিতা দিয়া নাকের ডগা এবং গালের পরিসর মাপিয়া কপালে অঙ্কপাত করিয়া আর্য্য অনার্য্য ভেদ করিতে হয় করুন, আমরা জাতিতত্ত্ববিদ্ নই এবং এজন্য মণিপুরের জাতি বিচার-করিতে ইচ্ছা করি না।

জাত্যাভিমান, আর্য্যাভিমান এবং হিন্দ্বভিমান অপর সকলের যেমন আছে, আমরা মণিপুরকেও তেমনি অভিমান করিতে নিশ্চয়ই দিব; ইহা তাহার প্রাপ্য। কিন্তু মণিপুরী জাতির জন্য আমরা এত কথা বলি কেন? তাহার কারণ কি? তাহার কারণ আছে এবং কারণটা বিশিষ্টও বটে!

বঙ্গদেশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; বৈষ্ণব যাঁহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং যিনি মহাপ্রভু নামে সর্ব্বদেশে পরিচিত সেই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে মণিপুরীগণ দীক্ষিত। এমন খাঁটিভাবে Sectorian বৈষ্ণব কোনও জাতির মধ্যে দেখা যায় না। মণিপুর রাজ্যে এবং মণিপুরের বাহিরে মণিপুরী জাতির সংখ্যা পাঁচ লক্ষের উপর। এই পাঁচ লক্ষ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের দীক্ষিত এবং শিক্ষিত। এই ধর্ম্মের উৎপত্তি বঙ্গদেশে কিন্তু এই ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিল বঙ্গদেশে এবং ব্রহ্মদেশ মধ্যবর্ত্তী মণিপুরের লোক সমূহ। এই ধর্ম্ম উৎপত্তি হইয়াছে ৪৩০ বৎসর হইল। ক্রমে মণিপুর রাজ্য ও তৎ পার্শ্ববর্ত্তী দেশগুলিতে এই ধর্ম্ম যেরূপ প্রসার লাভ করিতেছে তাহাতে মনে হয় কালক্রমে ইন্দো-চাইনিজ জাতিগণও এই ধর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িবে। তারপর হয় ত জাপান চীন প্রভৃতি মহৎ জাতিগণ এই বঙ্গদেশের ধর্ম্মে দীক্ষিত

হইবে এরূপ ভাবিবার কারণ মণিপুরী জাতি ও জাপান জাতির মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল দেখা যায়। আমারা যতদূর এই দুই জাতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি এবং এই দুইদেশে যাঁহারা গতিবিধি করিয়াছেন, তাঁহাদের শ্রীমুখাৎ যাহা শুনিতে পাই, তাহাতে বোধহয় ইহারা 'এশিয়ান' Nation। আমার পুত্র ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান ঘুরিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছে, তাহার দৃঢ়বিশ্বাস এই Eastern nation জাপানের সঙ্গে আমাদের মণিপুরীগণের আশ্চর্য্য রকমের সামঞ্জস্য আছে। এ কথা, প্রবন্ধান্তরে আলোচনায় ইচ্ছা আছে।

মণিপুরীগণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এবং গৌরীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় তাহাদের প্রাণ বঙ্গ সন্তানের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া পড়িয়াছে। বৈষ্ণব গোসাঞীগণের আজ্ঞানুসারে ইহারা অন্ধভাবে চালিতেছে কিন্তু জাতিগত অন্ধ প্রতাপের কার্য্য করিয়া লইতেছে। অন্ধ বটে, কিন্তু, অন্ধের ন্যায় ইহাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয় বড় ধারাল। ধারে যেমন কাটে ভারে তেমন কাটে না। এই পৃথক পৃথক সম্পর্কে ইহারা স্বাধীন হইয়া যে কার্য্য করিতেছে সে কার্য্যের বিষয় বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

যখন মণিপুরীগণ গৌরীয় বৈষ্ণব হইল তখন হইতেই তাহারা একটী স্বতন্ত্রজাতিতে পরিণত হইয়া জাতীয়তা সৃজনের জন্য ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হইল। ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করিয়া বসিল। বাঙ্গালী প্রভু সন্তানগণ মণিপুরী স্ত্রীরগর্ভে সন্তান উৎপাদন করিলেও সেই সন্তানগণ মণিপুরে ব্রাহ্মণশ্রেণী বলিয়া অভিজাত হইল। এক্ষণে মণিপুরে এই ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু তাহারা ক্ষত্রিয় প্রস্তুত করিয়া লইল; নিজেদের মধ্যে। অন্য দেশের ন্যায় তাহারা মহাভারতকে আকড়াইয়া ধরিল এবং বভ্রুবাহনের বংশ বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিল। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের জন্য শূদ্র দরকার—সেই শূদ্র জাতি মণিপুরী ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় মিলিয়া প্রস্তুত করিয়া লইল। পার্শ্ববর্ত্তী নানা জাতি মণিপুরের সঙ্গে যখন যুদ্ধে পরাজিত হইল (ক্ষত্রিয় জাতির যুদ্ধ ব্যবসা এবং যুদ্ধে জয় করা তাহাদের ধর্ম্ম) তখন নানাস্ত্রীর গর্ভে এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে যে সন্তান উৎপন্ন হইল—মণিপুরী ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় মিলিয়া তাহাদের শূদ্র শ্রেণী ভুক্ত করিয়া লইল। একটা জাতির অভাব পূর্ণ করিতে বড় বেশী দিন লাগেনা। মণিপুরী জাতির অভাব এই ভাবে পূরণ হইয়া গেল এবং অদ্য ভারতবর্ষে মণিপুরের জাত্যাভিমান যে ভাবে চলিয়াছে কালক্রমে এই অভিমানই তাহাদের উন্নততর করণ হইবে। বাঙ্গালা প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও কিন্তু বাঙ্গালীর হাতে (কি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং কায়স্থ ইত্যাদি) ইহারা কিছুতেই জল গ্রহণ করেনা! কিন্তু গৌরীয় বৈষ্ণবের হাতে জল খাইতে কিংবা প্রভুসন্তানগণের উচ্ছিষ্ট ভক্তি সহকারে খাইতে সদাই প্রস্তুত। ইহাই গৌরীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষত্ব এবং মণিপুরীগণের বিশেষত্ব।

ইহারা মৎস্য ভোজন করেন। জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া বলেন আমরা মহাপ্রভুর কথা শিরোধার্য্য করিয়া চলিতেছি। "মৎস্যের ঝোল—কামিনীর কোল" এই বাক্যের সার্থকতা রক্ষা করিতেছি। মণিপুরীগণ মাংসের নাম শুনিতে পারে না; সকল মাংসই গোমাংসবৎ পরিহার করে এমন কি, যদি পাখীর পালক ঘরে আসিয়া পড়ে তাহা হইলে হাঁড়ি ফেলিয়া দিয়া ঘর দুয়ার গোময় স্নাত করিয়া ইহারা শুদ্ধ হইয়া থাকে। মণিপুরের মহারাজা যখন ত্রিপুরা রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই উপলক্ষে ভোজবাজী দেখিতেছিলেন। কিন্তু যখন বাজীকর পারাবতের মুণ্ড ছেদন করিয়া পুনরায় জোড়া লাগাইতে পারে এই হেকমত্ দেখাইতেছিল, তখন তিনি সেই বাজী স্থান হইতে উঠিয়া পড়েন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সঙ্গী মণিপুরী সকলেই সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কারণ, বাজীকর বাজীতে যে প্রকারে দর্শকবৃন্দকে ঠকায়, তিনি ধর্ম্মের নামে সে প্রকার ঠকিতে ইচ্ছা করেন না।

মহারাজের নিজের মুখে বলিতে আমি শুনিয়াছি, আজমীর কলেজে যখন তিনি শিক্ষালাভ করিতে যান; সেখানে যাইয়া তখন দেখেন—চামড়ার মুসক দ্বারায় 'কুয়া' হইতে জল উঠান হয়। উচ্চবংশেরহিন্দুগণ তাহা অবাধে পান করিয়া থাকেন। মণিপুরের মহারাজা চমড়া ডুবান কুয়ার জল পান করিতে আপত্তি করিলেন। আজমীরে পাতকুয়া ছাড়া জল পাইবার উপায় নাই। এমন কি, দেবালয়ে ব্যবহৃত জলও এই মুসক সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়। কলেজের অধ্যক্ষ ফাঁপরে পড়িলেন এবং জল সংগ্রহ করিতে তাঁহার বেগ পাইতে হইয়াছিল।

নগর হইতে তিন মাইল দূরে এক পবিত্র তড়াগ আছে, সেই তড়াগ হইতে মণিপুরের মহারাজার জন্য জল সরবরাহ হইল। রাজপুত ক্ষত্রিয়গণ শুনিয়া অবাক হইল, এবং তিনমাস মধ্যে নূতন কুয়া প্রস্তুত হইয়া মণিপুরের মহারাজার জল পাইবার বন্দোবস্ত হইল। আপদ গেল, সেই কুয়ার নাম মণিপুরী কুয়া নামে অভিহিত হইল। ক্ষত্রিয় সন্তান মাংস ভক্ষণ করে না ইহা আজমীরে কি বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া ঘোষিত হইল। কিন্তু মণিপুরের মহারাজ যে অভিমান করিয়াছিলেন সেই অভিমানই তাঁহার জাত্যাভিমানে সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়াছিল। আর তাহার জাতি লইয়া বিচার করার প্রয়োজন পড়ে নাই।

এদিকে Sport এ মণিপুর মহারাজ সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিলেন এবং পুরস্কার পাইয়া প্রফুল্লিত হইলেন কিন্তু Polo খেলা খালি মণিপুরী জাতীয় খেলা—এই খেলায় তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী একজনও হইতে পারে নাই। তিনি কলেজ হইতে Cadet corps গেলেন, তথায় তিনি সৈনিক শিক্ষার্থী হইলেন এবং এই দু' বৎসর কাল এই Cadet corpsদের সহিত Polo খেলাইয়া যে বাজী জিতিয়াছেন, সেই বাজী সকল Cadet corps মাত হইয়া গেল। তবুও কি আমরা মণিপুর মহারাজকে তাঁহার জাত্যাভিমান দিতে কুণ্ঠিত হইব?

এই আপদ যুদ্ধে মণিপুর যে ভাবে সহায়তা করিয়াছেন ক্ষুদ্র মণিপুর রাজার পক্ষে সেই সহায়তা দৃষ্টান্ত স্থলে গিয়া পঁহুছিয়াছে! লোকবল, সৈন্যবল, এবং অর্থবল মণিপুর রাজা প্রচুর পরিমাণে দিয়াছিলেন।

মণিপুরীগণ অত্যন্ত শুচীবায়ুগ্রস্থ জাতি কিন্তু যখন যুদ্ধ যাইতে প্রস্তুত হইল তখন তাহাদের বায়ু—বায়ুর ন্যায় উড়িয়া গেল। জাহাজে চড়িয়া কালাপানি পার হইয়া যুদ্ধদেশে France দেশে যাওয়া সম্বন্ধে অদ্যও বাঙ্গালী সন্তানগণ মধ্যে মতদ্বৈধতা রহিয়াছে। জাত্যাভিমানের জন্য নহে সমাজভিমানের জন্য দলাদলি করিবার পথ পরিষ্কার করিতেছে। কিন্তু ধন্য মণিপুরজাতি যুদ্ধস্থলে জাত্যাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া বীরের কার্য্য করিয়া আসিল। বাঙ্গালী মহাপ্রভুর নাম রাখিল কর্ম্ম করিয়া।

মণিপুরীদের সাংসারিক যাবতীয় কার্য্যকলাপ নিয়মিত হয় হরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণবস্মৃত্যনুসারে এই অনুশাসন তাহারা মনেপ্রাণে গাঁথিয়া রাখিয়াছে।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সাংসারিক ক্রিয়াকলাপাদি সমস্তই হরিভক্তিবিলাস মুখাপেক্ষী করে। কীর্ত্তন বা হরিসংকীর্ত্তন ইহাদের বৃহৎ ব্যাপার। এমন কাজ নাই যে কাজের প্রধান অঙ্গ না হইল এই হরিসংকীর্ত্তন। জন্ম, উপনয়ন, বিবাহ এবং মৃত্যু প্রভৃতি ছোটবড় কাজে এক সংকীর্ত্তন দ্বারাই তাহাদের সর্ব্বকার্য্য উদ্ধার পায়।

Economy সাংসারিক কার্য্যে আবশ্যক। এই Economy যথার্থ বুঝিয়াছে, মণিপুর জাতি। ইহাদের সামাজিকতা সম্পূর্ণ তাহাদের আয়ত্তাধীন। যখন যাহা আবশ্যক হয় তখন যে পরিবর্ত্তন নিবর্ত্তনের দরকার মণিপুরীগণ বৈষ্ণব ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সব কার্য্য সমাধা করিয়া লইতে পারে। কাজেই বলিতে হয় এই মণিপুর-সমাজ কালের স্রোতে টিকিয়া যাইবে সে বিষয় সন্দেহ নাই।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

স্বরলিপি।

ইমন পূরবী—একতালা।

আপনি যখন হৃদয়ে ফুল
ফুটবে না—তুমি এস!
শুষ্ক যখন জীবনে গীত
উঠবে না—তুমি এস!
জীবন যখন হবে মরু,
রইবে না তায় একটি তরু;
যখন অন্ধ-কারা ঠেক্‌বে ধরা—
তুমি এস!
কান্না যখন বক্ষে আমার
বন্যা ব'বে—তুমি এস!
বিফল যখন লাগবে জীবন
মাগবে মরণ—তুমি এস!

ওগো নিমিষে ফুল ফুটিয়ো তবে,
সুধার উৎস ছুটিয়ো ভবে,
আমার কান্না জলে পান্না দোলায়—
তুমি এস!
তুমি আমার জীবনে কি—
কইতে আমি পারি সে কি—
সব গীতি যে বন্ধ সেথায়
উপমা নাই—উপমা কি!
তুমি আমার জীবনে কি—
আমি বিনে জানবে কে কি—
ওগে তোমার চরণতলে
সব বিকা'সু—তুমি এস।

কথা ও সুর:—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি, এল্। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

	২´				৩				০				১			
II	সা	-া	পা	|	পা	পা	-ক্ষা	|	গা॰	গা	-মা	|	গা	গা	-া	I
	আ	প্	নি		য	খ	ন্		হৃ	দ	০		য়ে	ফু	ল্	
	শু	ষ্	ক		য	খ	ন্		জী	ব	০		নে	গী	ত্	

	২´				৩				০				১			
I	গা	-া	মা	|	গা	-া	-া	|	ন্া	ন্া	-সা	|	সা	সা	-া	II
	ফু	ট্	বে		না	০	০		তু	মি	০		এ	স	০	
	উ	ঠ্	বে		না	০	০		তু	মি	০		এ	স	০	

২´ ৩ ০ ১
II{ গা গা -া | পা ধা -পা | পা পর্সা -া | র্সা র্র্সা -া I
জী ব ন্ য খ ন্ হ বে০ ০ ম রু ০
(ওগো) নি মে যে ফু ল্ ফু টি০ য়ো ও বে ০

২´ ৩ ০ ১
I না না না | ধা ধনা -া | পা -া না | ধা পক্ষা -গা }I
র ই বে না তা০ র্ এ ক্ টি ও রু০ ০
সু ধা র উ ৎস ০ ছু টি য়ো ও বে০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গগগা গা গপা | পা পধা -া | ক্ষা -া ক্ষা | গা গা -া I
যখন্ অ ন্ধ কা রা০ ০ ঠে ক্ বে ধ রা ০
আমার কা ন্না জ লে০ ০ পা ন না দো লা র্

২´ ৩ ০ ১
I গা গা -মা | মা গা -া | -ন্া -ন্া -সা | -সা -সা -া II
তু মি ০ এ স ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
তু মি ০ এ স ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
II{ গা -া রা | সা সা -া | সা -া সা | সা সা ন্া I
ক ন্ না য খ ন্ ব ০ ক্ষে আ মা র্

২´ ৩ ০ ১
I ধা -া ন্া | ধ্ন্া সা -রগা | গা গমা -া | মা গা -া }I
ব ০ ন্যা ব০ বে ০০ তু মি০ ০ এ স ০

২´ ৩ ০ ১
I গা গা -পা | পা পা -া | পা -া না | ধা ধা -া I
বি ফ ল্ য থ ন লা::গ্ বে জী ব ন্

২´ ৩ ০ ১
I পা -া ক্ষা | পক্ষা ধা পা | গা গমা -া | মা গা -া II
মা গ্ বে ম০ র ন্ তু মি০ ০ এ স ০

২´ ৩ ০ ১
II{ গা রা -া | সা সা -ন্ধ্া | ধ্া ন্া -া | ন্সা সা -া I
তু মি ০ আ মা ০র জী ব ০ নে কি ০

২´ ৩ ০ ১
I সা -া রা | রা রা -গা | সা সরা -গা | গা গা -া }I
ক ই তে আ মি ০ পা রি০ ০ সে কি ০

২´ ৩ ০ ১
I সা -া না | ধা পা -া | পক্ষা -ধা পা | ক্ষা গা -মা I
স ব্ গী ভি বে ০ ব০ ন্ ধ সে খা র্

২´ ৩ ০ ১
I মা মা -া | গা রা গা | সা সরা -গা | গা গা -া I
উ প ০ মা না ই উ প০ ০ মা কি ০

২´ ৩ ০ ১
I{ গা গা -া | পা ধা -পা | পা র্সা -া | র্সর্মা র্গর্রা -র্সা I
তু মি ০ আ মা র্ জী ব ০ নে০ কি০ ০

২´ ৩ ০ ১
I র্রা র্রা -া | র্সা না -া | ধা -া র্সা | না ধপা -ক্ষা } I
আ মি ০ বি নে ০ জা ন্ বে কে কি০ ০

২´ ৩ ০ ১
I -গা গসা সা | সা সা -া | সা সা -পা | পা পা -ধা I
০ ও গো তো মা র্ চ র ণ্ ত লে ০

২´ ৩ ০ ১
I ক্ষা -া ক্ষা | গা গা -া | গা গমা -া | মা গা -া II II
স ব্ বি কা সু ০ তু মি০ ০ এ স ০

রিপুজয়।

— ❋ —

"দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ।" এ জিজ্ঞাসা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে আরো অনন্তকাল চলিবে বোধ হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য! দুঃখ নিবৃত্তির চিন্তা লইয়াই আমরা বিব্রত দুঃখের উৎপত্তির বিষয় অনুসন্ধান করিবার অবসর পাই না। একবার ভাবিয়া দেখিলা তদবঘাতক হেতু সহজেই আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে যদি জানিতে পারি দুঃখের কারণ কি। মর্ত্ত্যভূমি দুঃখের আগার এখানে বাস করিলেই দুঃখ ভোগ করিতে হইবে এ কথা মিথ্যা, এবং বৃন্দাবন দিয়া স্বর্গে পাঠাইতে পারিলেই দুঃখের অবসান হইবে একথাও সত্য নহে। দুঃখ স্বর্গেও নাই মর্ত্ত্যেও নাই, আছে আমাদের মনে। আধ্যাত্মিক বল, আধিদৈবিক বল আর আধিভৌতিকই বল সর্ব্বপ্রকার দুঃখের কারণ আমাদের অন্তর্নিহিত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই কয় প্রবৃত্তি। ইহাদের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা মানসিক শান্তি লোপ করি, চারিদিকে শত্রু সৃষ্টি করি এবং বিবিধ পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের বিরাগ ভাজন হই। এই জন্যই ইহারা রিপু। এই রিপুবর্গকে জয় করিলেই দুঃখ নিবৃত্তি এবং তাহাতেই পরম পুরুষার্থ।

যাহাকে জয় করিতে হইবে তাহার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ ও মাৎসর্য্য এই কয়টী আমাদের পরিচিত। কিন্তু মোহ কি! শুনা যায় মোহ শব্দের অর্থ অজ্ঞান। অজ্ঞান যে রিপু পর্য্যায় ভুক্ত হইতে পারে না তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। প্রথমতঃ কামাদির ন্যায় ইহা বাহিঃ প্রকৃতির

অবস্থানুসারে ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভূত উদ্দীপিত ও নির্ব্বাপিত হয় না, ইহা চিরস্থায়ী ও দীর্ঘকাল একই ভাবে অবস্থান করে। দ্বিতীয়ত, দুঃখ বা পাপের কারণ হওয়া দূরে থাকুক অজ্ঞানই সুখ এবং অজ্ঞানই পুণ্য। ইংরাজীতে একটী কথা আছে Ignorance is bliss অর্থাৎ অজ্ঞানেই আনন্দ। আরো দেখা যায় ইংরাজীতে Ignorance ও Innocence একার্থ। Bibleএর মতে মানবের জীবনে দুঃখ ও পাপের পর্য্যায় আরম্ভ হইল জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভোজন হইতে। ইহার পূর্ব্বে তিনি ছিলেন অপাপবিদ্ধ এবং স্বর্গরাজ্যের অধিবাসী। আমাদের মতেও অজ্ঞান যে পুণ্য তাহার প্রমাণ,—আমরা পুণ্যজ্যোতি দেখিতে পাই একমাত্র শিশু, সন্ন্যাসী ও কুষ্ঠ রোগীতে। শিশু অজ্ঞান, সন্ন্যাসী রূপরসাদির জ্ঞান হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য দুর্গম পর্ব্বতগুহাশায়ী এবং কুষ্ঠ রোগী উক্ত জ্ঞানে বঞ্চিত।

আমার মনে হয় মোহ = অজ্ঞান এ স্থলে, "অ" টা প্রক্ষিপ্ত (শাস্ত্রে এরূপ প্রক্ষিপ্তের অভাব নাই)। প্রকৃত প্রস্তাবে মোহ শব্দের অর্থ জ্ঞান। জ্ঞানেই মোহিত করে, অজ্ঞান নহে। "আপেক্ষিক গুরুত্ব হইতে স্বর্ণের বিশুদ্ধি বা অবিশুদ্ধি নির্ণীত হইতে পারে" এই জ্ঞান লাভ করিবামাত্র আর্কিমিডিস কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। জ্ঞানের মোহিনীশক্তি না থাকিলে গ্যালিলিওই বা এত নির্য্যাতন সহ্য করিবেন কেন? Scott সাহেবই তুষার দুর্গম মেরুপ্রদেশে আত্মোৎসর্গ করিতে ছুটিবেন কেন? বাস্তবিক জ্ঞানেই মোহ। এই হেতু এদেশের মহাজ্ঞানী ব্যক্তিগণ "মহামোহোপাধ্যায়" উপাধি লাভ করেন।

কিন্তু অন্যান্য রিপুর ন্যায় জ্ঞান তো একটী মানসিক বৃত্তি নহে। উহা একটী বিশেষ মনোবৃত্তির পরিণাম। অতএব জ্ঞান বলিলে লক্ষণার দ্বারা উক্ত মনোবৃত্তিকেই বুঝিতে হইবে। এক্ষণে স্থির হইল মোহ শব্দের অর্থ জ্ঞানের কারণ তার্কিকতা বা বুদ্ধি।

বুদ্ধি যে একটী প্রবল রিপু সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কামাদির ফল দুঃখ, বুদ্ধির ফল সর্ব্বনাশ। কারণ বুদ্ধি হইতে সংশয় এবং সংশয় হইতে বিনাশ "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" কাম ক্রোধাদির ক্ষমা আছে বুদ্ধির ক্ষমা নাই। যিনি ক্ষমা করিতে পারেন সেই ভগবানই বুদ্ধিজীবিদের প্রতি বিমুখ কারণ বুদ্ধিজীবিগণ তর্কপ্রিয় এবং তর্ক বিধাতার পক্ষে Keatings powderএর তুল্য। তর্কের ঘ্রাণ পাইবা মাত্র তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করেন। প্রবাদও আছে বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর। স্বয়ং পরমেশ্বর যাহাকে ত্যাগ করেন তাহার নিজের কল্যাণ তো নাইই তাহার দ্বারা জগতেরও কোন কল্যাণ সাধিত হয় না। বস্তুতঃ বুদ্ধি হইতে যত অনর্থ ঘটিয়াছে, কাম ক্রোধাদি অন্য পাঁচটী রিপুর সমবায়ে তাহার শতাংশের একাংশও ঘটে নাই। এই যে এত বড় ফরাসী বিপ্লবটা ঘটিল তাহার মূলে ছিল বুদ্ধি। বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কতকগুলা লোক সনাতন নিয়মের প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল তাহার ফলে দুর্ব্বার রক্তস্রোতে সমস্ত দেশ তো ডুবিলই সঙ্গে সঙ্গে রাজার মাথাটী কোন সুদূরে ভাসিয়া গেল। বুদ্ধির লেশও মারাত্মক। বুদ্ধি কর্ত্তৃক পরিচালিত কয়জন সামান্য লোকও দেশের কতটা অনিষ্ট করিতে পারে সক্রেটীসের বিচার হইতে তাহার নজির সংগ্রহ করা যাইতে পারে। উক্ত বিচারে একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে দেশের অগণ্য মান্য ব্যক্তি যুবকদিগের কল্যাণ কামনায় প্রাণপাত করিলেও একা সক্রেটীস বুদ্ধির বলে ওই যুবকদিগকে অধঃপাতের পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই মহাপাপে তিনি প্রাণ হারাইলেন বটে কিন্তু যুবকদিগের আর উদ্ধার হইল না। যুবকদিগের হিতৈষী বিজ্ঞ ব্যক্তিগণেরও মানসিক শান্তি চিরতরে বিলুপ্ত হইল। এই প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধিকে তিরস্কৃত করিতে হইবে,---অন্যথা দেশের কল্যাণ নাই! অনেকের বিশ্বাস আমরা বুদ্ধিকে আগেভাগে বরখাস্ত করিয়াছি! ইহারা ভ্রান্ত। বুদ্ধিকে দূরীভূত করিবার জন্য আমরা বহুকাল হইতে

চেষ্টা করিতেছি সত্য! আমাদের আয়োজনের অভাব নাই, সাধনারও অন্ত নাই তথাপি এখনও সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারি নাই।

আজো ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় বুদ্ধি আমাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। ইহা অপ্রত্যক্ষ হইতে পারে, কিন্তু লোপ পায় নাই,—পাইলে "কেন" শব্দ বঙ্গভাষার স্থান পাইত না। কোন কোন অকালকুষ্মাণ্ড এমন প্রশ্নও করেন, "যদি মাছের ডিম খাইতে পারি ত মুর্গির ডিম খাইব না কেন?" শুধু তাই নহে কেহ কেহ মুর্গির ডিম উদরস্থ করিয়াছেন এ সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। তবে আর বাকী রহিল কি? মুর্গির ডিম পর্য্যন্ত চলিলে তো ধর্ম্ম আর তিষ্ঠিতে পারে না। ধর্ম্ম লোপ পাইলে স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, চুরী, ডাকাতী প্রভৃতি সর্ব্ববিধ পাতকই অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে। হইতে থাকিবে কেন হইতেছে, এই সে দিন শুনিলাম এক জন ভদ্র লোক হাওড়ায় যাইতেছিলেন, পথে কে তাহার পকেট হইতে একটা পানের ডিবা, রুমালে বাঁধা তিনটা দুয়ানী একটী শিকি ও এক বাণ্ডিল সূতা তুলিয়া লইয়াছে। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছে, অগ্নির শেষ রাখিবে না। অগ্নিস্বরূপ বুদ্ধিরও শেষ রাখিও না। একবার বুদ্ধিকে নির্ম্মূল কর দেখিবে সংসারযাত্রা সহজ হইয়া আসিবে।

উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি কোন যুবক হয় তো বলিবেন;—বুদ্ধিকে বিদায় দিলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিব কাহার সাহায্যে? কোন তথা-কথিত পণ্ডিত ইহাকে এই বলিয়া বুঝাইতে পারেন,—"তুমি ভ্রম-প্রমাদ শূন্য নহ, অতএব নিজের বুদ্ধিতে না চলিয়া শাস্ত্র মানিয়া চল।" ইহার উত্তরে বুদ্ধিবাদনী বলিবেন,—"আমি অভ্রান্ত নই! কিন্তু শাস্ত্রকারেরা যে অভ্রান্ত তাহার কোন প্রমাণ নাই। আর সত্যই যদি তাঁহারা অভ্রান্ত হন তাহা হইলেও শাস্ত্রকারদিগের বিভিন্ন মতের মধ্যে একটাকে নির্ব্বাচন করিতেও বুদ্ধির প্রয়োজন আছে।" এই দুই জাতীয় পণ্ডশ্রমীর প্রতি আমার বক্তব্য,—"বাপু হে, একবার ওই ঘড়ির কাঁটার প্রতি চাহিয়া দেখ। উহা কি বুদ্ধি খরচ করিয়া চলিতেছে, না শাস্ত্র মানিয়া? তোমরা তো শাস্ত্র মানিয়া আজ বিধবার বিবাহ দাও এবং কাল শাস্ত্র মানিয়া সে কথা অস্বীকার কর। আর বুদ্ধির সাহায্যে যে সব কীর্ত্তি কর তাহার বিবরণ তো ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে। তোমরা একবার বল মুষ্টিভিক্ষা প্রচলিত না হইলে দেশের দুঃখ দুর হইবে না, আরবার বল মুষ্টিভিক্ষা বন্ধ না করিলেই দেশের মঙ্গল নাই, তোমরা আজ বল ধনী ও নির্দ্ধনের মধ্যে পার্থক্য উন্নতির হেতু, একবার বল দেশের অর্থ সমান ভাগে ভাগ করিয়া উচ্চনীচের ভেদ লুপ্ত করিয়া দাও। আসল কথা বুদ্ধিমদে তোমাদের মাথার ঠিক থাকে না, তোমরা আজ হও কৃশ্চান, কাল হও ব্রাহ্ম এবং তারপর দিন হও বৈষ্ণব। কিন্তু ঘড়ির কাঁটার কখনো ভুল দেখিয়াছ? দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, কখনো দু'সেকেণ্ডের জন্য উহাকে দক্ষিণ হইতে বামে ঘুরিতে দেখিয়াছ?

হায়! আমরা কবে এই ঘড়ির কাঁটার মত চলিতে শিখিব? আমাদের এই বহুবর্ষব্যাপী বিরাট অধ্যবসায় কি ব্যর্থ হইবে? কখনই না। আমি মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখিতেছি, ভারতের সেই পরম পবিত্র ভবিষ্যৎ, যখন বুদ্ধির কবল হইতে আমরা মুক্তি লাভ করিব। যখন পিতাপুত্র, ভ্রাতাভগিনী স্বামীস্ত্রীতে কোন দ্বন্দ্ব থাকিবে না; শিরোমণি মহাশয় এবং নেলোর মা সকল বিষয় একমত হইবেন; এবং পাঁচ বৎসর বয়সের সঞ্চিত সংস্কার পঞ্চাশই বৎসর বয়সে অক্ষুণ্ণ থাকিবে; যখন ঘরে ঘরে শীতলা, ওলাদেবী ও সত্যপীরের পূজা হওয়ায় মারীভয় চিরনির্ব্বাসন লাভ করিবে; যখন একই কারণে ত্রিশ কোটী নাসিকা কুঞ্চিত হইবে; ত্রিশ কোটী হস্তে তুড়ি বাজিয়া উঠিবে এবং একই সময়ে একই নদীতে ত্রিশ কোটী মুণ্ডিত মুণ্ড এক সঙ্গে জলের উপর উঠিতে পড়িতে থাকিবে; যখন

অশ্লেষা মঘা ও ত্র্যহস্পর্শে আসমুদ্র হিমাচল হিন্দুস্থানের সমস্ত কারখানা যুগপৎ নিস্তব্ধ হইবে ; বাষ্পযান তাহার অযুত যাত্রী লইয়া মধ্যপথে নিশ্চল ; নির্জ্জন রাজপথ সমূহের নৈশদীপাবলী অঙ্গারফলকের ন্যায় নিষ্প্রভ, এবং রাজধানীর নিবিড় পণ্য বিপণিশ্রেণী নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপবৎ প্রতীয়মান হইবে ; যখন বিবিধ পণ্যভারাবনত অগণ্য অর্ণবপোত বিলাতেতর দেশদেশান্তে হিন্দুর বিজয়-বৈজয়ন্তী বহন করিবে, অথচ দিগ্দর্শন যন্ত্রের প্রয়োজন হইবে না, ভূগোল বিদ্যার প্রয়োজন হইবে না, কর্ণধারগণ যোগিনীর অবস্থান দেখিয়া নিজেদের গন্তব্য নির্ণয় করিবেন, যখন অগণিত বহিঃশত্রুর প্রবল আক্রমণ হইতে স্বদেশরক্ষার্থে নিষ্ক্রান্ত ভারতের লক্ষ অক্ষৌহিণী একটী মাত্র হাঁচির শব্দে সহসা চিত্রার্পিতবৎ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইবে !

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় ।

রক্তজবা ।

সদ্য-ছিন্ন হৃৎপিণ্ড রুধির চর্চ্চিত,
জবা নহে ! কে রে উহা করেছে অর্পণ
আদ্যাশক্তি কালিকার করিতে তর্পণ ?
রক্ত-পিপাসিনী মার চরণ অর্চ্চিত,
কার জন্ম ভরি রক্তপদ্ম বিল্বদল,
লক্ষপুষ্প দিয়া তবু করুণা-কণার
না লভিয়া লেশ, শেষে ছিঁড়ি আপনার
বক্ষের শোণিত সিক্ত ভক্তি-সুকোমল
আরক্ত হৃদয়খানি, অলক্ত-রঞ্জিত
শক্তি-পদ-কোকনদে দীপ্ত অনুরাগে
দিয়াছে উৎসর্গ করি। দেবীর বাঞ্ছিত
সেই অর্ঘ্য মৃত্যুহীন, সান্দ্র-রক্ত-রাগে,
সেই ভক্তি মূর্ত্ত, সেই শোণিত লাঞ্ছিত,
রক্তজবা-রূপে ভবে যুগে যুগে জাগে !

শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা ।

সময় ও অর্থের সদ্ব্যবহার।

সময়ই অর্থ। অর্থ অর্জ্জনকারীদের সময়ই যে অর্থ—নিঃসন্দেহ। যুবক যে মনে প্রাণে একাগ্র ভাবে উন্নত হইতে প্রয়াসী তাহার নিকট সময়ের মূল্য টাকার চেয়েও ঢের বেশী—ইহার সদ্ব্যবহারে শিক্ষা, চরিত্র এবং নিজের আবশ্যকতা বৃদ্ধি পায়। যদি সময়ের নিকট হইতে একমাত্র অর্থই আদায় করা যাইত তবে ফ্রাঙ্কলিন সময় নষ্ট করাকে সব চেয়ে অহিতকর বলিতেন না।

কিন্তু ইহা নষ্ট করাতে আমরা এমন জিনিসও হারাইয়া ফেলি যাহা অর্থ দ্বারা ক্রয় করা যায় না। হয় তো একটা প্রতিষ্ঠার আয়োজন এবং উদ্যম আমরা নষ্ট করিয়া ফেলি যাহা ছাড়া অর্থ কিম্বা আত্মোৎকর্ষের লাভ হয় না। যৌবন সুলভ চাপল্য ও উত্তেজনায় যত সময় নষ্ট হয় হয়তো তাহার মধ্যেই কত সৌভাগ্যের সূচনা হইতে পারে। সময়ে সদ্ব্যবহার করা একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত—আমরা এ প্রবন্ধে দেখাইব শুধু বিশ্রাম সময় টুকু কাজে লাগানোতেই জগতে জ্ঞান, বিজ্ঞান সাহিত্য, ব্যবসায়ে কত উন্নতি হইয়াছে।

সকলেরই বিশ্রাম সময় থাকা আবশ্যক, কিন্তু আলস্যের সময় কাহারও থাকা উচিত নহে। ঐ বিশ্রাম সময়টুকুকে সময়ের স্বর্ণরেণু আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে. স্বর্ণকারেরা তাহাদের কারখানায় ওই স্বর্ণরেণুগুলি যাহাতে নষ্ট না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে, এইরূপে তাহাদের বহু অর্থ বাঁচিয়া যায়, এইরূপ বিশ্রাম সময়টুকুও কাজে লাগাইয়া মানসিক শক্তিতে ঐশ্বর্য্যশালী হওয়া প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। ব্যাপারটি অদ্ভুত বোধ হলেও সত্য ঘটনা, বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকের জীবন হইতে ইহার উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহাদের সাহিত্য সাধনাও দৈনিক কর্ম্মান্তে যেটুকু বিশ্রাম পাওয়া যায় সেই সময়ই হইত। বেকন যখন লর্ড চ্যান্সেলার পদ লাভ করিলেন তখন তিনি খুব পরিশ্রমী আইন ব্যবসায়ী, কিন্তু এই গভীর দায়িত্বপূর্ণ কাজের মধ্যেই সময় করিয়া লইয়া তিনি আইন, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে পুস্তক রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া গেছেন। রবার্ট বার্ণস্ কৃষাণ ছিলেন নিজ হাতে লাঙ্গল ধরিয়া মাটি চষিতেন, অনেক সময় শরীর মন ঠিক রাখার উপযুক্ত খোরাকও জুটিত না এ অবস্থায়ও তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি তাহা প্রমাণিত করিয়া গেছেন।

কবি মিলন ও তাঁহার অবসর সময়েই কাব্য রচনা করিয়া অমর আখ্যা পাইয়াছেন। কবি রজার্স, 'History of Greece' লেখক গ্রোট ইহাঁরা ব্যাঙ্কার ছিলেন। বহু ফরাসী রাজনৈতিক দেশের কার্য্যেই যাহাদের সময় কাটিত তাহারাও সাহিত্যক্ষেত্রে নিজেদের নাম রাখিয়া গেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ De Focqueeille, Thiers, Guizot, Lamartine প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। র‍্যালে সৈনিক, নাবিক ক্রমে আবিষ্কারক হইয়াছিলেন। সিড্‌নি একজন রাজনৈতিক ছিলেন, ডান্টে একজন ঔষধ বিক্রেতা ছিলেন, গ্যালেলিও ডাক্তার সিলার অস্ত্র চিকিৎসক (Surgeon) ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সারাজীবন ডেপুটিগিরি করিয়াও অবসর সময়ে অমূল্য গ্রন্থরাজি প্রনয়ণ করিয়া বঙ্গের সাহিত্যসম্রাট অমর বঙ্কিম হইয়া গেছেন। নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ঐ কর্ম্মের অবসরেই সাহিত্য সাধনা করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রও কর্ম্মের অবসরে সাহিত্য সাধনা করিয়াই নাট্য সম্রাট খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ছাপাখানার কাজ করিয়া অবসর সময়টুকু জ্ঞানানুশীলনে ব্যয় করার জন্যই ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন বিখ্যাত হইয়াছেন: তিনি লিখিয়াছেন "বিশ্রামের সময়টা প্রয়োজনীয় কিছু করিবার জন্যই—এই

বিশ্রাম পরিশ্রমী লোকেরাই পাইবে, অলস জন নহে ; কারণ বিশ্রামের জীবন আর অলসতার জীবন দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ।”

এমস লরেন্সের ডায়েরিতে কয়েকটি মূল্যবান কথা এ সম্বন্ধে আছে। “আমি যখন প্রথম এ সহরে আসি তখন একটি বিধবার গৃহে বাসা লই, বিধবাটি জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য বোর্ডিং খুলিয়াছিলেন। আমিই একরকম তার প্রথম বোর্ডার, আমি বোর্ডারদের জন্য যে সব নিয়ম করিয়া দিতাম সেগুলি সে বেশ খুসী হইয়া গ্রহণ করিত। একটি নিয়ম আমি করিয়াছিলাম যে—রাত্রি ভোজনের পর যাহারা বৈঠকখানায় থাকিবেন তাঁহারা একঘণ্টার জন্য চুপ করিয়া থাকিবেন—কোন গোল করিতে পারিবেন না ইহাতে যাহারা পড়াশুনা বা চিন্তা করিতে ইচ্ছুক তাহাদের সুবিধা হইবে।

এর ফলে এই হইল যে আমরা সহরের মধ্যে বেশ একদল ধীর স্থির উন্নতিশীল যুবক হইয়া উঠিতে লাগিলাম। যে দু’জন এ নিয়ম মানিতেন না তাহারা আহারের পর থিয়েটার কিম্বা অপর কোন আমোদের স্থানে যাইতেন, পর জীবনে তাহাদের কাহাকেও সর্ব্ব বিষয়ে হৃতসর্ব্বস্ব হইতে দেখিয়াছি। আমাদের দলের প্রায় সকলেই সচ্চরিত্র, সমাজের ভূষণ কেহ কেহ উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এই সামান্য নিয়মটুকু আমার ও সঙ্গীদের যা উন্নতি করিয়াছে পরজীবনে আমরা সকলেই তাহা স্মরণ করিতেছি।

ডগলাস জেরল্ডের শিক্ষা নবীশির সময় তিনি ভোরে উঠিয়া ল্যাটিন গ্রামার পড়িতেন, এবং তার ছাপাখানার কাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে দু’এক ঘণ্টার সেক্সপিয়র বা অপর কোন কাব্য পড়িতেন। দিনের কর্ম্ম অবসানের পর রাত্রেও দু’এক ঘণ্টা পড়িতেন এই ভাবে সপ্তাহে সাহিত্য সাধনায় তিনি এত অগ্রসর হইতেন যে নিত্য-স্কুল-গামী কোন ছাত্রের পক্ষেও সে সহজ সাধ্য ছিল না। সতের বৎসর বয়সে তিনি সেক্সপিয়র কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন, কেহ কোন স্থান হইতে একটী লাইন বলিলে তিনি তৎক্ষণাৎ পরের লাইন যোগ করিয়া দিতে পারিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন যুবকেরা অবসর সময়ে না পড়ে’ বড়ই ভুল করে, বিশেষ সেক্সপিয়র ও বাইবেল না পড়ে’।

সিডন লি তাঁর মানসিক উন্নতির জন্য বিশ্রাম সময়ের প্রায় সবটাই কাজে লাগাইতেন। বাল্যে যে সময় তাঁর বৃথা নষ্ট হইয়া গেছে সেইটুকু শিক্ষা দ্বারা পূরণ করিয়া লইতে তিনি সতত সচেষ্ট ছিলেন। তিনি প্রকাণ্ড একটী লাইব্রেরী করিয়াছিলেন, বাহিরের বিস্তৃত কাজের অবসরে যেটুকু সময় করিতে পারিতেন ঐ লাইব্রেরীতেই কাটাইতেন। পাশ্চাত্যের অল্প ব্যবসায়ীই লির ন্যায় সাহিত্যরসিক ছিলেন।

পিটার ব্রুক্স্ বোষ্টনের একজন বিখ্যাত বণিক ছিলেন. ব্যবসায় ক্ষেত্র হইতে বিদায় লওয়ার পর তিনি সে দেশের প্রথম প্রবর্ত্তিত ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট হন। সিডন লীর মত ইনিও অবসর সময় পুস্তক পাঠ করিতেন, এডওয়ার্ড এভারেট ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

“গভীর অনুশীলনকারী ছাত্র ছাড়া অপর কাহারও তাঁহার মত পুরাতন ও আধুনিক সাহিত্যের জ্ঞান দেখি নাই। তাঁহার লাইব্রেরীতে বিখ্যাত সাহিত্যিকদিগের গ্রন্থ—সমালোচনার উৎকৃষ্ট পুস্তক ছিল, ও নূতন ভাল বই বাহির হইলেই আসিত, কোন নূতন ভাল বই সম্বন্ধে কিম্বা সংবাদপত্রে যে সমস্ত আলোচনা চলিত সেই সব নূতন খবরের সহিত তিনি পরিচিত থাকিতেন এবং সে সব সম্বন্ধে তাহার মতও বিশেষ বুদ্ধি ও বিচারদক্ষ বলিয়াই বিবেচিত হইত। দিনের কার্য্য সমাপনান্তে নিয়ম মত স্থিরভাবে এই কার্য্যে বিশ্রাম সময় যাপন করিলে কত উন্নত হওয়া যায় তাহা দেখা যাইতেছে।

জুলিয়াস সিজার শুধু যে এক জন বড় সেনাপতি ছিলেন তাই নয়, সময় এবং কার্য্যের মূল্য ইনি বিশেষভাবেই বুঝিতেন। যুদ্ধবিগ্রহ এবং রাজনৈতিক কঠোর পরিশ্রম ছাড়া ইনি ইঁহার বিখ্যাত "Commentaries"ও লিখিয়া গেছেন। ইতিহাস প্রভৃতি আরও অনেক বিষয় ইনি লিখিয়াছেন। শোনা যায় আলোকজেন্দ্রিয়া উপসাগরে একবার তাঁহার জাহাজে আগুন লাগে, তখন তিনি "Commentaries" লিখিতেছিলেন—বইখানি সুদ্ধই তিনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন ও নিরাপদে তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। সিজারের জীবন হইতে তিনি কিরূপ শ্রম করিতেন এবং বিশ্রাম মুহূর্ত্ত কাজে লাগাইয়া কি ফল অর্জ্জন করিয়া গেছেন বেশ জানা যায়। উৎসাহ ও অদম্য ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মানুষ অসাধ্যও সহজসাধ্য করিতে পারে।

বিশ্রাম মুহূর্ত্ত কাজে লাগাইয়া কত উন্নত হওয়া যায় Elihu Burritt তাঁহার বন্ধুর কাছে নিজের সম্বন্ধে যে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন এই চিঠিখানি হইতে বোঝা যাইবে।

"আমার ভাইদের মধ্যে আমি সব চেয়ে ছোট ছিলাম—আমার পিতামাতা অতি দরিদ্র ছিলেন। আমার পনের বছর বয়সের সময় বাবা মারা গেলেন সুতরাং পড়বার জন্য তাঁর কাছ থেকে সামান্য যা কিছু সাহায্য পেতাম তা থেকেও বঞ্চিত হলেম। তাঁর মৃত্যুর সামান্য কয়েক মাস পরেই আমাদের গ্রামের একটী লোহার কামারের দোকানে শিক্ষানবীশ রূপে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম। পাঠের অদম্য স্পৃহা আমার পূর্ব্ব হতেই ছিল, শিক্ষানবীশ রূপে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই আমি লাইব্রেরী হইতে ইতিহাস সম্বন্ধীয় বহু পুস্তক পাঠ করিয়াছিলাম। শিক্ষানবীশি কর্‌তে কর্‌তে আমার ল্যাটিন পড়িবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল, আমার এক দাদার সাহায্যে রাত্রে পড়ে' পড়ে' এক শীতে আমি ভাজ্জিল শেষ করিলাম তারপর সিসারো এবং আরো কয়জন ল্যাটিন গ্রন্থকার শেষ করে' আমি গ্রীক আরম্ভ কর্‌লাম। এই সময় আমার কাজের এত চাপ পড়্‌লো যে সমস্ত দিন তো খাটতে হতোই—রাত্রেও কিছুক্ষণ কাজ করতে হোতো। তখন আমি আমার গ্রীক গ্রামারখানা টুপির মধ্যে করে নিয়ে যেতেম—এবং একটু অবসর পেলে কিম্বা কোন একটা বড় লোহা ভাঙবার সময় Fapto, Fapteis, Faptei, পড়া আরম্ভ করতাম। রাত্রে আমি একাকী কারো সাহায্য ছাড়া হোমারের ইলিয়াড্ শেষ কর্‌লাম। আর এক শীতে আমি এই ভাষার কুড়িখানি গ্রন্থ আয়ত্ত কর্‌লাম, তারপর আধুনিক ভাষা চর্চ্চা আরম্ভ কর্‌লাম—তখন দেখ্‌লাম ল্যাটিন জানা থাকাতে আর সব ভাষাই আমার সহজ হয়ে গেছে। পাশ্চাত্যের এই সব নানা ভাষার দর্শন, উৎপত্তি ও সম্বন্ধ নির্ণয়ের আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হ'ল, এই সময় আমি হিব্রুও শিখলাম,—পাশ্চাত্যে প্রায় ভাষা শেখা হইলে আমার প্রাচ্য ভাষা শিখিবার ইচ্ছা হইল কিন্তু উপযুক্ত পুস্তক অভাবে বড় অসুবিধায় পড়তে হ'ল, তখন স্থির কর্‌লাম একখানা জাহাজে নাবিক হয়ে ইয়ুরোপে যাব, রাস্তার বন্দর থেকে নানা ভাষা সম্বন্ধীয় বই সংগ্রহ করবো, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রায় একশত মাইল রাস্তা পায় হেঁটে বোষ্টনে গেলাম, কিন্তু এ উদ্দেশে বিফল হয়ে অন্য উপায় কি অবলম্বন করবো যখন চিন্তা করছি, তখন ওরারচেষ্টর নগরের American Antiquarian societyর নাম এক দিন হঠাৎ শুনলাম, তখনি মনে আমি অসীম আশা নিয়ে সোসাইটির হলে প্রবেশ করলাম। প্রাচ্য, পাশ্চাত্য কত পুরাতন নবীন সাহিত্য পুস্তকের একত্র সমাবেশ; আমি এ কোন দিন ধারণাও করি নাই এক সঙ্গে এত বিচিত্র পুস্তকের সমাবেশ হতে পারে! আমি দিনে তিন ঘণ্টা করে সময় এই পাঠাগারে অতিবাহিত কর্‌তাম,—আর সময় আমার জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কঠোর শ্রম কর্‌তে হোত। এই পাঠাগারের সাহায্যেই আজ আমি পাশ্চাত্য [illegible] ভাষায় দক্ষতা পেয়েছি।"

যাঁহারা মানসিক উন্নতির জন্য সময়ের অভাব বলেন এই উদাহরণ তাঁদের তিরস্কার করিবে সন্দেহ নাই। কেহ হয়তো জোর দিয়া ব'লবেন "তবে কি আমরা বিশ্রাম ও আনন্দের একটু সময়ও পাব না?" কেন পাবেন না—অবশ্যই পাবেন। বিশ্রাম অবশ্য দরকারী। মন এবং শরীরকে তাদের শক্তির অতিরিক্ত খাটানোতে অনিষ্ট হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই বিশ্রাম থিয়েটারে, তাস, পাশা বা দাবার আড্ডায় কিম্বা আলস্যে কাটাতে হবে এমন কোন নিয়ম নাই। কাজ বদলানোই এই সব বিখ্যাত লোকদের নিকট বিশ্রামরূপে গণ্য হইয়াছে। কারখানা ছেড়ে লাইব্রেরীতে যাওয়া বা হাতুড় ছেড়ে বই ধরা এই সব বিশ্রাম। দু'এক ঘণ্টা বাগানে শ্রম কিম্বা বোটানি ও জিওলজির জন্য দু'চার ঘণ্টা মাঠে ঘোরা এও বিশ্রাম। যুবকেরা আমোদ ও বিশ্রাম দুটি কথায় প্রায়ই গোল বাধিয়ে বসেন, বিশ্রাম যে আমোদই হবে এমন কোন কথা নাই, দু'টোর ভুল করে অনেক অমূল্য সময় তারা বাজে ব্যয় করেন যাতে খ্যাতি অর্জ্জন করা অসম্ভব হইত না। যে সময় তারা বাজে কাজে ব্যয় করেন সেই সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়াই মিলার, উইলসন, রমেশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র অমর হইয়া গেছেন।

হারানো মুহূর্ত্ত আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না, হারানো অর্থের পুনরুদ্ধার অক্লান্ত পরিশ্রমে হইতে পারে, হারানো জ্ঞান পাঠে অর্জ্জন করা যাইতে পারে, হারানো স্বাস্থ্য সতর্কতায় ও সুচিকিৎসায় ফিরিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু সময় যা একবার চলে গেলে সে চিরতরে গেল। একজন সুন্দর ভাবে এই বিজ্ঞাপনটি দিয়াছিলেন—"গেছে কাল সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের মধ্যে দু'টি সোণার ঘণ্টা হারিয়ে গেছে, প্রত্যেকটি ষাইটটি হীরক মিনিটে আবৃত ছিল, কোন পুরস্কার ঘোষণা করা যাচ্ছে না এতে, কারণ সে যা গেছে চিরতরে গেছে।"

অর্থের মিতব্যয় ও সময়ের মিতব্যয় অপেক্ষা কিছু কম আবশ্যকীয় নয়। ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন বলিয়াছেন "একটা রোগী বাঁচানোও যা একটা রোগী উপার্জ্জন করাও তা।" তিনি যুবক ব্যবসায়ীকে লিখিয়াছিলেন "অর্থ লাভের রাস্তাও বাজারের রাস্তার মত সোজা, এ শুধু দু'টো কথার উপর নির্ভর করে, পরিশ্রম ও মিতব্যয়,—মানে সময় ও অর্থ কিছু নষ্ট কোরো না, কিন্তু দুয়েরই যথোচিত সদ্ব্যবহার কোরো। তাঁহার উপদেশ নানা বিষয়ে শিক্ষণীয় এ বিষয়ে তাঁহার কয়েকটি উপদেশ উদ্ধৃত হইল।

"ধনবান হইবার ইচ্ছা করিলে লাভের চিন্তাও যেমন করিবে সঞ্চয়ের বিষয়ও তেমনি ভাবিবে।"

"একটা ছোট ছিদ্রেই জাহাজ ডুবাইয়া দেয়। মনে করতে পার—আহারে একটু বিলাসিতা করলে, পোষাকে একটু বাবুয়ানা করলে, মাঝে মাঝে একটু আমোদ প্রমোদ—এ আর কি বেশী? কিন্তু মনে রেখো অল্পে অল্পেই খুব বেশী হয়ে যায়।"

"সিল্ক ও সাটিন, ভেলভেট ও স্কারলেটে উনুনের আগুন ক্রমে নিভিয়ে দেয়।

"একটা দোষ পালন করতে যত ব্যয় হয় তাতে দু'টি ছেলে পালিত হতে পারে।"

"একটি পয়সাও সতর্কতার সহিত রেখো, টাকা আপনিই গড়ে উঠবে।"

এই উপদেশগুলি কার্য্যক্ষেত্রে সঞ্চয়কারীর পক্ষে যথেষ্ট কাজে লাগিবে।

সঞ্চয় করা একটা অবশ্য কর্ত্তব্য কাজ, একজন কৃষক সারা জীবনে ষাইট হাজার ডলার সঞ্চয় করিয়াছিল। তার বন্ধু এত টাকার কথা শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলে কৃষক বলিয়াছিল "যা অপরে বৃথা ব্যয় করে সেই জমিয়েই আমার এ হয়েছে।"

এমস্ লরেন্স তার এক ছেলেকে উপদেশ দিয়াছিলেন "আমি অতি কঠোর মিতব্যয়ী ছিলাম, যে পর্য্যন্ত না চারিটি পেনী উপার্জ্জন করিতে পারিতাম সে পর্য্যন্ত বাক্সে ব য়ে কখনো ঐ সামান্য মুদ্রাও খরচ করি নাই। বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সের সময় কি পরিমাণ অর্থ তিনি জমাইয়াছেন তাহার উল্লেখ কালে ডয়ারীতে লিখিয়াছেন যে বালক একুশ বৎসর পূর্ব্বে একুশ বৎসর বয়সে এই সহরে সামান্য কিছু গ্রাম্য শিক্ষা পরিবারদের উপর অখণ্ড অনুরাগ, পরিশ্রমের অভ্যাস, মিতব্যয়—শুধু এই লইয়া আসিয়াছিল তাহার পক্ষে আজ এ মুদ্রা সামান্য নহে, জীবনে অনেক বিষয়ের জন্য নিজেকে নিজে তিরস্কার করি, কিন্তু আলস্যে সময় কাটানো কিম্বা অসৎকার্য্যে অর্থব্যয় করার জন্য কখনও অনুতাপ করি নাই।"

লরেন্স উইলিয়ামস্ কলেজে ছাত্রবৃত্তি প্রদান করেন, এবং আরও নানা ভাবে তিনি পরিশ্রমী ছাত্রকে সাহায্য করিতেন, কিন্তু তাহার সাহায্যের গোড়াই দু'টো কথা ছিল যে ছাত্র সিগারেট বা কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে সে তাঁহার সাহায্য পাইবে না। যে বালক এ গুলো ব্যবহার করে সে মিতব্যয়ী নয়, সুতরাং সাহায্য লাভেরও যোগ্য নয়।

ব্যাপারটি আরও বিষদ করা যাক্, একজন মধ্যবিত্ত অবস্থার কলেজ পাঠী ছাত্রের দিন যদি চারি আনা সিগারেট খরচ হয় তো মাসে তাহার প্রায় আট টাকা পড়ে—বছরের শেষে একশত টাকায় দাঁড়ায়, এই ভাবে পাঁচ বছর দশ বছরে যে কি খরচ পড়ে এবং সেই অর্থ উপার্জ্জন করিতে যে তাহার কতদিন দরকার তাহা একবার বোধ হয় কেহ ভাবেও না।

স্যামুয়েল বাজেট বলেন "এই মিতব্যয়িতার অভাবেই আমরা এত ব্যবসায় 'ফেল' পড়িতে দেখি," তাঁহার নিজের উন্নতির ভিত্তি মিতব্যয়িতাই একথা তিনি বলিয়াছেন। আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হইলে নটরাজ অমৃত বসু মহাশয় সত্যই বলিয়াছিলেন "অপর কোন পুস্তক বিক্রেতা একখানা বই বিক্রী করিয়া একটাকা পাইলে তখনই বাজার হইতে রুই মাছের মুড়োর ফরমাইস করেন, কিন্তু গুরুদাস বাবু ওই একটাকা হইতে তাঁহার যে দুই আনা প্রাপ্য তাহা দ্বারাই কোনরূপে খরচের ব্যবস্থা করিতেন আর চোদ্দ আনা গ্রন্থকারের জন্য আলাদা 'পুঁটুলি' বাঁধিয়া রাখিয়া দিতেন," ইহাতেই আজ গুরুদাস লাইব্রেরীর এত নাম—খ্যাতি। রুই মাছের মুড়ো যাহারা খাইতেন তাহাদের চিহ্নও নাই।

মিতব্যয়ী হইয়া চল, প্রকৃতির নিয়মানুসারে চল, বিশ্বের একটু পরমাণুও বৃথা ব্যয় হয় না, এক ভাবে ব্যয় অন্য ভাবে তাহাই অনন্ত চলতি প্রকৃতিতে সংযোজিত হয়। তাহাকেই মান্য করিয়া অগ্রসর হও; সাফল্য জীবনে আপনি আসিবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

দুঃখ বরণ।

(রাগিণী—সাহানা)

যখন যে রূপে খুশী তব সখা
 এস হে তেমনি হৃদয়ে মোর ;
কোমল করুণ মূরতি না হও
 হ'য়ো নিকরুণ কঠোর ঘোর।
যদি এসো তুমি দুখের মতন
সে হবে আমার বুকের রতন
অশ্রু মুছাতে না-ই এসো যদি
 নয়নের মণি সে হবে মোর।
যদি এসো তুমি ব্যথা ব্যাধি হয়ে
তনু ভরি তব অনুভূতি লয়ে
রোদনে বেদনে করিব মিলন
 ঘুচে যাবে সব নয়ন লোর।
সর্ব্বনাশের মত এস যদি
ভেসে যাব আমি তাহে নিরবধি
সকল অঙ্গ দিব এলাইয়া
 সে যে হবে মোর মাতার ক্রোড়।
পথে আনি যদি বসাও আমারে
সে হবে আমার আসা অভিসারে ;
মৃত্যুর মত এস যদি প্রিয়
 প্রাণ সঁপি সুখে রবে না ওর।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বিদিশা।

ভারতবর্ষে যে সকল প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন স্থানের নাম শুনা শুনা যায়, তাহাদের কির্ত্তীকাহিনী আজ অতীতের গর্ভে লুপ্ত হইলেও, সময়ে যে সে স্থানগুলি অনেক বিষয়ে অগ্রগন্য ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। ভারতের মধ্যে বিদিশা এইরূপ একটী হৃত সৌন্দর্য্য বহু প্রাচীন নগর। পুরাণ এবং ইতিহাসাদিতে এই নগর অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান বিদিশার কির্ত্তীগরিমা কাল গর্ভে বিলুপ্তপ্রায়—আছে কেবল ধ্বংসোম্মুখ স্মৃতি!

বিদিশা বেত্রবতী নদীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। এই নগর কোন সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল, সে বিষয় ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ক্যানিংহমের মতে, বিদিশা খৃষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর মধ্য ভাগে, গুপ্তরাজত্ব কালে প্রথম স্থাপিত হয়। কিন্তু ক্যানিংহমের এই উক্তি ভিত্তিহীন। কালিদাস তাঁহার "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকে বিদিশার উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত নাটকের নায়ক রাজা অগ্নিমিত্র কবি-কল্পিত ব্যক্তি নহেন। ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, অগ্নিমিত্র খৃষ্টের ১৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি সুঙ্গবংশীয় রাজা ছিলেন এবং বিদিশা ইহাঁর রাজধানী ছিল। পৌরাণিক বংশাবলিতে পুষ্পমিত্র, বসুমিত্র-আদি রাজগণের সহিত অগ্নিমিত্রেরও নাম পাওয়া যায়। বিদিশা হইতে পুষ্পমিত্র ও অগ্নিমিত্রের নামাঙ্কিত কতক-গুলি স্বর্ণমুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে, সে কথা আমি স্থানান্তরে উল্লেখ করিয়াছি। "বৃহৎ সংহিতা"য় বিদিশার নামোল্লেখ আছে।* সুতরাং বিদিশা যে পুরাণোক্ত প্রাচীন নগর সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বিদিশার চতুর্দ্দিক্ কোন সময়ে সুদৃঢ় প্রাচীর বেষ্টিত ছিল, এখন উহার কতক অংশ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কতক ধ্বংসোম্মুখ। নগর প্রবেশের প্রধান দ্বার তিনটি এখনও বর্ত্তমান আছে। উত্তরে "রায়সেন" দ্বার, পশ্চিম "ব্যাস" তোরণ এবং "গান্ধি" তোরণ নগরের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। গান্ধিতোরণের ভিতর দিয়া নগরে প্রবেশ করিয়াই একটি বিশাল দেব মন্দির দৃষ্ট হয়, ইহা বিজয়মন্দির নামে বিখ্যাত। ইহা রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত, সুন্দর কারুকার্য্যময় বিশাল সৌধ; সম্মুখে খিলানযুক্ত স্তম্ভ শ্রেণী সুশোভিত বৃহৎ নাট্যমন্দির। ইহার অনতি দূরে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর কারুকার্য্য সুশোভিত, দর্শনযোগ্যমন্দির আছে। দুইটি মন্দিরই ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে এই অঞ্চলের কোন শাসনকর্ত্তার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিজয়মন্দিরের নির্ম্মাণকর্ত্তা ও ইহা হিন্দুমন্দির কিনা সে সম্বন্ধে ইতিহাসকারগণের মতানৈক্য লক্ষিত হয়। কয়েক জন ঐতিহাসিকের মতে এই বিজয়মন্দির ১৮৩৩ খৃ অব্দে নির্ম্মিত নহে ও নিম্মাতা কোন হিন্দুরাজাও নহেন এবং ইহা হিন্দুগণের নিজস্ব সম্পত্তিও নহে। ইহা একটি মস্জীদ ছিল, পরে ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে, বিদিশার কোন হিন্দু শাসনকর্ত্তার দ্বারা হিন্দু মন্দিরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।† কিন্তু তাহাদের এই উক্তির সপক্ষেও প্রমাণ অভাব। যে দুর্দ্দান্ত ধর্ম্মদ্রোহী সম্রাট্ হিন্দুর দেবমন্দির চুর্ণ-বিচুর্ণ করিয়া, তাহার স্থানে মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাঁহারই নির্ম্মিত মস্জীদ যে পরে মন্দিরে পরিণত হইয়াছিল, তাহা সহসা বিশ্বাস হয় না। বিজয়মন্দিরের নির্ম্মাণ কাল ও নির্ম্মাণকর্ত্তা সম্বন্ধে সকল ঐতিহাসিক-গণের মতই অবিশ্বাস্য। মনে হয়, এই মন্দির ১৬৮২ খৃঃ অব্দের বহু পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং ১৬৮২ খৃঃ

* The Indian Antiquary. Vol. XXII. P. 169.

† The Central India State Gazetter. Vol. I. Text and tables. P. 204.

অন্দ ঔরংজীবের ধর্ম্মদ্রোহীতায় মসজীদে পরিবর্ত্তিত হইয়া পরে পুনরায় মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। কারণ মসজীদ এবং মন্দিরের নির্ম্মাণ প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন প্রণালীর। বিজয়মন্দিরের নির্ম্মাণ প্রণালী সম্পূর্ণ হিন্দু ধরনের ভিত্তিগাত্রে, মেজেতে এবং স্তম্ভশ্রেণীতে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি ও সুন্দর কারুকার্য্য অঙ্কিত থাকিয়া, ইহার হিন্দুত্বের পরিচয় দিতেছে। ইহার অনতিদূরেই লোহাঙ্গীপীরের সমাধি সৌধ। ইহা বৃহৎ না হইলেও দেখিতে সুন্দর, সমাধিকক্ষের মধ্যস্থলে উচ্চ মর্ম্মর মণ্ডিত বেদীতে খোয়াজা চিস্তি লোহাঙ্গী চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। মুসলমানগণ ইহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিয়া থাকেন, বিস্তর মুসলমান প্রত্যহ ইহার দরগায় সিন্নি দেন। এই সমাধি মন্দিরের সম্মুখেই একটি ক্ষুদ্র মসজীদ আছে, উহাও লোহাঙ্গী মসজীদ নামে বিখ্যাত। এই মসজীদে দুইখানি আরবী লিপিও আছে। প্রথম লিপিখানি মালওয়ার পাঠান রাজ প্রথম মহম্মদ খিলিজীর দ্বারা ১৪৬০ খৃঃ অব্দে লিখিত। ১৪৬০ খৃঃ অব্দেই মহম্মদ খিলিজীর দ্বারা এই উপাসনালয় এবং লোহাঙ্গীপীরের মসজীদ ভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল। অন্য লিপিখানি সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক ১৫৮৩ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, এই লিপি হইতে আকবরের মালওয়া বিজয়ের সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক ইতিহাস জানিতে পারা যায়। নগরের পূর্ব্ব দিকে একটি বৃহৎ সুন্দর পুষ্করিণী আছে, ইহা মালওয়ার পাঠান বাদশাহ কর্ত্তৃক গ্রীষ্মকালে ব্যবহারের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার চতুর্দ্দিক খিলান করা সুন্দর কারুকার্য্যময় বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভ দ্বারা বেষ্টিত। এই সকল স্তম্ভ কতকগুলি হিন্দু মন্দির হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল।*

বিদিশায় অসংখ্য ধ্বংসোন্মুখ বৌদ্ধ স্তূপ আছে সবগুলিই খৃষ্টের তিনশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্ম্মিত। এই অসংখ্য বৌদ্ধ স্তূপের মধ্যে ষাটটি উল্লেখযোগ্য এবং এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে। বিদিশার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহেও অগণিত বৌদ্ধস্তূপ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে সাঞ্চির স্তূপ উল্লেখযোগ্য। ফার্গুসনের মতে, এই স্তূপগুলি বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয় কালে নির্ম্মিত, এবং ইহাদের সম্বন্ধে কোন বিশেষণ প্রয়োগ করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র।† বিদিশা হইতে মগধে যাইবার জন্য একটি সুন্দর প্রাচীন রাজপথ আছে। শ্রাবস্তী হইতে পিথানিয়ায় যে প্রাচীন পথটি গিয়াছে, তাহাও বিদিশার উপর দিয়াই গিয়াছে। মুসলমান রাজত্ব-কালে বিদিশা একটি স্বতন্ত্র সুবা ছিল। রাজকর্ম্মচারী এবং সাধারণের সুবিধার্থে ঐ সময়ে হায়দ্রাবাদ হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল, উহাও বিদিশার ভিতর দিয়াই আগ্রা অভিমুখে গিয়াছিল। বিদিশার দেড়মাইল উত্তর পশ্চিমে বাস নগর নামক প্রাচীন নগর অবস্থিত। এখানে পালি ভাষায় লিখিত যতগুলি লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহা "চৈত্যাগিরি" নামেই অভিহিত হইয়াছে। খুব সম্ভব বৌদ্ধ রাজত্ব কালে ইহা এই নামেই বিখ্যাত ছিল। এই নগর প্রান্তে নদীতটে অনেকগুলি সুন্দর মন্দির আছে, এগুলি সমস্তই জৈন মন্দির। ইহা জৈন সম্প্রদায়ের একটি প্রধান তীর্থ স্থান,—"চরণতীর্থ" নামে বিখ্যাত। ঐতিহাসিকগণের ধারণা, পূর্ব্বে এই স্থানেই বিদিশা ছিল। এখান হইতে উজ্জয়িনীর রাজগণের নামাঙ্কিত মুদ্রা, নরবরের নাগা রাজগণের মুদ্রা এবং গুপ্তরাজগণের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; মহারাজ অশোকের কয়েকখানি তাম্র ও শিলালিপিও পাওয়া গিয়াছে।

* "......A tank has been built over a subterranean chamber for use in hot weather, supported on Hindu pillars taken from some Temples. The C. I. Gazetter Vol. I. P. 204.

† "We are not justified in assuming from the greater extent of this group, as now existing, that possessed the same pre-eminence in Buddhist days. It may only be that, situated in a remote and thinly peopled part of India, they have not been exposed to the destructive energy of opposing sects of the Hindu religion." Ferguson's History of Indian and Eastern Architecture. P. 61.

প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি হইতে জানিতে পারা যায় যে, রাজা রুক্মাঙ্গদ তাঁহার স্ত্রীর নামে এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার নামানুসারে ইহার,—বৈশানগর, বা ব্যাসনগর নামকরণ করেন। তাঁহার স্মরণার্থে প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে একাদশীর দিন এখানে এক বিরাট মেলা হয়, উহা রুক্মাঙ্গদ একাদশী নামে প্রসিদ্ধ। এখানে অনেকগুলি বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির আছে। এই সকল মঠ ও মন্দির নির্ম্মাণের জন্য বিদিশার প্রাচীন মন্দিরের প্রস্তর থাম ইত্যাদি গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই অসংখ্য মঠ এবং মন্দিরের অধিকাংশ মহারাজ অশোকের রাজত্ব কালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। একটি ভগ্নমন্দিরের লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, অশোকের অনুমতিতে অনেকগুলি বিহার ও মন্দির এই স্থানে নির্ম্মিত হয়।* দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চালুক্য রাজত্বকালে, বিদিশা "ভিলসাভামিন্" নামে বিখ্যাত ছিল।† বিদিশার ভগ্নপ্রাচীরে লিখিত একখানি লিপিতে ইহার ভিলসা নামকরণ সম্বন্ধে আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে,—রাজা কৃষ্ণদেবো রাষ্ট্রগণকে জয় করিবার পর, তাঁহার মন্ত্রী "বাচস্পতি" বিলাস নামক একটি সূর্য্যমন্দির নির্ম্মাণ করান, তদবধি ঐ সূর্য্য মন্দিরের নামানুসারে ইহা বিলসা বা ভিলসা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।‡ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তকে, এই নগরকে "ভাদ্রবতী" নামে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এই নামকরণ সম্বন্ধে তাঁহারা কোন যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। জৈনধর্ম্মগ্রন্থাদিতে ইহা "ভাদলপুর" নামে অভিহিত হইয়াছে। খুব সম্ভব ভাদ্রবতীর অপভ্রংশই ভাদলপুর। এই স্থানে দশম জৈন তীর্থঙ্কর শীতলনাথ জন্মগ্রহণ করেন, এখন প্রতি বৎসর এখানে তাঁহার জন্ম মহোৎসব উপলক্ষে বিরাট মেলা হইয়া থাকে।

অশোকের রাজত্বকাল হইতেই বিদিশা পূর্ব্বমালওয়ার রাজধানীতে পরিণত হইয়াছিল,—এবং তাঁহার সময়েই এখানে বৌদ্ধ-বিহার, স্তূপ, মঠ মন্দিরাদি নির্ম্মিত হয়। তদবধি বিদিশা এই প্রদেশের রাজধানী ছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত বিদিশা গুপ্ত রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল, তাঁহারা বিদিশা হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী উদয়গিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। উদয়গিরি যে গুপ্তরাজগণের রাজধানী ছিল, সে কথা তথায় প্রাপ্ত কয়েকখানি অনুশাসন লিপি হইতে জানিতে পারা যায়। সবলিপিগুলিই গুপ্তরাজত্বকালের। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্য ভাগে, মালওয়ার "পরমার" রাজগণ এই প্রদেশ জয় করেন। পরমারগণ প্রায় তিনশত বৎসর রাজত্ব করিবার পর, আনহিলবারার চালুক্যরাজগণ তাঁহাদের পরাজিত করিয়া, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই প্রদেশ অধিকার করেন এবং বিদিশায় রাজধানী স্থাপন করেন।§ চালুক্যরাজগণ যে কত দিন এ প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা সঠিক জানা যায় না। তবে তাঁহারা যে অধিক দিন এদেশে শাসন করিতে পারেন নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। কারণ দ্বাদশ শতাব্দীর পর আলতামস্ পশ্চিম মালওয়া জয় করেন এবং ইহার কিছু দিন পরে বিদিশা আক্রমণ করেন। সুতরাং চালুক্যরাজগণ বড় জোর একশত বৎসর রাজত্ব করিয়া থাকেন ত যথেষ্ট।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অলবরুণী তাঁহার মহাবালিস্তান গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম বিদিশার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "বিদিশা মালওয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত এবং উজ্জয়িনী ও বিদিশার মধ্যে দূরত্ব

* Cunningham's Reports of the Archæological Survey of India Vol. X P. 34.

† The Indian Antiquary Vol. XVIII P. 80 and 341.

‡ Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. XXXI Part I and II.

§ The Indian Antiquary Vol. XVIII P. 80 and 341 also B. R. S. 1882—3 P. 210.

পরগণার ব্যবধান।* ১২৩৫ খৃঃ অব্দে আল্‌তামস বিদিশা আক্রমণ করেন এবং একটি বিশালকায় প্রাচীন মন্দির ধ্বংশ করেন।† আল্‌তামসের এই আক্রমণে, বিদিশার রাজগণ কিছু দিনের জন্য তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন, কিন্তু তিনি দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অল্পদিন পরেই পুনরায় তাঁহারা নিজেদের স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। ১২৯০ খৃঃ অব্দে আলাউদ্দিন পুনরায় বিদিশা আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হন। আবার অসংখ্য সৈন্য সহ ১২৯২ খৃঃ অব্দে আলাউদ্দিন বিদিশা আক্রমণ করেন, এবং এক বৎসর ব্যাপি যুদ্ধের পর জয়লাভে কৃতকার্য্য হন।‡ এই সময় হইতেই বিদিশা প্রকৃতপক্ষে মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হয়। বাবর তাহার রচিত বাবরনামায় লিখিয়াছেন, যখন আমি ভারতবর্ষে আগমন (১৫২৭ খৃঃ অব্দ) করিয়াছিলাম, মহারাজ শিলাদি তখন বিদিশার রাজ সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। এই শিলাদিকে এবং কোন সময় হইতে ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বিদিশায় রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি কোন ইতিহাসকারই তাহার সঠিক মীমাংসা করিতে পারেন নাই, কোন কোন ঐতিহাসিক ইঁহাকে মুসলমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অমূলক। শিলাদি ভূমার বংশীয় রাজপুত ছিলেন। ইনি বাহুবলে বিদিশা, সারঙ্গপুর প্রভৃতি জয় করিয়া স্বাধীনভাবে এই প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন। ইনি মালওয়ার পাঠান নৃপতি দ্বিতীয় মামুদের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন।§ ১৫৩২ খৃঃ অব্দে গুজরাটের বাহাদুর সা কর্ত্তৃক বিদিশা আক্রান্ত হয়। ইনি বিদিশা জয় করিয়া তত্রস্থ অধিবাসীগণের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করেন, এবং বিস্তর প্রাচীন মঠ ও মন্দিরাদি ধ্বংশ করেন। শিলাদিকে মুসলমান ধর্ম্মে দিক্ষিত করাইবার জন্য অত্যন্ত নির্য্যাতন করিয়াছিলেন।(১) আকবরের রাজত্বকালে এই নগর মালওয়া সুবার একটী মহলে পরিণত হয়, সম্রাট, মির্জ্জা খাঁর খান-ই খানানকে ইহা উপহার স্বরূপ দান করেন। একটি সুন্দর কামান ভগ্ন দুর্গের প্রান্তে পতিত আছে, উহার পারসী লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুমতি ক্রমে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই কামানটি ২০ ফুট লম্বা। ঔরংজীবের রাজত্ব কালে, বিদিশার অনেক প্রাচীন মন্দিরাদি মসজীদে পরিণত হইয়াছিল। ঔরংজীব এই নগর আলমগিরপুর নামে প্রবর্ত্তিত করেন, কিন্তু ইহা অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সময়ে সময়ে বিদিশা বিভিন্ন রাজগণের অধিকার ভুক্ত হয়। অবশেষে ইহা পেশোয়ার অধিকারভুক্ত হয়। বালাজী বাজিরাও পেশোয়ার মৃত্যুর (২) পর বিদিশা মহারাজ সিন্ধিয়ার হস্তগত হয় এবং তদবধি (১৭৭৫ খৃঃ অব্দে) ইহা গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আছে।

বিদিশার ভাগ্য বহু রাজন্য হস্তে নিনীত হইয়াছে—সে প্রাচীন রাজগণের ইতিহাস আরও চিত্তাকর্ষক ও মনোহর, সময়ান্তরে তাহার আলোচনা ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

---

* Elliott's History of India Vol. I P. 59

† Elliott's History of India Vol. II P. 328. Also Tabakat-i Nasiri (Eng. Trans.) P. 622.

‡ Elliott's History of India Vol. III P. 148 and 543.

§ Brigg's History of the Rise of the Muhammadan Power in India Vol. IV P. 161 —Bayley's History of Gujarat P. 273 also Elliott's History Vol. IV P. 277.

(১) Brigg's History of the Rise of the Muhammadan Power in India. Vol. V P. 118.

(২) Elliot's History of India Vol. VIII P. 233 also Cunningham's Bhilsa Topes

গ্রন্থ-সমালোচনা।

আড়াই চাল,—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত। প্রকাশক—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স; ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬পেজী ১২০ পৃঃ। কাপড়ের বাঁধাই। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

আড়াই চাল—উপন্যাস; ঠিক উপন্যাস নহে—বড় গল্প; কারণ ইহাতে উপন্যাসের বিষয় ও চিত্র-বৈচিত্র নাই—গল্পের উপকরণ,—প্রধানতঃ একটী ঘটনাকে ঘিরিয়া রসকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। ঘটনা সাধারণ; আমাদের ভবিষ্যৎ আশা অধ্যয়ন-রত যুবকবর্গের গুণ অনেক—কিন্তু তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ শুনিয়া আসিতেছি, সেটা উচ্ছৃঙ্খলতা,—সংযমের অভাব। এইজন্য ছাত্রদের মেস ভদ্রলোকের বাসার নিকটে হইলে গৃহস্থ আতঙ্কিত হয়. নব্য-যুবকের এই নির্ম্মল-সৌন্দর্য্য-পিপাসা উপলক্ষ করিয়া লেখিকা এই 'আড়াই চাল' চালিয়াছেন,—'যাহা যে হয় নাই—ভগবানের আশীর্ব্বাদে!' যে সমাজে এখনও কোর্টসিপ চলে নাই,—সে সমাজে একজন কলেজে পড়া যুবকের পক্ষে পাশের বাড়ীর খোলা জানালায়—'আঘ্রাণ-তৃষিত কুঞ্চিতালকাবলী শোভিত একখানি অতি চমৎকার কচি-কোমল মুখ' দেখিয়া হতাশ-ব্যাকুল আলোড়িত হৃদয়ে আমাকে অপরিচিতা বালিকার উদ্দেশে একখানি 'হৃদয়োচ্ছ্বাস' পত্রসহ উপহার প্রেরণ যে কতদূর অমার্জ্জনীয় অপরাধ, তাহা সহজেই বিবেচ্য। এ ক্ষেত্রে ঘটনাক্রমে বালিকার অভিভাবক ছিলেন যুবকটীর হস্তে কন্যাদানপ্রার্থী—তাই রক্ষা! গ্রন্থকর্ত্রী, যুবকের বৌদির মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, "তোমাকে সত্যিকার স্নেহাস্পদ ছোট ভাইটী মনে করেই এই উপদেশটী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে হৃদয়োচ্ছ্বাস জিনিষটা খুব ভাল (!) সন্দেহ নেই, কিন্তু স্থান—কাল—পাত্রভেদে এটা একটু বুঝে খরচ করতে হয়, এর অযথা অপব্যয়টা মোটেই ভাল নয়। তোমার অপরিচিতা বিদ্যুৎটি ভাগ্যিস্ আমার বোন ক্ষণপ্রভা হয়ে গিয়েছিল, তাই রক্ষা, কিন্তু ও যদি আর কেউ হ'ত, তা'হলে—হঠাৎ হৃদয়োচ্ছ্বাস উপঢৌকন দেওয়ার ফলটি এ-ক্ষেত্রে কি রকম সাঙ্ঘাতিক হয়ে দাঁড়াত, বল দেখি?"

লেখিকা সূক্ষ্মদর্শী,—সমাজের এক একটী খুঁতকে, এক একটী অন্ধ-সংস্কারকে এমন ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে চশমা-সর্ব্বস্ব ক্ষীণদৃষ্টি দর্শকের চক্ষেও সেগুলির কদর্য্য অপকৃষ্টতা স্পষ্ট ধরা পড়িবে। 'আড়াই চাল' একাই এক নয় আরও সাতটী সমাজ-সমস্যা ও চিত্র-বৈচিত্র্যতার সহিত যুক্ত। "বুনো ওল ও বাঘা তেঁতুল"এর নায়ক ডেপুটি বাবুর আদালতে অসীম প্রতাপ; কিন্তু গার্হস্থ্য-জীবনের সঙ্কীর্ণ আয়তনে, সে প্রতাপের প্রভাবটা অত্যন্ত সঙ্কোচ-খর্ব্ব, কারণ গৃহলক্ষ্মী মহোদয়া তারো বাড়া জবরদস্ত মানুষ।' ফলে, তিনি বেহেড মাতাল বেপরোয়া হইলেও তাঁকে সোজা হইতে হইয়াছিল। এই স্বাধীনতার যুগে গৃহিণী মহোদয়াদের এ উপদেশটা বেশ ভাল মতই জানা আছে। ভাল! 'মাতালের স্ত্রীকে মাতাল স্বামীর উপযুক্ত দজ্জাল হইতে হইবে,—নচেৎ তাহার সহধর্ম্মিণীত্ব থাকিবে কি করিয়া?' এ সহধর্ম্মিণীত্ব অবশ্য সাদা চোখে;—উদ্দেশ্য মহৎ! এই উপদেশেই বুঝি মাতালের সংখ্যা শিক্ষিত সমাজে দিন দিন কমিতেছে—কিন্তু সেই সঙ্গে সহধর্ম্মিণীদের ঝাঁঝটা কমিতেছে কি বাড়িতেছে—তার সাক্ষ্য দিবার বল স্বামী মহোদয়দের আছে কি? ৩য় গল্পটি—"বাণার সমাধি" কাব্যকল্পনার আমেজে প্রেমের কাহিনী। শেষ ফল ইহাতে সচরাচর যা হয় তাই—'দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু উপহার দিয়া' উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রার্থনা—"পূর্ণ হোক ইচ্ছা তব দেব দেব দয়াময়।" এ প্রার্থনা ছাড়া আর অন্য পথ কি ছিল?

৪র্থ গল্প--"পয়সার প্রতাপ।" ও প্রতাপে যা হয়,--সংসারের সব অপকর্ম্মই ওতে ঢাকিয়া যায়। পয়সায় কত গণ্ড-মূর্খ বুদ্ধিমান,—শিক্ষিত সজ্জন মুখচোরা নোট মুখস্থ পাস্ নিরেট বোকা, খুনী সাধু রূপে পরিচিত—এক্ষেত্রেও তাই হইয়াছিল। নরহন্তা ধনী ফাঁসিকে ফাকি দিয়া সাজিলেন সাধু—অর্থের মোহে হত বালকের মাতা পর্য্যন্ত স্তম্ভিত ও পুত্রহন্তার স্তুতিতে, মনতুষ্টিতে ব্যস্ত। হায় পয়সা!

৫ম গল্প—"কর্পূরের মালা।" কর্পূরের মালার মতই শুভ্র, সুগন্ধযুক্ত, পবিত্র—অনিন্দ্য! ইহার পরিচয় এক কথায় দিবার নয়। নায়িকা ছবি,—ছবির মত বালিকা; জগন্নাথ দেবের মন্দিরে জগন্নাথের নির্ম্মাল্যের মত পূত; সে ভিড়ে হারাইয়া গিয়াছিল; রঞ্জন,—দেবতার সেবক—তাহাকে উদ্ধার করিয়া আত্মীয় আত্মীয়ার সহিত মিলিত করিয়া দিল, সেও সেই সঙ্গে তাহাদের আপনার হইয়া গেল। ছবির এক আত্মীয় ঠাট্টার ছলে রঞ্জনের প্রাণের ইচ্ছাকে মূর্ত্ত করিয়া বলিলেন,—'মিলন তাদের সম্ভব। আশা তা শুনিয়া বলিল "বেশ!" কর্ত্তব্যবুদ্ধি,—তার হৃদয়ের পবিত্রতা বলিল;--"না—না ভগবান একি পথ দেব তোমার আশ্রিত সন্তান সেবকের অন্তরে একি প্রলয়ঙ্কর প্রলোভন-ময় আকাঙ্ক্ষার দাবানল প্রজ্বলিত করিলে ঠাকুর! রক্ষা কর, রক্ষা কর প্রভু!" এমন হৃদয়মন দিয়া প্রার্থনা সেটা তা কি ব্যর্থ হয়! ঠাকুর শুনিলেন--রঞ্জনকে জয়যুক্ত করিলেন,--ইন্দ্রিয়, সংযমের পদতলে—রঞ্জন, ছবির বরকে তাই প্রাণ খুলিয়া আনন্দের দিনে—আনন্দে আশীর্ব্বাদ করিতে পারিয়াছিল—"আপনার জীবন সফলতায় চির গৌরবময় হোক।" ছবিকে বলিতে পারিয়াছিল—"তোমরা শান্তিময় সুখে সুখী হও।" লেখিকার এ-মালা দেবতার কণ্ঠের হার, দেবতার প্রসাদ!

অন্য গল্পটীর পরিচয়ের স্থানাভাব—বিশেষত্বও বড় নাই। 'একাদশী' গল্পটীর উপকরণ ভাল বেশ,—সাজাইবার দোষে তেমন ফোটে নাই। "ননী খানসামার ছুটী যাপন"—গল্প না বলিয়া চিত্র বলাই ঠিক্—চিত্রটীই বটে--একখানা নিখুঁত ফটো, না—আলোকচিত্রও নহে—তাহা অপেক্ষাও জীবন্ত! সূক্ষ্মদর্শী সুনিপুণ শিক্ষিত অভিজ্ঞ শিল্পীর পরিচয় ইহার প্রতি-রেখাঙ্কপাতে; এমন স্বাভাবিক যে কুত্রাপি রঙের বাহুল্য নাই, প্রকাশের চেষ্টা নাই, অথচ স্বভাবের সুস্পষ্ট আলেখ্য। নিজে পাঠ না করিলে ইহার সরল—অতি প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য্য-গৌরব বুঝাইবার নহে। এই উপভোগ্য গল্পগুলি পাঠ করিয়া পাঠকপাঠিকা আনন্দ ও উপকার উভয়ই লাভ করিবেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

নানা কথা—শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম্-এ, বার্-য়্যাট্-ল প্রণীত ও প্রকাশিত। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট, প্রকাণ্ড পুস্তক—মূল্য ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

'তেল, নুন, লকড়ি' হইতে 'বাঙ্গলা ভাষার' বিবিধ তথ্য,—'ব্রাহ্মণ-মহাসভা,' ভারতবর্ষের ঐক্য, 'ইয়ুরোপের যুদ্ধ ক্ষেত্র,' 'প্রাণের কথা' প্রভৃতি নানা কথা,--'নানা কথা'য় আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের পরিচয় বঙ্গভাষার পাঠকের নিকট নতুন করিয়া দিতে হইলে পাঠকপাঠিকাকে প্রকারান্তরে বঙ্গভাষার সহিত অপরিচিত বলিতে হয়; নাথ-হীন শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয়কে কে না জানে! তিনি নিজেই একা একশ'—একটা নতুন স্রোতে বঙ্গভাষাকে ভাসাইতে বসিয়াছেন; কত স্থান তাঁহার প্রভাবে উন্নত উর্ব্বর হইল—কত স্থান ডুবিল—ডুবুক্ তথাপি দেশের জমী ত দেশ ছাড়া হয় নি! তাঁহার আমদানী বিদেশীয় ভাবস্রোতে আবর্জ্জনাই পরিষ্কৃত হইয়াছে। স্বদেশ বিদেশ হইবার আশঙ্কা যদি কেহ করিয়া থাকেন তাহা বৃথা। চৌধুরী মহাশয় আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন—"বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির যে ভাষা, ভাব, আচার এবং আকার সম্বন্ধে নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে এক জাতি হয়ে উঠ্‌বে, এআশা করাও যা, আর কাঁঠাল গাছ ক্রমে আম গাছ হয়ে উঠ্‌বে, এআশা করাও তাই।" আশার কথা! কিন্তু দেশের

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৪র্থ বর্ষ। | পৌষ, ১৩২৬ সাল। | ২য় সংখ্যা।

দুঃখ-মধু।

সুখের আশা করে তোমারে চেয়েছিনু
তাই কি এত দুখ দিলে হে,
তোমার কথা যদি হেলায় ভুলে যাই
তাই কি প্রাণ কেড়ে নিলে হে?

সুখেরে পেলে যদি মিলন নাহি হয়,
মোহেতে ডুবে থাকে মুগ্ধ এ-হৃদয়,
বিরহ ব্যথাহত তাই কি তুমি নাথ
দুখেতে মোরে চেয়েছিলে হে?

তাই ত হ'ল আজ; তোমার স্নেহমাখা
বেদনা করাঘাতে ফাটে প্রাণ
মুক্তি নাহি চাই যুক্ত-করে কহি
এমনি করে নাথ কর ত্রাণ।

তোমারে ভুলিব না, তোমারে ভুলিব না
হৃদয়ে থাক্ জেগে প্রাণের এ বেদনা
দুখের মধুসম এমন মধুময়
কিছু কি আছে এ নিখিলে হে?

স্বপ্ন কথা।

—:*:—

"এই ভাল ওগো এই ভাল," আমার সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত ক'রে, আমার শুষ্ক কণ্ঠ হ'তে কেবলই এই কথাটী বেজে উঠ্ছে—"এই ভাল ওগো এই ভাল।"

আজ এই শ্রাবণ সন্ধ্যায় ঘন নীল মেঘ সারাটী আকাশ জুড়ে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া বিরহীর বুক ভাঙ্গা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মত হু হু ক'রে ভেসে আসছে।

আমার সাম্‌নেকার এই আঁকাবাঁকা পথটীর দু'ধারে গাছের সারি, যেন কোন্ অজানা প্রিয়তমের স্পর্শ পাবার জন্যে সহস্র বাহু আকাশের পানে মেলে দিয়েছে। আর আমার চারিধারে আছে শুধু অতলস্পর্শ আঁধার সাগরের মোহভরা নিথর জল। আর কেহ নাই কিছু নাই! না না আছে বৈকি! ঐ যে আমার মাথার ওপর ঝোপের মধ্যে মাঝে মাঝে দু'একটী ঝিল্লী সমস্ত নীরবতা ঘুচিয়ে আর্ত্তনাদ করে উঠ্ছে - শুন্‌তে পাচ্ছ না? ওযে আমারই ব্যথাক্ষত হৃদয়ের বিলাপ রাগিণীর প্রতিধ্বনি।

পাতার ফাঁক দিয়ে কয়েক বিন্দু বৃষ্টির জল আমার মুখের ওপর এসে পড়্‌ল, আঃ কি মিষ্টি! বৃষ্টি পড়ার রিম্ ঝিম্ শব্দ আমার কানে যেন ঘুমপাড়ান গানের মত লাগ্‌ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া অদৃশ্য বন্ধুর মত আমার মুখে বুকে তার স্নেহ ব্যাকুল হাতখান বুলিয়ে দিচ্ছে।

সকাল হ'তে গোধূলীর শেষ মুহূর্ত্তটী পর্য্যন্ত যখন পাগলের মত ছুটে চলেছিলাম, তখন আরাম যেন আমারই পায়ের হাওয়া লেগে দূরে দূরে সরে যাচ্ছিল! আরো কত দূর? আর ত ক্ষমতা নাই। আমার ক্লান্ত দেহটী বুঝি ধূলায় লুটিয়ে পড়্‌তে চায়! আমার চোখদুটী ব্যাকুল হ'য়ে সাম্‌নেকার পথের দিকে তাকিয়ে রইল। আমার রুদ্ধ কণ্ঠ ঠেলে কতকগুলি জড়িত শব্দ বেরিয়ে এল,—ওগো কে বলে দেবে—এ পথে শেষ কোথায়?

কি কর্কশ স্বর! একি আমারই মুখের ভাষা? একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আমার বুক হতে বেরিয়ে গেল। সে শব্দ এখনও যেন শুন্‌তে পাচ্ছি বাতাসের সঙ্গে কেঁদে বেড়াচ্ছে।

দু'একটী করে সমস্ত দিনের ঘটনা আমার মনে পড়্‌ছে। তখনও প্রভাতের আলো পৃথিবীর ওপর এসে পড়েনি, শুধু মাঝে মাঝে দু'একটী পাখী ঘুম থেকে জেগে গান গেয়ে উঠ্‌ছে,—আমি পথে এসে দাঁড়ালাম।

ওগো আমার পায়ের তলার মাটী, ওগো সর্ব্বংসহা, তোমার ঐ শিশির-ধোয়া মুখের ওপর যখন নির্ম্মল প্রভাতের প্রথম কিরণ এসে পড়্‌ল, মাগো কি সুন্দর তুমি! তোমার শ্যামল বসনখানি মৃদু বাতাসের হিল্লোলে দুলে দুলে

উঠ্‌ছে। শত যূথী মল্লিকা তোমার আঁচলখানি ভ'রে ফুটে রয়েছে। তন্দ্রা জড়িত তোমার চোখ দুটী যখন শুক-তারাটীর ওপর পড়্‌ল, কি মধুর সে চাহনি! স্নিগ্ধ স্নেহে ভরা।

লতায়, পাতায়, ফুলে, পাখীর কণ্ঠে তোমার যে বন্দনা গান বেজে উঠ্‌ল, কি মধুর তার সুর! তারপর জানি না, সে কোন অজানা শক্তির টানে আমার যাত্রা সুরু হল।

অপূর্ব্ব আনন্দে শ্যামল তরুবীথিকার ভিতর দিয়ে নদীর কূলে কূলে ছুটে চলেছি! আমার চারিদিকে শুধু ফুল, শুধু রূপ, হাসি, গান অফুরন্ত। কিন্তু তাদের পানে ফিরে তাকাবার অবসর নেই। সাম্‌নের টানে সাম্‌নের পানে ধেয়ে চলেছি— বাধাবন্ধনহারা স্রোতের মত, আপনার আনন্দে আপনি বিভোর।

আমার চলার আনন্দে যাদের দিকে একবারও ফিরে দেখিনি, এখন যেন তারা আমার ধূলি শয্যার ওপর এই অবসন্ন দেহটীর প্রতি পলকহীন চোখে চেয়ে আছে। ওদের চোখে কি চাহনি? একি পরিহাস? না গো না পরিহাস নয়,— ওরা বলে তুমি যার জন্যে অত ব্যাকুল হয়ে ছুটে চলেছ, আমাদের অবহেলা ক'রে, তার আসনখানি যে আমাদেরি মাঝে পাতা হয়েছে, এ আনন্দ উৎসবে আমাদের যদি না দেখ তা হলে তাকে ত দেখ্‌তে পাবে না।

কিন্তু তখনও ত আমার পথের সাথীদের কথা মনে জাগেনি! আমি ছিলাম চলার আনন্দে মেতে। মনে করেছিলাম এমনি করেই আমার পথের শেষে এসে পৌঁছাতে পারব, হায় দুরাশা!

মনে পড়ে না কখন চোখ জুড়ান সবুজ ছায়া অতিক্রম করে মরুভূমির মধ্যে এসে পড়েছি। ক্লান্তিতে সমস্ত দেহ ভরে গিয়েছে। এইবার আমি প্রথম পিছনের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম।

এ কোথায় এলাম? যেদিকে চাই কেবলই ধূ ধূ করছে। সাম্‌নে পিছনে ডাইনে বামে কেবলই শূন্য কুজ্ঝটিকার ধূলায় আচ্ছন্ন। মরণ যেন সমস্ত প্রাণটুকু শুষে নেবার জন্যে তার সহস্র জিহ্বা পৃথিবীর বুকের ওপর লেহন করছে।

এই কি আমার গানময়ী প্রাণময়ী শ্যামলা ধরণী? আহা মা আমার, কোন্ নিষ্ঠুর দেবতার নির্ম্মম লীলায় তোমার বুকের অফুরন্ত স্নেহ হাসি গান নিঃশেষ হয়ে গেছে?

এবার ছুটে চলেছি, চোখ বুজে কোন কিছুর দিকে লক্ষ্য না রেখে। আগুনের হল্কার মত হাওয়ায় আমার দেহের প্রত্যেক রক্তবিন্দুটীও যেন শুকিয়ে আসছে। প্রতি পদক্ষেপে আমার পা দুখানি প্রতিহত হচ্ছে। কাঁটায় সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। আমার শ্রান্ত দেহ বার বার তপ্ত ধূলায় লুটিয়ে পড়্‌ছে। আবার উঠ্‌ছি আবার চলেছি। এই রকমে জানি না কতক্ষণ চলার পর আমার অবসন্ন দেহ মন এইখানে লুটিয়ে পড়্‌ল। কিন্তু এবার উঠ্‌বার চেষ্টাও কর্‌তে পারলাম না।

কতক্ষণ এখানে পড়ে আছি জানি না। চোখ মেলে দেখি মেঘে আকাশ ভ'রে গেছে! অন্ধকারের কোলে সমস্ত পৃথিবী যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে।

বৃষ্টি পড়া বন্ধ হ'য়ে গেছে। চাঁদের আলো হাজার খণ্ডে ছিন্ন মেঘের পর্দ্দাখানি ঠেলে তাদের পথ ক'রে নিচ্ছে। আমার দক্ষিণ দিকের ঝোপের ওপর জ্যোৎস্না সাদা চাদরের মত পড়ে রয়েছে। আর সবদিক তখনও অন্ধকারে ভরা। আমার মাথার ওপর একটী কি গাছ আছে জানি না বোধহয় শেফালি হ'বে। তারই দু'একটা ফুল আমার বুকে মুখে ঝরে পড়্‌ছে।

আমার তন্দ্রার ঘোর ক্রমেই গাঢ় হ'য়ে আসচে। আর কিছুই ঠিক ধরতে পারছি না, মনে আনতে পারছি না। সমস্তই কেমন ঝাপসা হয়ে আসচে। কুয়াসায় যেন আমার সামনেকার সমস্ত জিনিসই ঢেকে ফেলছে। চোখের পাত' দুটী ধীরে ধীরে মুদে এ'ল। ঝিল্লী ডাকার শব্দও যেন আর শুনতে পাচ্ছি না, একি মূর্চ্ছা?

আমার দেহ হঠাৎ কেন জানি না, কেঁপে উঠল! মনে হল যেন নিশীথের নীরবতার ভিতর হ'তে কার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। কে অতি সন্তর্পণে আমার মাথাটীকে দু হাত দিয়ে তুলে ধরছে! একবার নড়ে উঠবার চেষ্টা করলাম পারলাম না। আমার বুকের স্পন্দন ক্রমেই দ্রুত হচ্ছে। ইচ্ছা করছে চীৎকার করে উঠি, একবার চোখ মেলে দেখি; কিন্তু কেমন ভয় করছে পারছি না!

কার একখানি হাত আমার বুকের উপর এসে পড়ছে, আর একখানি হাত আমার কপালের একদিক হতে আর এক দিকে নেবে গেল! আমি চোখ মেললাম।

একি! আমি কার কোলের ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছি? তার মুখের ওপর জোৎস্না এসে পড়েছে। ঐ আকাশের মেঘের মত নিবিড় চুলগুলি তার পিঠখানি ঢেকে রেখেছে। মৃদু বাতাসে দু'একটী চুল আমার মুখে এসে পড়ছে তার মাথাটী আমার মুখের কাছে নেমে এল! তার উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার মুখের উপর পড়ল।

প্রাণপণ চেষ্টায় আমার দেহটীকে টেনে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে দাঁড়ালাম। কি বলতে চেষ্টা করলাম কিন্তু আমার মুখ দিয়ে শুধু কতকগুলি অস্পষ্ট শব্দ বেরিয়ে এল! আর দাঁড়াতে পারছি না, সমস্ত দেহ অবশ হয়ে আসছে। আমার মনে হচ্ছে এইবার বুঝি মাটীর ওপর আছড়ে পড়ব। আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করলাম।

লতার মত হাত দুটী দিয়ে সে আবার আমাকে তার বুকের কাছে টেনে নিল। আমার মাথাটী তার কাঁধের উপর লুটিয়ে পড়ল। তার মুখের দিকে চাইলাম, সে তখনও আমার দিকে তেমনি করেই তাকিয়ে ছিল। ভাষা দিয়ে ত সে চাহনির বর্ণনা করতে পারব না, শুধু এইটুকু বলতে পারি—কি সুন্দর তার চোখ!

আমি অবাক্ হয়ে তার মুখের পানে চেয়ে আছি, দেখছি গোলাপের পাপড়ির মত পাতলা ঠোটের উপর বেদনা অভিমান ও লজ্জার ছায়াগুলি একে একে ফুটে উঠছে, আর মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি বলে উঠলাম—"কে তুমি গো?"

সে তাড়াতাড়ি বাম হাতখানি দিয়ে আমার গলাটী জড়িয়ে ডান হাতখানি আমার মুখের ওপর চেপে ধরল। তারপর আমার মাথাটী আবার তার কাঁধের ওপর টেনে নিল।

আমার জ্বরতপ্ত কপালটী তার গলাটী ছুঁয়ে আছে। আমার হাত দুটী কখন তাকে ঘিরে ধরেছিল বুঝতে পারি নি। মানুষ ডুবে যাবার সময় তার হাতের কাছে যা কিছু পায় তাই অবলম্বন ভেবে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে, সেই রকম করে আমিও তাকে দুহাত দিয়ে ঘিরেছিলাম। আমার দেহ তখন শীতার্ত্ত, বেণু শাখার মত কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

আমি তাকে বললাম "ওগো দয়া কর, কথা বল। বল তুমি কে?" তার শান্ত চোখ দুটী ধীরে ধীরে মুদে এল। একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস মনের আবেগে অতি সন্তর্পণে তার বুক হতে বেরিয়ে গেল। চারি দিক নিস্তব্ধ!"

অন্ধকারের মধ্যে জ্যোৎস্নার ম্লান আলোক হারিয়ে গেছে। দুএকটী ঝিল্লী আবার ডেকে উঠছে। সে আমার কানের কাছে মুখ এনে বল্‌ল—"আমি স্বপ্ন"। এ কোন্ স্বর্গের অমিয়মাখা ভাষা! এ কোন্ বাঁশরীর পাষাণ গলান সুর! এ কি শুন্‌লেম আমি?

মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো আবার চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। একটা দমকা হাওয়া মালতীর গন্ধ নিয়ে আমাদের আকুল করে বহে গেল। আমি আপন মনে বলে উঠ্‌লাম 'স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন?'

আমার মুখের উপর ছোট দুটী ফুলের মত কি পড়ল, আমি মুখ তুলে দেখতেই সে মাথাটী সরিয়ে নিয়ে আকাশের দিকে চাইল। তার চোখ দুটী জলে ভরে গেছে।

চাঁপা ফুলের কলির মত আঙ্গুল দিয়ে, আমার ডান হাতখানি সে আবেগের সঙ্গে চেপে ধর্‌ল। আমি তাকে বল্‌লাম "ওগো নারি, কি চাও তুমি?" সে তার মাথাটী আমার বুকের দিকে বাড়িয়ে বল্‌লে—"বিশ্রাম, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বন্ধু।"

হায় গো নারি, তুমিও শ্রান্ত, আমি মনে করেছিলাম জগতের সমস্ত ক্লান্তি বুঝি আমারই দেহে বাসা বেঁধেছে। হায় স্বপ্ন আমার এ দগ্ধ বুকে তোমার ত ঠাঁই হবে না, এখানকার সমস্ত রস যে শুকিয়ে গিয়েছে। প্রাণ যে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে!

তার মাথাটী আমার বুকের উপর লুটিয়ে পড়ল, আমাদের বুকের স্পন্দন মিশে গিয়ে সমান তালে উঠছে পড়ছে। তার এলো চুলের সুবাসে আমার মন মাতাল হয়ে উঠল। আমি মনে মনে ভাবছি ভগবান আমার এ স্বপ্নের ঘোর যেন না ভাঙ্গে। ওগো নিঠুর, আমার ত সব নিয়েছ, শুধু এই স্বপ্নটুকু, একান্ত আমারই হয়ে আমার বুকখানি ভরে থাক্!

সে বল্‌ল—"কি ভাবছ?" আমি বল্‌লাম—"স্বপ্ন তুমিও কি আমারই মত মরীচিকার পেছনে সারাদিন ছুটেছিলে?" সে বল্‌ল—"আমি তোমারই সঙ্গে চলে শ্রান্ত হয়ে পড়েছি প্রিয়তম! মরীচিকার পিছনে পিছনে ছুটে নয়। "তার এই অভিমানের করুণ সুরটী আমাকে পাগল করে দিল তার মাথার ওপর ডান হাতখানি রেখে বল্‌লাম "স্বপ্ন, তুমি কি সমস্তক্ষণই আমার কাছে ছিলে? আমি ত তোমায় দেখি নি!"

"তুমি ছিলে আপনার সুখের নেশায় মেতে। সে ঘোর কাটাবার ক্ষমতা ত আমার ছিল না, তাই তোমার আপনা হতে জাগবার মুহূর্ত্তটী পর্য্যন্ত অপেক্ষা করছিলাম। আমি তার মাথাটী আমার তপ্ত বুকে চেপে ধর্‌লাম। পশ্চিমাকাশে তখনও চাঁদের বাঁকা রেখাটী মিলিয়ে যায় নি। প্রভাতের সোনালী আভা অল্পে অল্পে আকাশের গায় ফুটে উঠছে, আমার তন্দ্রার ঘোর তখনও কাটে নি, শুনতে পেলাম কে গাইছে:—

"রাত্রি এসে যেথায় মেশে
　　দিনের পারাবারে
তোমায় আমায় দেখা হল
　　সেই মোহনার ধারে।
সেইখানেতে সাদায় কালোয়
　　মিশে গেছে আঁধার আলোয়
সেইখানেতে ঢেউ উঠেছে এ-পারে ঐ-পারে।"

এবার আমি সম্পূর্ণ জেগে উঠলাম। আমার রাত্রের কথা মনে পড়ে গেল, কৈ কেহ ত নেই! হাত দুটী তখনও আমার বুকে ওপর বেশ শক্ত করে জোড়া ছিল। আমার বেশ মনে হচ্ছে এমনি করে তার মাথাটী আমার বুকে চেপে ধরেছিলাম। সে স্পর্শ যে এখনও আমার দেহে অনুভব করছি।

সেই অপরিচিত গলার মধুর গানটী আমার কানে ভেসে আস্‌ছে :—

"নিতল নীল নীরব মাঝে
বাজ্‌ল গভীর বাণী
নিকষেতে উঠ্‌ল ফুটে
সোনার রেখাখানি!
মুখের পানে তাকাতে যাই
দেখি দেখি দেখ্‌তে না পাই
স্বপন সাথে জড়িয়ে জাগা
কাঁদি আকুল ধারে।"

আমি আকুল হ'য়ে ডেকে উঠ্‌লাম—স্বপ্ন—স্বপ্ন। আর কেহ সাড়া দিল না! ভোরের পাখী আমার চারিদিকের ঝোপের মধ্যে গান গেয়ে উঠ্‌ছে। পাতার আড়াল ঠেলে রবির কিরণ আমার মুখের ওপর এসে পড়্‌ল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। কতকগুলি ঝরা শেফালি আমার বুক হ'তে মাটিতে ছড়িয়ে পড়্‌ল।

শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ।

যাত্রা-পথে।

ঘরের কোণে ঠাঁই মেলেনি তোর,
উধাও হয়ে বাইরে এলি তাই।
বুকজোড়া তোর স্বচ্ছ বারির তৃষা
সাগর জলে মিটবে কভু ভাই?
আকাশ তোরে টানে বাহুর পাশে,
সিন্ধু দোদুল বুক এগিয়ে আসে,
সঙ্গীহারা অসীম পরবাসে
খাঁচার পাখী, মিল্‌বে কি তোর ঠাঁই?

আঁচল পেতে কাট্‌ল কতকাল,
ভিক্ষাঝুলি ভর্‌ল নাক হায় !
চাতকসম আকাশপানে চেয়ে
রইলি বৃথা সজল বরষায় ।
বুকের কথা রইল বুকের তলে,
আঁখির ধারা ঢাক্‌লি হাসির ছলে,
পথ হারালো পথের ধূলার তলে,
যাত্রা এবার কোন্ সে অজানায় ?

ফেনিয়ে ওঠে অসীম স্নেহের ঢেউ,
এটুকু প্রাণ, ধরবে কোথা তায় ?
কান্নাহাসির কূল ছাপায়ে ওই
উথ্‌লে ওঠে অকূল পারাবার ।
বিশ্বজোড়া বিপুল স্নেহরাশি,
পরাণ তবু রইল উপবাসী !
তবু কাঁদে ঘরের কোণের বাঁশী
ঘরহারা ও বক্ষে অনিবার !

একি বাঁধন ! একি মায়ার ছল !
সর্ব্বহারার বিফল হাহাশ্বাস !
পান্থ জনের অন্ধ আকিঞ্চন !
পায়ে পায়ে জড়িয়ে চলা ফাঁস !
ওগো সুদূর অশ্রুঝরা গেহ !
একি নিঠুর রক্তলোভী স্নেহ !
শ্রান্তি-শিথিল অস্থিগড়া দেহ
মরণ-পাশে বাঁধতে অভিলাষ !

•

ছুটে চলিস্ কোন্ আলেয়ার পানে ?
ওরে ভ্রান্ত ! ওরে অধম দীন !
পথ চলার এই ব্যর্থ ছলনায়
পথের মাঝে রইবি গতিহীন ?

বুক-ফাটা তোর তৃষ্ণা যে বুক জুড়ে,
ক্ষ্যাপার মতন মরিস্ কোথায় ঘুরে ?
ভুলে-যাওয়ার ব্যথা করুণ সুরে
কাঁদায় তোরে কাঁদায় নিশিদিন !

কেমন করে সইবি সাগর-দোল,
পাগ্‌লা-ঝোরার আকুল বারিধার ?
ঝড়ো হাওয়ার অধীর মাতামাতি,
নিরুদ্দেশের যাত্রা অনিবার ?—
কোথায় গভীর দীঘির কালোজল,
কোথায় নিবিড় আঁধার গেহতল,
দিবসরাতি নয়ন ছলছল,
পাঁজর-ভাঙা রুদ্ধ হাহাকার !

কে জুড়াবে অগ্নি-দহন-জ্বালা,
চরণ-দলা রক্ত-রাঙা প্রাণ ?
বিশ্বসভার ছন্দ-কলরোলে
শুন্‌বে কে ভাই ভাঙ্গা বুকের গান ?
ওই যে স্নেহের বিপুল ছন্দ তুলি'
মরণ-সিন্ধু উঠ্‌ছে দুলি' দুলি',
সবুজ-সনে নীলের কোলাকুলি,
সেথায় কি তোর যাত্রা অবসান ?

হারিয়ে যাবি অতল সিন্ধুতলে,
ছড়িয়ে যাবি অসীম নীলিমায় !
মিশায়ে রবি হাওয়ার পরশ-মাঝে,
লুকিয়ে রবি আলোক-কণিকায় !
তোর এ কাঁদন বাজ্‌বে সকল সুরে,
তোর এ ব্যথা রইবে আকাশ জুড়ে,
তোর এ তৃষা ফির্‌বে ঘুরে ঘুরে
অশ্রুগড়া ঘরের কিনারায় !

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

ত্রিপুরা রাজ্যে "সধবার একাদশী।"

"সধবার একাদশী" কি "বিধবার দাঁতে মিশি" এই রসিকতা আগরতলায় শিশুকালে শুনিয়াছিলাম। যখন সধবার একাদশী প্রকাশিত হইয়াছিল তখন আমার জন্ম হয় নাই। তখন বীরচন্দ্র ছিলেন যুবরাজ, (De facto ruler). ভ্রাতৃ বিরোধ উপস্থিত হইয়া ত্রিপুরার প্রাচীন সিংহাসন British আদালতের নিকট উপস্থিত হইল,—কে এই সিংহাসনে বসিবে তাহার হকদার ঠিক করিয়া দেয়। রাজ্যভার যুবরাজ বীরচন্দ্র, দায়িত্বজ্ঞানশীল এবং বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ব্রজমোহন ঠাকুর মোক্তারের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন। তিনি তখন বঙ্গভাষার অঙ্কে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কলাবিদ্যাদায়িনী দেবীর নিকট কলাবিদ্যা শিখিতে ছিলেন এবং সঙ্গীত-বিদ্যা আলাপ যথাশাস্ত্র করিতেন। এই সময় দুই কলিকাতাবাসী গুণী আগরতলায় আসিয়া দরবারে আশ্রয় নিলেন। শ্রীনিবাস সার্ব্বভৌম নামক এক ব্যক্তি, যিনি কলিকাতার ঠাকুর-পরিবারের আশ্রিত ও প্রতিপালিত ছিলেন। ইনি একজন সুপণ্ডিত লোক। তাঁহার প্রণীত "কন্দর্পদর্প-সংহার" নামক নাটক এবং "নীতিদর্পণ" নামক সংস্কৃত আইন গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্রস্থ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। অপর ব্যক্তির নাম যজ্ঞেশ্বরবাবু, ইনি সঙ্গীতজ্ঞ এবং অভিনয় কার্য্যে প্রাজ্ঞ ও বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞ ছিলেন। আমার পিতার নিকট তিনি যে সব পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে বুঝা যায় তিনি Political মতের ধার ধারিতেন এবং কলিকাতার সভ্য সামাজিক রঙ্গমঞ্চেও বিশেষ খ্যাত ছিলেন। এমন লোকের দৌহিত্র অর্দ্ধেন্দুবাবু* যে রঙ্গমঞ্চের শীর্ষস্থানে যাইবেন ইহা বিচিত্র নহে। অর্দ্ধেন্দুবাবুর সহিত আমি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচিত হই—জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর "খামখেয়ালী মজলিসে"। তখন তিনি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় লইয়াছেন কিন্তু ঠাকুরবাড়ীর রঙ্গরসের মঞ্চে যে রঙ্গ ও রস দেখাইতেন তাহা এ জীবনে আর ভুলিব না। এই যজ্ঞেশ্বরবাবু যুবক বীরচন্দ্র মাণিক্যের "friend in need" (বিপদের বন্ধু) ছিলেন। শ্রীনিবাস সার্ব্বভৌম স্মার্ত্ত-পণ্ডিত এবং নাট্যকার ছিলেন। এখনও এই "কন্দর্পদর্প-সংহার" যদি কেহ পাঠ করেন তবে বুঝিবেন ৬০ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজদরবারের বঙ্গভাষার অবস্থা কিরূপ উন্নত ছিল। ত্রিপুরার দরবারে এমন মণিকাঞ্চন যুগ আর হইবে কি না বলিতে পারি না।

পিতৃদেব ছিলেন বীরচন্দ্রের মোসাহেব বা A.D.C.; সুরু হইতে আরম্ভ করিয়া রাজসিংহাসনের খবর রাখিতেন। পিতৃদেবের নিকট শুনিয়াছি "কন্দর্পদর্প সংহার" নাটক অভিনয় হইবার পরেই রাজ দরবারে দুটি দল হইয়া, একদল অভিনয় করিয়াছিল "সধবার একাদশী;" অপর দল অভিনয় করিল স্বয়ং বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রণীত "বিধবার দাঁতে মিশি।" শেষোক্ত পুস্তক ছাপা এবং প্রচারিত হয় নাই। বীরচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। তিনি

---

* অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর সুযোগ্য পুত্র ব্যোমকেশ মুস্তফী এক্ষণে স্বর্গে। বঙ্গীয় পরিষদ তাঁহার বিরহে শোক… ব্যোমকেশ বাবুর সহিত আমার পরিচয় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে—রঙ্গমঞ্চে নহে সাহিত্য-… পার্শ্বদেশে। তখন তাঁহার সহিত যজ্ঞেশ্বর বাবুর কাহিনী কত দিন যে আলাপ করিয়াছি। ত্রিপুরা রাজ্যের … সূত্রে সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহা তিনি গর্ব্বসহকারে বলিতেন। তাঁহার নিকট যে কয়খানা বীরচন্দ্র মাণিক্যের … পাইয়াছিলাম তাহা হইতে বুঝিতে পার, বীরচন্দ্র যজ্ঞেশ্বর বাবুকে কি আদরের চক্ষে দেখিতেন।

দ্রব্য অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন এবং বেশ্যাবৃত্তিকে দুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তাঁহার প্রবল শত্রুও
এই দোষে তাঁহাকে দোষী করিতে পারিত না। ইঁহার সময়ে সঙ্গীতজ্ঞ অনেক ব্যক্তি অতিরিক্ত মদ্যপায়ী
বলিয়া দরবার হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। জনৈক সুপ্রসিদ্ধ ওস্তাদ বাদ্যকর দুশ্চরিত্র হইয়া রাজধানীতে
বেনামী হইয়া পড়িয়াছিল। এ সংবাদ বীরচন্দ্রের কর্ণকুহরে প্রবেশমাত্র তিনি তাহাকে কান মলিয়া তাড়াইয়া দিয়া-
ছিলেন। বীরচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল এই মদ্যপান মহাপাপ হইতে সমাজকে উদ্ধার করা। এই সধবার একাদশী অভিনয়
করিয়া তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা যাহা সমাজকে দেখাইলেন তাহা দ্বারা তাঁহার দরবারে পানদোষ বর্জ্জিত লোকের সমাগম
হইয়াছিল। আমার খুব মনে আছে, শিশুকালে শুনিয়াছিলাম আমার মাতুল শরৎচন্দ্র লস্কর (হাজারি)
সাজিয়াছিলেন—সধবার একাদশীর বাঙ্গাল রাম মাণিক্য। তিনি যে প্রথম শ্রেণীর অভিনয় করিতে পারিতেন তাহা
আমার জানা আছে। তিনি জামাইবারিকের জামাই সাজিয়া নাচিতে নাচিতে চামর হাতে মাণিক-
পীরের গান গাইতেন। তেমন অভিনয় কলিকাতার রঙ্গমঞ্চেও দেখি নাই। কিন্তু একটা বিষয়ে মাতুল
মহাশয়ের সহিত আমার রসিক খুল্লতাতদের "ভাগ্যধরী"কে লইয়া একটা ঠাট্টা তামাসা চলিত। কারণ
মাতুল ছিলেন শ্রীহট্টবাসী, এজন্য তামাসা হইত। কিন্তু একদিন কিছু বাড়াবাড়ী হইয়া গিয়াছিল।
মাতুল মহাশয় আমাদের বৈঠকখানায় বসিয়া রামমাণিক্যের অভিনয় করিতেছিলেন। তখন আমরা বয়সে
বালক; চুপিদিয়া তামাসা দেখিতেছি। মাতুল মহাশয় যখন প্রাদেশিক ভাষায় তান ধরিয়াছিলেন তখন
হঠাৎ দেখা গেল রঙ্গমঞ্চে একটী লোকের প্রবেশ ও মাতুলের মস্তকে লগুড়াঘাত; মাতুল মহাশয়
রক্তাক্ত কলেবরে ভূমিতে চিৎপাৎ! আর পাশের বাড়ীর মোক্তার বাবু শ্রীপাট বিক্রমপুরবাসী নবকৃষ্ণ
চট্টোপাধ্যায় মাতাল অবস্থায় লগুড় হস্তে শাসাইতেছেন "আর নি তোরা বিক্রমপুর পুরীরে নিন্দা করবা?"
বড় খুড়া অবস্থা দেখিয়া মনে করিলেন এ-ত real tragedy. এক লম্ফে চৌকি হইতে নামিয়া মাতাল
ব্রাহ্মণের গণ্ডে এক চপেটাঘাত। লগুড়খানা কাড়িয়া লইয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে এমন আঘাত করিয়া
ছিলেন যে তিনি তিন দিন পর্য্যন্ত শয্যাগত ছিলেন। লগুড়াঘাতে মোক্তার মহাশয়ও ভূমিসাৎ হইয়াছিলেন, কিন্তু
মাতাল উত্থানশক্তি রহিত। খুড়ামহাশয় দয়াপরবশ হইয়া মাতালটাকে ধরিয়া তুলিলেন এবং "right about
turn" বলিয়া ঘুরাইয়াদিলেন এবং অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া তাঁহাকে Millitary হুকুম দিলেন "Quick march," কিন্তু
পরে কাকাকে অনুশোচনা করিতে হইয়াছিল। ব্রাহ্মণকে চপেটাঘাত করার কথা সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল।
মাঝে মাঝে রাস্তায় এই মাতালকে দেখিতে পাইলেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন "শ্রীপাট' হ'তে এলে নাকি?"
মাতাল বামুন চটিয়া আগুন হইয়া যাইত। আগরতলায় রাজগুরুর বাড়ী "শ্রীপাট" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।
এই শ্রীপাটে তিনি মোক্তারী করিতেন, কিন্তু মাতাল বলিয়া তাড়িত হইয়াছিলেন এবং এজন্য কিছু উত্তম মধ্যম
পাইয়াছিলেন। আমাদের দরবারের অনেক Door ছিল। মাঝে মাঝে দরবারচাটা কর্ম্মচারীগণ খিড়কীর দরজা
(Back door) দিয়া দরবারে যাইয়া নানা জঞ্জাল ঘটাইত। এ শ্রেণীর কর্ম্মচারীগণকে খুড়া মহাশয় দু'চক্ষে দেখিতে
পারিতেন না। কোন এক কারণে একটী ব্রাহ্মণ Back door-দরবারীকে তিনি প্রথমে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া
গণ্ডদেশে চপটাঘাত করিয়াছিলেন। কৈফিয়ত দিতেন,--ব্রাহ্মণ, তাই প্রণাম করিয়াছিলাম সর্ব্বাগ্রে। সধবার একাদশী
অভিনয়ে রাম মাণিক্যের 'পার্ট' দেখিয়া মোক্তার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পিতৃদেবের নিকট নালিশ করিয়াছিলেন।
তিনি বলিয়াছিলেন—"তুমি কেবল 'রাম মাণিক্য' এবং 'বাগ্যধরার' চরিত্রই দেখিলে, আর বুঝি মাতালের
দুর্দ্দশা দেখিতে পাও নাই? তুমি মদ ছাড়; সাদা চোখে দেখলেই ঠিক দেখিবে।"

কোন দিন ত্রিপুরা রাজ্যে "সধবার একাদশী" অশ্লীল বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। দীনবন্ধু মিত্রের রসের কর্ত্তা ব্যতীত অন্য কোন রসিকতা হইতে পারিত না। বীরচন্দ্র মাণিক্যের কালে এ ধারণা ছিল। ইহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি যে দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন ছাড়া অন্য প্রহসন আগরতলায় রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে পারিত না। ১৯০০ খৃঃ অব্দে আগরতলায় এক ব্যবসাদারী Theatre Company আসিয়াছিল, বর্ত্তমান মহারাজার বিবাহ কালে। আগরতলায় এমন রসিক পুরুষ অনেক আছেন, যাঁহারা কোন দিন রাজধানী-সহরের সীমা উল্লঙ্ঘন করেন নাই অথচ রসিকতায় রসিক। ১৮৯৭ সালে ষ্টার থিয়েটার যখন সর্ব্বপ্রথম আমাদের দেশে আসে তখন তাহার অভিনয় দেখিয়া আগরতলাবাসী কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। বীরচন্দ্রের সময়ে মাতুল মহাশয় এবং আমার বৈবাহিক আনন্দ-মোহন ঠাকুর (সম্প্রতি মারা গিয়াছেন, তখন তাঁহার বয়স ১৫।১৬ বৎসর ছিল) সাজিতেন রামমানিক্য ও কাঞ্চন। আগরতলার দর্শকবৃন্দ ইহাদিগকে দেখাইয়া বলাবলি করিতেন "এই কাঞ্চন ঘেমটাওয়ালি ও রাম মাণিক্যের মত আর কখনও হইবে না।" ব্যবসাদারী অভিনেত্রীদিগকে দেখিয়া বৃদ্ধের দল বলিয়াছিলেন "পাউডার মাখা কৃষ্ণ কখনও দেখি নাই। বাজারের অভিনেত্রী অভিনয় কার্য্যে কি করিয়া গৌরব লাভ করিতে পারে? আমাদের কাঞ্চন ঘেমটাওয়ালি রঙ্গমঞ্চের নর্ত্তকী হইতেও টেক্কা দিয়াছিল।" আর আমাদের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিতেন "টাকা দিয়া সং দেখিতে চায় যাহারা, তাহাদের রুচি আমাদের রুচি হইতে ভিন্ন।" মেয়ে-মহলে সধবার একাদশী অন্তকার দিনেও হাতে হাতে দেখা যায়। "বিধবার দাঁতে মিশি" বীরচন্দ্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন—কতকগুলি সামাজিক চিত্র দেখাইবার জন্য। সেই অভিনয় দেখিয়া অনেকে এমনই দাগা পাইয়াছিল যে যুবতী বিধবা-গণ মাথার চুল পর্য্যন্ত মুড়াইয়া ফেলিয়াছিল। বীরচন্দ্র মানিক্যের চরিত্রচিত্র যদি কেহ উদ্ঘাটন করে তাহা হইলে বুঝা যাইবে এই চিত্র ভগবৎ কৃপায় অঙ্কিত। আট বৎসর পর্য্যন্ত তিনি যুবরাজ ছিলেন, কিন্তু এই দীর্ঘ কাল তিনি বৃথা অতিবাহিত করেন নাই। তিনি আট বৎসর যাবৎ ভবিষ্যৎ জীবন-পথের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি যদি আজ জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে "সধবার একাদশী" পড়িলে পাপ হয় একথা শুনিলে তিনি হাসিতেন কি কাঁদিতেন বলিতে পারি না। তবে লেখক পররাষ্ট্রবাসী স্বাধীন প্রজা। লেখকের অবস্থা বেশ মজার। তামাসা দেখিতেছি—British Indian Association পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার একটা খেলাসা হইতে পারে। I am watching the game এবং সধবার একাদশীর প্রথম সংস্করণখানা লইয়া নিজেই পাঠ করিয়া যাইতেছি, রস পাইয়াছি পূর্ণমাত্রায়, কষ পুলিশের হাতে পড়িয়া কাল হইয়া যাইতেছে। পাঠ্যজীবনে কুমিল্লায় সধবার একাদশী লইয়া এ পক্ষকে একখানা প্রহসন বিচারে পড়িতে হইয়াছিল, সে এক রুচিবাগীশের হিন্দু মাষ্টার মহাশয়ের কৃপায়। যে বিপদ হইতে এই স্বাধীন দেশবাসী ছাত্র বলিয়াই রক্ষা পাইয়াছিলাম। কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট Mr. Skrine আমাদের Political Agent ছিলেন। তাঁহার নিকট আমি অভিযোগ করিলাম রুচিবাগীশের ভিন্নরুচির দরুণ ভিন্ন দেশীয় (foreign-country) লোক মারা যাইতে পারে না। Skrine সাহেব বাঙ্গলা জানিতেন এবং দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থের পক্ষপাতী ছিলেন। সধবার একাদশী হাতে লইয়া তিনি তখন বলিয়াছিলেন—"তুমি যখন বাঙ্গলা বুঝ না এবং জান না তখন তোমার লজ্জা বোধ হওয়া উচিত।" ইহার পর আমাদের কোন কথাই বলা উচিত নয়। সব চেয়ে ভাল 'চুপ', কিন্তু সধবার একাদশী চুপ করিতে

দিবে না। যে পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা জীবিত থাকিবে দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী" অক্ষয় থাকিবে।* মরিয়া গেলেও বঙ্গবাসীগণ একাদশী পালন করিবে দীনবন্ধুর নামে।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

আশয়।

ওগো প্রিয়তম,

কতই সজ্জা অঙ্গে আমার
পরালে,
কখন বা রাণী কভু কাঙ্গালিনী
সাজালে;
ভুবন-রঙ্গ-মঞ্চে তোমার
কত অভিনয় করালে!

ঘুরায়ে ফিরায়ে এ জীবন ছবি
হেরিছ,
রঙে রঙে হায় কত তুলিকায়
আঁকিছ;
পুরাতন পুন মুছিয়া সে সবি
নব অঙ্কন করিছ।

সোহাগে আমারে কত না দহনে
দহিছ,
তব শ্রীচরণ- যোগ্য ভূষণ
গড়িছ;
শূন্য করিয়া পূর্ণ জীবন
সম্পদে নব ভরিছ।

---

* সৌভাগ্যের বিষয় সধবার-একাদশী রুচিবাগীশের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। আশ্চর্য্য, সধবার-একাদশীর ন্যায় গ্রন্থকেও পরীক্ষার দায়ে ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতে হইয়াছিল! রস ও রুচির বিবাদে সাহিত্য সংহারটা যত কম হয় তাহাই বাঞ্ছনীয় নহে কি? কোন গ্রন্থকে, বিশেষতঃ পুরাতন পরিচিত গ্রন্থকে চিরনির্ব্বাসিত করিবার পূর্ব্বে বিশেষজ্ঞ সাহিত্যিকগণের পরামর্শ গ্রহণ করিলে এ সকল প্রহসন অভিনীত হইয়া বিকট হাস্যরসের অবতারণার কারণ হয় না। সঃ।

এমনি কি খেলা তুমি অমরণ
করিবে,
করিয়া চূর্ণ আবার পূর্ণ
গড়িবে ;
রিক্ত করিয়া তিক্ত জীবন
নব নব রসে ভরিবে।

শ্রীশকুন্তলা দেবী।

ঝি।

একটা ঝির আস্পর্দ্ধা যে এতদূর বাড়িয়া যাইতে পারে, বাড়ীর লোক কেন, সারা পল্লীর লোকেও সেটা কোন ক্রমেই ভাবিতে পারিত না। সে ছিল অনেক দিনের পুরাতন ঝি; তাই বলিয়া এতটা আবদার, এতটা অভিমান, এতটা স্পর্দ্ধা যে বাড়ীর আবালবৃদ্ধবনিতাকে নীরবে সহ্য করিয়া যাইতে হইবে এ কোন কথা! যদি কোন প্রকারে তাহার অবৈধ অত্যাচার সকল তাহার কর্ম্মকুশলতা গুণে সহ্য করা যাইতে পারিত কিন্তু একেবারে অসহ্য ছিল তাহার সদা সপ্তমে চড়া গলাটী। সে যখন কোন একটা নিতান্ত গোপনীয় কথা বলিতে আরম্ভ করিত তখন মানুষের বুক ত দূরের কথা প্রাণহীন বাড়ীর এক একখানা ইট পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিত। আর মানুষের দেহটা ত রক্তমাংসের! তথাপি তাহাকে কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করাত দূরের কথা, কল্পনা করিতে পারিত না।

মোকররী সত্বের মত 'রামুর মা'র দখলি সত্বটা যে সুদৃঢ় হইয়াছিল বাড়ীর গিন্নী মাও তাহা বুঝিতে পারিতেন না। তবে তাঁহারই শৈথিল্য দোষে সে যে এতখানি উপরে উঠিয়া গিয়াছিল, তাহা তাঁহার উপযুক্ত পুত্রেরা বলিত 'রামুর মা' তাহাকে 'পরোয়া' বড় কমই করিত। এমন কি সে সময়ে অসময়ে সকলকে শুনাইয়া বলিত "এমন ঝি কত ভাগ্যে মিলে, যারা পেয়েছে তারা 'বর্তে' গেছে।"

রামুর মার কথাটার ভেতর যে কোন স্বার্থকতা ছিল না, একথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। সে মুখে যাহা বলুক না কেন, তাহার গলাখানা যতই উপরে উঠুক না কেন, হৃদয়খানা ছিল ঠিক একখানা আয়নার মত।

কলিকতার ঝি'র নাম শুনিলে যেমন ঘৃণায় মুখ আপনি বিকৃত ভাব ধারণ করে, রামুর মা'তে সে সব কিছুই ছিল না। তাহার সদা সপ্তমে চড়া গলাটীকে বাদ দিয়া যদি তাহার কাজের কথা ধরা যাইত, তবে যথার্থই তাহাকে ঝির আসন হইতে অনেকখানি উচ্চে স্থান দেওয়া যাইতে পারিত। সে ছিল রোগশয্যার জননী, সন্তান পালনে সুদক্ষ ধাত্রী, গৃহকার্য্যে মূর্ত্তিমতী কর্ম্মদেবী, আলাপে মার্জ্জিতরুচি-হাস্যময়ী হিন্দুনারী—কিন্তু কর্ম্মে বেতনভোগী।

এই কথাতেই রামুর মা'র সম্যক পরিচয় শেষ হয় না। বাহুল্য করিয়া না বলিলেও এইখানে একটা কথা বলিলে বোধহয় অবৈধ হইবে না, এবং না বলিলেও বোধহয় কোন একটা সত্যের অপহানী হইয়া যায়। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে রামুর মার এমন বয়স ছিল না যে তাহার সম্বন্ধে পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা দুই একটা বিশ্রী কথার অবতরণা করিয়া হাসিতে পারিত। যখন তাহার বয়স কাঁচা পাকার মাঝামাঝি স্থানে ছিল, সে আজ অনেক দিনের কথা, তখন সে সবে পাঁচ ছয় মাস বিধবা হইয়াছে, কোলে পাঁচ বৎসরের রাম; তারপর দশ বৎসরের হইয়া দুষ্ট রাম তাহাকে ফাঁকি দিয় চলিয়া গিয়াছে। সেই হইতে সে পুত্রকে জন্মের মত বিদায় দিয়া আরো দশটা বৎসর বিপুল বিক্রমে বোস পরিবারে ঝির কাজ করিয়া আসিতেছে। সুতরাং তার ঝি'র পদটা যে মোকররীর মত ক্ষমতা সম্পন্ন হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এক একটা করিয়া সে এই বাড়ীর পাঁচ ছয়টা ছেলেকে মানুষ করিয়াছে, বিবাহের অধিবাস হইতে তাহাদের ছেলের অন্নপ্রাশনে পর্য্যন্ত কর্তৃত্ব করিয়াছে। সুতরাং তাহার উপর একটা উঁচু কথা বলে এমন শক্তি কার আছে! আর কোন অবোধই যদি তা বলে রামুর মাকে নির্ব্বিবাদে সহ্য করিতে হইবে তাহারই বা কোন অর্থ আছে। রামুর মা তাহার বহুদিনের পুরাতন মনিব ছাড়িতে পারে, কোলে পিঠে করে মানুষ করা ছেলে মেয়েদের উপর অপত্য স্নেহটা নিমিষে ভুলিয়া যাতে পারে কিন্তু কাহারো "উঁচু কথা" বা "হাত নাড়া" সহ্য করিতে পারে না, তাহার স্বভাবটা ছিল এই রকমের।

(২)

ছোট ছেলে ধীরেন আসিয়া যেদিন যখন গিন্নীমার নিকট নালিস করিয়া বলিল যে রামুর মাকে না ছাড়াইলে আর খাতির থাকে না তখন গিন্নীমা'র মাথার উপর যেন আকাশের কতক খানা ভাঙ্গিয়া পড়িল। রামুর মা ছিল তাঁহার দক্ষিণ হস্ত! যখন তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী ইহধাম ত্যাগ করিয়া সমস্ত সংসারটা অপরিণত বয়সে তাঁহার উপর ফেলিয়া দিয়া যান, তখন হইতে রামুর মা উত্তরসাধিকার মত তাঁহাকে সমস্ত সংসার কর্ম্মে উৎসাহিত ও নিয়োজিত করিয়া আসিতেছে। আজ সেই রামুর মাকে কিনা বিতাড়িত করিতে হইবে! তাছাড়া তাহাকে যে তিনি ঝির মত দেখিতেন না। নিজের সহোদরার ন্যায় হাসি ঠাট্টা গল্প ইত্যাদি করিয়া আসিতেছেন। গিন্নী পুত্রের কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষন নীরবে থাকিয়া বলিলেন—"তা কেমন ক'রে হবে ধীরু! আমিও যতদিন এ বাড়ীতে ও-ও ততদিন। আমি মরে গেলে তোরা যা হয় করিস্ বাপু। আর বিনা দোষে একটা মানুষকে—বিশেষতঃ এতদিনের একটা পুরনো ঝিকে আমি জবাব দিতে পার্ব্ব না" ধীরেন্দ্র একটু উত্তেজিত ভাবে ব'লল বিনা অপরাধে আর কি? তোমার চোখেত ওর সবই গুণ। ঝি চাকরকে এমনি ভাবে মাথায় তুলে দিয়েছ যে যাদের অত্যাচারে ভদ্র লোকের সুমুখে হেঁট মাথা হ'য়ে যেতে হয়। পুরাণো হ'য়েছে, নূতন হ'লে কি এমনি করে—" এমন সময়ে কোথা হইতে ঘূর্ণবায়ুর মত রামুর মা গৃহে প্রবেশ করিয়া মাতাপুত্রের চক্ষে একটু চমক লাগাইয়া দিল। উভয়েই নীরব।

রামুর মা গলাটা বেশ করিয়া ঝাড়িয়া লইয়া বলিল "কেন গো ধীরেন বাবু! আমার জন্যে তোমার আবার মাথা কোথায় হেঁট হ'লো? যাঁর জন্যে চুরি কার সেই বলে চোর! মরি আর কি!" তারপর গিন্নীর দিকে ফিরিয়া বলিল "বেশ ত মা'য়ে পো'য়ে আর বিবাদ কেন বাপু! তোমার ছেলের যখন এত দিন পরে খোকা হ'তে বাবু বনে আমার অপছন্দ হচ্ছে, তুমি নিজে হ'তে আমায় জবাব দাও, আমি চলে

যাচ্ছি।" বলিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া আবার তেমনি কণ্ঠে আরম্ভ করিল—"হাঁ! মা, কথাটা যখন উঠেছে তখন তোমাকে বলেই যাই—এতখানা রাত্রি আর ছেলে কিনা গায়ে একখানা রেপার নিয়ে এই পোষের দিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প কচ্ছিলো। আমি কিনা তাই বল্লাম, এতখানা রাত্তির, হিম লাগবে কি হচ্ছে বাড়ী যাও ধীরেন, অসুখ কর্বে! অপরাধ ত আমার এই। কোলে পিঠে করে মানুষ করেই তাইতে আমার এত দরদ—! বলিয়া সে গৃহ হইতে হন্‌হন শব্দে বাহির হইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই নীচ হইতে রামুর মা'র কণ্ঠ শুনিতে পাওয়া গেল সে তাহার সহকর্মিনী ঝিকে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "কাল হ'তে আমার জবাব।" বলিয়া তাহার জন্য সজ্জিত যে সব জিনিষ ছিল একে একে টান মারিয়া ফেলিতে লাগিল। আর বলিতে লাগিল—"নে পোড়ার মুখা! তোদের জিনিষ পত্তর তোরা গুছিয়ে নে। আমার সঙ্গে তোদের আর সম্পর্ক কি? সহকারিনী ঝি তাহার কথা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে কেবল কবে কয়দিন আসিয়াছে মাত্র। রামুর মা'র মুখের প্রতি সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। রাগে রামু মা'র শরীরটা তখনো থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। সে ঝিকে এবম্বিধ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সজোরে তাহার গণ্ডে একটা ঠোকনা মারিয়া বলিল—"চেয়ে কি দেখছিস্ অভাগীর বেটী, জিনিষ পত্তর গুনে নে, রাত্তিরটার পরে আমি আর থাকচি নে।"

(৩)

সকালবেলায় সেই সবে গিন্নীমা সন্ধ্যা আহ্নিক সারিয়া উঠিয়া বারেন্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন,—এমন সময়ে রামুর মা আসিয়া গলাটা বেশ একটু গরম করিয়া বলিল—"তা হ'লে আজ হ'তে আমার কাজে জবাব?" কথাটি শুনিয়া গিন্নীমা থতমত হইয়া গেলেন। তারপর তাঁহার মুখের পানে কয়েক মুহূর্ত তাকাইয়া থাকিয়া আকাশের পানে চাহিয়া বলিলেন "আমি জানি না বাছা, তোর যা ইচ্ছে হয় কর। রামুর মা বলিল "তুমি হ'লে বাড়ীর গিন্নী, তুমি না বল্লে কেমন ক'রে তোমার ঘর ছেড়ে যাই বল? আমরা হ'লাম গরিব লোক গতর খাটিয়ে খাই, কাল যদি তোমার ছেলে চুরীর দাবী ক'রে আমায় জেলে দেয়?" গিন্নী মার আঁখি দুটো ছলছল করিয়া আসিতেছিল,—রামুর মা'র কথা শুনিয়া কোন প্রকারে হৃদয়ের আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিল না। যে রামুর মা আজ পনেরটা বৎসর ধরিয়া সহোদরার মত দিবারাত্র সহায় হইয়া সংসারকে আগলাইয়া তুলিয়াছে,—সে কিনা একটা সামান্য কথায় অভিমান করিয়া চলিয়া যাইতে চায়! তিনি আর ভাবিতে পারিলেন না। গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া আসিতে লাগিল। তিনি দ্রুত পদে গৃহ মধ্যে ঢুকিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন—"তোর হাতের ছেলে তোকে জেলে দেয় যদি যাবি। আমি তার কি কর্ব!"

রামুর মা যখন দেখিল—তাহার জবাব পত্র গৃহীত হইল না তখন ধীরে ধীরে নীচে আসিয়া ভাঁড়ার খুলিয়া তরকারী বাহির করিয়া কুটনো কুটিতে বসিল। সারা দিনটা সে বর্ষার মেঘের মত গম্ভীর হইয়া রহিল। ডাকিল না—হাঁকিল না। স্থির ধীর গম্ভীর ভাবে কলের পুতুলের মত কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। যাহার হাত চলিবার পূর্ব্বে মুখ যন্ত্রের মত চলিত তাহার মুখ আজ মূক। বাড়ীর অপর সকলে বুঝিল কদাকার ধীরেন বাবুর কথায় রামুর মা'র চেতনা হইয়াছে। কিন্তু গিন্নী মা বুঝিলেন ঠিক তার বিপরীত।

গভীর গাম্ভীর্য্যের পর ঝটিকা উত্থিত হ'লে সারা বিশ্বটা যেমন ত্রস্ত হইয়া পড়ে রামুর মা'র একদিনের মৌনাবলম্বনের ফলে তাহার পর দিন বোস বাড়ীটা একেবারে বিকম্পিত হইয়া উঠিল। প্রাতঃকালে সে যখন আসিয়া

দেখিল যে গোশালা হইতে তখনো গরুগুলো বাহির করা হয় নাই—তখন সে হুঙ্কার ছাড়িয়া একদিনের সঞ্চিত কণ্ঠ স্বরকে সজাগ করিয়া সহকর্মিনী ঝি এবং চাকরদের বাহার পুরুষের উপর আরো দুই চারিটা পুরুষকে টানিয়া আনিয়া উত্তম মধ্যমের ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিল। এক দিনের নিদ্রিত বাড়ীটা আবার সজাগ হইয়া উঠিল। একদিনের শান্ত ভাবের ফলে রামুর মা সে দিন সামান্য একটু খুঁটিনাটি লইয়া এরূপ ভাবে কণ্ঠ চড়াইতে আরম্ভ করিল যে সমস্ত পাড়াটা পর্য্যন্ত অজানা ভীতিতে আকুল হইয়া পড়িল।

রামুর মা'র রাগটা যে কেবল তাহার সহকর্মিণী ঝি এবং চাকরের উপর পড়িয়াছিল তাহা নহে। অনেক ক্ষেত্রে তাহা কুল ছাপাইয়া গিন্নীমা ও তাঁহার সন্তানদের উপর গিয়া পড়িতেছিল। গিন্নী মা'র এসকল ব্যাপার সহিয়া গিয়াছিল। আজ পনেরটা বৎসর তিনি রামুরমা'র স্বভাবটা বেশ করিয়া সমঝিয়া লইয়াছিলেন। এবং সেই সমঝানর ফলে তিনি বেশ করিয়া জানিয়া ছিলেন যে তাহার সহিত কথা কাটাকাটি করিলে একটা অনর্থকে আহ্বান করা হয়। তাই তিনি বুঝিয়া সুঝিয়া তাহার কথার কোন প্রতিবাদ করিতেন না। নীরবে তাহার তাণ্ডব নৃত্য সহ্য করিয়া যাইতেন। তিনি জানিতেন সে নরমের গোলাম গরমের যম। একটু নরম করিয়া বলিলে সে দশ জনের কাজ একা শেষ করিতে পারে—আর হুকুমের কণ্ঠে বলিলে, কাজ হওয়া ত দূরের কথা তাহার হুঙ্কারে প্রলয়ের ভীতি জাগাইয়া দেয়।

রামুর মা বলিল—"হ্যাঁগো—গেরস্তালীটা আমার না তোমার?" গিন্নীমা বলিলেন "এতদিন পরে আজ আবার সে কথাটা তোকে বুঝিয়ে দিতে হবে রামুর মা?" রামুর মা বলিল "সে সব কথা রাখ মা। এবাড়ীর সবাই যে 'হাম বড়'—তুমি হ'লে এবাড়ীর গিন্নী, ঝি চাকরকে বকিয়ে শুনিয়ে কাজ আদায় করবে, সে বেলা তা কোথা গেল—" "তুই কি ক্ষেপে আছিস?" বলিয়া তিনি হস্তস্থিত রামায়ণখানার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। রামুর মা চীৎকার করিয়া বলিল "মরণ—। বলি আজ আমি যে দু'দিন ধরে ঝাঁট দিতে যেতে পাই নি, সেটা কি ঐ অভাগীর বেটা বেটীদের দেখতে নেই? খাবার সময় ভাতের পালায় বেড়াল তাড়াতে পারে না—আর কাজের সময় মরা-আরসুলা! মরণ আর কি সব! তোমার ঘরকন্না তুমি দেখে নাও মা, এত কাজ আমায় দিয়ে হয়ে উঠবে না। আর সে গতর নেই, সে বল নেই, আছে কেবল সেই কাঁসার শব্দের মত গলাটা, তাও সকলের অসহ্য হ'য়ে পড়ছে।" বলিয়া দ্রুত গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

গিন্নীমা পুস্তকের উপর চক্ষু নিবিষ্ট করিয়াই বলিলেন—"শুনে যা রামুর মা—", রামুর মা গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল "আমি সত্যি সত্যিই বলছি মা আমায় দিয়ে আর কাজ কর্ম্ম হবে না। তোমাদের মনের মত লোক দেখে শুনে নাও।" গিন্নীমা পুস্তকখানা মাদুরের উপর সশব্দে ফেলিয়া দিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"তোর কি হয়েছে বল দেখি রামুর মা, সামান্য একটা কথা নিয়ে দিন রাত খুঁটি নাটি করলে কেমন করে সংসার চলে! ধীরে আবার ছেলে, তার উপর এতটা রাগ করলে যে তাকে অভিসম্পাৎ করা হয়। আমি তাদের পেটে ধরেছি,—তুই তাদের মানুষ করেছিস; তার উপর তোর দাবীটা আমার চেয়ে ঢের বেশী। তুই যদি এ সংসার নিয়ে আর আমাকে না পারিস্, তবে চল আমরা দু'জনে কাশী চলে যাই, ওরা মরুক আর বাঁচুক দেখবার দরকার নেই।"

অন্য দিন এ কথাটা হইলে রামুর মা গলিয়া জল হইয়া যাইত। কিন্তু আজ তাহার ভিতর একটা নূতন অভিযোগের সুর আলাপ করিতেছিল। সে তেমনি কণ্ঠে বলিল—"ধীরে! ধীরে আবার মানুষ। তার কথায়

ত আমি এখুনি বাড়ী ছেড়ে গেলাম আর কি? যাকে বুক ক'রে মানুষ কর্ত্তে পেরেছি তার দু'টো লাথিও খেতে পারি। কিন্তু ঐ অভাগীর বেটা, আঁটকুড়ের বেটা, নিঃবংশের বেটা, চামারের বেটা, ধনা হতচ্ছারার কথা কেন সৈব গা—। যত বড় মুখ তত বড় কথা! সে কিনা বলে "রামুর মা মুখ সাম্লে কথা বলো বাপ তুলে কথা বল্লে তোমার একদিন কি আমার একদিন!" বাপ তুলে কথা বল্বো না! যত কুঁড়ে যত আবাগীর বেটা বেটীরা এখানে এসে ভাতের ধ্বংশ কর্ব্বেন, আরে মর শালী তুই দিন রাত খেটে। কিসের এ দায় গা—!" গিন্নীমা বলিলেন—"চুপ্ কর বাছা এর ব্যবস্থা যখন ইচ্ছে কল্লেই কর্তে পারিস্ তখন তোর এত বক্তে যাবার কি দরকার ছিলো?" রামুর মা গলাটা না নামাইয়া বলিল "ও বাবা! তার আবার জো আছে! ধনকৃষ্ণ হ'লেন খোকাবাবুর পেয়ারের চাকর!" "আচ্ছা আচ্ছা তার ব্যবস্থা আমি কর্ব্ব এখন, তুই নীচে গিয়ে কাজ কর্গে যা—" বলিয়া গিন্নীমা পুস্তকখানা তুলিয়া লইলেন।

সে দিনকার কাণ্ডটা একটু অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছিল। বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছে; রামুর মা উপরের কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া নীচে আসিয়া দেখিল ধনা একটা ভাঙ্গা খাটের উপর শয়ন করিয়া বেশ আরামে নিদ্রা যাইতেছে। রামুর মা'র সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। এই ঘটনাটা গতবার পূর্ব্বে হইলে বোধ হয় এতটা জ্বলিয়া উঠিত না। অন্য কথাটাও তাহার মনের মধ্যে উদয় হইতে পারিত। কিন্তু যেদিন হইতে সে "ছোট মুখে বড় কথা" বলিয়াছে, সে দিন হইতে সে তাহার শাস্তির সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছে; তাহার উপর সে গত রাত্রে স্বচক্ষে তাহাকে এমন একটা দোষনীয় কাজ করিতে দেখিয়াছে, এবং সেটাও যদি খোঁড়া পায়ে খোঁচা লাগার মত তাহারই চক্ষে না পড়িত তবে বোধ হয় আজিকার শাস্তিটা এত গুরুতর না হইয়া কিছু লঘুও হইতে পারিত। সে কিনা কাল রাত ন'টার সময় সতের বছরের ছেলে ধীরেনকে চুরুট কিনে এনে দিয়ে তার পরকালের পথটা একেবারে পরিষ্কার কর্ত্তে বসেছে! হতচ্ছাড়া গেঁজেল হারামজাদার কি না দুধের ছেলেকে চুরুট এনে দেওয়া! এতগুলো রাগ সে কোন প্রাণে হজম করবে! সমার্জ্জনীটা হাতেই ছিল, ঝড়ের মত গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে নিদ্রিত ধনকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশে বসাইতে বসাইতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"গতর কুঁড়ে হতচ্ছারা বাড়ী হ'তে দূর হ'য়ে যা।" নিদ্রিত ধনকৃষ্ণের নিদ্রা সে অভিনব স্পর্শে কোথায় চলিয়া গেল। সে ব্যাপারটা প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিল না। থতমত ভাবে উঠিয়া বসিল। তার পর ক্রুদ্ধ বিক্রমে স্বীয় শয্যা ত্যাগ করিয়া দৃঢ় মুষ্টে রামুর মা'র চুলের গোছা ধরিয়া বিরাশী শিক্কার ওজনে এমনি গোটা কতক কিল রামুর মা'র পৃষ্ঠে বসাইল যে সে একেবারে মাটির উপর পড়িয়া উৎকট কণ্ঠে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, এবং সে চীৎকারে পাড়ার সমস্ত লোক আসিয়া বাটীর মধ্যে একটা বিপুল জনতার সৃজন করিল। গিন্নী মা ব্যাপারটা কি বুঝিতে পারিলেন না,—কেবল দেখিলেন ধনকৃষ্ণের রুদ্রমূর্ত্তি, আর শুনিলেন রামুর মা'র অভিনব আর্ত্তনাদ!

ব্যাপারটার ফলে,—দাঁড়াইল ধনকৃষ্ণ চাকরী হইতে বিতাড়িত হইল; আর রামুর মা, স্বেচ্ছায় তাহার পঁচিশ বছরের পুরাতন মুনিব ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

(৪)

গোটা একটা মাস অতীত হইয়া গেল। রামুর মা ভ্রমক্রমেও বোস বাড়ীর পথটা মাড়াইল না দেখিয়া গিন্নীমা বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন রামুর মা কোন ক্রমেই আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিবে না। সে অনেক বার ঝগড়া করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে—আবার এক দিন যাইতে না যাইতে আপনিই ফিরিবে

বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরিত্যক্ত আসনটা দখল করিয়া লইয়াছে, ডাকিতে হাঁকিতে কাহাকেও যাইতে হয় নাই। বেতন বৃদ্ধির প্রলোভন দেখাইতে হয় নাই, কিন্তু এবারে ডাকের উপর চারিটী ডাক গিয়াছে পাঁচ টাকার উপর সাত টাকা স্বীকার করা হইয়াছে তবুও রামুর মা জোরের সহিত বলিয়াছে যে টাকার প্রলোভনে রামুর মা মান খোয়াতে যায় না। মাতার অনুরোধে সেদিন ধীরেন স্বয়ং ডাকিতে গিয়া তাহার নিকট হইতে যে কথা শুনিয়া আসিয়াছে তাহাতে তাহার মনে হইয়াছিল যে দুর্ব্বলতাকে বেশ করিয়া জব্দ করে।

একটা ঝি পলায়নের শোকটা যে এত গুরুতর ভাবে গিন্নিমাকে আঘাত দিবে, বাড়ীর লোক তাহা কোন দিন অনুমানও করে নাই। বাটীর বিধবা মেয়ের হাতে সংসারের ভারটা দিয়া গৃহিণী নিশ্চিন্ত হয়েন গিন্নীমাও তেমনি রামুর মার হাতে সংসারটী সঁপিয়া দিয়া সংসার হইতে নিজকে অনেকখানি দূরে লইয়া গিয়া পরমার্থের পথ অন্বেষণে তৎপর. কিন্তু যখন তাঁহার সাজান সংসারটীকে এলোমেলো করিয়া রামুর মা তাঁহার গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন তাঁহার এতক্ষণ অভিমান দপ্ করিয়া ফুলিয়া উঠিল।

সামান্য কোন একটা বিষয়ে নগণ্য একটা ত্রুটী ঘটিলে বধূ ও কন্যাগণ অজস্র বাক্যবাণের জ্বালায় অধীরা হইয়া পড়িতে লাগিল। রামুর মা থাকা সত্ত্বেও কন্যা সরযূর উপর গিন্নীমার আহ্নিকের স্থান করিবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এখন সে সে কাজ করিতে গেলে যদি কোন স্থানে একটু ত্রুটী লক্ষিত হয় অমনি গিন্নীমা বড় গলা করিয়া বলেন—"সে পোড়ার মুখী যাবার সময় তার কাছে কাজগুলো শিখে নিতে পারিস নি!" সরযূ ভাবিয়া পায় না যে কোন্ দিন রামুর মা তাহার মাতার আহ্নিকের গৃহে প্রবেশ করিয়াছে কি না! এত দিন ধরিয়া তাহার যে কার্য্য-গুলি গৃহিণী সানন্দে অনুমোদন করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা আজি তাঁহার কেন যে বিরক্তির কারণ হইয়াছে বুঝিতে বাকী ছিল না। গিন্নীমার যে মতিভ্রম ঘটিয়াছে অচিরে পল্লী মাঝে তাহাই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

দুর্ভাবনাটা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে না পারিলে তাহার আধিক্য হেতু যেমন একটা দুরারোগ্য রোগ শরীরে প্রবেশ লাভ করে, সেইরূপ রামুর মা অন্তর্ধানরূপ যে দুর্ভাবনাটা গিন্নীমার অন্তর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক দিন সন্ধ্যার পর প্রবল বেগে জ্বর আনিয়া দিল জ্বরটা দিনের পর দিন এরূপ প্রবল আকার ধারণ করিতে লাগিল; যে বাড়ীর সকলে একটা অশুভ মুহূর্ত্তের জন্য সচকিত হইয়া পড়িল। জ্বর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি যখন প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিলেন তখন কেবল মাত্র রামুর মার নাম ছাড়া আর কিছুই শ্রুত হইত না।

সেদিন জ্বরের প্রকোপটা কিছু কমিয়াছে। এক পার্শ্বে সরযূ ও অপর পার্শ্বে ধীরেন বসিয়াছিল। সরযূ বলিল "মা রামুর মা নিশ্চয়ই তোমার অসুখের সংবাদ পায় নি। পেলে না এসে থাকতে পারত না।" গিন্নীমা ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন "সে আবাগীর বেটির কথা বলিস্ নে। তার নাম শুন্‌লে আমার গা জ্বলে যায়। সর্ব্বনাশীর আমি যেন ছেলে আছড়ে মেরেছি!" সরযূ দেখিল মাতার চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া আসিয়া উপাধানে পড়িল। সরযূ বুঝিল—রাগ নয় অভিমান! এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে রামুর মাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল! গিন্নীমা পাশ ফিরিয়া উপাধানে মুখ ঢাকিলেন। আদেশের অপেক্ষা না করিয়া রামুর মা তাঁহার পায়ের কাছে গিয়া বসিল।

রামুর মা বলিল—"কেমন আছ মা?" গিন্নীমা যেন কণ্ঠের একটা বড় বাধাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—"মরে গেলেই বা তোর তাতে ক্ষতি কি?" রামুর মা একটু হাসিয়া বলিল—"কিছু না! মানুষ মলে আবার মানুষের

কি ক্ষতি হয়!" গিন্নীমা বলিলেন "তোকে এখানে আসতে কে বল্লে পোড়ারমুখি! "কেউ না" বলিয়া রামুর মা পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

তারপর আরো তিন চারিটা দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। গিন্নীমার রোগটা ক্রমেই বৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। ধীরেন ও সরযু নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছে। মা ছাড়িয়া তাহারা কেমন করিয়া থাকিবে!

সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া রামুর মা গিন্নীমার পায়ে হাত বুলাইতে ছিল। পার্শ্বে ধীরেন ও সরযু। গিন্নীমা ডাকিলেন—"রামুর মা!" রামুর মা তাঁহার মুখের প্রতি চাহিল। গিন্নীমা সজল নয়নে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন "এদিকে সরে আয় দিদি!" রামুর মা মাথার কাছে গিয়া বসিল। তিনি রোগশীর্ণ হস্ত দ্বারা রামুর মার কর্ম্মকঠিন হস্ত দুইখানি ধরিয়া বলিলেন "সব চেয়ে তোকে একটা আজ উঁচু কাজের ভার দেব বলে ডেকেছি -নিতে হবে কিন্তু—!" রামুর মা বুঝিল—তাহার চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া আসিল। সরযু ও ধীরেন নীরবে শুনিতেছিল। গিন্নীমা বলিলেন "কেমন পারবি ত?" রামুর মার কণ্ঠ জড়াইয়া আসিতেছিল' সে বলিল—'কি হচ্ছে?" গিন্নীমা তাঁহার পাংশু অধরে একটু হাসিয়া বলিলেন "মাতৃহারা হবে কাঁদবে না! কিন্তু যদি মাতৃহারা না হয় তবে আর কান্না কিসের? বল তুই আজ হতে ওদের মা হবি?" রামুর মার আঁখির কোণ বহিয়া জল আসিতেছিল। সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "মা!" গিন্নীমা মৃদু হাসিয়া বলিলেন "আমি তোর মা নই—! কিন্তু আজীবন তোকে সহোদরার মত দেখে এসেছি, আজ তোকে সেই জায়গাটা দখল করতে হবে।" রামুর মা নীরব রহিল। গিন্নীমা ধীরেন ও সরযুর হাত দুইখানি ধরিয়া তাহার হাতের ধারে দিয়া বলিলেন "আজ হতে তোদের নতুন মা দিয়ে গেলুম। মিছে তোদের মা সাজিয়ে দিলাম একথা ভাবিস্ নে। যে দিন একে বুঝতে পারবি সেদিন দেখবি তোদের প্রকৃত মা কে!"

রাত্রি শেষে দীপ নির্ব্বাণ হইয়া গেল। মাতৃশোকাকুল পুত্রকন্যাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিল "তোদের ভয় কি বাছারা, আমি আছি।" হারাসনি তোরা—ভাবিয়েছি আমি হতভাগী। ঊষার স্নিগ্ধ আলোকে ধীরেন ও সরযু দেখিল শোক সমুদ্রের মাঝখানে একটি শান্ত মাতৃমূর্ত্তি।

শ্রীসনৎকুমার সেন।

দুঃখ।

—:০:—

(গান)

দুঃখ আমার বাল্যদোসর

　　জন্ম-সোদর, সঙ্গী, সাথী।

তারি সাথে বসত আমার

　　এক-চালাতে দিবস রাতি।

নিদাঘ-দিনে রৌদ্র-তাপে রুদ্র হ'য়ে আসে সে
বর্ষা-আঁধার-ঘন রাতে ঝঞ্জা বাতে হাসে সে
তুহিন-শীতে জর্জ্জরিয়া
জমায় সে মোর বুকের ছাতি।

মিলন ভেঙে গড়ে চির-বিয়োগ ব্যথার কারাগার
হাসি গানের আলপনাটি মুছিয়ে সে দেয় তিলক তার
ভাগ্যহীনের আগ্নটীকা
দীপ্ত করি ললাট-ভাতি।

বন্ধু আমায় গড়েছে এই রক্ত গোলাপ কাঁটায় ঘিরি,
কয়লা আমার রাঙিয়ে দেছে আগুন দিয়ে বক্ষ চিরি,
কোরক আমার ফুটিয়ে দেছে
মরণ-মোহন-করাঘাতি।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

মণিপুর চিত্র।

(চেরাব বা মণিপুরের আদালত)

(৪)

মণিপুরের প্রাচীন চিত্র খুঁজিতে গিয়া দেখিতে পাইলাম, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট প্রাচীনতার কতকগুলি চিহ্ন বর্ত্তমান রাখিয়াছেন। বিচারালয়টী প্রাচীনতার ধ্বজা স্বরূপ রক্ষিত হইয়াছে। মণিপুরে বিচার পদ্ধতি যে রকম ছিল, ঠিক সেই রকমই এখনও চলিতেছে। বিচারাদালতের নাম—মণিপুরে আবহমান কাল হইতে 'চেরাব' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এই 'চেরাব' নামক কোর্টই আদালতের কার্য্য করিয়া থাকে। মণিপুরে যখন মহারাজাদের পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, বাহির হইতে কোন শক্তিমান জাতি আসিয়া—শক্তি সঞ্চালন করেন নাই,—সেই প্রাচীন সময়ের 'চেরাব' কোর্ট যে প্রণালীতে গঠিত এবং পরিচালিত হইত, অদ্য পর্য্যন্ত তাহাই নিখুত অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। এই 'চেরাব' কোর্ট সমস্ত দেশীয় রাজ্যের পক্ষে একটী শিক্ষণীয় বিষয় এবং অনুকরণীয় বলিয়া মনে করি। 'চেরাবে' বিচারপতিগণের অমোঘ ক্ষমতা। এই 'চেরাব' বিচারপতিগণের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ রাজাকর্তৃক নিযুক্ত হয় এবং অপর তিন ভাগ প্রজা সাধারণ হইতে—দস্তুর মত—নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। অতএব রাজারপক্ষে Majority কখনও পাওয়া যায় না, প্রজার পক্ষেই Majority হইয়া পড়ে। এই পাঁচ জন 'চেরাব'

কোর্টের বিচারপতিগণ—একত্র বসিয়া রাজ্যের বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই আদালতে উকীল নাই, মোক্তার নাই, ষ্ট্যাম্প নাই, কোর্টফি প্রভৃতি কোন জঞ্জাল নাই—এমন কি লেখাপড়া পর্য্যন্ত নাই! এই অভিনব প্রাচীন আদালত দেখিবার জন্য আমার ইচ্ছা বলবতী হইল এবং দেখিতে গেলাম।—যাইয়া দেখি পাঁচ জন বিচারকের উপবেশনের জন্য পাঁচখানা রক্তবর্ণের বনাতের আসন যথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের পদোচিত গৌরব রক্ষার জন্য পানদান, পিকদান, জলপাত্র, দর্পণ, শঙ্খ এবং হুঁকা (রৌপা বেষ্টিত বৈঠকে স্থাপিত) প্রভৃতি যথাস্থানে রক্ষিত হইয়াছে এবং এই সকল দ্রব্যের ভারবাহী সেবকগণ সন্তর্পণে দণ্ডায়মান আছে। তখনও আদালত বসে নাই—অর্থী প্রত্যর্থীগণ ক্রোড়হাতে দাঁড়াইয়া আছেন, কাহারও এ ধর্ম্মাধিকরণে বসিবার অধিকার নাই। আলাপ এবং প্রলাপ বকিবার এ স্থানে বিধিবদ্ধ নিষেধ। ভিন্ন রাজ্যের লোক আমাকে দেখিয়া উপস্থিত লোকের মধ্যে কানাকানি হইতেছিল, পরে বুঝিলাম; এ ধর্ম্মাধিকরণে আমি কেন? যথা সময়ে শুনিতে পাইলাম চেরাবগণ অগ্রসর হইতেছেন। ভারবাহীরা রাজকীয় চিহ্নের জিনিসগুলি লইয়া অগ্রসর হইল; অর্থী প্রত্যর্থী পর্য্যন্ত তাহাদের অনুগমন করিল এবং দর্শকবৃন্দ পশ্চাতে তাহাদের সঙ্গ যোগ দিলেন। ইতিমধ্যে শঙ্খধ্বনি দ্বারা 'চেরাবগণে'র আগমন ঘোষিত হইল—আর অমনি সমস্ত লোক মণিপুরের প্রথানুসারে 'চেরাবগণকে' ভূমিতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। এ দৃশ্য দেখিবার জিনিষ—শুনিবার বিষয় নহে। হঠাৎ আমাকে দেখিতে পাইয়া প্রধান চেরাব ক্ষণিক-ক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন বটে, কিন্তু বাক্যব্যয় না করিয়া গম্ভীর ভাবে তাঁহাদের স্ব স্ব আসনে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। মণিপুরের প্রথানুসারে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু আমি যুগপৎ স্তম্ভিত হইয়া অবনত মস্তকে প্রণত হইলাম; মনে করিলাম, যথার্থই আমি ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইয়াছি। এ ধর্ম্মাধিকরণের ধর্ম্ম কি, আমি জানি না; কিন্তু বিচারপদ্ধতি দেখিয়া বোধ হইল এই চেরাবগণ যথার্থ ধর্ম্মাবতার।

বিচার আরম্ভ হইল, পক্ষাপক্ষ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক হাঁটু গাড়িয়া বিনীত ভাবে রোদন করিতে লাগিল এবং ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতে লাগিল। বিচার ছিল একটী গুরুতর বিষয়ের। এই চেরাবগণ অমোঘ ক্ষমতাশালী; দণ্ড অথবা ক্ষমা করা অথবা আপোষ করিয়া দেওয়াই তাঁহাদের অমোঘাস্ত্র। এই অস্ত্রের দ্বারা তাঁহারা দেশের শান্তি রক্ষা করিয়া থাকেন। মোকদ্দমার বিষয় এই ছিল, একটী পরিবারের বিবাহিতা কন্যা পিত্রালয় আসিবার সময় অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছিল; তাহার স্বামী এজন্য আদালতে বিবাহ ভঙ্গের জন্য আবেদন করে। বিচার-কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই ঐ গর্ভবতী গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য প্রয়াস পাইলে মৃত্যুমুখে পতিতা হয়। কাজেই বিচারকগণ বড় উগ্র হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের অবস্থা দেখে বুঝিতে পারিলাম তাঁহারা এ বিষয়ে একটা বিশেষ শাস্তি দিবার ইচ্ছা করিতেছেন। মণিপুরী ভাষায় লোকের সব কার্য্য নির্ব্বাহ হয়—আমি মণিপুরী ভাষায় বিশেষ পারগ নহি, এ জন্যই সঙ্গীয় পথপ্রদর্শকের নিকট হইতে বিচার সংক্রান্ত সব কথা জানিয়া লইলাম। চেরাব কোর্টের প্রথানুসারে বাদী বিবাদীর মধ্যে আপোষ হইয়া গেলে চেরাবগণ তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন; আর যদি কোনও শাস্তিই বিধানীয় হয় তাহা হইলে সামাজিক দণ্ডই প্রদত্ত হইয়া থাকে। আমরা সকলেই বুঝিয়াছিলাম—যখন বাদী বিবাদীর মধ্যে আপোষ হইয়া গিয়াছে তখন শাস্তি সরল হইবে। কিন্তু চেরাবগণের সেই অধিকার থাকিলেও তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন না—গুরুতর শাস্তি বিধান করিলেন। চেরাব-প্রধান অতি গম্ভীর অথচ উচ্চৈঃস্বরে হুকুম প্রচার করিলেন। গ্রামের বৈদ্য যিনি ঔষধ দ্বারা এই অপকার্য্য ঘটাইয়াছেন তাঁহার প্রধান

যথাযথরূপে না হইলেও চেরাবগণ তাঁহাকে মুক্তি দিতে রাজি নহেন। এজন্য সে কবিরাজকে দেশান্তরের হুকুম প্রচার করিলেন। সামাজিক প্রথায় তাহার শাস্তি হইল।

বাদী বিবাদীর মধ্যে আপোষ হইয়া গিয়াছে কেন না যে স্ত্রীলোকটি মারা গিয়াছে তাহার দাহ সংস্কার ব্যবস্থা পাইতে চেরাব কোর্টের নিকট উপস্থিত। চেরাব-প্রধান হুকুম প্রচার করিলেন এই যে, মৃতদেহের অগ্নিসৎকার হইবে না—পাপীদের জন্য মৃতদেহের ফেলিয়া দিবার যে স্থান নির্দিষ্ট আছে সেই স্থানে এই মৃতদেহ ফেলিয়া দিতে হইবে। এই আদেশ প্রচার হওয়া মাত্র বাদী বিবাদীর যেন মুণ্ডচ্ছেদের হুকুম হইয়াছে এই ভাবে তাহারা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া ভূমে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। হুকুম বড়ই মর্ম্মান্তিক কঠোর হইয়াছে। কঠোর হইলেও কর্ত্তব্যবোধে যে হুকুমপ্রচার হইয়াছে তাহা হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য কেবল মাত্র, আর্ত্তনাদ আশ্রয় করিল; চেরাবগণ 'বজ্রাদপি কঠোরাণি—মৃদুনি কুসুমাদপি'র ন্যায় হইয়া নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। বাদী বিবাদী আর্ত্তনাদের মাত্রা বাড়াইয়া যখন কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল তখন প্রধান চেরাব অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। প্রকাশ করিয়া বলিলেন 'হাকিম নড়েত হুকুম নড়ে না।' এই হুকুম তামিল করিতে হইল।

বাদী বিবাদীর পরিবারবর্গ এইরূপ শাস্তি বিধানে প্রায়ই যেন নিরয়গামী হইয়া পড়ে। কারণ, এই উভয় পরিবারে এই কুৎসা বাক্য পুরুষানুক্রমে প্রচার থাকিবে ইহাই তাহাদের দুঃখ ও মনঃকষ্টের কারণ। যথা সময়ে চেরাব বিচারপতিগণ গাত্রোত্থান করিলেন, আবার পূর্ব্ব প্রথানুসারে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। দর্শকবৃন্দ চলিয়া গেল, কেবল রহিয়া গেল ভূমিতে লুটাইয়া দণ্ডবৎকারী সেই বাদী-বিবাদী এবং তাহাদের পরিবার-বর্গ ইহারা এ অবস্থায় কতক্ষণ কাটাইবে তাহার ঠিকানা নাই। ক্ষমা চাহিতে কাল সাপেক্ষ করে না, মান সাপেক্ষ রাখে।

এই চেরাব বিচারাদালতে এ রাজ্যের যুবরাজ এবং রাজপরিবারের পর্য্যন্ত বিচার হইয়া থাকে, এ বিষয়ে জিয়ে কর্ণেল সাহেবের লিখিত মত উদ্ধৃত করিলাম :—

"I have already alluded to the turbulent character of Kotwal Koireng, the Maharaja's fourth son, and now again I was to have fresh evidence of it. The Maharajah handed over the case to the 'Cherap court', for trial, and as might be expected, they acquitted Kotwal of the charge of causing death and found him guilty of injuring the other two. They sentenced him to banishment for a year to the Island of Thanga, in the Logtak lake, and Temporary degradation of caste.

(My Experience in Manipur. (P. 113) by Col. John Stone.

এই কোতওয়াল Koireng পরে যখন ক্ষমতাশালী হন তখন তাঁহার নাম হইয়াছিল--'টিকেন্দ্রজিৎ'—মণিপুরের আধুনিক ইতিহাস যাঁহারা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা টিকেন্দ্রজিতের অবস্থা অবশ্যই জানেন এবং তাঁহার শেষ অবস্থা কি হইয়াছিল তাহা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। এমন ক্ষমতাশালী লোকের চেরাব কোর্ট যেখানে বিচার করিতে পারেন এবং কঠোর হুকুম দিতে পারেন সে কোর্ট যে দেশমান্য কোর্ট হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে চেরাব ধরণের কোন কোর্ট না থাকিলেও পাহাড় আদালত নামে এক আদালত ছিল এবং তাহার

বিচারপতিগণ—এদেশের ঠাকুর শ্রেণী নিযুক্ত হইত। অর্থী, প্রত্যর্থী বিনা ব্যয়ে বিনা উকীলের সাহায্যে সুবিচার পাইত কিন্তু যখন আমরা সভ্য-ভব্য হইলাম, সেই ভব্যতাই আমাদের বহু মূল্যবান 'চীজ' উঠাইয়া লইল। ১২৮৮ ত্রিপুরাব্দে ([illegible] খৃঃ) ১৭ই আষাঢ় তারিখে প্রচারিত দাসত্ব-প্রথা রহিত পত্রের সঙ্গে 'পাহাড়' আদালতের কার্য্যও সেই আ[illegible] বন্ধ হইয়া গেল। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট মণিপুর রাজ্য এবং মণিপুরবাসীর উপর সর্ব্বদা এবং সর্ব্ব বিষয়ে সদয়। তা[illegible] প্রাচীন প্রথা মণিপুরে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। "লালুপ" বিচার প্রথা এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে। মণিপুরের ইহাতে মহালাভ হইয়াছে বলিতে হইবে।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

নব্যমিল।

মিলের লাগিয়া রজনী জাগিয়া অভিধান করু ঘাটি,
মিল আগে চাই, ন'লে সব ছাই, মিল হবে তোফা খাঁটী;
আভাস অর্থ করিতে ব্যর্থ করি নাকো কোন দ্বিধা;
মিলেতে শব্দ করিতে জব্দ ফন্দি সে বহুবিধা।
যেটা বা হ্রস্ব অ-মিলবশ্য দীর্ঘ করে দি টানি।
দীঘলের মাথে হাতুড়ীর ঘা'তে খাটো করে করে আনি!
দরকারে ভাঙ্গি কড়েকাড়ে ভাঙ্গি চ্যাপটা করে দি চটি;
কোনটারে ঘসি সারাদিন বসি কারো যায় খসি কটি।
কভু দেই ছাঁটি, কভু ফেলি কাটি, কভু কসে আঁটি জোড়া,
কারো যায় প্রাণ, কারো শুধু কান, কারো ঠ্যাংখান খোঁড়া।

এ ত গেল রূপ, শুনে হবে চুপ, ভাবের কিরূপ দশা,
শব্দের দিল কভু করি ঢিল কভু এক তিল কসা।
শব্দ বেচারা দিশাহারা সারা দুর্দ্দশা ভাবি ভাবি,
আরো হবে কিবা ভাবে নিশি দিবা জানে না বরাত ভাবী।
কোনটার দশা প্রায় মাকড়শা টানে টানে সূতা বাড়ে,
কোনটা ইক্ষু, রসবিবিক্ষু পিষি তবে রস ছাড়ে।
কারো মুখে দেই ভাব-ভাষা সেই যাহা কভু নেই জানা
তাহার জনমে, কাহারো মরমে কভু হয় শেল হানা।
প্রসূনের সাথ রসুনের পাত গাঁথি তো, যদিও গন্ধে
অমিল বড়ই, সামিল বোঁড়ই করি মধু-মকরন্দে।

'সন্দেহে' লিখিলে অনন্ত, লিখিলে নাহি যদি মেলে জুড়ি।
মূঢ়ধী ধন্দেছে হকারে রন্দেছে নব ভাব-কূপ খুঁড়ি।
কথাটী যে সোজা দায় হয় বোঝা বলি সে এমনি ঢংএ,
ঢোকনা পুরানো পেঁচানো ঘুরানো বাঙ্গলো এমনি রংএ।
মিলের এ লীলা, ভাসে জলে শিলা মিলের পরশ-ভয়ে।
মিলের ভৃত্য আমি যে নিত্য, সেবি মিলে খেলা নয় এ।
মিলের কারণ জীবন-মরণ শব্দের কাড়াকাড়ি।
যদি দায়ে পড়ি তবে ধড়ফড়ি ইংরেজী আনি পাড়ি।
ভাব-পথ রোধি শব্দ বিরোধী ঠাসি শব্দের কাঁধে
সুবিমল মিল ঝলে ঝিলমিল্ অর্থ বসিয়া কাঁদে।

এমনি সে ঠাসা মেশে যেন খাসা গঙ্গা যমুনা সহ;
মিলের বাহার বাসনা যাহার, মিলের নমুনা লহ।
এনেছি খড়্গ ত্রিগুণ খড় গো কাজেই তো বোঝা দুই;
কিনেছি কাঁকুড়, কি করি পাঁকুড় ঠেকিয়া উঠানে কুই।
পসিয়া বনদেশে বসিয়া বন্দে সে ডুবিয়া গন্ধে সে দেবে।
আলোকে নন্দিত, পুলকে স্পন্দিত সে নহে বন্দী তো এবে।
আঁখিতে বারিপাত, আঁকিতে পারিজাত, জিনিয়া নারীকান্ত স্বর্গ,
অফুটো কালিকার ও ছোট বালিকার (মিলাতে) শালিকার স্বর গো
মধুর বিষ্টি, মধুর দৃষ্টি, মধুর চিষ্টি করে,
কাকা-কাকা-বাক্ ঝাকে ডাকে কাক মরি কি মিষ্টি স্বরে।

• • • • •

বাদর-রোদ্দুরে অদূরে দোদ্দুরে নাদিছে, পোস্তদূরে ভাসে,
বরষা দৃশ্য সরসা বিশ্ব ভরসা নিস্ব বাসে।
হ'ল না মিলটা অখুসি দিলটা আপোসে কিলটা খাই।
Rhyme-plan ঠিক রয়না ক্যান ঠিক, রচনা antique তাই।
সোমরি সোমরি তোমারি Memory গুমরি গুমরি মরি,
বাগ সে মসগুল্ বিকাশে রোজ গুল্ বিলাতী Rose-ফুল স্মরি।
ভাবি ও মূরতি হয় না ফুরতি পূরি না সুরতি পানে,
বাসনা পূরতি হায় সে দুরতি সুভাষা স্ফূরতি কানে।
হে চিত চঞ্চল চকিতে সঞ্চল সে শীত অঞ্চল পাশে,
মানিনী প্রিয়া সে দহিছে পিয়াসে বসিয়া কি আশে বাসে।

থাকিব একাকী, ললাটে, লেখা কি' সুখের রেখা কি নাই,
হেথায় বিদেশে জাগিছে হৃদে সে-কথনো নিদে সে পাই।
বিরহ-পেষণে—এ separation-এ অশন-এষণে মতি
হয়না মগনা, আকাশ-লগনা, লখনা অগোণা গতি।
তাই তো আজিকে এ মন-পাজিকে মিলের magic-এ ধরি,
চাইছি ভুলাতে, নতুবা কুলাতে পারি না ধুলাতে পড়ি।
'ধরি'তে 'পড়ি'তে মিলন গড়িতে কোমলে কড়িতে মেশে,
তাতে কি ঠেকি দায়, ফাঁকেতে ঢেঁকিটায় ঢুকায়ে দেখি তায় বেশ এ।
মিলের মালিকা—গীতের পালিকা, রীতের তালিকা দামী;
ফুটাতে এ ছিরি কথা টানি ছিঁড়ি ভাব কাটি চিরি আমি।

শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা।

ছিটে-ফোঁটা।

ফুল, গাছেই শোভা পায় কিন্তু যতক্ষণ না সেটিকে মানুষ গাছ থেকে চয়ন করে মনের মত কেটে-ছেঁটে ফুল-দানিতে সাজিয়ে তুলবে ততক্ষণ তার আর তৃপ্তি নেই। প্রকৃতির দৃশ্য অবর্ণনীয় কিন্তু যতক্ষণ না মানুষ কাব্যে বা চিত্রে নিজের মনের মত করে সেটিকে মানস-কল্পনায় নতুন করে গড়ে তুলে লোকসমাজের চক্ষে তুলে ধরছেন ততক্ষণ আর তার নিস্তার নেই। তাই "প্রকৃতি" ও "শিল্পকলা" এক সূত্রে গাঁথা; তাদের বাহিক বৈষম্য দেখা গেলেও প্রকৃতিগত সেটা নয়।

● ● ● ●

সকলেই তাকিয়ে দেখেন কিন্তু চেয়ে দেখেন ক'জন? প্রকৃতির বুকে রোদ, ঝড়, আলো, আঁধার কত খেলাই চলছে—মানুষ ক'জন সেগুলি দেখার মত করে দেখবার সুযোগ পান? এই প্রকৃতির খবর পৌঁছয় শিল্পীদের কাছে যাঁরা দৃষ্টির চেয়ে দূরেরও অগোচরের খবর তাঁর শিল্প-কলায় প্রকাশ করে থাকেন। (অবশ্য প্রকৃতির হুবহু নকল করে নয়।)

● ● ● ●

কোন একটি ছবিতে "এ ইহা বলিল," "এ উহা করিয়া ঐদিকে গিয়া বসিল" প্রভৃতি সাহিত্যের মত ঘটনা-পরম্পরার ব্যাখ্যা করা চলে না। এ হিসাবে ছবি স্থির! সে তার বক্তব্য স্থির করেই দেখা দেয়, যদিও মানুষের মনে সে অনেক কথা জাগিয়ে তুলতে পারে। ছবি টীকাটিপ্পনির ধার ধারে না।

● ● ● ●

আমাদের দেশের ৯৯ জন শিক্ষিত অশিক্ষিত লোক ইউরোপীয় আর্টের পক্ষপাতি—দেশের আর্ট তাঁদের এক প্রকার চক্ষুশূল। প্রকৃত প্রস্তাবে ইউরোপীয় শিল্পীদের কাছে আমাদের শেখবার এই আছে যে তাঁরা ইউরোপীয় অর্থাৎ দেশীয় আর্টেরই চর্চ্চা করেন—আমাদের মত অনধিকার চর্চ্চা করেন না।

* * * *

জহুরী হতে গেলে যেমন সাচ্চা ঝুটো পাথর চেনার বিষয় বিশেষ একটা শিক্ষা ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়, ছবি বুঝতে হলেও ঠিক্ তেমনি কিম্বা ততোধিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে। অনেকের ধারণা ছবি এমন হবে যে দেখবার মাত্রই দশজনে মুগ্ধ হবেন কিন্তু সেটা ভুল। রঙিন জিনিষে যেমন শিশুদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তেমনি রংচংএ ছবি সাধারণকে মুগ্ধ করে। যে ছবি দেখলেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে ছবি ছবিই নয়। ছবির জহুরীর (art-critic) কাছে যাচাই হয়ে যে ছবি টিঁকে যায় সেই ছবিই ছবি।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

সমব্যথী।

—:*:—

কাহার সোণার তরীখানি ভেসে গেছে নয়নের ধারে
নিভে গেছে পরাণের দীপ দুর্ভাগ্যের ঝটিকা প্রহারে !
হাসি, খেলা, আলোক, পুলক, তা'র সাথে গিয়াছে বহিয়া,
শ্রাবণের গগনের তলে গুমরি মরিছে ক্লান্ত হিয়া !

কোন্ সুদূরের কোথা হ'তে ভেসে আজ আসিল ঝঙ্কার ?
বিদেশীর হৃদয়ে বাজিছে করুণ রেখারটুকু তা'র ;
বিষাদে বিরস করি দিল আকাশ বাতাস জল স্থল ;
মনে পড়ে ভুলে যাওয়া ব্যথা অকারণে চোখে আসে জল।

কি গান গাহিস্ রিক্ত ওরে, কাহারে করিস্ নিবেদন ?
ভাঙা হৃদয়ের বোঝে ব্যথা আর তার আছে কি আপন ?
জীবনের শেষ ফুল দিয়ে যে মালা পরায়েছিলি ভাই,
ছিন্ন শুষ্ক স্মৃতিটুকু তার থাকে যদি আছে শুধু তাই।

* * * *

হায় রে, পলায়ে যদি যায় জীবনের রঙীল স্বপন,
তারে চাহি কেন ফেলে শ্বাস প্রদোষের ম্লান সমীরণ ?
যামিনীর জোছনার শেষ ঊষালোকে যদি নিভে যায়,
লয়ে তা'র ক্ষীণ অবশেষ কেন শশী বেঁচে থাকে হায় ?

শরতের শ্যাম উপবনে কাঁদিয়া মরিছে বুল্‌বুল্‌,
বসোরার লতিকা বিতানে হারায়ে গিয়াছে তার গুল্ ;
মথুরার গৌরব আসনে আজি শ্যাম রাজ অধিরাজ,
মরণের গান গাহে রাধা তাহার ফুরায়ে গেছে কাজ।

•　　•　　•　　•

ছিন্ন তব বীণার তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিল যেই তান ,
এ জগতে মিলিবে না সাড়া, জান তুমি, জানে তব প্রাণ ;
একটী মুহূর্ত্ত সরে গেলে এ জীবনে মিলেনাক আর ;
নাহি ভয় আশাহত ওরে, অসীমেতে খোঁজ মেলে তা'র।

সব শেষে যেই মালাখানি চুরি করে পরেছিলে গলে,
এখনও যা' আঁখিনীরে ভাসি চেপে রাখ পাঁজরের তলে;
(হয়ত সে দেখেনি) তবুও তা' ব্যর্থ কভু নয়,
মৃত্যু পারে ইন্দ্রধনু হয়ে একদিন ফুটিবে নিশ্চয়।

আজি তব নয়ন শোণিত, ফোঁটা ফোঁটা পড়িছে যা' ঝরি,
একদিন নীলিমার তলে ফুটিবে তা' তারা রূপ ধরি ;
আধখানা ভাঙা বুক তব শশী হয়ে ভাসিবে গগনে ;
দূরগতা কাছে সরে আসি ধরা দিবে মধুর লগনে।

•　　•　　•　　•

কি হবে জানিতে চেয়ে কবি, বীণার সে সমর আসরে,
মৃত্যুক্ষীণ-কণ্ঠটুকু তব পশিবে কি,—পড়িবে কি ঝরে ?
দিন দিন বিন্দু বিন্দু জমি' মেঘ খণ্ড জমিয়াছে যাহা,
হারায়ে সবার মাঝখানে কি আর দেখিবে বল তাহা !

জীবনের শান্ত উপকূল ছেড়ে সে যে গিয়াছে তরণী,
অনিশ্চিত অদৃষ্টের পথে ; পিছে তার মিলায় ধরণী ;
তাহারে কাঁদিয়া ফিরে ডাকি, মিছে কেন কর উপহাস।
ব্যাকুলে চাহিয়া বারে বারে হয়ত সে ফেলিবে নিঃশ্বাস।

• • • •

যেতে দাও যেতে দাও ওগো বুকেত কতই ব্যথা সয় ;
লুকারিতে চায় যদি হিয়া গলা টিপি মার নিরদয়।
অতি সত্য জগতের মাঝে, প্রেম মিথ্যা, সত্য আর সব ;
বিষাদে মরিতে পার ভাল, নহে চির রহগো নীরব।

এ জগতে থাকে কিবা কবি, কি বাঁধিতে পার বাহু ডোরে ?
নীরবে চাহিয়া থাকা ছাড়া প্রেমের কি আছে আর ওরে ?
যদিবা বিধির বিধি পেয়ে, ছুট যাও দাঁড়াইতে পাশে,
সংসারের ভীম পদাঘাত বজ্র সম বুকে নেমে আসে।

• • • •

কাহার সোণার তরীখানি ভেসে গেছে নয়নের ধারে ?
শত ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাঝে দাঁড়ায়ে কে কাঁদিতেছে পারে ?
কাহার প্রাণের শত ভাঁজে চাপা আছে জ্বলন্ত অনল ?
সমব্যথী আশা দেয় ওরে, একদিন জুড়াবে সকল ;—

একদিন, আঁধারের ধারা, রাশি রাশি পড়িবে ঝরিয়া,
মরণের বিস্মৃতির বুকে সব ব্যথা লইবে ধরিয়া।

শ্রীধীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পুরুষস্য ভাগ্যং।

—:*⊕*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যে দেশে টাকার একগণ্ডা করিয়া উকীল পাওয়া যায় বলিয়া দেশময় একটা কথা উঠিয়াছে, সেই উকীল-প্রসূ বাংলা দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া জীবন মধ্যাহ্নের অবসানে কোন অন্ধ আশায় আজ আবার "ল" পড়িতে আসিয়াছি, আমার সতীর্থ সুহৃদ শরৎকুমার আজ কয়েক দিন হইতে এই প্রশ্নে আমাকে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কর্ম্মজীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে এখন আমার পক্ষ ছিন্ন, বক্ষ ক্ষতবিক্ষত, সংসারের ধূলিরাশিতে নয়ন যুগল অন্ধ। শরীরে আর সে শক্তি নাই, মনের আর সে বল নাই, পরমকারুণিক মঙ্গলময়ের করুণায়ও আজ আর তেমন আস্থা নাই। এমন যখন অবস্থা, তখন এই নিদারুণ ক্লান্তি নিপীড়িত বক্ষে কেন স্বেচ্ছায় দুঃখকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিতেছি, সাধ করিয়া কেন জটিল হইতে জটিলতর ভ্রান্তি জালে জড়িত হইতে যাইতেছি, সাধারণ ভাবে দেখিলে বাস্তবিকই তাহা হাস্যকর বলিয়াই মনে হয়।

আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের দুঃখপূর্ণ কাহিনী কখনও যে কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে হইবে, আমি কিন্তু তাহা স্বপ্নেও মনে করি নাই বা সেরূপ কোন ইচ্ছাও আমার কোন দিন ছিল না। যে দুঃখ যে নিষ্ফলতার বোঝা একাকীই গোপনে বহিয়া বেড়াইতেছি, মনে করিয়াছিলাম, অন্য কাহাকেও আর সে দুঃখের দোসর করিব না। কিন্তু শরৎকুমারের নিকট তা গোপন রাখা ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। তিনি আমার সতীর্থ; শুধু সতীর্থ নহেন, অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমাদের এই নবীন প্রবাসে এতটা আত্মীয়তার আরো একটু কারণ ছিল, একই ছাত্রাবাসের একই প্রকোষ্ঠে আমরা উভয়ে 'সিট' লইয়া ছিলাম। আমার কোন দিনের কোন উত্তরে যে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির সমুজ্জ্বল আলোকের সম্মুখে কোন কথা গোপন করিয়া রাখিবার মত ক্ষমতা আমার ছিল না। আমার জীবন-গতির এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন যথেষ্ট পরিমাণে তাঁহার কৌতূহল সঞ্চার করিল। ক্রমশঃ অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইল, যখন আমি বুঝিলাম, যে আর সে সরল হৃদয়কে প্রতারণা করা চলিবে না। সত্যকথার অবতারণায় বিলম্ব ঘটিলে তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত পাইবেন। এমন আঘাত দিবার শক্তি বা ইচ্ছা আমার ছিল না। তারী ত কথা, তাহারই জন্য এত? ছিঃ, অত অল্পে যাহারা তুষ্ট হয় তাহাদিগকে কি তুষ্ট না করিয়া থাকা যায়? তাই এবার শরৎকুমারের নিকট আমাকেই হার মানিতে হইল।

সন্ধ্যা হইতে তখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব ছিল। ক্লাসের ছুটীর পর প্রতিদিনের ন্যায় সেদিনও গোলদীঘিতে আসিয়া বসিলাম। হঠাৎ আবার সেই প্রশ্ন!

দুই একটী এ-কথা ও-কথার পর শরৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন "বল্লেন না, ঠাকুরদা, আচ্ছা লোক যা হোক কিন্তু আপনি।" আমি কিছু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

"যে খোসামোদ আপনাকে কর্ত্তে হচ্ছে, ততটুকু যদি ভগবানকে কর্ত্তাম্, তা'হলে—হাসছেন কেন ঠাকুরদা,—সত্যিই বলছি, তাহলে তিনিও স্থির থাকতে পার্ত্তেন না, বৈকুণ্ঠ থেকে তিনিও নেমে আসতেন! কেমন কি না, তা আপনিই বলুন?"

আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম। এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। একে ত আমার সতীর্থগণ অপেক্ষা আমার বয়স কিছু অধিক ছিল, তাহাতে আবার কেশরাশির শুভ্রতা আমাকে বয়স অপেক্ষাও প্রাচীন করিয়া তুলিয়াছিল। তাই আমার রসিক সহাধ্যায়িগণের আমাকে তাঁহাদের ঠাকুরদাদার পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। শরৎকুমারও সেই হইতেই এই সুমিষ্ট সম্বোধনে আমাকে তুষ্ট করিতেন। এই সব ছোট্ট কথার ভিতর দিয়া যে কত বড় একটা আত্মীয়তা, কত বড় একটা সহানুভূতির সৃষ্টি হয় তাহা বলিয়া কাহাকেও বুঝান যায় না। যাহারা ছাত্র, তাহারা ইহা মর্ম্মে অনুভব করে। যাক সে কথা।

আমি একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলাম "বলব না কেন ভাই?"

শরৎকুমার বলিলেন—"হাঁ, বলছেন তো রোজই! যা হোক আজ আর ফাঁকি দেবেন না যেন বুঝেছেন?"

আমি বলিলাম—"না বলে আমি অবশ্য অন্যায়ই করেছি ভাই! কিন্তু কেন যে এতদিন তোমাকে কিছু বলিনি, তোমার মত সহৃদয় বন্ধুর কাছেও কথাটা গোপন করে এসেছি তার কারণ একবার ভেবে দেখেছ কি? তা হলেই সব বুঝতে পার্ত্তে! বাস্তবিকই ভাই, বলবার মত কিছু আমার এ কাহিনীতে নাই—এতদিন গোপন করেই আমি অন্যায় করেছি, শুধু তোমার কৌতূহল বাড়িয়েছি। আমার কথা শুনে যে তুমি হতাশ হয়ে পড়বে, তা আমি ঠিক জানি; এমন কি হয় ত শেষ পর্য্যন্ত তোমার ধৈর্য্যও থাকবে না। না—না—এ আমার বিনয়ের অহঙ্কার নয় ভাই, এ আমি সত্যিই বলচি। আর তা ছাড়া আর একটা কথাও এই সঙ্গে ভেবে দেখ। জীবন কাহিনীর যা মূল্য তা শুধু মহাপুরুষদের—কর্ম্মবীরদের জীবনেরই; আমার মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, নগণ্যের ব্যর্থ জীবনের কাহিনী শুনে তোমার কি উপকার হবে ভাই?"

শরৎকুমার হাসিয়া বলিলেন, "ঢের হয়েছে ঠাকুরদা, থাক, আর বলতে হবে না, আমার খুব গল্প শোনা হয়েছে! বাবা! যে বক্তৃতা সুরু করলেন, বুড়ো বয়সেও প্র্যাকটিস্ জমিয়ে তুলবেন দেখচি! কি বলছিলেন যেন?—হাঁ, মহাপুরুষদের জীবনের কথা বুঝি!—নয়? আমিও অবশ্য সে কথা অস্বীকার করি না; জীবন গঠনে সেগুলো একটা আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়! কিন্তু তাই বলে জীবনের ব্যর্থতাও মানুষকে কম শিক্ষা দেয় না! ব্যর্থতারও যে একটা সার্থকতা আছে! না—না আপনি ও সব যুক্তিতর্ক ছাড়ুন—যা বলতে বসেছেন তাই-ই বলুন। আমি জিজ্ঞাসা করচি, আপনার ইচ্ছা হয় ত বলবেন? না হলে ত জোর কিছু নেই ঠাকুরদা!"

শরৎকুমারের এ অভিমান আমার বক্ষে বাজিল। দ্বিরুক্তি না করিয়া আমি তখন বলিতে আরম্ভ করিলাম—শোন ভাই, বল্‌ছি;—এখন আমার যে অবস্থা দেখিতেছ, চিরদিন কিছু এমন ছিল না। পিতৃপিতামহের আমলে অবস্থা একটু উন্নতই ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে আমরা লক্ষ টাকা আয়ের জমিদার ছিলাম। রাজার হালে কোনদিন না থাকিলেও বা ঘটা করিয়া বাড়ীতে কখন বার মাসে তের পার্ব্বণ না হইলেও মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাবে কখন কষ্ট পাই নাই। এক পিতৃদেব ব্যতীত পূর্ব্ব পুরুষদের মধ্যে অন্য কেহ তেমন কোন বড় চাকরী না করিলেও তাঁহাদের জমী, জিরাত, পুকুর, বাগান প্রভৃতি পল্লীগ্রামের লোকের যাহা থাকিতে হয় তাহার

কোনটিরই অভাব ছিল না। তাহা হইতেই পূজা অর্চনা, দান, ধ্যান সকলই চলিত। লোকে পিতৃমাতৃদায়েও সাহায্য পাইত। গ্রামে অতিথি অভ্যাগত কেহ আসিলে লোকে "রায়বাড়ীই" দেখাইয়া দিত।

"এই গেল আমাদের আগেকার কথা। কিন্তু আর ত সে দিন নাই। কেমন করিয়া কোন পথ দিয়া যে সেদিন চলিয়া গেল তাহা তোমাকে কি বলিব? আমি নিজেই তাহা বুঝিতে পারি না। যাক সে কথা—পাবনা জেলার পদ্মাতীরে আমাদের বাড়ী ছিল। পর পর তিনবার আমাদের বাড়ীখানি গ্রাস না করিয়া কিছুতেই রাক্ষসীর অতৃপ্ত ক্ষুধার তৃপ্তি হইল না। পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিতে প্রথম প্রথম সকলেই আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু কতদিন এরূপভাবে চলে? ক্রমাগত এইরূপ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে যখন আমাদের অবস্থা উত্তরোত্তর শোচনীয় হইতে লাগিল তখন পিতৃদেব একরূপ জোর করিয়াই আমাদের বসবাস উঠাইয়া লইয়া দিনাজপুরে আসেন। সেই হইতেই আমরা দিনাজপুরে। পিতৃদেব তথায় কালেক্টরীতে কাজ করিতেন।

"স্কুলে আমার বেশ সুনাম ছিল। ক্রমশঃ প্রত্যেক পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বৃত্তি লাভ করিয়া বি.এ. ক্লাসে পড়িতে লাগিলাম। পুত্রবধূর মুখ দেখিবার জন্য ইতিমধ্যেই মাতাঠাকুরাণী বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমার থার্ড ইয়ার ক্লাসের প্রথম ভাগেই তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়। আমার শ্বশুর অতিশয় দরিদ্র ছিলেন কিন্তু তাঁহার দারিদ্র্য শুধু অর্থেই সীমাবদ্ধ ছিল। বহু সদ্গুণের তিনি আধার ছিলেন। শ্বশুর-তনয়াও পিতৃগুণের অনেকটা অধিকারী হইয়াছিলেন। স্ত্রীমহিমা কীর্ত্তন করিতেছি বলিয়া হাসিতেছ? হাসিও না ভাই! জীবনকাহিনী শুনিতে চাহিতেছ, জীবনসঙ্গিনীর কথা একটু শুনিবে না? দারিদ্র্য-সমুদ্র মন্থন করিয়া যে বহুমূল্য রত্ন বক্ষে পাইয়াছি, জীবনের কোন কথা বলিতে গেলেই যে তাহার কথা আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে! আমার এ দুর্ব্বলতাটুকু মাফ করিও ভাই।

"আমার বি.এ. পরীক্ষা শেষ হইবার মাসখানেক পরে পিতৃদেব পরলোক গমন করেন। যথাসম্ভব যতদূর সম্ভব চিকিৎসার বা সেবা শুশ্রূষার কোন ত্রুটী হয় নাই বটে কিন্তু ফল কিছু হইল না। চারি পাঁচ দিনের সামান্য জ্বরে সজ্ঞানে ভগবানের নাম করিতে করিতে তিনি বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাদের সকলের সাক্ষাতে মাকে বলিয়া গেলেন "তুমি ভেবো না; আমার খোকা রইল, সেই তোমাদের দুঃখ দূর কর্ব্বে; যামিনী ঠাকুর ত বলেছেন—'খোকা আমার হাকিম হবে।' তাঁর কথা মিথ্যা হবার নয়, এ আমি বলে যাচ্ছি!"

"এই যামিনী জ্যোতিষির নাম বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে। তখনকার সময় তাঁহার মত অত বড় জ্যোতিষী বাঙ্গালীদের মধ্যে আর দুইটী ছিল না। তাঁহার গণনার উপর আমাদের ত যথেষ্ট বিশ্বাস ছিলই, শুনিয়াছি বড় বড় সাহেবরাও তাঁহার দ্বারা ভাগ্যগণনা করাইতেন।

"যাহা হউক পিতার মৃত্যুর পর আমি অকূল পাথারে পড়িলাম। কোন কূল-কিনারা না পাইয়া—অবলম্বনহীন হইয়া শুধু হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। খাইবার পরিবার লোক ত আর নিতান্ত কম ছিল না, কিন্তু কে খাওয়াইবে পরাইবে? উপার্জ্জনযোগ্য তখন আমি একা। আর আমারই বা হঠাৎ কোথা হইতে চাকরী মিলিবে! এদিকে পিতারও কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল না। থাকিবে কেমন করিয়া? কালেক্টরীতে কাজ করিতেন বটে, আয়ও অবশ্য নিতান্ত কম ছিল না, কিন্তু তবু যে তিনি কিছু সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই,

তার কারণ ছিল। একে-ত বাবা সেকেলে লোক ছিলেন; দীন-দুঃখী অতিথ্-অভ্যাগতকে বিমুখ করিতে পারিতেন না। তদ্ব্যতীত সাত আটটী লোকের সর্ব্বপ্রকার খরচ সমাধা করিয়া পুত্রগণকে উপযুক্ত লেখাপড়া শিখাইয়া, যুগল কন্যার শ্বশুরের সমস্ত দাবী রক্ষা করিয়া তিনি যে কিছু সঞ্চয় করিয়া যাইবেন, এরূপ আশাকে দুরাশা বই আর কি বলা যাইতে পারে?

"পড়াশুনা যে এইখানেই সমাপ্ত হইল, সেজন্য তত ভাবনা হইল না। কনিষ্ঠা ভগিনী কিরণের বিবাহ দিতে হইবে, তাহারও কিঞ্চিৎ বিলম্ব ছিল। কিন্তু প্রধান চিন্তা হইল কোথায় চাকুরী পাইব, কেমন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে? সম্বল তো কিছুই নাই। মাকে সব কথা বলিতাম, মা সান্ত্বনা দিতেন—"তুমি ভেবো না বাবা, যেমন করেই হোক্ সংসার চলবেই, তুমি কায়মনে ভগবানকে ডাক'।

"ভগবানকে আমি কায়মনেই ডাকিতাম; কিন্তু এই 'যেমন করেই হোক্ চলিবে' কিছুতেই বুঝিতাম না। ভদ্রলোকের সন্তান, তাতে যা-হোক্ কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছি, যা-তা' কাজ তো আর করিতে পারি না। আর মুটে-মজুরী করলেই বা তাহা হইতে কতটুকু সাহায্য হইবে? তাই আমার ভাবনার শেষ ছিল না।

"যাহাহউক হঠাৎ দিনাজপুর স্কুলেই সহকারী ইংরাজী শিক্ষকের পদ শূন্য হইল। বুঝিলাম দৈবানুগ্রহ—আমার আকুল-আবেদন সর্ব্বপাপহারীর শ্রীচরণে পৌঁছিয়াছে! স্কুলের সেক্রেটারীর সহিত পিতৃদেবের বন্ধুত্ব ছিল, আমার এ বিপদে তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। শিক্ষকতা কার্য্যে আমার কোন অভিজ্ঞতা না থাকিলেও বি-এ, পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্স পাইয়াছিলাম বলিয়া চাকরী লাভ করিতে আমার বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

"শিক্ষকতার এই সামান্য আয়ে যে কিরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত তাহা মাতাঠাকুরাণী জানিতেন। বেতনের টাকা পঞ্চাশটি তাঁহার হাতে দিয়াই আমি খালাস হইতাম! খালাস হইতাম বটে কিন্তু মনের ভাবনা তো ঘুচিত না। কিরূপে বিনয়কে (আমার ছোট ভাই) মানুষ করিব, কিরূপে কিরণের বিবাহ দিব ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতাম না। অল্প আয়ের দরিদ্র শিক্ষক আমি, আমি কিরূপে এত টাকা সংগ্রহ করিব? কিন্তু হায়, নব্য সমাজ তো দরিদ্র বলিয়া আমাকে অনুগ্রহ করিবে না!

"হ্যাঁ, একটা কথা এতক্ষণ বলা হয় নাই। শিক্ষকতা কার্য্য যদিও গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা হইলেও যামিনী জ্যোতিষীর কথা আমি ক্ষণেকের জন্যও বিস্মৃত হই নাই। কথাটা আমার মানস সাগরে সর্ব্বদাই একটা তরঙ্গ তুলিত। এক এক বার মনে করিতাম, একবার 'ট্রাই' করিয়া দেখিতে দোষ কি? আবার পরক্ষণেই নিজের দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া হাসি পাইত! আমার মুরুব্বী কই! মুরুব্বীহীন যে এ-যুগে কোন কার্য্যেরই উপযুক্ত নয়! কিন্তু হাকিমির এমনি নেশা—ডেপুটিগিরির প্রতি এমনই লালসা—যে কিছুতেই আশা ছাড়িতে পারি না! মনে মনে আপনা আপনি প্রশ্ন করি, চেষ্টায় ক্ষতি কি? বিশেষতঃ এ যে যামিনী জ্যোতিষীর গণনা, তাহা তো মিথ্যা হয় না! হায়, মরীচিকা বুঝি এমনি করিয়া মানুষকে দিগভ্রান্ত করিয়া বিপথে লইয়া যায়!

"নানারূপ বিপদ জালে সে বৎসর এমনিই জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে ঐ অল্প সময়ের মধ্যে 'ট্রাই' করিবার কোন সুবিধা করিতে পারিলাম না। পর বৎসর যথারীতি আবেদন করিলাম, ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন— যথাসময় নিযুক্ত-পত্র আমার হস্তগত হইল।"

আমার কথায় বাধা দিয়া হঠাৎ শরৎকুমার বলিয়া উঠিলেন—"কি, আপনি তা' হলে ডেপুটি—"

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়া বলিলাম—"থাম ভাই, ব্যস্ত হইও না, আমার কথা শেষ করিতে দাও, তারপ[র] যা' বলিবার থাকে বলিও।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে বিশ্বামিত্র অবশ্যই কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন; কিন্তু তার চেয়েও আমাকে আ[রো] কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল যখন আমি বাঙালী সাধারণের চরম উপাস্য চাকরী, এই ডেপুটিগিরির জন্য ব্যা[কুল] হইয়াছিলাম!

কত রাজা-গজা সাহেব-সুবোর যে স্তুতিবাদ করিয়াছিলাম, তাহার আর ইয়ত্তা ছিল না! তবে সান্ত্বনার ক[থা] এই, যে তাহা হইতে কিছু ফল লাভ হইয়াছিল। কিন্তু ঐ ছত্র মূল্যহীন লেখার জন্য যে কত আত্মীয়ের আত্মী[য়] বন্ধুর বন্ধুর পদলেহন করিয়াছিলাম তাহা আজ এই পার ঘাটে বসিয়া স্বীকার করিতে আর লজ্জা কি? কে বুঝাইয়াছিলেন;—"দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে!"—ভবার্ত্ত!

যাহা হউক চাকরী লাভ করিবার পর হইতেই ভবঘুরে না হউক বদঘুরে যে হইয়াছিলাম সে বিষয় আর কো[ন] সন্দেহ ছিল না। আজ এখানে, কাল সেখানে করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। দ্বিতীয় অভিভাব[ক] কেহ না থাকায় পরিবারস্থ সকলকেই সঙ্গে রাখিতে হইত। এমনি করিয়াই কর্ম্মজীবনের প্রথম চারি বৎস[র] কাটিয়া গেল। পঞ্চম বৎসরে সদর সবডিবিসনাল অফিসারের ভার লইয়া ময়মনসিংহে আসিলাম।

এই ময়মনসিংহেই আমার জীবন-গতির পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়। আমার শুভাগমনের (?) সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের ভাগ্য বিধাতা সুযোগ্য গবর্ণর বাহাদুর বঙ্গদেশের এই বৃহত্তম জেলা পরিদর্শন করিতে আসিলেন সহরময় একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। নগরবাসীরা পূর্ব্ব হইতেই উৎসব আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, মিউনিসিপালিটি, অঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া প্রভৃতি সকলেই লাট সাহেবের অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনের জ[ন্য] ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যে সকল রাজপথ দিয়া মহামান্য লাট-সাহেবের শুভাগমন হইবে সেগুলি যথারীতি সংস্কারে বন্দোবস্ত হইল—কোনখানে সাধামত কোন ত্রুটী রহিল না। কালেক্টর-সাহেব আহার নিদ্রা একরূপ পরিত্যা[গ] করিলেন।

অভ্যর্থনার অঙ্গস্বরূপ আর একটী বিষয় তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কি অশুভক্ষণেই যে এই খেয়াল তাঁহা[র] মাথায় চাপিয়াছিল তাহা অন্তর্যামীই জানেন। স্কুল কলেজের উপযুক্ত ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে লইয়া একটা বা[ংলা] নাটক অভিনয় করিতে মনস্থ করিলেন। শুধু মনস্থ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না—অভিনয় করিতে বদ্ধপরি[কর] হইলেন। সহরে নানারূপ গুজব রটিতে লাগিল, চারিদিক হইতে কত আপত্তি আসিতে লাগিল। ছাত্র[ছাত্রী] সংযোগে অভিনয় সম্বন্ধে দোষ দেখাইয়া আমিও সাহেবকে অনেক বুঝাইলাম কিন্তু সবই বৃথা হইল। আমার যুক্তি শুনিয়া সাহেব প্রথমে তো হাসিয়াই উড়াইলেন!—আর যাহা বলিলেন তাহা আর সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করি[তে] না! যাহা হউক প্লে করাই ঠিক হইল এবং তজ্জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হইল তাহাতে সাহেব স্বয়ং প্রেসিডেন্[ট] হন করিয়া আমাকে সম্পাদক নিযুক্ত করিলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দুস্থানী যাত্রীদের মত বিপদ কখন একাকী আসিতে ভালো বাসে না। দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণই তাহাদের চির অভ্যাস। এক্ষেত্রেও সেই চিরন্তন প্রথার কোন ব্যতিক্রম হইল না। এক বিপদের সঙ্গে সঙ্গে আমার এক নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। সাহেব কিরণকেই রিজিয়ার অংশ অভিনয়ের সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যা পাত্রী স্থির করিলেন। কথা শুনিয়া আমার ত চক্ষুস্থির। ভাবিলাম, এ আবার কি বিপদ! কলেজের বয়স্ক যুবকদের সহিত ত্রয়োদশবর্ষীয়া এক হিন্দু যুবতীর প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয়—এ যে অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার! সাহেবকে বিবিধ ভাবে বুঝাইতে লাগিলাম, নানারূপ আপত্তি উপস্থিত করিলাম, বৃদ্ধা জননী দুঃখিত—না না মর্ম্মান্তিক আহত হইবেন এ কথাও তাঁহাকে বলিতে ত্রুটী করিলাম না। কিন্তু কোন ফল হইল না। আমার সমস্ত আপত্তি সমস্ত যুক্তি সাহেবের বক্তৃতা তরঙ্গে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সাহেব যে কেন এত জেদ করিতে লাগিলেন তাহার অবশ্য কারণ ছিল—রাণীর মত না হইলেও কিরণ ঐ শ্রেণীর বড় বেশী নীচে পড়িত না.—তাহাতে আবার বাংলা আবৃত্তি করিতে তাহার বিশেষ দক্ষতা ছিল, বালিকা বিদ্যালয়ের অনেক সভায় সাহেব কিরণের এই পরিচয় পাইয়াছিলেন। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, কালেক্টর সাহেব বোনাফাইড্ সাহেব হইলেও বঙ্গ ভাষার সহিত তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় ছিল।

ফলাফল ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। সমস্ত পথটা শুধু এই ভাবিতে ভাবিতে আসিলাম, যে আজ আমা হইতে এ কি হইল? মা-কেই বা কি বলিয়া বুঝাইব? তিনি বৃদ্ধা, তাহাতে সেকেলে লোক নব্য যুগের কোন রীতি নীতি তিনি বুঝিতেনও না, তাঁহার ভালোও লাগিত না। কিরণকে স্কুলে ভর্ত্তি করিবার সময়ই তিনি বলিয়াছিলেন, 'হিঁদুর মেয়ে ইস্কুলে পড়বে কি বাবা? বাড়ীতে কি তাদের কম শিক্ষা হয়?' আর আজ! আজ সে বিবাহযোগ্যা—গোঁড়া হিন্দু মতে বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এমন বয়সে সে যদি কলেজের বয়স্ক যুবকদের সহিত মিশিয়া প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে—না—না আমি যে ভাবিতেই পারি না—কী শোচনীয় তাহার পরিণাম! হোক না ক্ষণকালের জন্য! কিন্তু ক্ষণকালের সামান্য ঘটনাতেও যে বৃহতের অঙ্কুর লুপ্ত থাকে! উঃ কী ভয়ানক! শুধু এই কথাটাই তীরের মত আমাকে বারে বারে খোঁচা দিতে লাগিল। এ আমি কি করিলাম! অথচ—অথচ করিই বা কি?

কিরণ, রিজিয়ার অংশ অভিনয় করিবে, এ আনন্দ বিনয় মার কাছে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিল না। কিন্তু তাহার সকল আনন্দ তিরোহিত হইল যখন মা সেকথা শুনিয়া পুনঃ পুনঃ ললাটে করাঘাত করিতে লাগিলেন। আর আজ তাঁহার শিক্ষিত পুত্রেরা তাহাদের অশিক্ষিত বংশের গৌরব কিরূপ ভাবে রক্ষা করিতেছে, উদ্দেশ্যে তাহা আমার স্বর্গগত পিতৃপুরুষগণকে জানাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা দেই তখন আমার এমন কোন শক্তি ছিল না। তিনি বার বার আমাকে বলিতে লাগিলেন, 'আমার লেখাপড়া শেখা ছেলে তোমরা, তোমরা কেন মায়ের কথা শুনবে বাবা? হিঁদুর মেয়ে, ঘর গেরস্থালি যাদের কাজ, তাদের অত লেখাপড়া শেখবার দরকার কি বল? এই লেখা পড়া শেখাতে গিয়েই ত আজ এই বিপদ! এ কি করলে হরি ঠাকুর! নাঃ—আমি যে আর ভাবতেও পারি না!"

সান্ত্বনার সুরে আমি তাঁহাকে শুধু এই কথাটী বলিলাম—

"তুমি ভেবো না — যাতে তোমার মনে কষ্ট না হয়, আমি তার ব্যবস্থা কর্ব্ব।"

মা বলিলেন, "হাঁ, তাই করো বাবা। ছিঃ, হিঁদুর মেয়ের কি ওসব সাজে! বিশেষতঃ আমরা পরাধীন জাতি! স্ত্রী স্বাধীনতা কি আমাদের শোভা পায়! আমার বড় দুঃখ, যে, এত লেখা পড়া শিখেও তোমরা এই সাধারণ কথাটা বুঝ্‌তে পার না?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যাহা হউক দিনের মত দিন সমভাবেই গড়াইয়া যাইতে লাগিল। কিরণ রীতিমত রিহারস্যাল দিতে লাগিল। তাহার অভিনয় নৈপুণ্য সম্বন্ধে যতটুকু আভাস পাওয়া গেল, তাহাতে সকলেই বিশেষ প্রীতি ও মুগ্ধ হইলেন ক্রমশঃ দেখিতে দেখিতে অভিনয়ের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুবৃহৎ অভ্যর্থনা মণ্ডপ ও তাহারই পার্শ্বে সুদৃশ্য অভিনয় মঞ্চ প্রস্তুত হইল। রাশি রাশি দেবদারু পত্র রক্ত, পীত, হরিৎ বর্ণের পতাকা প্রভৃতিতে তাহা সুসজ্জিত হইল। সম্রাট, সম্রাজ্ঞী ও লাট সাহেবের মঙ্গল সূচক 'মটো'তে সে শোভার আরো বৃদ্ধি হইল। লাট সাহেব আসিবেন, অভ্যর্থনার আয়োজনে কিছুমাত্র ত্রুটী রহিল না।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে—তখনও লাটসাহেব আসিয়া পৌঁছেন নাই—অভিনয়োৎসবের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য কালেক্টর সাহেব একবার গ্রীণরুমে প্রবেশ করিলেন। দুই একটি কথা বলিবার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—Hallo, Mr. Ray, where is Kiron? I don't see her! Why she is so late? (মিঃ রায়, কিরণ কোথায়? তাকে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না! এত দেরী কেন তার?)

সঙ্কোচ ভয় ও বিনয়ের সহিত আমি উত্তর দিলাম, "কাল সন্ধ্যে থেকে তার বড্ড জ্বর হয়েছে সাহেব—হাই টেম্পারেচার—প্লে' করা তার পক্ষে অসম্ভব!"

আমার কথা শুনিবামাত্র কালেক্টর সাহেবের মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"সর্ব্বনাশ, তুমি বল কি মিঃ রায়? তা হ'লে উপায়?"

পার্শ্বস্থ এক সুন্দরী বালিকাকে দেখাইয়া আমি বলিলাম—

"এই যে—এই নলিনীই 'প্লে' কর্‌বে।

অনেক ভালো ভালো 'রোলে' ও নেমেচে! রিজিয়ার 'রোলেও' দুদিনবার নেমেচে, শুনেচি চমৎকার প্লে করে, কিরণের চেয়ে কোন অংশে 'ইনফিরিয়র' হবে না, দেখবেন!"

আমার কথা শুনিয়া কালেক্টর সাহেব যেন একটু আশ্বস্ত হইলেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা বেশ, কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে তুমি কি করে 'ম্যানেজ' করলে?"

আমি উত্তর দিলাম—"একটা মেন পার্ট, তার ডুপ্লিকেট রাখবার ইচ্ছা আমার অনেক দিন থেকেই ছিল। কি জানি হঠাৎ যদি কারো কোন অসুখ বিসুখ করে! তাই, আপনাকে না বল্‌লেও, আমি প্রায় সবকটা মেন পার্টেরই ডুপ্লিকেট রেখেছিলাম—এখন দেখছি না রাখলে বড় বিপদে পড়তে হ'ত! ঘড়ি দেখিয়া কালেক্টর সাহেব বলিলেন—"অলরাইট; হিজ এক্সেলেন্সীর আসতে এখনও কিছু দেরি আছে, দেখছি চল আমি কিরণকে একবার দেখে আসি—আমার 'কার' নিয়ে যাচ্ছি—এসো। আমি বলিলাম "কিরণ তো এখানে নেই! আজ সকালে তাঁকে

ঢাকায় পাঠিয়েছি সাহেব! তাই টেম্পারেচার দেখে—বিশেষতঃ আমি এদিকে ব্যস্ত রয়েছি—কাজেই এখানে রাখতে সাহস হলো না বিনয়কে দিয়ে—

কথাটা এমন অযুক্তিপূর্ণ বেফাঁস হইয়া গেল যে নিমেষের মধ্যে সমস্ত ঘটনা তিনি বুঝিয়া লইলেন এবং আমার কথা সমাপ্তির পূর্ব্বেই ক্রোধে গস্ গস্ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন।

মুখে কিছু বলিলেন না বটে; কিন্তু তাঁহার রোষকষায়িতলোচন ও মুখের অন্যান্য ভঙ্গিমা আমাকে যেন শাসন করিয়া গেল—

ড্যাউন রাইট লায়ার! ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে লেখা পড়া শিখে তোমরা এমন প্রতারণা কর্ত্তে শিখেচ! ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ!

যাহা হউক অভিনয়োৎসব নির্ব্বিঘ্নেই সম্পন্ন হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, একে অভিনয় কার্য্যে নলিনীর বেশ একটু দক্ষতা ছিল, তারপর তাহাকে গোপনে পূর্ব্ব হইতেই শিক্ষা দিতেছিলাম। কাজেই কোন অংশেই তাহার অভিনয় নিন্দনীয় হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কালেক্টর সাহেব ক্রমশঃ আমার কার্য্যের ত্রুটী দেখিতে লাগিলেন। ভবিষ্যতে সাবধান হইবার জন্য তাঁহার নিকট হইতে মাঝে মাঝে 'ওয়ার্ণিং লেটার' পাইতে লাগিলাম।

ব্যাপারটা যথারীতি হৃদয়ঙ্গম করিতে আমার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। তাই আমি বদলী হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু বিপদ যাহাকে শত বাহু বিস্তার করিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহার আর নিস্তার কোথায়! হঠাৎ আমার বিরুদ্ধে এক ঘুঁষের মামলা দায়ের হইল।

মোকদ্দমা দায়ের হইতে যতটুকু না বিলম্ব হইল, প্রমাণিত হইতে তাহার অর্দ্ধেক সময়ও লাগিল না। তাহার ফল হইল শুনিবে? ফলে এই, প্রতারক ঘুঁষখোর হাকিম কর্ম্মচ্যুত হইল।

কর্ম্মচ্যুত ত হইলাম! কিন্তু খাইব কি? পরিবারবর্গকেই বা খাওয়াইব কি? চাকরি ভিন্ন ত আমাদের মত লোকের—কলো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। সুতরাং আবার চাকরী অন্বেষণে বহির্গত হইলাম। কতজনের নিকট কতভাবে যে আবেদন জানাইলাম, কত লোকের যে দয়া ভিখারী হইলাম তাহা আর বলিতে পারি না। কিন্তু তবু কোন উপায় হল না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্বের উল্লেখ করিয়া স্কুলের চাকরী প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু বিএ ডিগ্রি লাভের পর যে এই সুদীর্ঘকাল বসিয়া আছে (সত্য ঘটনা তো আর কেহ জানে না)—অর্থাৎ শিক্ষকতা কার্য্যে যাহার কোন অভিজ্ঞতা নাই, তাহাকে কে চাকরী দিবে?

যাহা হউক এমনি করিয়া ছয় বৎসর চলিয়া গেল। এটা ওটা করিয়া দিন কাটাইলাম। কোন স্থায়ী কর্ম্ম জুটিল না। তারপর অকস্মাৎ ভাগ্যচক্রের একটু পরিবর্ত্তন ঘটিল। আমার বন্ধুর এক আত্মীয়ের সাহায্যে এই চাকরী লইয়া কলিকাতা আসি; তদবধি এই "গুরুদাস মেমোরিয়্যালে ই" আছি।

পাঁচ বৎসর হইতে এই কাজ করিতেছি। মাহিয়ানা বৃদ্ধি হইয়া ৪২৲ হইয়াছে। টিউসনি করিয়াও গোটা কুড়ি টাকা পাই। আয় অর্দ্ধশত মুদ্রা অধিক হইলেও ব্যয়ও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াছে। কয়েকটী পুত্রকন্যা দেখা দিয়া সুখ দুঃখের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছে। কিরণের বিবাহ যদিও অনেক দিন দিয়াছি এবং অন্য কোন অতিরিক্ত খরচও এখন নাই, তথাপি কিছুতেই সংসারের ব্যয় সঙ্কুলান হইতেছে না। তাই এই বয়সে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি।

ভগবানের ইচ্ছায় বিনয় এখন স্কুল বিভাগের এসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর। তাহারও বিবাহ দিয়াছি—একটী পুত্র সন্তানও হইয়াছে। ছেলেমেয়েদিগকে তাহার কাছেই পাঠাইয়া দিয়া এখানে একা আছি। এইত আমার কথা। এখন বল দেখি, ল পড়া ভিন্ন আমার আর কি গতি ছিল? ফাষ্টক্লাশ অনার্স পেয়ে, পাঁচবৎসর ডেপুটী-গিরি করে, শেষে একটা স্কুল মাষ্টারী জোটাতেও কত বেগ পেতে হয়েছে, একবার ভেবে দেখ দেখি? একি কম আক্ষেপ কম দুঃখের কথা ভাই; যদি ল টা পড়া থাকত তাহলে আজ আর এ বিপদে পড়তে হত না—বুড়ো বয়সেও আর এ ভোগ ভুগ্‌তে হত না। আমিত বেশ বুঝেছি ভাই, যে কোন একটা 'টেকনিকোল নলেজ' না থাক্‌লে আজকাল প্রস্পার করা কঠিন; খুব কষ্টসাধ্য হোক না, 'বার' ওভারক্রাউডেট তাতে কিছু আসবে যাবে না যদি 'মেরিট' দেখাতে পারি, যদি মক্কেলের উপকারের জন্য প্রাণপাত করে পরিশ্রম কত্তে পারি ভগবান অবশ্যই দয়া করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। কি বল তুমি?" শরৎকুমার এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া আমার গল্প শুনিতেছিলেন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তা বেশ করেছেন, কিন্তু ফাঁকিমাটী খুব করলেন যা হোক।" গল্প শেষ হইতে দেখিলাম গোলদীঘি জন বিরল হইয়া আসিয়াছে। একটা সিগার ধরাইয়া দুই বন্ধুতে 'মেস' অভিমুখে রওনা হইলাম।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু।

প্রেয়সী।

—※—

তব রূপ আহা রমণীয়
তনুখানি তব কমনীয়
বাহুলতা তব নমনীয়
তুমি মোর চির প্রেম-খনি
তোমা হ'তে নাহি মনোহরা
নাহি কেহ ভবে প্রিয়তরা
তাই আছো চির বুকভরা
কণ্ঠের হারে তুমি মণি।

তুমি মোর প্রিয়া প্রাণ-সমা
জনমে জনমে মনোরমা
মূর্ত্তি ধরিয়া দয়া ক্ষমা—
হইয়াছ গৃহে বরণীয়
ধরা-জীবনের বনে বনে
দুখ-জ্বালা আসে খনে খনে
ভাগ করে নিয়ে তোমা সনে
করিব জীবনে স্মরণীয়।

শ্রীকালিদাস রায়।

চন্দ্র।

—*—

চন্দ্র, সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারে একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। নৈশ-গগনপটে যাবতীয় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে সুধাংশু চন্দ্রই আমাদের নয়ন-মনকে সমধিক আকর্ষণ করিয়া থাকে। অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকার অবসানে যখন শুক্ল-দ্বিতীয়ার নব-শশিকলা আমাদের নেত্রপথে পতিত হয় তখন স্বতঃই একটা অপূর্ব্ব আনন্দ-প্লাবনে অন্তর ভরপুর হইয়া উঠে। এই সুধাংশুর অংশু-বসায়ন যোগে কবিগণ, শরদিন্দুনিভাননা—হিমাংশুবরণীগণকে কল্পলোকের পরী সাজাইয়া শতশত উপমার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদের কাব্যের পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে এইরূপ ইন্দুকান্তি-বিনিন্দিত কত মনোমদ উপমার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া আমরা পদে-পদে মুগ্ধ হইয়া থাকি। যখন ভাব-প্রাবল্যে বিভোর হইয়া সুধাকণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয়—

"ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন সৌরভ,
ভেসে আসে উচ্ছল জলদল কলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি জোছনার মৃদু হাসি
ভেসে আসে পাপিয়ার তান—
আজি—এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভাল
সে মরণ স্বরগ-সমান!"

তখন বাস্তবিকই একটা অনির্ব্বচনীয় মধুর ঝঙ্কার অনুভূতির নিভৃত কেন্দ্রে আপনিই সাড়া দিয়া উঠে।

* *
*

শুধু ভাবরাজ্যে নহে, জীব-জগতেও চন্দ্র কম প্রতিপত্তি লাভ করে নাই। ভারতের পূর্ব্ব-পরাক্রান্ত নৃপতিবর্গ আপনাদিগকে 'চন্দ্রবংশ' বলিয়া পরিচয় দিয়া কতই না গৌরব অনুভব করিয়াছেন ও জনসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের পূজা-পার্ব্বণ ও যাবতীয় শুভকার্য্য চন্দ্রাবস্থিত তিথি বিহিত মতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গলা মাসের নামকরণ চন্দ্রের অধিষ্ঠিত নক্ষত্রের নামানুসারেই হইয়াছে ;—বিশাখা নক্ষত্রে যে মাসে পূর্ণিমা তিথির অন্ত হয়, তাহার নাম—বৈশাখ ; এইরূপ জ্যেষ্ঠায়—জ্যৈষ্ঠ, পূর্ব্ব বা উত্তরষাঢ়ায়—আষাঢ়, শ্রবণায়—শ্রাবণ, পূর্ব্ব বা উত্তরভাদ্রপদে—ভাদ্র, অশ্বিনীতে—আশ্বিন, কৃত্তিকায়—কার্ত্তিক, মৃগশিরায়—মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ), পুষ্যায়—পৌষ, মঘায়—মাঘ, পূর্ব্ব বা উত্তরফল্গুনীতে—ফাল্গুন, চিত্রায়—চৈত্র মাসের পূর্ণিমার অন্ত হইয়া থাকে।

মানবদেহেও সে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। পূর্ণচন্দ্রোদয়ে যেমন নিখিল-জগৎ আলোকিত হয় সেইরূপ আমাদের আপাদমস্তক তাহারই বৈদ্যুতিক প্রবাহে আলোকিত হয়। তাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সম্ভূত একরূপ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে যদ্দ্বারা দৃষ্টি করিলে দেহমধ্যগত আলোকের গতি অনুভূত হয়। শরীরের উপর চন্দ্রের প্রভাব এই যন্ত্রে স্পষ্ট ধরা পড়ে। সচরাচর শ্বাস ও বাত রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় তাহাদের দেহে চন্দ্রের আধিপত্য মর্ম্মে-মর্ম্মে বেশ অনুভব করিয়া থাকেন।

সুধাকরের স্নিগ্ধ কররাশির প্রশংসা আমরা শতমুখে ঘোষণা করিয়াও ক্লান্ত হই না। কিন্তু সেই নন্দন-নন্দিত কিরণসম্পাত তাহার নিজস্ব সম্পত্তি নহে। উহা প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড দেহ-নিঃসৃত তীক্ষ্ণ কিরণ-জালের প্রতিবিম্ব মাত্র। সচরাচর কৃষ্ণপক্ষের প্রাতঃকালে শশধরের মধুর হাসিরাশি সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই নিষ্প্রভ মলিন হইয়া পড়ে। তখন একখণ্ড শুভ্র মেঘের উজ্জ্বলতা তাহার অপেক্ষা প্রায় কোন অংশে হীন বলিয়া বিবেচিত হয় না। একটী পূর্ণিমার পূর্ণশশী আমাদিগকে যে পরিমাণ কিরণ প্রদান করে তাহার ছয় লক্ষ গুণ কিরণ বিনিময় করিলে মাত্র একটী সূর্য্যের কিরণ লাভে অধিকারী হইতে পারি।

বারিধির বিপুল বারিরাশির বক্ষেও চন্দ্রের আধিপত্য অটুটভাবে বিদ্যমান। তাহার আকর্ষণ-বিকর্ষণ বশতঃ সমুদ্রে জোয়ার ভাটার উদ্ভব হইয়া থাকে। এ তথ্য সকলেরই পরিচিত।

* * *

তারাকান্ত, তারামণ্ডলীসহ প্রত্যহ গতায়াত করিলেও তাহার আর একটী স্বতন্ত্র গতি আছে। ঠিক সন্ধ্যার সময় তাহাকে যে নক্ষত্রটীর সহিত মিশিয়া-মিশিয়া চলিতে দেখি, নিশাশেষে দেখা যায়—যেন তাহার সহিত বিচ্ছেদ হইয়া সে একটু পূর্ব্ব দিকে সরিয়া পড়িয়াছে। আবার পরদিন সন্ধ্যায় যেন তাহার ভালবাসায় জলাঞ্জলি দিয়া আরও পূর্ব্বদিকে হটিয়া অপর তারকার শোভা সম্বর্দ্ধনে মনোনিবেশ করিয়াছে। চন্দ্রের এই দ্বিতীয় গতি অনুসারে ২৭·৩ দিনে, পথমধ্যবর্ত্তী তারকাবলীর সন্তোষ সাধন করিয়া পুনর্ব্বার প্রথম-দৃষ্ট স্থানে সমাগত হয়। সূর্য্যমণ্ডল হইতে চন্দ্র যতদূর সরিয়া পড়ে, তাহার দেহস্থ আলোকপ্রাপ্ত ভাগ ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কালে শুক্লা প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা তিথির উৎপত্তি হয় এবং যখন সে ক্রমাগত সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে তখন দেহস্থ আলোকপ্রাপ্ত ভাগের হ্রস্বত্ব পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে অমাবস্যার

অবসান হইয়া থাকে। এক অমাবস্যা হইতে আরম্ভ করিয়া এই গতিবশে (১) ২৯.৫৩ দিনের পর পুনর্ব্বার অমানিশার আগমন হইয়া থাকে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষার্থীগণ, চন্দ্রের এই পরিদৃশ্যমান গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া শিক্ষারম্ভ করিলে দুরূহ গণিত বিদ্যার কথঞ্চিৎ সৌকর্য্য সাধন হইতে পারে।

* * *

পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া দুইলক্ষ আটত্রিশ হাজার মাইল দূর হইতে চন্দ্র স্বীয় কক্ষপথে প্রতিনিয়ত পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই কক্ষপথের বক্রতা নিবন্ধন পৃথিবী হইতে তাহার দূরত্বের তারতম্য ঘটিয়া থাকে যখন দূরত্বের চরম সীমায় গিয়া উপস্থিত হয় তখন চন্দ্র ও পৃথিবীর মধ্যে ব্যবধান ২,৬০,০০০ দুই লক্ষ ষাট হাজার মাইল, আর যখন দূরত্বের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হয় তখন উভয়ের মধ্যে মাত্র ২,২০,০০০ দুইলক্ষ বিশ হাজার মাইল পথ ব্যবধান থাকে। এই দূরত্বের হ্রাসবৃদ্ধিনিবন্ধন আমরা চন্দ্রকে কখন ক্ষুদ্র কখন বা বৃহৎ বলিয়া অনুমান করিয়া থাকি।

দৃশ্যমান রবিপথ ও চন্দ্রপথ অসমসূত্রে অবস্থিত বলিয়া দুইটী বৃত্তাভাস পথ দুইস্থানে (সমার্দ্ধ পরিধি বিন্দুতে) ছেদ হইয়া থাকে। এই বৃত্তদ্বয়ের মধ্যভাগে আমরা পৃথিবীতে নিশ্চল অনুভবে বাস করিতেছি। পূর্ব্বোক্ত ছেদ-বিন্দু দুইটীর একটীতে চন্দ্র ও অপরটীতে সূর্য্য অবস্থান করিলে মধ্যগত পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়িয়া চন্দ্র গ্রহণ এবং স্বীয় গতিপথে উভয়ে এক বিন্দুর সমসূত্রে এক সময়ে উপস্থিত হইলে চন্দ্র কর্ত্তৃক সূর্য্যালোক অবরুদ্ধ হইয়া সূর্য্যগ্রহণের উৎপত্তি হয়।

* * *

আমরা মুক্ত নেত্রে যে সকল জ্যোতিষ্কমণ্ডলী বিমানমার্গে প্রত্যক্ষ করি, তন্মধ্যে নিশাকর চন্দ্রই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্ত্তী; তাই আমাদের কাছে নক্ষত্রগণ অপেক্ষা চন্দ্র বৃহদায়তন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই নৈকট্য-সম্বন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলেও চন্দ্র আমাদের পৃথিবী হইতে ২,৩৮,০০০ দুই লক্ষ আটত্রিশ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত! এই দূরত্বনিবন্ধন ২,১৬০ মাইল ব্যাস বিশিষ্ট পূর্ণচন্দ্র আমাদের চক্ষে একটা স্বর্ণগোলক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমাদের আধুনিক মতে পঞ্চাশটী চন্দ্র, একটী খলে মর্দ্দন করিয়া একটীমাত্র বটিকা প্রস্তুত করিলে উহা পৃথিবীর সমান আয়তন বিশিষ্ট হইতে পারে। নিক্তিতে তুলিয়া ওজন করিলে একদিকে পৃথিবী, অপর দিকে ৮০টী চন্দ্র ওজনে ঠিক সমান হইবে। আকার ও গুরুত্ব পরিমাণে চন্দ্র, পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র বলিয়া চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর আকর্ষণের ছয়ভাগের এক ভাগ মাত্র। আমরা এখানে যদি একমণ ওজনের লৌহগোলক উত্তোলন করিয়া সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইতে পারি, তবে চন্দ্রলোকে গিয়া অনায়াসে ছয়মণ

---

(১) গ্রহগণের গতি আট প্রকার যথা :—

বক্রানুবক্রা কুটিলা মন্দামন্দতরা সমা।
তথা শীঘ্রতরা শীঘ্রা গ্রহণামষ্টধা গতিঃ॥ সূর্য্যসিদ্ধান্ত ২অঃ ১২৫ শ্লোঃ।

ওজন গোলকের ক্রীড়া দেখাইয়া দর্শকের চিত্ত বিনোদনে সমর্থ হইব। এখানে উচ্চে ৪হাত লাফাইয়া উঠিতে পারিলে সেখানে ২৪হাত লাফাইতে কোন আয়াস বোধ হইবে না এবং এখানে ৫০হাত উর্দ্ধে ঢিল ছুড়িতে পারিলে সেখানে ৩০০হাত উর্দ্ধ পর্য্যন্ত ঢিল ছুড়িতে সমর্থ হইবে।

যদি আমরা মানসরথে কল্পনা অশ্ব যোজনা করিয়া কুমুদবন্ধুর বন্ধুর উরসে উপনীত হইতে পারি, তবে তাহার বাহ্যসৌন্দর্য্য তৎক্ষণাৎ আমাদের কাছে এক ভীষণ মৃত্যু-অভিনয় জাগাইয়া তুলিবে। সেখানে না আছে জল, না আছে বায়ু, না আছে জীব, না আছে উদ্ভিদ্—সুধাকরের উদাস-হৃদয় আগ্নেয়গিরির তপ্তোচ্ছ্বাসে হুহু করিতেছে! তাহার হৃদয়ক্ষেত্র প্রতপ্ত মরুভূমিতে পরিণত—সেখানে নেত্রস্নিগ্ধকর শ্যামল পত্রপুষ্প শোভিত তরুলতা নাই, বিবিধবর্ণ খচিত বিহঙ্গের কলতান নাই, হিংস্র জন্তুর বিকট-গর্জ্জন, মাংসভুক শকুনির পক্ষবিধুনন সেখানে একেবারেই অভাব। নিঃশ্বাস গ্রহণের উপযুক্ত একটুকু বায়ু বা পিপাসা শান্তির বিন্দুমাত্র পানীয় প্রদানে চন্দ্র নিতান্ত অক্ষম। চন্দ্রলোকে থাকিয়া একবার আমাদের এই "সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা" ধরণীর দিকে নেত্রপাত করিলে দেখিতে পাইব আমাদের 'ধরাচন্দ্র' চন্দ্রলোক অপেক্ষা সাড়ে তের গুণ বৃহৎ। কি উজ্জ্বলতায় কি স্নিগ্ধতায় 'ধরাচন্দ্র' 'গগণচন্দ্র' হইতে কত মনোমদ—কত নেত্রানন্দ প্রদায়ক! তখন যত শীঘ্র সম্ভব তল্পীতল্পা বাঁধিয়া ভগ্ন মনোরথে আরোহণ করিতে হইবে। পৃথিবীতে সুখ সম্ভোগের নিমিত্ত আমরা প্রতিনিয়ত যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করি, যাহা আমাদের জীবন ধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় তাহা চন্দ্রলোকে নাই বলিলেও চলে। দূরের দৃষ্টিতে যে চন্দ্র অমন বিমল, মনপ্রাণ স্নিগ্ধকারী সুধাকর—সামীপ্যে সেই কলঙ্কময়, জীববাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কেবল ভোগ্যবস্তুর অপেক্ষা কাম্যবস্তুর আপাতঃরম্য সৌন্দর্য্য অনন্তগুণে বর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগকে নিয়ত আসঙ্গলিপ্সার বশবর্ত্তী করিয়া তুলিতেছে—আমরা বাহ্যিক দৃষ্টিতেই মুগ্ধ! তাই পদে পদে মৃগতৃষ্ণিকায় প্রতারিত হইয়া আমাদের হৃদয়যন্ত্রে ঝঙ্কৃত হয়— "অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।"

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

ধাত্রীপান্না ও আশাশা।

—:০:—

[বণবীর উদয় সিংহকে হত্যা করিবার নিমিত্ত আগমন করিলে, বীর হৃদয়া ধাত্রী কিরূপে আত্মজকে কাল কবলে নিপতিত করিয়া উদয় সিংহের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন সকলেই সেই অলৌকীক ঘটনা পরিজ্ঞাত। বর্ত্তমান কবিতায় ধাত্রীপান্না কিরূপে উদয়কে লইয়া দ্বারে দ্বারে বিমুখ হইয়া ঘুড়িয়া বেড়াইয়াছিলেন এবং অবশেষে কিরূপে আশাশার দয়াবতী জননী উদয়কে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহাই বর্ণিত হইল]

(১)

কহিলা পান্না আশাশারে ডাকি,—
"শোন সামন্ত রাজ!
যাহার অন্নে হতেছ পালিত
তাহারে রাখ হে আজ;

ডুঙ্গরপুর দেবলরাজ্য
গেছিনু সকল ঠাঁই
ভয়ে ভীত তারা সংগ্রাম সুতে
আশ্রয় দেয় নাই।
ঘুরি' সব ঠাঁই বিমুখ হইয়া
এসেছি তোমার রাজ্যে;
মহাবীর তুমি, বীর্য্য তোমার
দেখাও রাণার কার্য্যে।"

(২)

অবনত শিরে ধীরে ধীরে তারে
কহে সামন্ত রাজ,
"শোন হে ধাত্রি! বড়ই বিপদে
ফেলিলে আমারে আজ।
রণবীর এবে মেবারের রাণা
—তাহারি রাজ্যে বাস;
তাহার শত্রু আশ্রয় দিলে
হবে যে সর্ব্বনাশ!—"

(৩)

"কি কহিলি ওরে?" না ফুরাতে কথা
হেরিল সামন্ত রাজ,
জননী তাহার কহিছে ঘৃণায়
"ধিক্ তোরে! রে নিলাজ!
যাহার অন্নে হয়েছ পালিত
তাহারে বিপন্ন করি,
দূরে সরে যাও অধম অকৃতী
দস্যুর ভয়ে ডরি?
কিসের বিপদ বীর পুত্রের
যুদ্ধ যাদের খেলা,
যাহারা ডরে না শত শত্রুরে
মরণে যাদের হেলা।

শোন বাছা কথা, ধর্ম্ম এখনো
যায় নি রে একেবারে,
আপন ধর্ম্ম যে করে রক্ষা
ধর্ম্ম রাখেন তারে।
নিতে হবে তোরে রাণার কুমারে
আদরে বরণ ক'রে,
প্রয়োজন হলে হৃদয় রুধির
ঢেলে দিবি অকাতরে।"

(৪)

"তাই হোক্ দেবি।" কহিলা আশাশা
"জননি তোমার বাণী,
তিল তিল করি করিব পালন—
হৃদয় রুধির দানি।"

শ্রীমণীন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত।

ডালি।

—:*:—

১—ভারতে নারীর অধিকার।

বর্ত্তমান যুগে সর্ব্ব দেশের নারীগণ নিজেদের অধিকার বিস্তারে ব্যস্ত। মহাসমর তাঁহাদিগকে সে পথে অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। পাশ্চাত্য রমণীগণ নানা কার্য্যে পুরুষদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন,—কার্য্যদক্ষতাও দেখাইতেছেন। ইহার পরিণাম কি—তাহার বিচারে এত যুক্তি তর্ক, এত কথা কাটাকাটি হইয়াছে যে তাহাকে দ্বন্দ্ব ও ভেদের রূপান্তরই বলা যায়—সেগুলির বিচারের সময় এখন নয়। স্রোতের প্রবল গতি রোধ করিবার প্রয়াস বৃথা—ফলাফল তাহার যাহাই হউক। তবে ইহা নিশ্চয়—এতদিন রমণী গৃহের অধিষ্ঠাত্রী কর্ত্রী থাকিয়া যে গৃহস্থালী যেরূপ ভাবে পাতিতেন এখনকার গৃহের ব্যবস্থা তাহা হইতে হইবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভারতের বিশেষতঃ বাঙ্গলার পুরুষদের এ বিষয়টা লইয়া বেশী ভাবিত হইবার কথা, কারণ তাঁহারা অন্দরকে অন্তর হইতে অন্তরিত করিয়া বহুদিবসাবধি বাহিরেই ছুটাছুটী করিয়া ফিরিতেছেন। শ্রীমতী ঠাকুরাণীদের যারো আনাই যেমন বাহিরের আলোকের অযোগ্য হইয়া ঘেরাটোপ ঢাকা খাঁচার পাখী হইয়া পড়িয়াছেন—পুরুষদের পক্ষেও তেমনি গৃহস্থালীর ব্যবস্থা 'গিন্নীপণা' করিতে গেলেই—"অনো করলে লাঠী বাজে।"

মান্দ্রাজে ইহার উচ্চবাচ্য শুনা গিয়াছে—বাঙ্গলায় নয়। বাঙ্গালী সর্ব্ব বিষয়ে উদাসীন—যতক্ষণ তাঁহাদের ঘাড়ে কোন কিছু চাপিয়া পড়িয়া তাঁহাদিগকে ভূশায়ী না করে ততক্ষণ তাঁহাদের নিদ্রা বড় ভাঙ্গে না। এ শোয়াস্তির কারণ আছে। কারণ বাঙ্গলার রমণীগণ সহজে উচ্চবাচ্য করিতে চান না; তাঁহাদের দুঃখের পরিমাণ হয় না, অথচ তাহার প্রতিকার তাঁহাদের কেরোসিনে আত্মসমর্পণে। অনেক স্থলে আবার এই নারী নির্য্যাতনের কারণ নারী—কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা দায় হইয়াছে।

নারী-শিক্ষার বহুল বিস্তার ভারতে,—বিশেষতঃ বাঙ্গলায় অতি আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে তাহা বিনা-বিচারে কেবলমাত্র বঙ্গনারীর বুদ্ধি বিপর্য্যয় দেখিলেই বুঝা যায়। নানা প্রকার কুসংস্কার ও অজ্ঞতা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া আছে। শিক্ষিতা নারীগণ তাঁহাদের ভগিনীগণের শিক্ষার জন্য চেষ্টিতা হউন,—ইহাই তাঁহাদের জীবনের প্রধান ব্রত হউক—নতুবা অজ্ঞতা তাঁহাদিগকে বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিয়া বহু প্রকারে নির্য্যাতিত হইতে হইবে। গৃহে তাঁহাদের প্রদীপ অক্ষয় থাকুক—কিন্তু তাহা আলোকে উদ্ভাসিত হউক—আঁধার যে ক্রমেই জমাট বাঁধিয়া আসিতেছে। সময় সমুপস্থিত। সৌভাগ্যের বিষয় ভারতীয় নারীর কথা পার্লামেণ্ট মহাসভায় পর্য্যন্ত বিবেচিত হইয়াছে। মেজর হিল্স সেদিন মহাসভায় ভারতীয় নারীর অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

পার্লামেণ্ট সভায় তিনি রক্ষণশীলদলের লোক। সভার কার্য্য আরম্ভ হওয়া মাত্র তিনি প্রস্তাব করেন, ভারতের স্ত্রীলোকদিগকে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হউক। ভারতের স্ত্রীলোকেরা খুব বুদ্ধিমতী, সকল বিষয়ে সুদক্ষা ও বিচক্ষণা। তাঁহাদের অনেকের পুস্তকগত বিদ্যা না থাকিতে পারে, তাহাতে কি? লেখা পড়া জানে না, এমন অনেক পুরুষকেও নির্ব্বাচনাধিকার দেওয়া হইয়াছে। বোম্বাইর স্ত্রীলোকেরা মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে ভোট দিয়া থাকেন। ভারতের ৫০ লক্ষ পুরুষ ভোট দানের অধিকার পাইবেন, আমার প্রস্তাব গ্রাহ্য হইলে ১০ লক্ষ স্ত্রীলোক সেই অধিকার লাভ করিবেন। স্ত্রীলোকেরা ভোট দিতে পারিবে কিনা, যদি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে এই প্রশ্ন নির্দ্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া যায়, তবে এক এক প্রদেশে এক এক রকম ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হওয়ার কথা। অতএব পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক এতৎ সম্বন্ধে বিধি করিয়া দেওয়া হউক।

মিঃ মণ্টেগু বলেন, জয়েণ্ট কমিটির নিকট যাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই স্ত্রীলোকদের ভোট দানের সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং স্ত্রীলোকদিগকে যদি ভোট দানের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়, তবে পার্লামেণ্ট ভুলই করিবেন। অপর দিকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে স্ত্রীলোকদিগকে ভোট দানের অধিকার দিতে ভারতের অনেক প্রদেশের লোক খুব আপত্তি করিয়াছেন। সুতরাং এই প্রশ্নের মীমাংসার ভার ভারতবাসীর উপর অর্পিত হউক।

মিঃ স্পুর বলেন যদি বিলের মধ্যে উহার ব্যবস্থা করা না হয়, তবে ভারত-গবর্ণমেণ্টকে পার্লামেণ্টের এই দৃঢ় ইচ্ছা জানাইয়া দেওয়া হউক যে স্ত্রীলোকদিগকে ভোট দানের অধিকার যেন দেওয়া হয়।

লর্ড উইণ্টারটন বলেন; স্ত্রীলোকদিগকে বঞ্চিত করিলে ভারতেও নারীজাতির অধিকার স্থাপন প্রয়াসিনী একদল স্ত্রীলোকের আবির্ভাব হইবে।

মিঃ বেনেট বলেন, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার উপরই এই বিষয়ের মীমাংসার ভার দেওয়া ভাল। বোম্বাইর ব্যবস্থাপক সভা নিশ্চয়ই অতি শীঘ্র নারীদিগকে ভোটদানের অধিকার দিবেন।

শিক্ষা মন্ত্রী মিঃ ফিসার বলেন, অনেক প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভাই নারীদিগকে অধিকার দিবেন। মিঃ হিল্সের প্রস্তাবের পক্ষে ৬৭ ও বিপক্ষে ২০২ জন ভোট দেওয়াতে উহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। আজ অগ্রাহ্য হউক ক্ষতি নাই, স্বায়ত্ব শাসনে নারীর অধিকারের কথা ভাবিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষার কথা ভাবিবার বিষয় নয় কি?

ভারতীয় নারীর স্বাস্থ্য-সমস্যা দিন দিন জটীল হইয়া উঠিতেছে। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোথায় মাতৃবংশের উন্নতি সাধিত হইবে না ক্রমেই অবনতি। বহুকাল হইতে নারীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পুরুষেরা, এমন কি নারী নিজেও উদাসীন। জীবন-সংসারের দিনে সর্ব্বাপেক্ষা সহ্য করিতেছেন,—নারী ও তাঁহাদের বক্ষের ধন! অথচ ইঁহারাই জাতীয়তার ভিত্তি ভূমির প্রথম উপাদান!

কলিকাতায় উন্নত কলকারখানায়, বাণিজ্য ব্যবসায়,—আর অসংখ্য পায়রার খোপের ন্যায় আলোক-বাতাসহীন গৃহাবলীতে! আহারায় চায়ের জল, নানা প্রকার দূষিত ভেজাল মিশ্রিত খাদ্য, আর শিশুর সম্বল—টিনের দুগ্ধ বা ভুট্টার গুঁড়া কর্ণফ্লাউয়ার! স্বাস্থ্য আর ফিরিবে কোথা হইতে?

এত দিন যে সমস্যা ছিল মহানগরীর, এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে দেখা দিয়াছে—মফস্বলে! দুগ্ধাদির অভাবে পল্লীর শিশুদের প্রাণ ধারণ করিতে হইতেছে ঐ সকল কদর্য্য 'খাদ্যে'।

'শঠী' নামক এক প্রকার খাদ্যের মূল্য কিছু সুলভ সুতরাং এ দেশে বহুলভাবে প্রচলিত। কিন্তু ইহা এমনই অপরিষ্কার অবস্থায় আমদানী করা হয় যে অব্যবহার্য্য! এ দিকে কেহ দৃষ্টিপাত করিলে ঘরে লক্ষ্মী ও কার্ত্তিকেয়ের কৃপা উভয়ই হইতে পারে! কিন্তু কে দেখে!

দুঃখনিশা অবসানের অনেক দেরী! যে দেশের পুরুষই পেচক স্বভাব, অন্ধকার-প্রয়াসী উষার আলোক চক্ষে পতিত হইবা মাত্র চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তমসাচ্ছন্ন কোটরে, তাহাদের পুরাতন বাসে পলায়ন করিয়া কৃতার্থ হয়, সে দেশের রমণীর স্থান কোথায় জগত তাহার বিচার করিবে—করিতেছে, আমরা কেবল তাহা শুনিয়া রাগে অস্থির হইয়া ফুলিতে থাকি, ক্রোধের ফল ভোগ করি! মুখে বলি রমণীর মান্য আমাদের সর্ব্ব উচ্চে,—কার্য্যতঃ, রাখিতে চাই, রাখিই নারীকে সর্ব্ব পশ্চাতে,—সম্পূর্ণ অবজ্ঞায়িত অবস্থায়।

সমাজের এ ব্যবহারের পরিবর্ত্তন করা সহজ নহে। আবাল্য সংস্কারঅন্ধ যুবক শিক্ষিত হইয়াও সকল শিক্ষা হারাইয়া ফেলে ঐ সংস্কারে; নারীও নিজেই আপনাতে অস্থাহীনা। শিক্ষিতা রমণী—কেবল পাশ ও পুস্তকের বিদ্যায় পারদর্শী হইলেই যথেষ্ট হইল না—স্বভাবের অভাব পূরণ করিয়া ভারতের সতী আদর্শে নির্ম্মল নারী-ধর্ম্মের উদ্ধার সাধনে যত্নবতী হউন। আদর্শের অভাব নাই। সীতা সাবিত্রীর উদাহরণের প্রয়োজন কি,—সকলেই স্বস্ব হৃদয় পরীক্ষা করুন। ভারতের নারী হৃদয় ভগবান যে অতুলনীয় বৃত্তিতে ভূষিত করিয়াছেন; নানা আবিলো, বাহিরের কোলাহলে চঞ্চল না হইয়া মাতৃশক্তি যদি তাহার গতি অনুভব করিতে যত্নবতী হন, আপন আপন হৃদয় বৃত্তির অনুসরণ করেন, তাহা হইলেই ভারতের দুঃখনিশা অবসান হইবে। হৃদয়, ত্যাগে সর্ব্ব আবিল্যমুক্ত হউক, দয়ামায়ামমতাময়ী মা আমার তখন যে বিদ্যায়, যে দেশের বিদ্যায়, গৃহে বাহিরে যেখানে আত্মনিয়োগ করিবেন সেখানেই অমৃত ধারায় মৃত ভারতকে সঞ্জীবিত করিতে সমর্থা হইবেন; যে দিন আপনাদের আগ্রহের অপেক্ষায় অদূরে অপেক্ষা করিতেছে, কল্যাণময়ী মা তাহা বরণ করিতে কাল হরণ করিও না আর! জগতের নারী জাগিয়াছে—তাঁহাদের দেশের আদর্শে, তোমরা জাগ্রত হও, তোমাদের দেশের আদর্শে,—সকলকে রক্ষা কর মা।

—ম।

২—ভারতে নারীর স্থান।

বর্ত্তমান জানুয়ারী মাসের "মডার্ণ রিভিউ" পত্রে শ্রীযুক্ত লালা লাজপত রায় মহোদয় লিখিয়াছেন—"ভারতীয় নারীর অধোগত অবস্থা ঢাকিবার জন্য আমরা বহু যুক্তিতর্কের অবতারণা করি না কেন, পুরাকালে তাঁহাদের অবস্থা যতই উন্নত থাকুক না কেন, এক্ষণে যে তাহা অতি নিম্নে সে কথা আর স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই। ভারতীয় নারী,—কি হিন্দু, কি মুসলমান,—পারিবারিক জীবনে ও সমাজে কোন কোন স্থানে প্রভাব বিস্তারে সমর্থা হইলেও সাধারণতঃ তাঁহারা যে ক্রমেই নিম্নগামী হইতেছেন ইহা অতি সত্য! ভারতের অনুন্নত জাতির ন্যায় নিখিল ভারতের নারীজাতিরও সামাজিক ও নৈতিক ধর্ম্মের উত্থান-প্রচেষ্টার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া যাঁহারা স্ত্রী ও পুরুষের "সাম্য" জোর গলায় প্রচার করেন আমি তাঁহাদিগের সহিত সম্পূর্ণ এক মত হইতে অসমর্থ। আমার মনে হয় যাঁহারা স্ত্রীপুরুষের সমতা প্রচার করেন, তাঁহারা কোন্ কথার কি অর্থ সে বিষয় একেবারে বিবেচনায় আনেন না। নারী—নারীই, পুরুষ—পুরুষই! তাহারা উভয়ে সর্ব্ব বিষয়ে সমান এ উক্তি একেবারে অর্থহীন। নারী বরং পুরুষ অপেক্ষা কতকগুলি বিষয়ে বেশী উন্নত। প্রেমে, ভালবাসায়, পবিত্রতায়, সন্তানবাৎসল্যে, সেবাধর্ম্মে, সান্ত্বনাদানে, সমবেদনায় প্রকৃতিকঠোর পুরুষ অপেক্ষা কোমল-স্বভাবা নিখিল নারীর স্থান কত উচ্চে তাহা অস্বীকার করিয়া অকৃতজ্ঞতার বোঝা কোন পুরুষই বোধ হয় বৃদ্ধি করিবেন না। নারীহৃদয়ে যে অনাবিল নিঃস্বার্থ সহানুভূতির কোমল প্রবাহ অবিরত উৎসারিত হইতেছে, কুপ্রবৃত্তি হইতে বহু দূরে অবস্থান করিয়াও কেবল মাতৃত্বের গৌরবে পুষ্ট হইয়া জননী সৃষ্টি রক্ষার জন্য যাহা অনুভব করেন তাহার জন্যই কি তাঁহারা পুরুষের অপেক্ষা উচ্চে দাঁড়াইবার অধিকারী নহেন? পক্ষান্তরে শৌর্য্যে, ধৈর্য্যে, সহ্যগুণে, সমরে, শাসন-শক্তিতে, প্রকৃতিকে করতলগত করিতে, কঠোরতাই যে স্থলে গুণ তাহাতে নারী অপেক্ষা পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদী।

হ্যাভলক এলিস্ (Havelock Ellis) সাহেব তাঁহার সাময়িক প্রবন্ধে বলিয়াছেন 'স্ত্রীপুরুষের মানসিক বৃত্তি ও ব্যক্তিত্বে প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নাই—এ-মত অনেকে প্রচার করেন; কেহ বা বলেন,—পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব একটা আকস্মিক ঘটনা ব্যতীত আর কিছুই নহে, স্ত্রীত্বের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ প্রদান কর, দেখিবে—নারী কোথায় গিয়া দাঁড়ায়।'

এলিস সাহেব বিষয়টি সুযুক্তির সহিত আলোচনা করিয়া প্রথমতঃ স্ত্রী ও পুরুষের দৈহিক গঠনের পার্থক্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। দেহ সুস্থ সবল সুদৃঢ় হইলেই যে মস্তিষ্ক তদনুরূপ হইবে, অথবা দেহ রুগ্ন দুর্ব্বল হইলেই যে উহা শক্তিহীন হইবেই ইহা সত্য নহে বটে, কিন্তু দেহের সহিত মস্তিষ্কের যে অতি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে ইহা সাধারণতঃ স্বীকৃত। মস্তিষ্ক দেহের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের—প্রতি অংশের—প্রতিনিধি স্বরূপ। স্ত্রী ও পুরুষের দেহ-গঠনে মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান, সুতরাং তাহাদের স্নায়ুমণ্ডলীতে এবং মস্তিষ্কেও অবশ্যই তদনুরূপ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। নারী মাতা না হইলেও মাতৃত্বের নিমিত্ত তাঁহার দৈহিক গঠনে যে বৈশিষ্ট্য, তাহাতেই তাঁহার মস্তিষ্ক তথা মনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। এইরূপ স্ত্রীপুরুষের পেশী গঠনেও মূলগত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। অসভ্য সমাজে স্ত্রীলোকেরা সমস্ত শক্তির কার্য্যে অভ্যস্ত থাকা সত্ত্বেও দৈহিক বলে পুরুষের সমকক্ষ কখনও হইতে পারে নাই; এবং সভ্য সমাজে কতকগুলি নারী বহু যত্নে নানাবিধ ব্যায়াম চর্চ্চা করিয়াও পুরুষের সহিত শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী হইতে পারেন নাই। ইহার কারণ যাহাই হউক না কেন, তাহার ফলে উভয়ের মানসিক শক্তিরও যে বিভিন্নতা

ঘটিয়াছে তাহা সুনিশ্চিত স্ত্রী ও পুরুষের কর্ম্মশক্তির হিসাব তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেখা গিয়াছে যে স্ত্রীগণ পুরুষ অপেক্ষা অল্পেই দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া পড়েন। বালক ও বালিকাদিগের শক্তি তুলনায় দেখা গিয়াছে যে বালিকারা প্রথম বয়সে বালকগণ অপেক্ষা শীঘ্র এবং সহজে কতকগুলি বিষয় বুঝিতে পারিলেও তাহাদের এই বুদ্ধিশক্তি একটানা ভাবে অগ্রসর হইতে পারে না। পনর ষোল বৎসরের পর তাহাদের উন্নতি স্রোত এক প্রকার বদ্ধই হইয়া পড়ে; কিন্তু বালকগণ তাহাদের উন্নতি-রেখায় সমান ভাবেই অগ্রসর হইয়া যায়।

এক দল পুরুষ বলেন স্ত্রীগণ সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানাবিধ কর্ম্মের অনুপযুক্ত। আবার এক দল স্ত্রীলোক বলিয়া থাকেন যে পুরুষগণ নৈতিক হিসাবে নারী অপেক্ষা হীন। এলিস সাহেব উভয় দলকে ভ্রান্ত মনে করেন। তিনি বলেন—"আমরা অনেকেই মনে মনে বিশ্বাস করি যে আমাদের সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের যে বিভিন্ন আসন ও কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে উহা এক বিশ্বব্যাপী সনাতন ব্যবস্থার অনুগত বস্তুতঃ এ ধারণা একেবারে ভিত্তিহীন। জগতে এমন কোন সামাজিক আসন, গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য এবং জাগতিক বৃত্তি নাই (অবশ্য মাতৃত্ব ছাড়া) যাহা কেবল মাত্র স্ত্রী অথবা কেবল মাত্র পুরুষের জন্য নির্দ্দিষ্ট। এক দেশে একই যুগে যে কর্ম্ম পুরুষের করণীয় আবার এমন দেশও আছে যেখানে সেই কর্ম্মই নারীর দ্বারা অনুষ্ঠেয়।" আফ্রিকায় কোন কোন স্থানে নারীরা সূচ স্পর্শও করেন না। উহা পুরুষের কর্ম্ম। কোনও নারীর গাউন ছিঁড়িয়া বা ফাটিয়া গিয়াছে, যে স্বামী তাহা তৎক্ষণাৎ লক্ষ্য করিয়া সেলাই করিয়া দিলেন না, তিনি স্বামীই নহেন। স্বামী-মহাশয়ের এতাদৃশ গুরুতর দোষাবহ অমনোযোগীতাই তাহাদের বিবাহভঙ্গের যথেষ্ট কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

এইরূপ অনেক আলোচনার পর সুবিজ্ঞ এলিস সাহেব যে দুইটি মোটামুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন আমি তাহার সহিত সম্পূর্ণ একমত এবং আমি উহা আমার স্বদেশবাসীগণকে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। তিনি বলেন একদিক হইতে দেখা যায় স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মধ্যে মূলগত সাদৃশ বা সাম্য অনেক আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও দেখা যায় যে মানব-ইতিহাসে অসাধারণ ধীশক্তি (Genuis) এবং অতিরিক্ত নির্বুদ্ধিতা (Idiory) এই যে দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত-বিকাশ দেখা যায়, ইহা প্রধানতঃ পুরুষের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়। নারী জাতির মধ্যে বুদ্ধির বিভিন্নতা অধিকতর অল্প সীমার মধ্যে আবদ্ধ। নারী জাতির মধ্যে প্রতিভাশালিনীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প; ইহাতে মনে হয় মানব জাতির উন্নতি ব্যাপারে পুরুষই পথ-প্রদর্শক থাকিবে।

অপর দিকে দেখা যায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে মূলগত বৈষম্যও অনেক। এই বৈষম্য তাহাদিগের দৈহিক গঠন এবং প্রকৃতিতে দৃঢ়-সংবদ্ধ। যে সকল সংস্কারক এই স্বাভাবিক বৈষম্যকে উপেক্ষা করিয়া নারী ও নর উভয়কে সর্ব্বতোভাবে সমান কল্পনা করিয়া নারীকে পুরুষ এবং পরুষ ভাবে গড়িয়া তুলিতে যত্নবান তাঁহাদের সে চেষ্টা কেবলমাত্র নিরর্থক বলিলে যথেষ্ট হয় না—পরন্তু মহানিষ্টকারী। নারী চিরকালই দৈহিক গঠনে এবং মনো-বৃত্তিতে নর হইতে বিভিন্ন থাকিবেই থাকিবে এবং তাহাতেই উভয়ের মঙ্গল। এক সম্প্রদায়ের যে সমস্ত ভাব বা ঝোঁকের (aptitude) অভাব আছে অন্যে তাহা পূরণ করে এবং তাহাতেই সংসার সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়। এই পার্থক্য আছে বলিয়াই নর ও নারী পরস্পরকে মুগ্ধ করে। এ প্রকৃতি দত্ত আকর্ষণের কে মূলচ্ছেদ করিতে পারে? সে চেষ্টায় উপকারের আশাই বা কোথায়? খোদার উপর খোদাকারীতে বাহাদুরীও নাই, মঙ্গলও নাই।

লালা সাহেব অবশেষে বলিতেছেন—"ভারতীয় নারী ও পুরুষ পরস্পরের সামাজিক অবস্থা তুলনা করিতে যাইয়া আমি পূর্ব্বাপরই বলিয়া আসিতেছি তাহাতে নারী অতিশয় অধঃপতিতা হইয়াছেন। কিন্তু চিরকাল তাঁহারা

এরূপ ছিলেন না। তাঁহাদিগের দুর্গতি দূর করিতে হইবে, অবস্থার উন্নয়ন করিতে হইবে। কিন্তু এই কার্য্যে সমাজ-সংস্কারকেরা যেন পুরুষ হইতে তাঁহাদের মৌলিক পার্থক্যের কথা একেবারে ভুলিয়া না যান। অবশ্য কেহ যেন এ কথায় মনে না করেন আমি নারীগণের ভোট-অধিকারের বিরোধী।"

জ—ন।

৩—ধার করা বিদ্যা।

শান্তিনিকেতন পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন :—

আমরা কোনো বিষয়ে জোরের সঙ্গে মৌলিকতা প্রকাশ করিতে পারিলাম না, এই প্রশ্ন আমাদের মনে উঠিয়াছে। ইহার কারণ, বিদ্যাটাও যেখান হইতে ধার করিয়া লইতেছি বুদ্ধিটাও সেখান হইতে ধার করা। কাজেই নিজের বিচার খাটাইয়া এ বিদ্যা তেজের সঙ্গে ব্যবহার করিতে ভরসা পাই না। বিদ্যা এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রে ইংরেজের ছেলে পরবশ নহে, তাহার চারিদিকেই স্বাধীন সৃষ্টি ও স্বাধীন বিচারের হাওয়া বহিতেছে। একজন ফরাসী বিদ্বান নির্ভয়ে ইংরেজি বিদ্যায় বিচার করিতে পারে, তার কারণ যে ফরাসী বিদ্যা তাহার নিজের সেই বিদ্যার মধ্যেই বিচারের শক্তি ও বিধি রহিয়াছে, এইজন্য মাল যেখান হইতেই আসে যাচাই করিবার ভার তাহার নিজেরই হাতে; এইজন্য নিজের হিসাব মত সে মূল্য দেয় এবং কোন্‌টা লইবে কোন্‌টা ছাড়িবে সে সম্বন্ধে নিজের রুচি ও মতই তাহার পক্ষে প্রামাণ্য। কাজেই জ্ঞানের ও ভাবের কারবারে নিজের পরেই ইহাদের ভরসা। এই ভরসা না থাকিলে মৌলিন্য কিছুতেই থাকিতে পারে না।

আমাদের মুস্কিল এই যে, আগাগোরা সমস্ত বিদ্যাটাই আমরা পরের কাছ হইতে পাই—সে বিদ্যা মিলাইব কিসের সঙ্গে, বিচার করিব কি দিয়া? নিজের যে বাটখারা দিয়া পরিমাপ করিতে হয়, সেই বাটখারাই নাই। কাজেই আমদানি মালের উপরে ওজনের ও দামের যে টিকিট মারা থাকে সেই টিকিটটাকে ষোল আনা মানিয়া লইতে হয়। এই জনাই আমাদের ইস্কুল মাষ্টার এবং মাসিকপত্র-লেখকদের মধ্যে এই টিকিটে লিখিত মালের পরিচয় ও অঙ্ক যে যতটা ঠিকমত মুখস্থ রাখিতে ও আওড়াইতে পারে, তাহার ততই পসার বাড়ে। এতকাল ধরিয়া কেবল এমনি করিয়া কাটিল কিন্তু চিরকাল ধরিয়াই কি এমনি করিয়া কাটিবে?

শিক্ষার প্রণালী ও ভাষা।

আমরা মাতৃভাষা যখন শিখি তখন কোনো ভাষাসম্বন্ধে আমাদের মনে কোনো সংস্কারই নাই। এই কারণে এই শিক্ষার প্রণালীই বিশুদ্ধ অপরোক্ষ প্রণালী। তাহার পরে আমাদের সাত বা আট বছর বয়সে যখন বিদেশী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করি তখন ভাষা সম্বন্ধে আমাদের মনের সংস্কার পাকা হইয়া গেছে। তখন সেই পূর্ব্বসংস্কার আমাদিগকে পদে পদে বাধা না দিয়া থাকিতে পারে না।

নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যখন আমাদের সংস্কারের পরিবর্ত্তন বা বিস্তার ঘটিতে থাকে, তখন তাহাতে মনের ভার বৃদ্ধি করে না। ছেলেবেলায় জানিতাম দিগন্ত রেখাতেই দিকের সীমা, এখন জানি দিকের সীমা নাই। দিকের ধারণা সম্বন্ধে আমার ছেলেবেলার সংস্কার এখনকার সংস্কারের বিরুদ্ধ হইয়া আড্ডা গাড়িয়া বসিয়া নাই, এক সংস্কার আর এক সংস্কারে বিলীন হইয়া গেছে।

কিন্তু ভাষার সংস্কার এ জাতের নয়। মাতৃভাষার এবং ইংরেজি ভাষার সংস্কার চিরদিনই পাশাপাশি বিরুদ্ধ হইয়া বাস করিবে—একটা আর একটাকে আত্মসাৎ করিয়া লইবে না। এই জন্যই পরভাষা শেখা এবং তাহাকে ব্যবহার করার এত দুঃখ।

এমন স্থানে আমাদের মন কি করে? দুইকে যখন সম্পূর্ণ এক করিয়া দিয়া সে ভার লাঘব করিতে না করিতে তখন দুই স্বতন্ত্র পদার্থের মধ্যে একটা সম্বন্ধে ঘটাইতে চেষ্টা করে। সেই সম্বন্ধকে বলিব তুলনার সম্বন্ধ। যে ভাষা শিখিতেছি সে ভাষা আমার মাতৃভাষার সঙ্গে কোনখানে মেলে না ইহাই স্পষ্ট করিয়া জানার দ্বারাই নূতন ভাষার আয়ত্ত করা স্বাভাবিক প্রণালী। যাহা জানি তাহারই সঙ্গে তুলনা করিয়া যাহা জানিতেছি তাহাকে আমরা জ্ঞানের অঙ্গ করিয়া লই।

সাত আট বছর বয়সে যে বাঙালীর ছেলে ইংরেজি শিখিতেছে তাহার পক্ষে ঐ ভাষা একটা বিষম উৎপাত। ঐ বয়সের ইংরেজের ছেলের পক্ষে ফরাসী বা জার্ম্মন ভাষা তেমন উৎপাত নহে। ইংরেজি শিক্ষাতত্ত্ব গ্রন্থে Foreign language শিক্ষা বলিয়া যে আলোচনা আছে তাহা ইংরেজের পক্ষে য়ুরোপীয় ভাষা শিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনা। সে আলোচনা যে আমাদের ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষাসম্বন্ধে খাটে না সে কথা মনে রাখা দরকার। আমরা যখন হিন্দি শিখি তখন সে পরিচ্ছেদের পরামর্শ গ্রহণ করিলে ক্ষতি নাই। ইংরেজি ভাষাকে সম্পূর্ণ অপরোক্ষ প্রণালীদ্বারা শিক্ষা দিতে গেলে বাঙালীর ছেলের পক্ষে যে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হয় সে সময় দেওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব। বিলাত ফেরত বাঙ্গালীর ঘরে যেখানে তেমন করিয়া সময় দেওয়া হয় সেখানে ছেলেরা বাংলা ভাষসম্বন্ধে ফিরিঙ্গি হইয়া ওঠে। অর্থাৎ সেখানে স্বভাবতই এক ভাষাকে ঠেলিয়া কোণে সরাইয়া দিয়া অন্য ভাষাটি আধিপত্য করে। দুই ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষার পরাভবকে যাঁরা শোচনীয় না মনে করেন তাঁরা স্বভাবত এই অপমান বা অপঘাতমৃত্যুতে বেদনা বোধ করেন না।

তাই আমরা মনে করি যতদূর সম্ভব মাতৃ ভাষার সঙ্গে বার বার তুলনা করিতে করিতে বাঙালীর ছেলেকে ইংরেজি শেখানো উচিত—অর্থাৎ যে ভাষা সে জানে সেই ভাষাই পটভূমিকার উপরে অন্য ভাষাটাকে নিক্ষেপ করিয়া দেখাইলে তাহার চোখে অন্য ভাষাটা ক্রমশই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

(শান্তিনিকেতন)

৪—শিক্ষার আদর্শ।

শিশুশিক্ষা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন সংস্কার।

কিছুদিন পূর্ব্বে খবরের কাগজে গ্রে সাহেব এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের মত প্রকাশ করেছিলেন, তা' পড়ে আমি বড় আনন্দলাভ করেছিলুম। তিনি বলেন "এই বর্ত্তমান যুদ্ধে আমাদের এই কথা বেশ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে আগামী কালের সাধারণ শিক্ষার প্রণালী গতকালের প্রণালী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হতে বাধ্য।" আমাদের জাতীয় ভবিষ্যৎ আপনাদের হাতে, এই কথা মনে করে আবেগ কম্পিত হৃদয়ে আমি আপনাদের দু'এক কথা বলচি।

শিশুদের চিত্তবৃত্তি আপনারা যে ভাবে বিকশিত করে তুলবেন তার উপর আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করচে। আজ পৃথিবী পাপের ভারে মুহ্যমান, জিত এবং বিজিত উভয়েই হীনতার পঙ্কে নিমজ্জিত, ঈর্ষার বিষদিগ্ধ বাক্য বিনিময়ে মত্তপ্রায়।

যুদ্ধের ফলে এই যে সামাজিক এবং নৈতিক বিপর্য্যয় ঘটেছে এবং যুদ্ধ অবসানে সন্ধিপত্র এই বিপর্য্যয়কেই যখন চিরন্তন করে তোল্‌বার অভিপ্রায় জানাচ্চে, তখন সব জিনিষকে পুনর্গঠিত ও সুসংস্কৃত করে তোলবার ভার আপনাদের উপর রয়েচে। যদি শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন নতুন মানুষ গড়ে তুলতে না পারেন তবে ইউরোপ মত্ততার নিম্নতম স্তরে নেমে যাবে।

লোকে বলবে "কেন এই বৃথা প্রয়াস? মানুষের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।" হাঁা, তা ঠিক, পরিবেষ্টনই মানুষকে গড়ে' তোলে, আর একথাও ভুললে চলবে না যে খাদ্য এবং বাতাসের চেয়ে শিক্ষাই মানুষকে রূপান্তরিত করে।

যে শিক্ষা আমাদের সর্ব্বনাশে অতল গহ্বরে টেনে নিয়ে যাচ্চে সে শিক্ষাকে আর টিঁক্‌তে দেওয়া চল্‌বে না! সমস্ত বিদ্যালয় থেকে দূর করে দাও সেই শিক্ষা যে শিক্ষা শিশুদের মনে নরহত্যাপ্রিয়তা এবং পাপপ্রবণতা জাগিয়ে তোলে।

শিশুদের পাঠ্যপুস্তক হত্যা, অনাচার, দুর্ব্বল পীড়ন এবং দুর্ব্বলদের পৃথিবী থেকে চিরবিলুপ্তির ইতিহাসে ভরা Cinemaতে ছেলেদের এই সব ছবি দেখানো হয়, আর সৈনিকের বেশ পরে ছেলেরা সব বুক ফুলিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়; এ অবস্থা শুধু জর্ম্মানিতে নয়, আমাদের দেশেও তাই।

এই সব নিদারুণ অভ্যাস দূর করতে হবে। অধ্যাপকরা শিশুদিগের কর্ম্ম এবং প্রেমের জয়গান করতে শিক্ষা দিন, যুদ্ধ বিরোধকে ঘৃণা করতে শিক্ষা দিন। পরের প্রতি ঈর্ষা, এমন কি অতীতের শত্রুর প্রতি বিদ্বেষভাব যেন তাদের মনে স্থান না পায়।

বিদ্বেষকে ঘৃণা করতে শেখান্। সমস্ত পৃথিবীর কাছে আপনাদের গুরুতর দায়িত্ব রয়েছে একথা ভুল্‌লে চল্‌বে না। শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করে সামাজিক বিপ্লব জাগিয়ে তুলে সব বলিষ্ঠ কর্ম্মীপুরুষ তৈরী করে তুলুন। যারা কর্ম্মী, বীর, তারাই বাঁচবে, আর সব বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এই সব শুভ চিকীর্ষু কর্ম্মীরা কেবল মাত্র স্বজাতির জন্যে নয় সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য, একথা যেন তারা না ভোলে।

দগ্ধ কর সেই সব বই যা মানব বিদ্বেষের সমর্থন করে। কর্ম্ম এবং প্রেমের জয় গান কর। আপনারা এমন সব বীর তৈরী করে তুলুন যারা এই উগ্র গর্ব্বস্ফীত স্বাজাত্য এবং Imperialism কে পদদলিত করে পৃথিবী থেকে চিরনির্ব্বাসিত করতে পারবে।

আর যুদ্ধ নয়, আর বাণিজ্য নিয়ে রেষারেষি নয়; আমরা চাই এখন কর্ম্ম এবং শান্তি। সব মানুষই এক, এই চেতনা যদি আমাদের মনে জাগ্রত না হয় তবে আর আমাদের ধ্বংস থেকে কে রক্ষা করবে?

আমার অন্তরের একটি একান্ত বাসনা আপনাদের কাছে নিবেদন করচি। আমার আন্তরিক ইচ্ছা এই যে একটা আন্তর্জাতিক শিক্ষকসমিতি সংগঠিত হোক্ এবং তাঁরা সকলে মিলিত হয়ে স্থির করুন কি প্রণালীতে

শিশুদের শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য এবং এমন সব ভাব প্রচার করুন যার ফলে পৃথিবীতে অক্ষয় শান্তি স্থাপিত হবে আর "সব মানুষ এক" এই ধারণা বিশ্ববাসীর মনে বদ্ধমূল হবে।

একটা জগৎজোড়া আমূল পরিবর্ত্তনের সময় এসেছে! পাপশক্তি আপনার বিষে আপনি জর্জ্জরিত হয়ে মরবে। নরহন্তা, লোভী, নিষ্ঠুর যারা তারা দূষিত রক্তাধিক্যে নিজেরাই কেটে মরছে।

গর্ব্বান্ধ ও পাপিষ্ঠ উপরওয়ালাদের চর্ব্বিতার উৎপীড়নে জনসাধারণ পিষ্ট ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, কিন্তু তবু এই জনসাধারণ মাথা উঁচু করে জেগে উঠবে বিশ্বব্যাপী এই জনসাধারণ এক মহা মিলন ক্ষেত্রে মিলিত হবে এবং socialistদের এই ভবিষ্যদ্বাণী তারাই সফল করবে "সকল কর্ম্মীর মিলনেই জগতে অক্ষয় শান্তি স্থাপিত হবে।"

(শান্তিনিকেতন)

৫—বট।

বটকে 'বৃক্ষনাথ' বা 'দেববৃক্ষ' বলিয়া অভিহিত করা হয়। বটবৃক্ষের ন্যায় ছায়াপ্রদ বৃক্ষ আর নাই। বটের ছায়া শীতকালে উষ্ণ ও গ্রীষ্মকালে শীতল। "ঝুরি" নামায় বট বহু স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। "ঝুরি" সমেত বটবৃক্ষ যেন একটি অতি প্রকাণ্ড ছত্র।

মধুপুর ও পাথরোলের মধ্যপথে একটি বিশাল বটবৃক্ষ দেখা যায়। উহা শিবপুর বাগানের বটবৃক্ষের ন্যায় প্রকাণ্ড। শিবপুরের বৃক্ষটী ৯৫০ ফুট উচ্চ ও উহা হইতে ৬০ ফুট উচ্চ ৭২০টী ঝুরি নামিয়াছে।

আকারে বট যেরূপ গরীয়ান্, উপকারিতায়ও তদ্রূপ অতুলনীয়; এই জন্যই বট হিন্দুর চক্ষে পূত ও অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছে। চিকিৎসকের নিকটেও ইহা কম আদরণীয় হয় নাই। ডাক্তার কুন্টার সাহেব একবার বট দ্বারা "ব্রঙ্কাইটীস্" নামক শিশুদের শমন সদৃশ রোগ আরাম করেন।

বৈদ্যশাস্ত্রে আছে "বটানাং বিসর্পনাশকাং"—বটবৃক্ষই বিসর্প নামক দুরারোগ্য অতীব যন্ত্রণাদায়ক রোগ-নাশক। বিসর্প রোগ কোন প্রকার ঔষধেই আরোগ্য হয় না; বিখ্যাত বিখ্যাত ডাক্তারগণ বিসর্প রোগ আরোগ্যাতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বট যকৃত ও প্লীহা সংযুক্ত জ্বরের পাচনের একমাত্র অনুপান। চার্ব্বাক মুনি কোন এক সময়ে একটী জ্বরাতিসারগ্রস্ত রোগীকে বটের ছাল দ্বারা আরাম করেন, তাহার প্রমাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। চীন দেশের কোন এক বিখ্যাত ডাক্তার বট সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার অনুবাদ দিলাম।

* Once I had an occassion to pass over an India lady's case. The lady had her Cav-baflot torn to two, but by applying the milky juice of a tree which very likely seems to be a banian. She was cured. Certainly I do admit it is baniaa which I have often seen to reign over the forests in Bengal. Doctors could do nothing with the sore as the juice did. "—Frasor's Visit to Up-Country.

বাড়ীতে বটগাছ থাকিলে কাটা প্রভৃতি ঘায়ে ভয় নাই।

"বটের ছাল সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ একটী রোগীকে প্রায় তিন মাস ধরিয়া খাইতে দেওয়ায় সেই রোগী আরোগ্য লাভ করে। বটের নাম পূর্ব্বে জানিতাম না—জনৈক বাঙ্গালী বন্ধু বটকে চিনাইয়া দেন। এই বন্ধুকে শত ধন্যবাদ দিই।" ভ্রমণকারী ফ্রেজার কি লিখিয়াছেন*—কণ্ঠনালীতে যে একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "দামাচির" মত স্ফোটক হয়—বটের ছালের কাথ উহার অব্যর্থ ঔষধ। আসামের জনৈক প্রাচীন ও বহুদর্শী বিদ্বান "বড়ুয়া" মহাশয় বলেন—"শিফাজহর পত্রঅ মোহর রাংবু নি। পত্র অটা পিশিকরি দেইবা—আয়ুর্ব্বেদঅ বটীকা সমা অইবু।" বটের পত্র পিশিয়া বটী না করিবে, তাহাতে দাদ প্রভৃতি আরোগ্য হইবে।

গাত্রদাহে বটের আটা মাখা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। ডাক্তার দুর্গাদাস বলিয়াছেন "হয় কচি কালো পাঁটার রক্ত না হয় বটের আটা মাখাইও। ইহাতে যেমনই গাত্রদাহ হউক না কেন নিশ্চয়ই আরাম হ'বে।"

বিখ্যাত দস্যু রত্নাকারের (বাল্মীকি) বিবরণে রামায়ণের একস্থানে আছে যে বটের আটার দ্বারা তাঁহার কাটা কাণের লতা জুড়িয়া যায়। আবার তাপ্তিয়ার বিবরণেতেও এইরূপ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যে ক্ষতের অব্যর্থ মহৌষধ সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

ডাক্তার ব্রেঁরো বলেন—"If you had a banian, no fear of cut, sores or bruises." ৺প্যারীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মধুপুর ভ্রমণ কালে একটী ঘটনা দেখেন, ঘটনাটী এইরূপ—আমি যখন পাথরোলের কাছাকাছি তখন গাড়ীর দরজায় আমাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোকের আঙ্গুলটী দু' আধখান হইয়া যায়। কাছে কোন ডাক্তার ছিল না যে ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিই। কেবল জল দিতে দিতে যাইতেছিলাম দেখিয়া রাস্তায় জনৈক স্থানীয় প্রাচীন ব্যক্তি বটের আটা দিতে বলিলেন। বটের আটা দিবামাত্রই রক্ত বন্ধ হইল। এইরূপ বটের আটার সাহায্যে স্ত্রীলোকটী তিন দিনে আরাম হইয়া উঠে।"

আমি একবার নিজেই নাসিকাভ্যন্তরস্থ ক্ষতরোগে বিষম কষ্ট পাই। বিখ্যাত প্রাচীন ও বহুদর্শী হোমিও-প্যাথী কৃতবিদ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অনুরোধে বটের আটা দিই। সাত দিনের মধ্যে ক্ষত শুকাইয়া যায়। আমি এই রোগে এক বৎসর ধরিয়া কষ্ট পাইতেছিলাম। বটের দ্বারা কুষ্ঠব্যাধি আরাম হয় কিনা, এই বিষয় লইয়া অনেক কৃতবিদ্য বৈজ্ঞানিক, প্রাজ্ঞ ডাক্তার ব্যস্ত আছেন। বটে যে যে দ্রব্য আছে তাহাতে কুষ্ঠ প্রভৃতির ন্যায় দুরারোগ্য ব্যাধি আরাম হইবার সম্ভাবনা। আমেরিকার 'সায়েণ্টেফিক আমেরিকায়' বটের আটা কুষ্ঠাদি-ক্ষত রোগ আরোগ্যকারী কিনা এই বিষয়ে আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে।*

বটের আটার নিম্নলিখিত পদার্থগুলি আছে—

১।	হৃদজান দ্বিঅম্ল Hydrogen Peroxide.	৩২	৪।	মাখন Cream.	৭
২।	বোরিয়ম Boric.	১৬	৫।	আইডিন Iodide.	১২
৩।	আলবুকুটেজিন্ Albuetijin.	২০	৬।	জলীয় পদার্থ Miscellaneous watery substances.	১৩

বটের দুগ্ধ ব্রণ-আরোগ্যকারী বলিয়া বিখ্যাত। বটের দুধ না থাকিলে যত প্রকার ক্রিম বা পাউডার লোপ পাইত। ফরাসী দেশের বিখ্যাত সৌন্দর্য্যালোচনা সভা হইতে ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে বটের দুধ ব্রণনাশক।

* November 1909, Scientific Amrican.

ডাক্তার রেঁা বলেন—"Milk juice of the banian is the best face cream powder. It releives itches or scraps on the face." ইংলণ্ডের নৈকা শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলেন—"I daily use banian juice." সুন্দরীকুলাগ্রগণ্যা ইন্দুবালা ব্রণ উপশমের জন্য বটের আটা ব্যবহারে ব্রণের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন।

শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

৬—বঙ্গ শিশুর স্বাস্থ্য।

অস্মদ্দেশে শিশুর মৃত্যু সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতেছে। পাশ্চাত্যদেশের লোকে স্বাস্থ্যের নিয়মানুসারে থাকায় মৃত্যু-সংখ্যা অনেক কম, হাজারকরা ১৫ অংশ। আমাদের দেশে সুতিকাগারেই প্রায় ½ অংশ শিশু অকালে প্রাণত্যাগ করে ও প্রতি সহস্র নবজাত সন্তানের অর্দ্ধাংশ প্রায় দশ বৎসরের মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হয়। কলিকাতা সহরে মৃত্যুর হার শতকরা ৩৫ অংশ; অন্যান্য দেশে প্রায় শতকরা ২৫ জন। কিন্তু বিলাতে নবজাত সন্তানের এই অর্দ্ধাংশ ৫০ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। বিলাতের তুলনায় পঞ্চম বর্ষের অনধিক বয়স্ক বালক ও পঞ্চাশোর্দ্ধ প্রবীণের মৃত্যুর পরিমাণ এ দেশের দ্বিগুণ হইয়া থাকে। ইহা বড় কম আক্ষেপের কথা নয়। বঙ্গের ভাবী বংশধরগণকে রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক জননীকে শিশু পালন সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া এইরূপ ভয়াবহ অবস্থায় প্রতিকার করা উচিত। আমরা অন্ধকূপের মত বদ্ধ কারাগারে সুতিকা-গৃহ নির্দ্দিষ্ট করি বলিয়া এক মাসের মধ্যেই শিশু ক্ষীণজীবী হইয়া পড়ে এবং সামান্য অযত্নের ফলে সর্দ্দি বা ম্যালেরিয়ার প্রকোপে নূতন সংসারে অধিক দিন বাঁচিতে পারে না। এজন্য পিতামাতাকে যথেষ্ট মনস্তাপ পাইতে হয়। প্রকৃতপক্ষে যে গৃহে উত্তমরূপ বায়ু পরিচালন ও আলোক প্রবেশ করিতে পারে, সেই প্রকার গৃহ সুতিকাগারের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলে মৃত্যুসংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইবে সন্দেহ নাই।

আমরা শিশু ও বালক-বালিকাদিগের পোষাকের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখি না, দাসদাসীর উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকি। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছদ এমন ভাবে ঢিলা থাকা উচিত, যেন পেশীসমূহের প্রসারণে বাধা না দেয়। ঢিলে পেণী বা ফ্রক দ্বারা শিশু ও বালকবালিকাদিগের সমস্ত মেরুদণ্ডটী উত্তমরূপে আচ্ছাদিত রাখা কর্ত্তব্য এবং উহা এরূপ ভাবে প্রস্তুত (কাঁধে বোতাম দিয়া) করিবে যেন সহজেই খুলিতে পারা যায়। ছেলেদের কোটের বোতাম চোস্তভাবে আঁটা উচিত নয়। কারণ, তাহাতে পঞ্জরাস্থির স্বাধীন গতি রহিত হইয়া ফুসফুস্ মধ্যে আবশ্যকমত বিশুদ্ধ বায়ু যাইবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে। উহাদের কোমরবন্ধের দ্বারা সর্ব্বনিম্নস্থ পঞ্জরাস্থির উপর যেন চাপ না পড়ে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। বালকবালিকাদিগকে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় উন্মুক্ত স্থানে কিছুক্ষণ খেলা করিতে দেওয়া আবশ্যক এবং তাহারা নিজেদের ইচ্ছামত দৌড়াদৌড়ি করিলে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া অনুচিত। কারণ তদ্দ্বারা পেশী ও অস্থি বলবান হয়। ব্যায়াম কালে সকল স্থানের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়; বিশেষতঃ ত্বকের নিম্নস্থ রক্তবহা নাড়ীগুলি অধিক রক্তে পরিপূর্ণ হওয়ায় ঘর্ম্ম হইতে থাকে। ব্যায়ামের সময় ঐ প্রকার ঘর্ম্ম হওয়া আবশ্যক; ঐ সময়ে শরীরাভ্যন্তরস্থ উত্তাপ কমিয়া যায়।

এজন্য ঐ সময়ে ঠাণ্ডা লাগিবার বিশেষ সম্ভাবনা। এবং বাত অথবা আভ্যন্তরিক কোন যন্ত্রের প্রদাহ হইতে পারে। এজন্য ব্যায়ামের সময় গাত্রে চাদর আচ্ছাদন থাকা উচিত। ব্যায়াম শেষ হইলে ঐ পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া শুষ্ক ও গরম পরিচ্ছদ ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে সকল বালকবালিকাদিগের পৈত্রিক বাত বা কফের পীড়া থাকে, তাহাদিগকে সর্ব্বদা পশমী পোষাকে আচ্ছাদিত রাখিবে। কিন্তু সাধারণ সুস্থ বালকবালিকাদিগকে ঐ প্রকার বাঁধাবাধি নিয়মে রাখিবার আবশ্যক নাই। তাহারা খোলা গায়ে খেলিয়া বেড়াইলেও দোষ হয় না। তবে ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় তাহাদের উপর কর্ত্তৃপক্ষের একটু লক্ষ্য রাখা উচিত।

ছেলেদের কাপড় ও জামা একদিন অন্তর সাবান দিয়া ধৌত করা আবশ্যক; নচেৎ তন্মধ্যস্থ ময়লা লোমকূপের ছিদ্র দিয়া শরীরে প্রবেশ করিলে নানা প্রকার চর্ম্মরোগ হইতে পারে। সুস্থ বালকবালিকাদিগকে প্রত্যহ উত্তমরূপ সরিসার তৈল মাখাইয়া ঠাণ্ডা জলে গা ধৌত করান আবশ্যক। স্নানের পর শুষ্ক তোয়ালে দিয়া গাত্র ঘর্ষণ করিলে শরীর উত্তপ্ত থাকে। এজন্য ঘর্ষণ করা উত্তম প্রথা। ঠাণ্ডা জলে স্নান করান অভ্যাস করাইলে ঋতু পরিবর্ত্তন সময়ে হঠাৎ কোন প্রকার ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না। স্বাস্থ্য রক্ষা ও সৌন্দর্য্যের জন্য বালকবালিকাদিগকে প্রত্যহ স্নান করাইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা একান্ত আবশ্যক। স্নান না করাইলে ত্বকের ছিদ্রসমূহ বন্ধ হইয়া যায়। ফলে, শরীরমধ্যস্থ দূষিত পদার্থ বহির্গত হইতে না পারায় নানা প্রকার ব্যাধি আক্রমণ করে। স্নানের পর চুলগুলি ক্রস দ্বারা আঁচড়াইয়া পরিষ্কার রাখা উচিত। ছেলেদিগকে সাঁতার শিক্ষা দেওয়া বিশেষ আবশ্যক; কারণ, সকল প্রকার ব্যায়াম অপেক্ষা সন্তরণ উৎকৃষ্ট এবং অনেক সময়ে বিপদ হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে পারে।

আজকালকার বালকেরা শয্যা হইতে উঠিয়া মুখ হাত না ধুইয়া বিছানাতেই চা পান করিয়া থাকে। এ প্রথা সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয় এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। প্রত্যহ প্রাতে দাঁতন অথবা ব্রুসের সাহায্যে কয়লার গুঁড়া কিম্বা চাখড়ি দিয়া দন্ত ধাবন করা উচিত। দন্ত ধাবন না করিয়া কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করা দোষাবহ তদ্দ্বারা অনেক সময়ে ক্রিমি এবং অজীর্ণ রোগে ভুগিতে হয়।

বালকবালিকাদিগকে খালি পায়ে আর্দ্র ভূমির ঘাসের উপর বেড়াইতে দেওয়া অতীব অন্যায়; কারণ, হুকওয়ার্ম্ নামক কীটাণু পদ দ্বারা ত্বকের মধ্যে প্রবেশ করে এবং রক্তবহা নাড়ীর সহিত হৃৎপিণ্ডে চালিত হইয়া ফুসফুসের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু উহারা আকারে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বলিয়া ফুসফুসের সূক্ষ্ম শিরা মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া এ্যালভিওলির প্রাচীর ভেদ করিয়া ফুসফুসের গর্ত্ত মধ্যে থাকে। অবশেষে শ্বাসনালীর দ্বারা ল্যারিংসে আসিলে উক্ত হুকওয়ারমের কীটাণু সকল কফ বা গয়েরের সহিত গলাধঃকৃত হইয়া পাকাশয়ে পতিত হয়। তথা হইতে ক্ষুদ্র অন্ত্রে গিয়া নিজ নিজ হুকের ন্যায় দন্ত দ্বারা অন্ত্রস্থ ঝিল্লির রক্ত শোষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। তাহাতে রক্ত ক্রমশঃ পাতলা হইয়া রক্তহীনতা রোগ জন্মে। ফলে, মাথাধরা অজীর্ণ, পেট বেদনা, বুক দুড় দুড় করা এবং শোথ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্যানিটারি কমিশনারের তদন্তে প্রকাশ পাইয়াছে যে, মেদিনীপুরে শতকরা ৬৪.৭, হুগলিতে ৮৬ এবং কলিকাতায় ৪৭৯ জন লোক হুকওয়ারম্ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক স্ত্রী-জাতীয় কীটাণু অন্ত্র মধ্যে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৬০০০ ডিম্ব প্রসব করে। পরে মলের সহিত ঐ ডিম্ব সকল নির্গত হইয়া যায়। ভিজে, সেঁতসেঁতে ছায়াযুক্ত স্থানে অথবা গরম মৃত্তিকায় ডিম্বসমূহ ছোট ছোট কীটাণুতে পরিণত হয়, কিন্তু তাহা এত ক্ষুদ্র যে চক্ষু দ্বারা

দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐ সকল কীটাণু অনেকের পদতলের নিম্ন কিম্বা উপরিস্থ চর্ম্ম ভেদ করিয়া দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। অথবা ঐ জীবাণু কাঁচা তরকারি কিম্বা পুষ্করিণী, পাতকুয়া অথবা নদীর জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া মুখ-গহ্বর দিয়া মানব দেহে প্রবেশ করে। এই প্রকার ভয়াবহ ও মারাত্মক ব্যাধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হ'লে কদাচ খালি পায়ে থাকিবে না। জুতা বা খড়ম ব্যবহার করিলে এবং মুলা, শশা, ইক্ষু, আম ও পেয়ারা ইত্যাদি উত্তমরূপে ধৌত করিয়া খোসা ছাড়াইয়া বালকবালিকাদিগকে খাইতে দিলে হুকওয়ারম ব্যাধি হইবার আশঙ্কা থাকে না। নদী পুষ্করিণী এবং পাতকুয়ার জল ফুটাইয়া ব্যবহার করিলে নিরাপদে থাকা যায়। মাঠে মলত্যাগ করিবার বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া পায়খানা অথবা কুঁয়া পায়খানা প্রস্তুত করিয়া মলত্যাগ করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। উক্ত ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইলে চিনোপডিয়ম তৈল এবং থাইমল ডাক্তারের উপদেশ মত ব্যবহার করিলে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

(স্বাস্থ্য সমাচার)   শ্রীরাজেন্দ্রকুমার ঘোষ।

স্বরলিপি।

ভৈরব—একতালা।

সবার সঙ্গে সবার মাঝে,
তোমারি সঙ্গ লভিব হে!
সকল কর্ম্মে, নয়নে, বচনে—
তোমারি সঙ্গে রহিব হে!
আকাশে, আলোকে, শিশিরে, পবনে;
কুসুমে, কাননে, তারকা, তপনে;
প্রভাতে, নিশীথে, নদী, গিরি, বনে;
তোমারি মহিমা গাহিব হে!
দুঃখে, দৈন্যে, বিপদে, ব্যসনে—
তোমারি নাম ডাকিব হে!
শান্তি যবে নামিবে প্রাণে—
প্রেমানন্দে থাকিব হে!
কণ্টক-ঘেরা সংসার পথে—
তব জয়-ধ্বজা বহিব হে!
বক্ষ পাতিয়া লব তব দান—
আনন্দে সব সহিব হে।

কথা ও সুর—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

২´ ৩ ০ ১
II সা সা -সঋা । ঋা -া ম মা । পা পা -া । পা -া পা I
স বা র্ স ঙ্ গে স বা য্ । মা ০ ঝে

২´ ৩ ০ ১
I ণা ণা ণা । দা -া পা । মা মা মাপ । পা -া -া I
তো মা রি স ঙ্ গ ল ভি ব হে ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I পা দা দা । ঋ´া -া র্সা । ণা ণা ণা । দা দা পা I
স ক ল ক র্ মে ন য় নে ব চ নে

২´ ৩ ০ ১
I পা পা পা । পা -া পা । স্মা পা দা । দা -পমগা -ঋসা I
তো মা রি স ঙ্ গে র হি ব হে ০০০ ০০

অন্তরা।

২´ ৩ ০ ১
[মা দা দা]
I { দা দা দা । দা দা দা । না না নর্সা । র্সা র্সা র্সা I
আ কা শে আ লো কে শি শি রে প ব নে

২´ ৩ ০ ১
[র্ণা র্ণা র্ণা । ঋ´া ঋ´া ঋ´া]
I ঋ´া ঋ´া ঋ´া । ঋ´া ঋ´া র্সা । না না র্সা । র্সা র্সা র্সা } I
কু সু মে কা ন নে তা র কা ত প নে

২´ ৩ ০ ১
I র্সা র্সা র্সা । ঋ´া ঋ´া র্সা । ণা ণাদ দা । দা পা পা I
প্র ভা তে নি শী থে ন দী গি রি ব নে

২´ ৩ ০ ১
I পা পা পা । পা পা পা । স্মা পা দা । দা -পমগা -ঋসা II
তো মা রি ম হি মা গা হি ব হে ০০০ ০০

সঞ্চারী।

২´ ৩ ০ ১
II সা -া ঋা । মা -া মা । পা পা পা । পা পা পা I
দু ঃ খে দৈ ০ ন্যে বি প দে ব্য স নে

২´ ৩ ০ ১
I ণা ণা ণা । দা -া পা । মা মা মাপ । পা -া -া I
তো মা রি না ০ ম ডা কি ব হে ০ ০

I পর্সা -া র্সা । ঋা -া র্সা । ণা ণা ণা । দা -া পা I

শ ন্ তি । য ০ বে । না মি বে প্রা ০ ণে

২´ ৩ ০ ১

I পা -া পা । পা -া পা । পা পা পা । দা -পমগা -ঋসা II

প্রে ০ মা ন ন্ দে থা কি ব হে ০০০ ০০

আভোগ।

২´ ৩ ০ ১

[মা]

II { দা -া দা । দা দা দা । না -া র্সা । র্সা র্সা র্সা I

ক ন্ ট ক ঘে রা স ং সা র প থে

২´ ৩ ০ ১

[র্গা র্গা র্মা । র্গা র্পা র্সা]

I ঋা ঋা ঋা । ঋা ঋা র্সা । না না নার্স । র্সা -া -া } I

ত ব জ য় ধ্ব জা ব হি ব হে ০ ০

´ ৩ ০ ১

I র্সা -া র্সা । র্সা র্সা র্সা । না না দা । দা পা -া I

ব ০ ক্ষ পা তি য়া ল য় ত ব দা ন

২´ ৩ ০ ১

I পা পা পা । পা -া পা । পা পা পা । দা -পমগা -ঋসা II II

আ ন ন্দে স ০ ব স হি ব হে ০০০ ০০

বিচারক।

—:*:—

সমুদ্র তরঙ্গের মত বিশাল জনশঙ্খ পূণা নগরে পেশোয়া-নৃপতির বধ্যভূমি ঘিরিয়া রহিয়াছে, দিকে দিকে সশস্ত্র প্রহরী ফিরিতেছে ; মধ্যস্থলে নীল চন্দ্রাতপ তলে অমাত্য সভাসদ্ পরিবেষ্টিত মহারাষ্ট্র নৃপতি রঘুনাথ রাও, সম্মুখে অপরাধী শৃঙ্খলাবদ্ধ বসন্ত রাও নতমুখ নতদৃষ্টি, অযুত দৃষ্টির তলে নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া, দূরে প্রসাদ চত্বরে গজদন্তের চিকের আড়ালে মহারাষ্ট্র রমণীর কুণ্ঠাকাতরসোৎসুক দৃষ্টি বন্দীর পাংশু মুখে নিবদ্ধ হইয়া আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে।

চারিদিকে কোলাহল, অশ্বারোহী অশ্ব সংযত করিতে পারিতেছেনা, সৈনিকের কটিবন্ধে অসির ঝঞ্চনা উঠিতেছে। সঙ্গীনবদ্ধ গৈরিক নিশান বাতাসে দুলিতেছে। একজন হতভাগ্য বন্দীর অন্তিম যন্ত্রনার শোনিতাপ্লুত শোচনীয় পরিণাম দেখিবার জন্য বন্যাস্রোতের মত লোকস্রোত আসিয়া মিলিতেছে। কাহারও মুখে

বেদনার হাহাকার, কেহবা বন্দীর অপরাধে তিরস্কার করিয়া কলরোলে রাজদণ্ডের বিভীষিকাকে ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিতেছে।

অকস্মাৎ শুভ্র নিশান তুলিয়া জন সমুদ্র ভেদ করিয়া কে একজন রাজ সিংহাসনের সম্মুখে গর্ব্বভরে ঝড়ের মত আসিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে অযুত কণ্ঠের মুখর মন্ত্র থামিয়া গেল। ভূপতি সিংহাসন ছাড়িয়া সম্ভ্রমে শির নত করিলেন।

এই বিপুল জনসঙ্ঘ শির অবনত করিল।

আগন্তুক দীর্ঘকায়, সুগৌর তনু, গৈরিক বসনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত, চন্দনচর্চ্চিত প্রশস্ত ললাট, প্রদীপ্ত নেত্র, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হেলাভরে নৃপতির পানে অনিমিক চাহিয়া রহিলেন।

স্তব্ধ জনমণ্ডলী উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। দেখিল কেহ দেখিল না—এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অস্ফুট আভাষে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়া গেল ন্যায়াধীশ রামেশাস্ত্রী।

করযোড় রঘুনাথ রাও আনত শির সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গুরুদেব! আজ অসময়ে বধ্যভূমে ভবদীয়ের আগমন কেন?" শ্রাবনের মেঘ নির্ঘোষের মত শাস্ত্রী উত্তর করিলেন—"রঘুনাথ! এই পাপ হইতে আমি তোমায় নিবৃত্ত করিব।"

বিশাল জন-সমুদ্র কাঁপিয়া উঠিল। বন্দীর শৃঙ্খল বাজিয়া উঠিল। বাতাস অট্টরালে ধ্বনিয়া তুলিল—"পাপ!"

চকিত রঘুনাথ নিম্নস্বরে ব্রাহ্মণের চরণতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন "প্রভু! বন্দী বসন্ত রাও সৈনিকের পদ গ্রহণ করিয়া মহীশুরে হায়দর আলীর গর্ব্ব টুটাইতে আমার সহগামী হইতে অনিচ্ছুক। দুর্দ্ধর্ষ যবন অত্যাচারে দেশ জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছে। আমি শান্তির শুভ্র পতাকার তলে পীড়িত নরনারীর অভয় শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অভিযান করিতেছি।"

নৃপতির কণ্ঠ কেহ শুনিল, কেহ শুনিল না।

ব্রাহ্মণের ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, বন্দীর প্রতি ঈষৎ ফিরিয়া চাহিলেন।

বন্দীর শীর্ণ দেহ নুইয়া পড়িল। চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। আসন্ন জীবন, শৃঙ্খলপিষ্ট বেদনার মর্ম্মন্তুদ একটি অস্ফুট হাহাকার নীরবে বাতাসে মিশিয়া গেল।

ন্যায়ধীশ স্রোতবিকম্পিত বেতসের মত ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিলেন। ভৈরব হুঙ্কারে সভাস্থল কাঁপাইয়া বলিলেন—

"দস্যি! জীবনের উপর রাজার প্রভাব কোথায়? দুর্ব্বল মানব যেইদিন আপনার ক্ষমতার সীমা ভুলিয়া ভগবানের বিধানে হস্ত দিবে সেই দিন আর জাতির অস্তিত্ব থাকিবে না। সোণার দেশ শ্মশান হইয়া যাইবে।"

রঘুনাথ সংযত স্বরে সিংহাসন এবং রাজদণ্ডের পানে চাহিয়া কণ্ঠে বিনয় ভরিয়া বলিলেন—

"প্রভু! আমার কোন দোষ নাই, বন্দী সমুচিত বিচারে এই দণ্ডাজ্ঞা পাইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ উচ্চহাস্যে ভীষণ বিভীষিকা জাগাইয়া সভাতল কাঁপাইয়া উত্তর করিলেন—"বিচারক! সকল সময়ে আপনার বিচারকে নির্দ্দোষ মনে করিও না। বন্দীর প্রতি তোমার সমুচিত বিচার হয় নাই। আমি তাহার আবার বিচার করিব।"

বিশাল জনমণ্ডলী কি বুঝিল জানিনা। "জয় গুরুদেও! হর হর মহাদেও!" বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল।

শাস্ত্রী বন্দীর পানে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাহাকে কাছে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। কম্পিত কলেবর বসন্ত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। হাতের শৃঙ্খলে ঝঞ্ঝনা উঠিল। ব্রাহ্মণ তাহা মোচন করিয়া দিলেন।

তখন ন্যায়াধীশ আদেশ করিলেন—"বসন্ত! আমি তোমার সমুচিত বিচার করিব। অকপটে আমার কাছে সকল অপরাধ স্বীকার কর।"

বন্দী বসন্তরাও গ্রীবা হেলাইয়া অনেকক্ষন তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। এই সুগৌর তেজপুঞ্জ দেহের মহাদেবের মত অভয় হস্ত বাড়াইয়া তাহাকে যেন জন্মমৃত্যুর সন্ধিস্থান কোলে তুলিয়া লইতে আসিয়াছে। শুষ্ক চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। করুণস্পর্শে হৃদয় আকুল করিয়া দিল। "প্রভু জয় হোক তোমার!" বসন্তরাও শির অবনত করিল। একবার গ্রীবা সঞ্চালন করিয়া বিশাল জনসঙ্ঘের দিকে চাহিল। যেন জন্মশোধ একবার সকলের সহানুভূতি মাগিয়া লইল।

জন কোলাহল থামিয়া গেল। বিশাল মণ্ডলী বসন্তের পানে নীর্নিমিষ চাহিয়া রহিল।

বসন্ত একবার উর্দ্ধ আকাশের পানে চাহিল। কি দেখিল জানি না। নীলাম্বরে জ্যোতির্লেখা বিদীর্ণ করিয়া কাহার মানসী মূর্ত্তি যেন ভাসিয়া উঠিল। অভয় বরদ হস্ত, মুখে আশ্বাসের বাণী দৃষ্টি ভরিয়া শান্তনার অমৃত ধারা ক্ষরিয়া পড়িতেছে। বুকে বল পাইল, করযোড়ে বলিয়া উঠিল—

"গুরুদেব! আমি সৈনিক। মহারাষ্ট্র রাজের গৈরিক নিশানের ছায়ায় আমি একজন দীন সৈনিক। আজ দ্বাদশ বৎসর ব্যাপিয়া এই কাজে নিয়োজিত থাকিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে আমি ইহার দর্প এবং গৌরব অনুভব করি। সেই প্রথম দিন যখন তরুণ জীবন যুগলপানি আশুতোষের পেশোয়ার সিংহাসনতলে কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম তখন অপত্যস্নেহমুগ্ধা জননী, অশ্রুজলে ভাসিয়া বুক বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, স্নেহের প্রতিষেধে শান্ত কৃষিকর্ম্ম হইতে বিরত হইতে নিষেধ করিয়াছিল। কিন্তু যবন যবনের অত্যাচারে হিন্দুস্থান প্রপীড়িত, ধর্ম্ম নষ্টপ্রায় দেখিলাম তখন আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। হৃদয়ে প্রতিশোধের বহ্নি জাগিয়া উঠিল, আমার এই দুর্ব্বল বাহু হিন্দুরাজ্যপ্রতিষ্ঠাকল্পে পেশোয়ার গৈরিক নিশান উড়াইয়া সমর তরঙ্গে ঝাঁপ দিবার সাধ হইল। তারপর—প্রতি অভিযান, আক্রমন, বিপক্ষের শোণিতস্রাবি নির্ম্মম পেষণে অগ্রগামী ছিলাম। স্বয়ং মহারাজ তাহা লক্ষ্য করিয়া দুইবার আমাকে পুরস্কৃত করিয়াছেন।

তারপর—গুরুদেব! এই জীবনের পরপারে বৈতরণী তীরে দাঁড়াইয়া কিছু গোপন করিব না। রণক্ষেত্রে শিবিরে শিবিরে ঘুরিয়া তরুণ যৌবনের সকল সুখসম্ভোগস্পৃহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। একদিন সম্বাদ পাইলাম পরিণীতা সাধ্বী স্ত্রী অন্তিমশয্যায়, জন্মশোধ একবার দর্শন প্রার্থনা করিয়াছে। আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। ভীষণ দুর্য্যোগে ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া রণক্ষেত্র হইতে গোপনে ধাইয়া আসিলাম। হায় ভগবান! কি দেখিলাম? আমার জীবন-আকাশের একমাত্র ধ্রুবতারা, বসন্তনিকুঞ্জের শ্যামাসাধ্বী বল্লরী উৎপাটিতমুল, নিদারুণদাহনে মলিনা, জীর্ণশয্যা আঁকড়িয়া রহিয়াছে। মল্লিকা মুকুলের মত সংহত-সৌরভ এবং অপূর্ণ সৌন্দর্য্য লইয়া সে আমার খেলাঘরের নব বধূটির মত আসিয়া দেখা দিয়াছিল। তারপর জানি নাই কখন বসন্তের মলয় হিল্লোলে তার জীবনের দলগুলি ক্রমে বিকশিত হইয়াছিল। সে অতুল শুভ্র, সুষমার ভরপুর-

অকলঙ্ক দেবী প্রতিমাটির মত আমার কুঁড়েখানি উজ্জ্বল করিয়া জাগিয়াছিল। আমার এই ভরা যৌবনের উন্মাদ ভালবাসা অস্ত্রের আকারে শত্রুর বুকের রক্ত পাণ করিতে ছুটিয়াছিল। আমার এই গোপন অন্তঃপুরে প্রেয়সীর পিয়াসি অধরের চুম্বনে ধন্য হইবার সুযোগ তাহার কম জুটিয়াছে।

তারপর? তারপর কি বলিতে যাইয়া কি বলিতেছি প্রভু, মার্জ্জনা করিও। সেই মুমূর্ষুর শয্যাপ্রান্তে বসিয়া রোগতপ্ত হাতখানি হাতে তুলিয়া লইলাম। রোগ-মসিঢালা জীর্ণতনুখানি, বুকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য প্রাণের ভিতর ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। ভয় হইল পাছে মল্লিকার জীর্ণ দল আমার ভারে সহসা ঝরিয়া পরিবে। নীর্ণিমেষ দৃষ্টে মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

সে আমার পায়ে ধরিয়া বলিল—"প্রভু! ইহপরকালের দেবতা! অযথা শোণিতপাতে ধর্ম্ম নাই। বিধাতার সৃষ্টি খর্ব্ব করিয়া পাপের বোঝা বাড়াইওনা। হিন্দু, মুসলমান তাঁর এক হাতে গড়া। তোমাদের ভেদ দৃষ্টি থাকিলে হিন্দুস্থানে আর শান্তি নাই। সোণার দেশ পুড়িয়া ছাই হইবে। শ্মশানের বুকে আসিয়া পিশাচের দল অট্টহাস্যে নাচিবে।"

আমার দিব্য দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। দেখিলাম কি এক গরিয়সী দেবী প্রতিভা তাহার ললাটে, দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। কিছু বলিতে আর সাহস পাইলাম না।

সে তৈলহীন নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের মত নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। অতি কষ্টে স্বর নির্গত হইল, বলিল—"দেবতা! শেষ প্রার্থনা—তুমি আর নরশোণিতে হস্ত কলঙ্কিত করিও না। তোমার কোলে আমার শেষ স্মৃতিচিহ্ন তুলিয়া দিতেছি।" শয্যাপার্শ্বে ইঙ্গিত করিয়া একখানি দোলনা দেখাইল, দেখিলাম—একটী শিশু বালিকা মুখের ভিতর অঙ্গুলি পুরিয়া অব্যক্ত ধ্বনি করিতেছে।

তারপর আমার পানে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া কোন অজ্ঞাত পথের গোপন যাত্রী হইল।

বসন্তের দুই চক্ষু ফাটিয়া দর বিগলিত ধারায় অশ্রু নিষেক হইল। সমবেত জনমণ্ডলীর চক্ষু আর্দ্র হইল। চিকের আড়ালে দীর্ঘশ্বাস তুলিয়া চন্দ্রাতপ কাঁপাইয়া তুলিল।

বসন্ত কতক্ষণ স্থির থাকিয়া বল সংগ্রহ করিয়া আবার বলিতে লাগিল—সেইদিন সংসারের সকল সুখ আশা টুটিয়া গেল। হৃদয়ের গতি ভিন্ন পথে বহিল। শারীরিক দুর্ব্বলতা জানাইয়া ছুটি লইয়া আমার সংসারের শেষ সম্বলটিকে মানুষ করিতে লাগিলাম। সমর ক্ষেত্রে অস্ত্রের ঝঞ্চনা শুনিলে বুক কাঁপিত। আক্রমন করিতে সাহস পাইতাম না। কেবল আত্মরক্ষা করিয়া চলিতাম; বর্ম্ম চর্ম্মে ঠেকাইয়া আঘাত ব্যর্থ করিতাম। এই-রূপে কত সময় ক্ষতবিক্ষত হইয়া শিবিরে ফিরিতাম। প্রতিহিংসুকের দলে আসিয়া আমার সান্ত্বনা কোথায়? গোপনে নিশাধ দিশাহীন ঘুরিয়া বেড়াইতাম। সমর ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শোণিতাপ্লুত ছিন্নবিচ্ছিন্নকায় মুমূর্ষু সৈনিকের সেবা করিতাম, মরনোন্মুখের তৃষিত কণ্ঠে বারি বিন্দু ঢালিতাম। বাপিতের আর্ত্তনাদে হাহাকারে কাঁদিয়া উঠিতাম। শত্রু মিত্র ভেদ থাকিত না। আহতকে বুকে বাঁধিয়া নিরাপদ স্থানে দৌড়িতাম।

কে আমাকে ইহা শিখাইয়াছিল? আমার সৈনিক ধর্ম্মে যে এমন নিয়ম নাই। সেবাপরায়ণা নারীর মত এমন দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া কি করিয়া আস ধরিব?

কে আমার বুকের ভিতর আসিয়া অহর্নিশি বলিত—"বসন্ত! পালাও,—দূরে চাহিয়া দেখ—তোমার জন্য শান্তিকুঞ্জ রচিত রহিয়াছে; তাহার শীর্ষে সাম্যবাদের শুভ্র নিশান দুলিতেছে।"

করযোড়ে বিদায় মাগিলাম। মহারাজের অনুমতি পাইলাম না। মাতৃহীনা শিশু কন্যার লালনের কথা বলিলাম তবু দয়া হইল না।

তখন আর কি করিব? বিদ্রোহী সাজিয়া দশের হৃদয় বিচলিত করিয়া তুলিতে কুণ্ঠা হইত। আমার সংসারের শেষ সম্বলটিকে—সাধ্বী পত্নীর শেষ স্মৃতি-চিহ্নটিকে—আমার সাধের বীণাকে তবুও দেখিতে পাইব এই ভাবিয়া নেপথ্যের অন্তরাল হইতে তাহাকে পুণা নগরে লইয়া আসিলাম। বিরামের সময় মাতৃপিতৃস্নেহ দিয়া আমার কুন্দ-কলিকাটিকে বুকে করিয়া সকল জ্বালা ভুলিতাম। কোথায় স্বর্গ? আমার বুকের মাঝে চাহিয়া দেখিতাম অতুল স্বর্গ, আমার কুটির দ্বারে মন্দার সুষমা!

প্রভু.—গুরুদেব! এ সুখ সাধ ভাঙ্গিতে পারি নাই। যবন বিপ্লবে যাইয়া পাছে আত্মরক্ষা করিতে না পারি তাই মহারাজের সহগমনে দ্বিধা প্রকাশ করিয়াছি। আমার হৃদয়ের স্বাধীনতা কোথায়? অপত্যমায়ার লোহার বাঁধন আমাকে অহরহ পিছন দিকে টানিতেছে। আমার বিহনে যে কুসুম কলিকা অঙ্কুরে শুকাইয়া যাইবে!

বলিতে বলিতে বসন্ত উন্মাদের মত অধীর হইল। স্নেহের উৎস জাগিয়া বুকের ভিতর টন টন করিতে লাগিল। গুরুর পানে চাহিয়া আবার জন-সমুদ্রের ভিতর কাহাকে খুঁজিতে লাগিল। বোধহয় মিলিল না। দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ছল ছল নেত্রে ভূমির পানে চাহিয়া রহিল।

শাস্ত্রী দুই হাত উধাও শূন্যে তুলিয়া বলিলেন--"বসন্ত তুমি নির্দ্দোষ। আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম।"

বিশাল জনমণ্ডলী হর্ষে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

নৃপতির চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। ক্রোধে অধর কম্পিত হইল। বজ্র নির্ঘোষে বলিয়া উঠিলেন—"ব্রাহ্মণ! রাজ বিধানে তোমার ন্যায়-বিধান খাটিবে না। বন্দীর দণ্ড অমার্জ্জনীয়।"

জনতরঙ্গ নীরব ম্লান চোখে চাহিয়া রহিল।

ব্রাহ্মণের মুখ অপ্রসন্ন হইল। সতেজ চোখের ভিতর দিয়া মলিন কুণ্ঠিত এমন এক দৃষ্টি জাগাইয়া তুলিল—দর্শকগণ দেখিল—নৃপতি ভ্রষ্টতেজ দণ্ডমুকুট বহিয়া দীনের মত নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া আছে।

ব্রাহ্মণ শান্ত স্বরে, কণ্ঠে করুণা ভরিয়া বলিলেন—"নৃপতি! মৃত্যুর যন্ত্রণা তুমি জান না। বসন্তের প্রাণ দণ্ডাধিক যন্ত্রণা সে পাইয়াছে, এখন মুক্তি তাহার পক্ষে অসীম করুণা নহে।"

রঘুনাথ নীরব, চোখে মুখে দৃঢ়তার তেজ বিকীর্ণ হইতেছে।

শাস্ত্রী এই মূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিলেন—মার্জ্জনা রাজবিধানে লিখিত নাই।

বসন্ত করুণাপিপাসু নেত্রে একবার সমবেত জনমণ্ডলীর পানে চাহিল। দেখিল—তাহার বেদনায় সকলকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। সকল দৃষ্টির ভিতর দিয়া সহানুভূতির স্নিগ্ধ জ্যোতি ক্ষরিত হইতেছে। বসন্ত আশ্বাস পাইল। আজ তাহার বেদনায় সকলকে ব্যথিত করিতে পারিয়াছে।

আবার শূন্যের পানে চাহিল। সূর্য্যের তীব্র দ্যুতি করুণায় বঙ্কিম। অনন্ত নীল অম্বরে ইন্দ্রধনু বর্ণে রঞ্জিতা কোন অশরীরী মিলনবাঞ্ছিতা বুকে লইবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া যেন আকুলে আহ্বান করিতেছে।

অহো! সেই কুণ্ঠাবিহীন সামা জ্যোতির্মণ্ডলের মিলন কতই সুন্দর! বসন্তের বড় সাধ হইল সে সেখানে যায়!

অকস্মাৎ দূরে কোলাহল জাগিল। প্রহরী, মন্ত্রী, রক্ষী, বিশাল মণ্ডলী বিচলিত হইয়া উঠিল। দেখা গেল অগণ্য জনতরঙ্গ ভেদ করিয়া উন্মাদিনীর মত বিদ্যুৎবর্ণী কে ছুটিয়া আসিতেছে। তার গোলাপী আঁচল ধুলায় ধুসর, চূর্ণকুন্তল বাতাসে দোদুল, রাঙা ঠোঁট ভূপানি স্ফীত, ডাগর চোখ দুটি অশ্রু ছল ছল। কাহারো পানে দৃকপাত না করিয়া এই উন্মাদিনী দামিনী-ঝলক বসন্তের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। নাগপাশ বাঁধনের মত মৃণাল বাহুতে তাহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া ধরিল।

এককালে সহস্র বীণা ঝঙ্কারের মত সভাতল চমকাইয়া ঝঙ্কার দিয়া কহিল "বাবা! তারা তোমায় কেটে ফেলবে। চল আমরা পালিয়ে যাই।"

এই উন্মাদিনীর স্পর্শে বসন্তের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। সে এই অগণ্য লোকের বেষ্টনের মধ্যে দাঁড়াইয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিল।

সে এতক্ষণ মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল. কিন্তু, আর তাহার সাহস হইল না। সেই দৃঢ়তা টুটিয়া গেল। আবার বাঁচিতে সাধ হইল। এই সপ্তম বর্ষীয়া অধীরা বালা বীণার অমিয় মুখখানি দেখিয়া আবার নরলোকে ফিরিবার সাধ হইল। মনে হইল এই বিশ্বরচনা কতই সুন্দর! চতুর্দ্দিকে কত হাসি কোলাহল, জীবনের সঙ্গে জীবনের কি মধুর মিলন! কেমন সোনার আলোক তরঙ্গ নাচিয়া নাচিয়া সীমা হইতে অসীমের পানে ছুটিয়া যাইতেছে।

হায়, সকলি তাহার শেষ! সকলই তাহার স্বপ্ন! আজ বিচিত্র বিশ্ব ব্যাপারের এক প্রান্তে জীবনমরণের সঙ্গমস্থল বৈতরণী তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রক্ত লোলুপ দানবের উলঙ্গ কৃপাণ শিরে পড়িতে উদ্যত। মুহূর্ত্ত পরে বুকের রক্তে অসুর অবগাহন করিবে। হৃৎপিণ্ড ধমনী লইয়া প্রেতের দল কাড়াকাড়ি করিবে।

আমার কি গতি হইবে? ভগবান! আমায় বাঁচাও। জীবনকে আর একটুখানি দীর্ঘ করিয়া দাও, আর একটু আলোক, আর একটু বাতাস আমার চোখে ফুটুক, আমার শরীর ঘিরিয়া সঞ্চারিত হউক!

বসন্ত চারিদিকে ফিরিয়া চাহিল, সকল দিক হইতে মায়ার আকর্ষণ তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল, এই সুন্দরী ধরিত্রী তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে কত মায়ার বাঁধন আঁটিয়া দিয়াছে। সে কি করিয়া এই মায়াপাশ ছিন্ন করিবে? সকল কিছু ভুলিতে পারে বসন্ত তাহার বীণাকে ভুলিতে পারে না। সে যে আজ উন্মাদিনীর মত তাহার পিতাকে মৃত্যুর কবল হইতে ফিরাইতে আসিয়াছে। গোধূলির নীলিমা সাগরের একমাত্র স্বচ্ছ তারকার মত যার কমনীয় সৌন্দর্য্য হাসিতে বাণীতে প্রত্যেক অঙ্গ ভঙ্গিতে ঠিকরিয়া পড়িত আজ সে নিদাঘ তাপিত মাধবীর মত বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। সে যে তার পিতা ব্যতীত আর কাহাকেও জানে না। আহার, নিদ্রা, হাসি, খেলায় তার যে আর কেহ দোসর সঙ্গী নাই!

কতদিনের কত স্মৃতি বসন্তের মনে জাগিতে লাগিল। কি করিয়া সে এই মাতৃহীনা কন্যাকে শাখাবদ্ধ ফলের মত বুকে করিয়া লালন করিয়াছে। তাহার কতদিনের কত আবদার রক্ষা করিয়াছে, আজ তাহাকে কি করিয়া সে ছাড়িয়া যাইবে! তার বিহনে সে কি বাঁচিবে?

এই বিশ্বরচনার অন্তঃস্থলে এমন কে আছে, যে আজ তাহাকে রক্ষা করিবে? তাহার স্বর্গ মোক্ষ সকল কিছুর বিনিময়ে একমাত্র বীণাকে বুকে বাঁধিয়া সৃষ্টির এক প্রান্তে জাগাইয়া রাখুক। সে তার জীবনসর্ব্বস্বকে সম্মুখে করিয়া যুক্ত করে অহর্নিশি ডাকিবে। সেই অনন্ত করুণায় বিগলিত অশ্রু তলে সে হৃদয় পাতিয়া দিবে।

আত্মহারা বসন্ত উন্মাদের মত অগণ্য জনমণ্ডলীর পানে পানিবদ্ধ হইয়া মস্তক দুলাইয়া বলিতে লাগিল—"তোমাদের পায়ে পড়ি তোমরা আমায় ছেড়ে দাও, ওগো! তোমরা আমায় বাঁচতে দাও। আমি আর লোকালয়ে থাকব না, বীণাকে বুকে করে কোথাও পালিয়ে যাব। আর নিয়মের রাজ্যে ফিরে আসব না। এ মুখ আর দেখাব না। আমার রক্তে তৃষ্ণা মিটায়ো না। আমায় ছেড়ে দাও।"

বলিতে বলিতে অধীর বসন্ত অবলম্বনহীন ছিন্ন বল্লীবৎ ধরাতলে পড়িয়া গেল।

উন্মাদিনী বীণা "বাবাগো"—বলিয়া বসন্তের বক্ষ আশ্রয় করিয়া মুর্চ্ছিতা হইল। স্বর্ণ প্রতিমা ধূলিধূসরিতা হইল।

সেই বিপুল জন-তরঙ্গ চঞ্চল, চক্ষু সজল, হৃদয় বেদনায় করুণ।

তখন শাস্ত্রী নৃপতির পানে ফিরিয়া আদেশ করিলেন—

"রঘুনাথ! বন্দী মুক্ত। দোষ থাকে যদি ক্ষমা কর। আমার কথা রাখ, এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হও।"

নৃপতি কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া অবিচল কণ্ঠে উত্তর করিলেন—"রাজদণ্ড অমার্জ্জনীয়।"

ব্রাহ্মণ ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন, তাঁহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইল। মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল, রঘুনাথের দিকে এক মর্ম্মভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শ্রাবণের মেঘ নির্ঘোষের মত সভাতল কাঁপাইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"দম্ভি! এতটুকু মার্জ্জনাও কি তোমার হৃদয়ে নাই? পিশাচের মত শোণিত পানে উন্মত্ত তুমি! বিচারকালে বিবেচনায় আসিয়াছে কি বিচারক,—প্রাণের দাবির মূল্য কতখানি! মনে রাখিও—তোমার উপরে একজন বিচারক আছে। তাহার হাতে কিছুতেই নিস্কৃতি নাই।"

অগণ্য জনমণ্ডলী চমকিয়া উঠিল, নীরব ধিক্কারে পেশোয়া নৃপতিকে অভিশপ্ত করিল।

কতক্ষণে বসন্তের চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে ধূলিবিলুণ্ঠিতা হৈম প্রতিমাকে বুকে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, সে সুন্দর অমিয় মুখের মোহন ছবি দেখিল, একবার চারিদিকে চাহিল,—বিশাল জগত সূর্য্যালোকে হাসিতেছে, স্নেহ বান্ধব অনন্ত টান তাহাকে টানিতেছে, মাথার উপরে অসীম শূন্য দুর্জ্জেয় রহস্যের মত গম্ভীর। তাহার বাঁচিবার সাধ হইল। সে এই অনন্ত মায়া কিছুতেই কাটাইতে পারে না।

তারপর করুণা পিপাসু নেত্রে অনিমিখ্ গুরুর পানে চাহিয়া রহিল।

রঘুনাথ সরোষে বলিলেন—"ব্রাহ্মণ! সংযত হও। এখানে তোমার ন্যায়-বিধান খাটিবে না। আমার ন্যায় অন্যায় বিচারে তোমার অধিকার নাই।"

শাস্ত্রী নৃপতির মুখের দিকে তর্জ্জনি হেলাইয়া বলিলেন—

"রঘুনাথ! আমি তোমাকে এই পাপ হইতে রক্ষা করিব। বন্দীকে আমি মুক্তি দিব। মনে রাখিও রাজবিধান ব্রাহ্মণের ন্যায়-বিধানের পদতলে। যে দিন ইহার অন্যথা হইবে সেই দিন এই গরিমাময় হিন্দুস্থান আঁধার হইবে।" বলিতে বলিতে বীণাকে বুকে বাঁধিয়া বসন্তের হাত ধরিয়া এই বিপুল জনসঙ্ঘ ভেদ করিয়া নক্ষত্রের মত ছুটিয়া চলিল।

উন্মত্তের মত রঘুনাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ব্রাহ্মণ"!

কে তাহার উত্তর করিবে? চতুর্দ্দিকে কোলাহল। অশ্বারোহির অশ্ব নাচিল। অসি চমকিল, গৈরিক নিশান বাতাসে দুলিল। কেহ রুদ্রতেজ ব্রাহ্মণের গতিরোধ করিতে সাহসী হইল না।

পেশোয়া নৃপতি—কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত স্থির, স্বপ্নাবিষ্টের মত জ্ঞানহারা হইয়া একদিকে চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন।

আবির্ভাব।

—:০:—

এসেছ কি তুমি আঁধার জীবনে
দেখাতে আলো?
তপ্ত ধরার তাপিত জনেরে
বাসিতে ভাল?
এসেছ কি তুমি কাননে ফুটাতে
কুসুমরাশি;
ভুবন-মোহন! ভুবন-ভোলানো
বাজাতে বাঁশী?
এনেছ কি তুমি পিপাসিতে দিতে
করুণা-বারি;
করপুট-তলে পরশ এনেছ
চরণে তাঁরি?

এসেছ কি তুমি শুষ্ক মরুর
তৃষ্ণা-হরা ;
দীর্ঘ দিনের দহন-অনলে
শীতল-করা ?
এসেছ কি তুমি নূতন বাসনা
কামনা নিয়ে ;
পুরাণ যা' কিছু মলিন আমার
মুছায়ে দিয়ে ?
গেয়েছ কি আজ কাননে আমার
তোমার গান ?
ললাট পরশি' করেছ কি মোরে
আশীষ দান ?
এনেছ কি তব স্নেহের পুণ্য
কিরণে জ্বালা ;
সন্ধ্যা-আঁধারে কনক পাত্রে
প্রদীপ-মালা !

শ্রীমতী পত্রলেখা সিদ্ধান্ত।

চাট্‌নী।

—:*:—

"বুউউ।"

মফঃস্বলে তুলার আড়ত,—মস্ত কারবার। বাবুরা কেউ বড় থাকেন না—একজন গোমস্তাই কাজ কর্ম্ম দেখেন। তিনিই এখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা। গোমস্তার বন্ধু কানাই দাঁ—অবসর পাইলেই আড়তে আসিয়া তামাক খান, আর ফাঁক বুঝিয়া সুযুক্তি দেন, বলেন :—

"তুমি কি হে বোকা ? নিজের আখের বোঝ না—একটা পেট ত নয়—এই মেয়েটা আছে পার করতে হবে—ছেলেটা আছে পড়াতে হবে—অসুখ্‌রে—বিসুখ্‌রে"—

গোমস্তা কেবল শুনিয়াই যায়—উত্তর প্রত্যুত্তর কিছু করে কিনা। এই রকমে অনেক দিন যায়, শেষে একদিন কি মনে হইয়াছে, কানাইকে বলিল :—

"বুঝিতো সব, তুমি যে বল কিন্তু উপায় কি ?"

কানাই বেশ উৎফুল্ল হইয়া বলিল :—"উপায় তো সোজা—একটা দেশলাই-এর কাঠী। দাও বেটার গুদোমে আগুন লাগিয়ে—এদিকে যা কিছু আছে সরাও।"

"তারপর ?"

"তারপর আর কি ? তদন্তে এসেই তুমি পাগল ;—যেই জিগ্‌গেষ করবে শুধু ব'লবে—বুউউঃ—লেঠা মিটে গেল সবই তোমার, আর আমি বন্ধু মানুষ একজন আছি, আমাকেও অবিশ্যি ভুলবে না—আধা না হ'ক ছ আনা বথ্‌রা দেবেই"—

"তা আর ব'লতে ? আচ্ছা—তাই হবে।"—

"হ্যাঁ—কিন্তু মনে থাকে যেন—এক দম উন্মাদ, বদ্ধ পাগল—কেবল মুখে বুলি বুউউঃ, বুঝলে !—

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—বুউউঃ"—

বন্ধু বিদায় লইয়া গেলেন। সেই দিনই দুপুর রাত্তিরে—গুদাম লাল্লাল—কিসের বা জল, কিসের বা কি ?—হু হু করিয়া আগুন জ্বলিতে লাগিল—গোমস্তা এ দিকে বাক্সপাঁক্স পার-টার করিয়া ঠিকঠাক।

অনেক টাকা লোকসান হইয়া গিয়াছে খবর পাইয়া বাবুরা অনুসন্ধানে আসিলেন—গোমস্তাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—"ওহে! কি ক'রে এ কাণ্ড হ'ল ?"

"বুউউঃ।"

"আ রে গেল—কি ক'রে আগুন লাগ্‌লো ?"

—"বুউউঃ"—

"এ পাগল হ'য়ে গেল নাকি ?"

"বুউউঃ"—

না আর উপায় নাই, লোকটা দুর্ঘটনায় হতভম্ব হইয়া পাগল হইয়া গিয়াছে। বাবুরা দুঃখিত হইলেন। আড়তের নূতন বন্দোবস্ত হইল। বুউউঃ—এই ফাঁকে বেশ গোছাইয়া গাছাইয়া বসিলেন দাঁর বেটা সময় বুঝিয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত, গোমস্তা বন্ধুকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"আ রে কিহে. কেমন বুদ্ধি ?—যাক, মিটে গেছে এখন আমার বথ্‌রাটা ভাই ?"—

আর বথ্‌রা—গোমস্তা উত্তর দিলেন—"বুউউঃ"—

* * * *

"সেয়ানে সেয়ানে।"

"ট্রেণ"খানা সে দিন যে আসিয়াছে—একদম ভর্ত্তি, সে "মশাই"—লোকের উপর লোক। নলিনী বাবুর আবার সেখায় জরুরী কাজ না গেলেই নয়। বেচারী একটা জাপানী "ম্যাটিং"এর "সুটকেস" হাতে লইয়া একবার "এঞ্জিন"—আর একবার "ব্রেক্‌ভ্যান্"—এই ছুটোছুটি হয়রাণ বনিয়া ভদ্রলোক অবশেষে একটা মধ্যশ্রেণীর কামরার দরজা খুলিবার চেষ্টা করিতেই ভিতর হইতে এক বাবু বলিয়া উঠিলেন :—

"কোথায়—কোথায়—মশাই, আসছেন কোথায় ?"

"গাড়ীতে—গাড়ীতে—মশাই রেল গাড়ীতে।"

"বারে কথা !—রেলগাড়ীতে তো বুঝ্‌লাম কিন্তু জায়গা কোথায় ? যাবেন কি করে ?"

"দাঁড়িয়ে—দাঁড়িয়ে মশাই,—না হয় দাঁড়িয়েই যাব।" বলিতে বলিতে তো ঠেলিয়া-ঠুলিয়া উঠিয়া পড়িলেন—উঠিয়াই "ওরে বাবা ! একি কাণ্ড—সে কি "মশাই"—বপুই ?—বিরাট-বিপুল প্রায় পৌনে চার হাত বেড়—একখানা বেঞ্চ তাহার অধিদখল করিয়া পড়িয়া আছে। তার উপরে ভুঁড়ি—নধরের দাদাঠাকুর—"বেঞ্চি" হইতে প্রায় সওয়া হাত বাহির হইয়া আসিয়াছে—কোনও যাত্রীরই আর সে দিকটা মাড়াইবার ভরসা নাই—যে গেরদে টিকিটী রাখাও চলিবে না। নলিনী বাবু রোগা-টে পাতলা নেহাৎ কাহিল মানুষ—একেবারে এই দেখিয়া তো তাজ্জব ! শেষে খানিকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন :—"জায়গা নেই কি ব'লছিলেন মশাই ?—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শ্বশুর বাড়ীর আরাম চলবে না ?—"ও মশাই, দেখুন ?"—উঁহু হ্যাঁও ও না—ক্যাঁও ও না।

"আরে শুনছেন মশাই ?"

নাসিকা গর্জ্জিয়াই বলিল "বু ঝ ৬৪ চাকার উপর ৭৫ মাইল পাল্লার কামান।"

"আরে উঠুন না মশাই, ওই পেছনের গাড়ীতে যান।"

ভদ্রলোক এইবার মিরাটের বলের মত দুই চক্ষু মেলিয়া একবার দেখিয়া লইয়া পাশ ফিরিবার উপক্রম করিতেই বে-পরিমাণ সোর দেহ জানালার নীচে ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া আসিল—ভারি চটিয়া গিয়া ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন :—

"জ্বালা ফ্যাসাদরে বাপু !"

"আর ফ্যাসাদ-ট্যাসাদ নয় মশাই বুঝলেন—বপুখানিতো দেখ্‌ছি "গুড্‌স্"—উঠুন গার্ডের কেয়ার যান।"

"ব্রেকভ্যান নাকি ?—তা হ'লে তোমারি বা হল্লার দরকার কি ?—"মেলসর্টারের" কেয়ারে যাও—বুক-পোষ্টের থলিয়াতে।"

"সাত গোয়ালের গরু"

গোয়ালার গুরু ঠাকুর জাতে ভট্টাচার্য্য ; চলিয়াছেন শিষ্যবাড়ী। সঙ্গে বাবাজী। প্রভুর চাদরখানি স্কন্ধে, ছাতিটী বগলে, শুধু পিতামহের আমলের চটী জোড়াটা কি জানি বা পাছে তিনি জুতা-জন্মে অব্যাহতি পান তাই বাবাজীর মাথায়। শিষ্যবাড়ী গঙ্গাজলী আসটা আছে তাই, দেবতার তুলসী আর কাগজপত্র দুই পাটী ডান হাতের দুই আঙুলে মাথার উপর ধরিয়া বাবাজী কাসিতে কাসিতে সঙ্গে যাইতেছেন। রাস্তায়ই—"দই" প্রভুর শিষ্যই ফেরী হাঁকিয়া "গাঁওয়ালে" চলিয়াছেন। রাস্তায় প্রভু !—আরে বাপরে বাপ্। তাড়াতাড়ি ভার নামাইয়া, কাঁধের গামছাখানা ঘাড়ের উপর দিয়া গলায় দুই পাশে ঝুলাইয়া আনিয়া একেবারে উপুড় ঠাকুরের পায়ের নীচে টানটান। ঠাকুর অমনি ডান পায়ের বুড়া আঙুল শিষ্যের ব্রহ্ম তালুতে ঠেকাইয়া কহিলেন।

"কে রে প্রহ্লাদ ?"

"আজ্ঞে অধম, পাতকী।" বলিতে বলিতে প্রহ্লাদ উঠিয়া দুই হাত যোড় করিয়া সম্ভ্রমের সহিত একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—বেশ! বেশ! ভাল ত রে সব?"

"আজ্ঞে!—যামন রাক্‌চ্যান। ছিচরণের আশীর্ব্বাদ।"

"আচ্ছা আচ্ছা বেশ চল্।"

"আগ্যাতে আজ্ঞ্যা হ'ক্—আমি এই ঘড়িকের মোদ্দেই ফিরা্যা আসত্যাছি; শিবরতন বাড়ীত, আছে, প্রভুর নফরের নফর সেবায় তুরুটি হবে না দেব্‌তা।"

"বেশ, বেশ, শিগ্‌গিরি ফিরিস" বলিয়া বৈরাগীর সহিত দেবতা আবার চলিয়া প্রহ্লাদের গৃহে পৌঁছিলেন। শিবরতন প্রহ্লাদেরই ছোট সংস্করণ—প্রণামাদি যথারীতি শেষ করিয়া প্রভুর স্নানাহ্নিক ও আহারাদির আয়োজন করিয়া দিল। বেলা ঢের হইয়াছে—ঠাকুর আর বেশী কিছু রাঁধিবেন না ভাতে ভাতের যোগাড় হইল—বাবাজীর ক্রোধ কাটিয়া বাহির হইতে না পারায় নেশে রাঙ্কেম হইয়া দেখা দিল কিন্তু প্রভুর আজ্ঞগুবি ইচ্ছা—আর উপায় কি? ঠাকুর প্রথমতঃ স্নানাহ্নিক পরে রন্ধন শেষ করিয়া ভাতের আলু বেগুন মাখিতে যাইবেন কিন্তু কি আপদ।—এক নেকড়ার পুটলীতে বাঁধিয়া আলু, বেগুন, উচ্ছে, পটল, ঝিঙা নানা তরকারী দিয়াছেন তাকে আবার গরম—অনেক চেষ্টা—না!—কিছুতেই বাহির হয় না,—শেষটায় এই টানাটানি উঁহু ভাঙনা—একে বোগ্‌নোর মুখ ছোট—তাতে আবার তরকারী সিদ্ধ হইয়া ফুলিয়াছে শিবরতন দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল আর ভাবিতেছিল—এবার অতি বিজ্ঞের ন্যায় বলিয়া ফেলিল—

"দেব্‌তা ও রকম ক'র‍্যা হ'বো না—বাছুর টানা ক'র‍্যা বা'র করেন।"

আর কতদূর যাবে—ঠাকুর তো চটিয়া আতশবাজীর মত ছুটিয়া উঠিয়া বলিলেন—

"বেল্লিক—ব্রাহ্মণের জাতিপাত প্রয়াসই মূর্খ, অপগণ্ড, অর্ব্বাচীন,—আঃযো বংস অভিধানারোপ—রাম—রাম! শ্রী মধুসূদন নিপাত যা—নিপাত যা—পাষণ্ড।

প্রভু তো এ গৃহে জল গ্রহণও করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া বহির্গচ্ছন হইতে ছিলেন, ইতিমধ্যে প্রহ্লাদ আসিয়া উপস্থিত! সে তো অনেক মিনতি করিয়া দুই হাতে দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া ঠাকুরকে ফিরাইল। পুত্রের হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল—"চলুন দেখি অবস্থা কি হ'চিল—হারামজাদার ইটুগতো বুদ্ধি নাই।"

ঠাকুর সাধ্য সাধনায় কিছু শান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখাইবার জন্য পুটলী খুলিবার চেষ্টা করিতেই এবার পুটলী বাহির হইয়া আসিল। প্রহ্লাদ আহ্লাদে আটখানা হইয়া আবার নিবেদন করিল—

"আর ক্রোধ রাখ্‌পেন না দেব্‌তা—টোপলা খোলেন সেবার অনুমতি হ'ক—দেখি কি কি দিছে?"—ঠাকুর পুটলী খুলিয়া দেখাইলেন—আলু, বেগুন, উচ্ছে, পটল, ঝিঙা, কাঁচাকলা ইত্যাদি।

"ওঃ—ও বারই বা হবে ক্যান্ দেবতা—আপনেও দেখি সাত গোয়ালের গরু একখানে ক'র্‌চ্যান।"

বলিয়া প্রহ্লাদ খালাস।

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নাম-জপ

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৪র্থ বর্ষ। | মাঘ, ১৩২৬ সাল। | ৩য় সংখ্যা।

বঙ্গনারী।

নমঃ নমঃ নারীগুরু দেবী তুমি বঙ্গে,
মঙ্গলা রূপে অয়ি আছ সদা সঙ্গে।
সংসার-মঞ্জীর বাঁধা তব চরণে,
শক্তির সেতু তুমি জীবনে ও মরণে।
হিন্দুর আশা অয়ি বাঙালীর ভাষা গো!
নিখিলের মধুভরা তুমি ভালবাসা গো।

নমঃ নমঃ হে ত্যাগের প্রাণময়ী প্রতিমা,
যুগযুগ-বক্ষের স্মৃতি ওগো সতী মা!
শ্রান্তির পারাবারে শান্তির তরণী,
নন্দন-পথে তুমি র'চে দাও সরণী।
জীবনের পন্থায় আলোকের বাতি রে,
পুরুষের প্রতি কাজে আছ বুক পাতি' রে।

নমঃ নমঃ গরিমার মহিমার সবিতা,
বাল্মিকী-প্রাণ হ'তে গলিয়াছ কবিতা।
রসে রসে ভরা চিরসুন্দরী মরতে,
সৌরভ ভরি' দিলে সৃষ্টির পরতে।
লক্ষ্মীর রূপে ওগো আসিয়াছ ভারতী,
ঘরে ঘরে কবি তোরে করে চির আরতি।

নমঃ নমঃ লজ্জার সজ্জার পুতলি,
হরিচরণামৃতে উঠিয়াছ উথলি'।
দুঃখের মাঝে তুমি ধৈর্য্যের তরণী,
কর্ম্মের মহাযোগে জ্বেলে দাও অরণী।
নিরাশার কুল তব বুক ভরা হাসিটী,
তোরি মাঝে বাজে চিরজীবনের বাঁশীটী।

ভূলোকের মাঝে তুমি দ্যুলোকের দর্পণ,
তব প্রেম-গঙ্গাতে প্রাণ পরিতর্পণ।
মানবীর বেশে উমা এলে মন ছলিতে,
পতি পদ রঞ্জিত কর প্রাণ-বলিতে।
ধর্ম্মের দ্বারে তুমি হয়ে রও দ্বারী গো,
বাংলার দেবী অয়ি বাংলার নারী গো!

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

মাঘ।

—:*:—

সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে সর্ব্বসমেত ছয়খানি কাব্যগ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। রঘুবংশ, মেঘদূত, ও কুমারসম্ভব এই তিনখানি "লঘুত্রয়ী" এবং কিরাতার্জ্জুনীয়, নৈষধচরিত ও শিশুপালবধ, এই তিনখানি "বৃহত্রয়ী" নামে প্রসিদ্ধ। বৃহত্রয়ীর মধ্যে অনেকে শিশুপালবধকেই সংস্কৃত সাহিত্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া স্বীকার করেন। আবার যাঁহারা শ্রীহর্ষের পক্ষপাতী, তাঁহারা নৈষধচরিতকেই কাব্য-সাহিত্যের অমূল্যরত্ন বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন;—

"তাবদ্‌ভা ভারবের্ভাতি যাবন্মাঘস্য নোদয়ঃ। উদিতে নৈষধেকাব্যেক্ক মাঘ ক চ ভারবিঃ।"

সংস্কৃত রসজ্ঞ অন্য সম্প্রদায় বলেন,—"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ॥

প্রাচীন কবিগণের শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করা অসম্ভব না হইলেও, দুঃসাধ্য নিশ্চয়ই! প্রত্যেক কবির মধ্যে একটা নূতনত্ব, বিশেষত্ব অবশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং একের সহিত অপরের তুলনা করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যিকগণ কেহ কালিদাসকে, কেহ মাঘকে, আর কেহ শ্রীহর্ষকে সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া থাকেন। কবি-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে এইটুকু বলাই সঙ্গত যে, আপনাপন প্রতিভায় সকলেই শ্রেষ্ঠ,—যাঁহার যেটা ভাল লাগে তিনি তাহাকেই শ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয় বলিয়া থাকেন। বঙ্গকবিগণের মধ্যে কেহ হেমচন্দ্রকে, কেহ মাইকেলকে, আবার কেহ নবীনকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া থাকেন; আর বর্ত্তমানে কবি রবীন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রকে লইয়া দস্তুরমত দলাদলি চলিতেছে। একদল বলিতেছেন, দ্বিজেন্দ্র শ্রেষ্ঠ; আর একদল বলিতেছেন, রবীন্দ্র কবি-সম্রাট, তিনি বর্ত্তমানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি! সুতরাং কবিগণের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে এইটুকু বলা উচিত যে, যাঁহার রচনা যাঁহাকে ভাল লাগে, তাঁহার চক্ষে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।

মহাকবি মাঘ রচিত শিশুপালবধ ব্যতীত অন্য কোন কাব্য পাওয়া যায় না, কিন্তু কেবল এই একখানি কাব্যই মাঘকে সাহিত্য জগতে অমর করিয়া রাখিয়াছে। সংস্কৃতজ্ঞগণের নিকট মাঘের কাব্য যে আদর ও সম্মান লাভ করিয়াছে, তাহা অল্প কাব্যের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। শিশুপালবধ না পাঠ করিলে সংস্কৃত শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। মাঘ যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আধুনিক এবং প্রাচীন কালের বিদ্বানগণ তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। কবি প্রভাচন্দ্র, মাঘ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"শ্রীমাঘো অগাধধীঃ প্রাপ্তঃ কলানাম্ভবত। চিত্তকাণ্ডকরা যদাকাব্যগঙ্গোর্মিবিপ্রুষঃ॥

অদ্বিতীয় টীকাকার মল্লিনাথ বলিয়াছেন,—"ধন্যো মাঘকবিঃ বয়ং তু কৃতিনস্তৎসূক্তিসংসেবনাৎ," অর্থাৎ,—কবি মাঘ তুমি ধন্য, আর তোমার কবিতারসামৃত পান করিয়া আমরাও ধন্য। কবি রাজশেখর মাঘকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "মাঘেনেব চ মাঘেন কম্পঃ কম্পঃ ন জায়তে।" বস্তুতঃ মাঘ এইরূপ প্রশংসা পাইবার উপযুক্ত কবিই ছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বানগণ মুক্ত কণ্ঠে মাঘের প্রশংসা করিয়াছেন। ফরাসী ভাষায় শিশুপালবধের অনুবাদও হইয়া গিয়াছে। শিশুপালবধ একখানি পৌরাণিক কাব্য, ইহাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা চেদিঅধিপতি শিশুপাল বধের কথা বর্ণিত হইয়াছে। নাটিকান্তর্গত কথাভাগ এইরূপ,—"নাটিকারম্ভে মহামুনি নারদ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া, শিশুপালের জন্মজন্মার্জ্জিত কুকার্য্য সকলের বর্ণনা করিয়া, তাহাকে বধ করিবার জন্য ভগবানকে অনুরোধ করিলেন। কৃষ্ণ নারদের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, তিনি শিশুপালকে নিশ্চয়ই বধ করিবেন। অতঃপর কৃষ্ণ এ সম্বন্ধে বলরাম ও উদ্ধবের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। বহু তর্কবিতর্কের পর স্থির হইল যে, উপস্থিত শিশুপালের বিরুদ্ধে কিছু না করিয়া, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সম্মিলিত হওয়াই কর্ত্তব্য! ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ দলবলসহ হস্তিনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, পথে নানা প্রকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন। রাজসভায় মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকেই অর্ঘ্যদান করিলেন; ইহাতে শিশুপাল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠির এবং কৃষ্ণকে বিস্তর কটুবাক্য বলেন এবং দলবল সহ সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। দুই দলের মধ্যে সন্ধি করাইবার জন্য দূত প্রেরিত হইল, কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল, অবশেষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করিলেন; ইহাই শিশুপালবধ কাব্যের মূল কথাভাগ। এই যৎসামান্য কথাকে কবি বিংশ স্বর্গ যুক্ত এক বৃহৎ কাব্যে পরিণত করিয়াছেন; শিশুপালবধের অর্দ্ধেকেরও অধিক কথাভাগ অন্যান্য বিষয়ে পূর্ণ—

চতুর্থ সর্গ হইতে ত্রয়োদশ সর্গ পর্য্যন্ত কেবল প্রাকৃতিক দৃশ্যই বর্ণিত হইয়াছে। শিশুপাল বধের উপাখ্যান কয়েকখানি পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু মাঘ তাঁহার কাব্যরচনায় ভাগবত, ভারত ও অগ্নিপুরাণ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ভাগবতোক্ত শিশুপালবধের কথার সহিত মাঘ রচিত শিশুপাল বধের বিশেষ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়; সামান্য পরিবর্ত্তন ব্যতীত দু'য়ের কথা ভাগ প্রায়ই একরূপ। দুইখানি গ্রন্থের কথারম্ভেই নারদ শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হন, উদ্ধবের সহিত পরামর্শ হয়, অতঃপর কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করেন। কৃষ্ণদর্শনমানসে ইন্দ্রপ্রস্থের পুরনারিগণের রাজপথে উপস্থিত হওয়া, পাণ্ডবগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অভ্যর্থনা, রাজসভায় তাঁহাকে অর্ঘ্যদান এবং শিশুপালের কটূক্তি প্রয়োগ ইত্যাদি দুইখানি গ্রন্থেই বর্ণিত হইয়াছে; ইহা ব্যতীত দুইখানি পুস্তকের স্থল বিশেষে ভাব, অর্থ ও পদবিন্যাস প্রায়ই একরূপ, উদাহরণ স্বরূপ,— * * * দেবর্ষিঃ পরমদ্যুতিঃ। বিভ্রৎপিঙ্গজটাভারং প্রাদুরাসীদ্যথারবিঃ॥

তং দৃষ্ট্বা ভগবান কৃষ্ণ সর্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ। ববন্দ উত্থিতঃ শীর্ষ্ণা সসভ্য সানুগো মুদা॥

* * * * * * —ভাগবত।

"দধানমম্ভোরুহকে সরদ্যুতীর্জটাঃ শরচ্চন্দ্রমরীচিরোচিষম্।

* * * * *

"পতৎপতঙ্গ প্রতিমস্তপোনিধিঃপুরোস্যযাবন্নভুবিব্যলীয়ত॥ গিরেস্তড়িৎবানিবতাবদুচ্চকৈর্জবেনপীঠাদুদতিষ্ঠদচ্যুতঃ॥

—শিশুপাল বধ

উপরোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ের "বিভ্রৎপিঙ্গজটাভারং" এবং "দধানমম্ভোরুহকেসরদ্যুতীর্জটা" এই দুইটিশব্দ একই অর্থবাচক। ভাগবতের "যথারবি" স্থানে শিশুপাল বধে "পতৎপতঙ্গপ্রতিম" এবং "দেবর্ষিঃ" স্থানে "তপোনিধিঃ" প্রযুক্ত হইয়াছে; "ববন্দ" প্রভৃতি মাঘ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তারপর,— "জীবস্য যঃ সংসরতোবিমোক্ষণং, নজানতোনর্থবহাচ্ছরীরতঃ।

লীলাবতারৈঃ স্বযশঃ প্রদীপকং প্রাজ্বালয়ত্ত্বাং তমহং প্রপদ্যে॥—ভাগবত।

* * * * *

"উদীর্ণরাগপ্রতিরোধকং জনৈঃর ভীক্ষ্ণমক্ষুণ্ণতয়াতিদুর্গম্। উপেয়ুষোমোক্ষপথংমনস্বিনস্তবমগ্রভূমির্নিরপায়সংশ্রয়া॥

—শিশুপাল বধ।

ভাগবতের প্রথম দুই ছত্রের ইহা যেন অবিকল অনুবাদ। ইহার পর,—

"এবমাদীন্যভদ্রানিবভাষেনষ্টমঙ্গলঃ। নোবাচ কিঞ্চিদ্ ভগবান্ যথা সিংহঃশিবারুতম্॥" —ভাগবত।

"প্রতিবাচমদত্তকেশবঃ, শপমানায় ন চেদিভূভুজে। অনহুঙ্কুরুতেধনধ্বনিং, নহিগোমায়ুরুতানিকেসরী॥"

—শিশুপালবধ।

উক্ত শ্লোক দুইটির ভাব এক, কিন্তু দ্বিতীয়টি প্রথমের স্পষ্ট প্রতিধ্বনি। উপরোদ্ধৃত প্রমাণ হইতে দেখা গেল যে, মাঘ তাঁহার কাব্য রচনায় ভাগবত হইতে কত দূর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। জন্মকালে শিশুপালের চারিটি হস্ত এবং তিনটি চক্ষু ছিল একথা ভারত ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থে নাই, মাঘ তাঁহার কাব্যের এই কথাভাগ এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় ভীষ্ম কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি, মহাভারত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। শিশুপালের পূর্ব্ব জন্মের

জন্মগ্রহণ করিয়াছে ; মাঘের এই কথাভাগ অগ্নিপুরাণ হইতে গৃহীত বলিয়া বোধ হয়। কাব্যের অন্য কথাভাগ ও যুদ্ধ বর্ণনাদি সমস্ত কবির কল্পিত। এই শুষ্ক পৌরাণিক কথায় মাঘ নবীন জীবন দান করিয়াছেন। কাব্যান্তর্গত সমস্ত চিত্রই, কবির রচনা গুণে সজীব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, শিশুপাল, শ্রীকৃষ্ণ, উদ্ধব, বলরাম ইত্যাদি সমস্ত পাত্রকেই আমরা যেন নূতন রূপে দেখিতে পাই। কবি নিজের ইচ্ছামত পাত্রপাত্রীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ভারত ও ভাগবতের শিশুপাল অত্যন্ত ক্রোধী, অন্যায়পরায়ণ রাজা, হৃদয় তাঁহার হিংসা-দ্বেষে পরিপূর্ণ, কটু কথা বলিতে তিনি অদ্বিতীয় ; রাজনীতির সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কই নাই। কিন্তু মাঘের শিশুপাল ভাগবত ও ভারতের শিশুপাল হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, মাঘের শিশুপাল ক্রোধী কিন্তু গম্ভীর, তিনি প্রবীন, বীর এবং বাক্‌পটু ; হিংসা ও ঈর্ষার পরিবর্ত্তে তাঁহার হৃদয়ে অভিমানের মাত্রা কিছু অধিক। মাঘের শিশুপাল একজন উদার হৃদয় বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ। ভাগবত ও ভারতের শিশুপালের উপাখ্যান পড়িতে পড়িতে তাহার উপর ঘৃণা ও ক্রোধের উদয় হয়, কিন্তু মাঘের শিশুপালের প্রতি প্রশংসা ও সহানুভূতির ভাব হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। রাজসভায় যুধিষ্ঠির যখন শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্যদান করিলেন, তখন মাঘের শিশুপাল সগর্ব্বে উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—"অভিতর্জ্জয়ন্নিব সমস্ত নৃপগণমসাবকম্পয়ৎ। লোল মুকুটমণিরশ্মি শনৈঃ শনৈঃ প্রকম্পিতজগত্রয়ং শিরঃ॥ ধ্বনয়ন্নথ সনীরদনীরবগম্ভীরবাগভীঃ। বাচমবদতি বাসবগদাদাতিনিষ্ঠুরস্ফুটতরাক্ষরামসৌ॥"—অর্থাৎ—উপস্থিত রাজন্যবর্গকে ভর্ৎসনা করিয়া, ত্রিলোককম্পিতকারী, মণিমুকুটশোভিত মস্তক হেলাইয়া, শিশুপাল সভাস্থলে বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া, মেঘগর্জ্জনের ন্যায় ক্রোধপূর্ণ নিষ্ঠুর অথচ গম্ভীর ও স্পষ্ট কণ্ঠে সভাস্থল কাঁপাইয়া কহিলেন ;—"যদপূপুজস্ত্বমিহপার্থমুরজিতমপূজিতং সতাম্। প্রেম বিলসতি মহত্তদহো দয়িতং জনঃ খলু গুণীতিমন্যতে॥ যদি বার্চনীয়তম এষ কিমপি ভবতাং পৃথাসুতাঃ। শৌরিরবনিপতিভির্নিখিলৈরবমাননার্থমিহ কিং নিমন্ত্রিতৈঃ॥" "হে পার্থ! গুণহীন মুরারিকে সভাস্থলে পূজা করায়, তাঁহার প্রতি তোমার অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মানুষ তাহার প্রিয় ব্যক্তিকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান মনে করে! হে পাণ্ডবগণ! যে কোন কারণেই হোক, যদি শ্রীকৃষ্ণই তোমাদের অত্যন্ত প্রিয় ও পূজনীয় ছিলেন, তাহা হইলে পৃথিবীর সমগ্র নরপতিকে নিমন্ত্রিত করিয়া অপমান করিবার কি প্রয়োজন ছিল?" মাঘ শিশুপালকে এমনি রাজনীতিজ্ঞ, বীর এবং উদার ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। মাঘের কৃষ্ণ চরিত্রও অন্যরূপ। ভাগবতের কৃষ্ণে ঐশ্বরিক শক্তি আছে, তিনি ঈশ্বর ; মাঘের কৃষ্ণে ঈশ্বরত্ব নাই, তিনিও সর্ব্বসাধারণের ন্যায় মানুষ। ভাগবতের কৃষ্ণ বসিয়া বসিয়া চক্রদ্বারা শিশুপালকে বধ করিলেন, ইহাতে তাঁহার ঐশ্বরিক ক্ষমতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু দৃশ্যটা হত্যাকাণ্ডের মতই বিসদৃশ ঠেকে। মাঘের কৃষ্ণ কিন্তু ঐশ্বরিক শক্তির সাহায্যে শিশুপালকে বধ করেন নাই, যুদ্ধ করিয়া তিনি শিশুপালকে আহত করিয়াছিলেন। মাঘের কৃষ্ণ শস্ত্রনিপুন, উদার, দুষ্টের শত্রু, সজ্জনের মিত্র, আদর্শ সম্রাট। ভাগবতের উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত ও ভৃত্য, কিন্তু মাঘের উদ্ধব কৃষ্ণের পূজনীয় গুরুজন। মাঘের উদ্ধব বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ, স্বভাব তাঁহার শান্ত সরল। মাঘের বলরাম অত্যন্ত ক্রোধী, কামাতুর ও মদ্যপ, তাঁহার বলরাম চরিত্র এইরূপ, "ততঃ সপত্নাপনয়স্মরণানুশয়স্ফুরা। ওষ্ঠেন রামো রামোষ্ঠবিম্বচুম্বনচুঞ্চুনা॥ * * * * ঘূর্ণয়ন্মদিরাস্বাদমদপাটলিতদ্যুতী। রেবতীবদনোচ্ছিষ্টপরিপূতপুটে দৃশৌ॥ আশ্লেষলোলুপবধূস্তনকার্কশ্যসাক্ষিণীম্। ম্লাপয়ন্নভিমানোষ্ণৈর্বনমালাং মুখানিলৈঃ। দধৎসন্ধ্যারুণব্যোমস্ফুরত্তারানুকারিণীঃ। দ্বিষদ্দ্বেষোপরক্তাঙ্গসঙ্গিনীঃ স্বেদবিপ্রুষঃ॥ * * * ককুদ্মিকন্যাবক্ত্রান্তর্বাসলব্ধাধিবাসয়া। মুখামোদংমদিরয়া কৃতানুব্যাধমুদ্বমন্॥" মাঘের বলরাম রাজনীতিজ্ঞানহীন, একজন উদ্ধত ব্যক্তি তাঁহার উক্তি,—

"আত্মোদয়ঃপরজ্যানির্দ্বয়ং নীতিরিতীয়তী" বলরামের এইরূপ চিত্র অঙ্কিত করায়, আধুনিক সমালোচকগণ মাঘকে নিকৃষ্ট কাব্যকার বলিয়াছেন। উক্ত কারণে যাঁহারা মাঘকে নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন যে, মাঘের হাতেই বলরামের চিত্র এরূপ বিকৃত হয় নাই, কয়েকখানি পুরাণে এবং অন্যান্য পুস্তকেও আমরা বলরামের এইরূপ চিত্র দেখিতে পাই; সুতরাং ইহার জন্য মাঘকে নিন্দা করা নিতান্ত অনুচিত। সংস্কৃত সাহিত্যে শিশুপালবধ কোন স্থান পাইবার উপযুক্ত, তাহা নিরূপণ করিবার পূর্ব্বে, উক্ত সাহিত্যের ক্রম বিকাশ গভীর মনোনিবেশ সহকারে আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। শিশুপালবধ ব্যতীত, বিভিন্ন পুস্তকে আরও কতকগুলি শ্লোক কবি মাঘ রচিত পাওয়া যায়। বল্লভদেব তাঁহার সুভাষিতাবলীতে নিম্নোক্ত শ্লোক দুইটি মাঘ রচিত বলিয়াছেন,—

নীলংশৈলতটাৎপতত্যভিজনঃসন্দহ্যতাংবহ্নিনা,
মাস্ত্রোষংজগতিক্রমৎসা বিফলাক্লেশসানামাপাইম্,
শৌর্য্যে বৈরীন বজ্রমাশু নিপতত্বর্থোঽস্তুমেসর্ব্বদা।
যেন কেন বিনা গুনাস্তৃণলবপ্রায়াঃ সমস্তা অভী॥

দ্বিতীয় শ্লোকটি এই,—

"নারীনিতম্বফলকে প্রতিবধ্যমানা, হংসীব হেমরশনা মধুরং ররাস।
তন্মোচনার্থমিব নূপুররাজহংসা শ্চক্রন্দুরাতমুখরং চরণাবলগ্নাঃ॥"

ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার "ঔচিত্যবিচার চর্চ্চায়" নিম্নের শ্লোকটি মাঘের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

"বুভুক্ষিতৈর্ব্যাকরণং ন ভুজ্যতে, পিপাসিতৈঃ কাব্যরসোন পীয়তে।
ন বিদ্যয়া কেনচিদুদ্ধৃতং কুলং হিরন্যমেবার্জ্জয় নিষ্ফলাঃ কলাঃ॥"

উক্ত শ্লোকগুলি শিশুপাল বধে পাওয়া যায় না; খুব সম্ভব মাঘ রচিত আরও একাধিক গ্রন্থ ছিল। মাঘ যে একজন সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, মহাবৈয়াকরণিক কবি ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ।

মহাকবি মাঘের স্থিতিকাল সম্বন্ধে, ঐতিহাসিকগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মান ঐতিহাসিক জেকবীর মতে, মাঘ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন। প্রফেসার মেক্‌ডনেল বলেন, খুব সম্ভব নবম বা দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে মাঘের অভ্যুদয়। প্রফেসার ক্লট দশম শতাব্দীর প্রথমভাগ মাঘের স্থিতিকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন; রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় মাঘকে একাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ মত পুরাতন এবং ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের নবীন অনুসন্ধানের ফলাফল হইতে বঞ্চিত। কেহ কেহ বলেন মাঘ বহুদিন পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন; এমন কি তিনি কালিদাস অপেক্ষাও প্রাচীন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া থাকেন,—"পুষ্পেষু জাতী নগরেষু কাঞ্চী, নারীষুরম্ভা পুরুষেষু বিষ্ণুঃ। নদীষু গঙ্গা নৃপতৌ চ রামঃ, কাব্যেষু মাঘঃ কবি কালিদাসঃ।" তাঁহারা বলেন, উক্ত শ্লোকটি ঘটখর্পর রচিত। এই ঘটখর্পর রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নব-রত্নের এক রত্ন ছিলেন; যথা,—"ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতাল ভট্টঘটখর্পর কালিদাসাঃ। খ্যাতোবরাহমিহিরোনৃপতেঃ সভায়াংরত্নানিবৈবররুচির্নব বিক্রমস্য॥" সুতরাং "পুষ্পেষুজাতী" শ্লোকটি যদি ঘটখর্পর রচিত হয়, তাহা হইলে মাঘ নিশ্চয়ই বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ রত্নগণের বহু পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কারণ অদ্যাবধি কেহই ইহা প্রমাণ করেন নাই যে, "পুষ্পেষুজাতী"

শ্লোকটি বস্তুত ঘটকর্পর রচিত কিনা! কেবল কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া, মাঘকে কালিদাস অপেক্ষা প্রাচীন বলা অসঙ্গত ও অশোভন। "ঘটকর্পরকাব্য" ও "নীতিসার" নামক দুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তক ব্যতীত, ঘটকর্পর রচিত অন্য কোন পুস্তকই অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। এই পুস্তকদ্বয়ে বা অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থে, উক্ত শ্লোকটির কোন উল্লেখই নাই; অতএব ঐ শ্লোকটী যে ঘটকর্পরের দ্বারাই রচিত এ কথা কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ ব্যতীত, উক্ত শ্লোকটি ঘটকর্পর রচিত বলিয়া মানিয়া লইতে আমরা বাধ্য নহি। অন্য সম্প্রদায় বলেন যে,—মাঘ ধারাঅধিপতি রাজা ভোজের সমসাময়িক ছিলেন। বল্লাল রচিত "ভোজপ্রবন্ধে", জৈন মেরুতুঙ্গাচার্য্য রচিত "প্রবন্ধ-চিন্তামণি"তে এবং প্রভাচন্দ্র রচিত "প্রভাবক-চরিতে" মাঘ সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত আছে, তাহাতে জানিতে পারা যায়, গ্রন্থকর্ত্তাগণ মাঘকে রাজা ভোজের সমকালীন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ—"তস্য শ্রীভোজভূপালবালমিত্রং কবীশ্বরঃ। শ্রীমাঘো নন্দনো ব্রাহ্মীদানন্দনঃ শীলচন্দনঃ।" ইহা প্রায় স্থিরনিশ্চয় হইয়া গিয়াছে যে, রাজা ভোজ একাদশ খ্রীষ্টাব্দের উত্তরার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং তদনুসারে মাঘও ঐ সময়ের কবি। কিন্তু ভোজপ্রবন্ধ, প্রবন্ধ চিন্তামণি ও প্রভাবক-চরিত কোন ঐতিহাসিক বা প্রামাণিক গ্রন্থ নহে। ভোজপ্রবন্ধ ও প্রবন্ধ চিন্তামণিতে রাজা ভোজের সময়ই যে ভারতের ইতিহাসে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময় ছিল, তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে; এই গ্রন্থের মতে সংস্কৃতের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ কবিই রাজা ভোজের সমসাময়িক ছিলেন; অতএব এই গ্রন্থদ্বয়ের উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রভাবক চরিতের রচয়িতা গ্রন্থারম্ভেই এই কথা বলিয়াছেন যে, আমি এই পুস্তকে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহার সমস্তই জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিতেছে; পুরাকালীন কোন ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করি নাই। সুতরাং উক্ত গ্রন্থত্রয়ের উপর নির্ভর করিয়া, মাঘের স্থিতিকাল একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নির্দ্দেশ করা নিতান্ত অসঙ্গত। এই সকল প্রমাণ ব্যতীত, আরও কতকগুলি এমনও প্রমাণ পাওয়া যায় যে মাঘ একাদশ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ কবি ধ্বন্যালোকের রচয়িতা আনন্দবর্দ্ধন (ইনি নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন) তাঁহার গ্রন্থে শিশুপালবধের দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কবি সোমদেব দশম খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহার রচিত "যশস্তিলকে" কবি মাঘের উল্লেখ আছে। একাদশ শতাব্দীর টীকাকার মম্মটভট্ট তাঁহার "কাব্যপ্রকাশে" শিশুপালবধের অনেকগুলি শ্লোক উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। নৃপতুঙ্গ তাঁহার "কবিরাজমার্গ" নামক গ্রন্থে মহাকবি মাঘের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহাকে কালিদাসের ন্যায়ই শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াছেন। রাজা অমোঘবর্ষের অন্য নাম নৃপতুঙ্গ এবং ইহা স্থির হইয়া গিয়াছে যে, ৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর রাজ্যাভিষেক ও ৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। এই সকল প্রমাণ হইতে স্পষ্ট জানিতে পারা যায় যে মাঘ রাজা ভোজের সমকালীন ছিলেন না এবং খুব সম্ভব নবম শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে বা অষ্টম শতাব্দীর শেষে বিদ্যমান ছিলেন। শিশুপালবধের একটি শ্লোকে মহারাজ জয়াদিত্য ও বামনের "কাশিকাবৃত্তি" এবং জিনেন্দ্রবুদ্ধি রচিত উক্ত গ্রন্থের "টীকান্যাসের" স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা,—"অনুৎসূত্রপদন্যাসা সদ্বৃত্তিঃসন্নিবন্ধনা। শব্দবিদ্যেবনোভাতি রাজনীতিরপস্পশা ॥" এই শ্লোক ব্যতীত শিশুপালবধের কয়েক স্থলে "ন্যাসের" কতকগুলি সিদ্ধান্তেরও উল্লেখ আছে; সুতরাং ইহা জানা গেল যে, মাঘ কাশিকাবৃত্তি ও ন্যাস রচনার পরিবর্ত্তিকালে বর্ত্তমান ছিলেন। ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধানের ফলে, ইহা স্থির হইয়া গিয়াছে যে, মহারাজ জয়াদিত্য ও বামন সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন এবং জিনেন্দ্রবুদ্ধি অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। এই সকল প্রমাণ হইতে স্পষ্ট জানিতে পারা যায় যে, মাঘ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে শেষ ভাগের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন।

শিশুপালবধের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং স্থানু বর্ণনা পাঠে মনে হয় যে, গুজরাট বা গুর্জ্জরই কবির জন্মভূমি ছিল; তাঁহার গ্রন্থে সমুদ্র, দ্বারকা, রৈবতক পর্ব্বত (আধুনিক গিরনার পাহাড়) প্রভৃতির চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায়; ইহা হইতে অনুমান হয় যে, খুব সম্ভব তিনি এই দেশেরই অধিবাসী ছিলেন। একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন শিশুপালবধ কাব্যের শেষে,—"ইতিশ্রীভিন্নমালববাস্তব্যদত্তকসূনোঃ মহাবৈয়াকরণস্য মাঘস্য" ইত্যাদি লিখিত আছে। প্রভাবক চরিতের রচয়িতা "ভিন্নমালবের' পরবর্ত্তি মাঘের নিবাসস্থান "শ্রীমাল" নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অধুনা গুজরাট ও মারবাড়ের সীমায় "ভিনমালা" নামক এক নগর আছে, খুব সম্ভব এই নগরই মাঘের নিবাসস্থান ছিল। শিশুপালবধের শেষে মাঘ তাঁহার বংশ পরিচয়ও দিয়াছেন, ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার পিতার নাম দত্তক এবং পিতামহের নাম সুপ্রভদেব ছিল। মাঘ তাহার বংশ পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন,—

"সর্ব্বাধিকারী সুকৃতাধিকারঃ
শ্রীবর্ম্মলাখ্যস্য বভূব রাজ্ঞঃ।
অসক্তদৃষ্টিবিরজাঃ সদৈব
দেবোঽপরঃ সুপ্রভদেবনামা॥

তস্যাভবদ্দত্তক ইত্যুদাত্তঃ
ক্ষমী মৃদুর্ধর্ম্মপরস্তনূজঃ।
যং বীক্ষ্য বৈয়াসমজাতশত্রো-
র্বচো গুণগ্রাহী জনৈঃপ্রতীয়ে॥

তস্যাত্মজঃ সুকবিকীর্ত্তিদুরাশয়াঽদঃ।
কাব্যং ব্যধত্ত শিশুপালবধাভিধানম্॥

অর্থাৎ,—শ্রীবর্ম্মল রাজার মহামন্ত্রী সুপ্রভদেব ছিলেন; ইনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও দৃষ্টিশক্তিহীন ছিলেন। দত্তক নামে ইঁহার এক পুত্র ছিলেন, ধর্ম্মাত্মা এবং ক্ষমাশীল ছিলেন; তাঁহার পুত্র মাঘ শিশুপালবধ নামক কাব্য রচনা করিলেন। এই পরিচয় হইতে জানিতে পারা যায় যে, সুপ্রভদেব শ্রীবর্ম্মলরাজের মহামন্ত্রী অথবা বল্লভদেবের কথানুসারে মহাসেনাপতি ছিলেন। এখন ঐতিহাসিকগণ যদি অনুসন্ধান করিয়া ইহা স্থির করিতে পারেন যে, শ্রীবর্ম্মল কোথাকার রাজা ছিলেন এবং কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা হইলে মহাকবি মাঘের স্থিতিকাল অভ্রান্তভাবে নির্দ্দেশ হইবার উপায় হয়। শ্রীবর্ম্মল কোন সময় বর্ত্তমান ছিলেন, অদ্যাবধি সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা না হইলেও, মাঘ যে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে শেষভাগের মধ্যেই বর্ত্তমান ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ; তবে শ্রীবর্ম্মলরাজের সময় নিরূপিত হইলে, মাঘের স্থিতিকালও দিনের আলোর মত স্পষ্ট হইয়া যাইত।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

পদ্মিনী।

ফুল-কুলে কমলিনি, মহারাণী তুমি,
পারিজাত সত্যকার দীন মর্ত্ত্য-ভূমি
ধন্য করি বিরাজিছ। গুরু গরিমায়
গরবিণী গরীয়সী; শোভা সুষমায়
নিরুপমা ত্রিভুবনে। সৌরভ-রভসে
সমীরণ শিহরিয়া হরষে অবশে
লুটায় সরসী-বুকে। অলি মধুলোভী
আনন্দে প্রেমান্ধ তব মকরন্দ লভি'
ভুলি ফুল্ল উপবন পুষ্পিত অটবী।
দেবতা ত্রিদিব ত্যজি ত্যজি দিব্য-রূপ
তব সুধা-মধু-আশে সাজিয়া মধুপ
ধরাতলে আসি তব সুস্মিত সুহাস
হেরিয়া বিস্মিত হ'য়ে চাহে মর্ত্ত্যবাস।
অভিনব শরতের প্রফুল্ল প্রভাতে
সুহাসিনী ঊষা যবে রক্ত-রশ্মিপাতে
সরোবর-বক্ষ তোলে রঞ্জিত করিয়া,
রূপের তরঙ্গে তুমি সরসী ভরিয়া
বিকশিত হাসি রাশি ফুটাও যখন,
শিশিরের স্বচ্ছ-মুক্তা-বিন্দু অগণন
চারিদিকে ভাসমান পত্র-পুটে পুটে
ঝলসিতে থাকে যবে, তখন যে ফুটে
অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-ছটা, কোথায় তুলনা
স্বর্গে মর্ত্ত্যে তার, অয়ি রূপসী ললনা?
গন্ধরাজ নাগেশ্বর কেতকী কিংশুক,
অশোক অরুণোজ্জ্বল, অরুণ উৎসুক
সূর্য্যমুখী, বিদেশিনী বিলাসিনী ফুল
রূপসী গোলাপ-বালা, মানস আকুল
সৌরভ-সম্ভোগে যার, চামেলি বকুল,
রজনী রঞ্জন, জবা, কুসুম-সমাজে
রূপে গুণে বিমোহিনী যত পুষ্প রাজে,

কেহ তো মহিমান্বিতা নহে তব সম।
সলিলের অলঙ্কার তুমি মনোরম,
কমলিনী নাম তাই। পঙ্ক জুগুপ্সিত
ধন্য ধরাতলে, তুমি ধরার ঈপ্সিত,
তোমার জনম দিয়া, ওগো পঙ্কজিনি!
সরসী সরসা এত, নদ নদী জিনি
প্রীতিময়ী চারু স্বচ্ছ, তোমারি পরশে।
তুমি সরসিজা, তার উজ্জ্বল উরসে
বিরাজিছ রাজ-বালা, সতত সরসি,
তাই তো সে রূপময়ী—তাই সে সরসী।
সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্যের আদর্শ তুমি যে.
উপমা-বিহীনা সদা রহি তুমি নিজে,
নামের সঙ্গীতে তব করিয়া ঝঙ্কৃত,
ভাষা-অলঙ্কার-কলা করি অলঙ্কৃত,
উপমান উৎপ্রেক্ষার দিয়া উপাদান,
রূপকে ভাষাকে রূপ করিতেছ দান।
অনিন্দ্য-সুন্দর আঁখি আয়ত উজ্জ্বল,
রসে যা সাঁতার দেয়, ভাবে ঢলঢল,
নলিন-নয়ন তাই, প্রেমিকের প্রিয়।
রমণীয় সুকুমার কান্ত কমনীয়
লাবণ্য-তরল মুখ, যাহার দর্শন
মুনিমনোবিমোহন, যার আকর্ষণ
জগতে অপরাজেয়, যার মোহে নর
নরবস্ব বিসর্জ্জিছে, সুধা-সরোবর
বাঞ্ছনীয় সেই মুখ পঙ্কজ-বদন।
পূর্ণ-বিকশিত দেহ, শোভার সদন
পরিপূর্ণ প্রতি অঙ্গ সৌন্দর্য্যের রসে,
সমুচ্ছল যৌবনের পরিপ্লব-বশে
টলমল অনুক্ষণ; প্রতি অবয়বে
কন্দর্পের জয়কেতু মাধুর্য্য-বৈভবে,
সমস্ত-সম্পন্না যেই সৌভাগ্য-শালিনী
কবির নয়নে সেই হেম-কমলিনী।

যে নারী ঐশ্বর্য্যবতী প্রতিভা-প্রভাবে,
অগণিত গুণরাজি যাহার স্বভাবে
মুক্তা-মণি-হীরা-সম করে ঝলমল,
প্রকৃতি অমৃতময়ী, প্রবৃত্তি নিশ্মল
পুণ্য-পথ-প্রবাহিতা প্রতি পদে কাজে,
প্রতি বাক্যে যার নিত্য শ্রী-সুষমা রাজে,
সেই লক্ষ্মী-স্বরূপিণী পদ্মিনী-পদবী
লভিয়া কৃতার্থ হয়। চির-শান্তিচ্ছবি
শত বৈজয়ন্ত জিনি সে বৈকুণ্ঠ-ধাম,
নিখিল-সৌন্দর্য্যে সুখে রমা অভিরাম,
অনন্ত বিশ্বের বাঞ্ছা, সর্ব্বত্যাগী ঋষি
অচিন্ত্য স্বরূপ যার বসি দিবানিশি
ধ্যান করে আজীবন, সেই নিকেতন
কমলা স্বেচ্ছায় ত্যজি,

প্রাণ-বিনোদন

তোমার আলয়ে সতী নিত্য-লীলাময়ী
বসতি করেছে সার, কমলিনি অয়ি,
আনন্দে, বিলাসে, পদ্মালয়া নাম ধরি।
পদ্মবন-সন্নিকর্ষে সন্নিহিত হরি,
তাই তো বাখানে শাস্ত্র। লীলা-পদ্ম-করে
লীলা ভরে হেলাইয়া বাহুলতা, হরে
কমলা হরির চিত্ত।

দেবতা দানব,

গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ অপ্সরোমানব,
হৃদয়-আসন পাতি যুগে যুগে সবে
রহিয়াছে প্রতীক্ষিয়া পদ্মালয়া কবে
চরণ-নখর-রেণু-কণা-পরশন
প্রদানিবে ক্ষণতরে, সেই চিত্তাসন
ভক্তির-পরাগ-রক্ত অবহেলি রমা,
তুমি তামরস তাঁর চির-মনোরমা,
তব দল-রাজি-পরে আনন্দে বিরাজে।
স্বয়ং বৈকুণ্ঠ-পতি নাভি-পুট-মাঝে

সাধ করি রাখি তোমা নাম পদ্ম-নাভ
লভিয়াছে। নিরমল শুভ্র রক্তিমাভ
ব্রহ্মা সেই পদ্ম হ'তে সদ্যঃ-সমুদ্ভূত,
তাই পদ্মযোনি, রক্ত-পদ্ম-প্রভা-যুত।
—শ্রেষ্ঠতর গরিমা কি আছে কারো আর?
বরণীয় মণ্ডনীয় তুমি দেবতার,
মরতে মানব-মনে রূপের স্বপন
রচিতেছ চিরদিন; এ বিশ্ব-ভবন
প্রমোদিত বিনোদিত, সৌরভ-বাসিত,
তব রূপে, গন্ধে, নামে, চির-প্রভাসিত।

শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা।

প্রিয়তমা।

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জার্ম্মনীর রুডিস্ডর্কে—কাউণ্ট ট্রেচেনবার্গের প্রাসাদের নামও রুডিসডর্ক। প্রাচীন ট্রেচেনবার্গ বংশীয়গণ যখন ঐশ্বর্য্য ও শক্তিতে জর্ম্মনরাজ্যে সমুন্নত শির, তখন এই বিস্তৃত প্রাসাদেরও সৌন্দর্য্য সম্পদের সীমা ছিল না। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই, সে আনন্দ ও আলোক ঝলমলায়মান সুখ-ভবন শূন্য-আঁধার ও দৈন্যের শ্রীহীন চিত্র দেখাইতেছে মাত্র। পূর্ব্বতন কাউণ্টগণের বিলাস ও অপরিমিত ব্যয়ের প্রচণ্ড আঘাত সে সহ্য করিতে পারে নাই এবং সে শোভাহীন ভবনে সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী কমলাও আপনার আসন ত্যাগ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান কাউণ্টের পিতা মৃত কাউণ্ট ট্রেচেনবার্গের সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের শেষ চিহ্নটুকুও নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে; একমাত্র পুত্র ম্যাগনস্, দুই কন্যা—আল্‌রিক ও জুলিয়েন এবং পত্নী কাউণ্টেস্ ট্রেচেনবার্গ এখন সেই বংশের নাম ও চিহ্নরূপে বর্ত্তমান। অগণিত দাসদাসীর পরিবর্ত্তে একটি মাত্র বৃদ্ধা ধাত্রীর দ্বারায় তাঁহাদের সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। সকলেই পলাইয়াছে শুধু সেই পুরাতন প্রভুপ্রাণা দাসী স্নেহের বাঁধনে বাঁধা পড়িয়া আছে; সে যাহা পারে করে, অবশিষ্ট ট্রেচেনবার্গ কন্যাদ্বয়ই সারিয়া লন।

কোন গৃহে কোন সজ্জা নাই; বৃহৎ বৃহৎ কক্ষগুলি যেন গৃহস্বামীর দুর্ভাগ্যে হাহাকার করিতেছে। গৃহতল অনাবৃত-শীতল, আবরণহীন ভগ্ন কাচ বাতায়ন গুলি যেন রুগ্নের দৃষ্টির ন্যায় কুয়াসাচ্ছন্ন; সে অগ্নিহীন আলোকশূন্য গৃহে যে মানুষ বাস করিতে পারে ইহা ট্রেচেনবার্গ বংশে কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই।

কি আর অবশেষ ছিল? কেবল মাত্র একটি বৃহৎ কক্ষে মৃত কাউণ্টগণের পূর্ণায়তন তৈল চিত্রাবলী চারিদিকের প্রাচীর উজ্জ্বল করিয়া সজ্জিত, কি জানি কেন পাওনাদারেরা সেগুলি নিলামে তুলিয়া দেয় নাই। তাঁহাদের

যোদ্ধৃবেশ বহুমূল্য বসনভূষণ ও হাস্যোজ্জ্বল প্রশান্তমূর্ত্তির প্রতি চাহিলে মনে জাগে, বর্ত্তমান ট্রেচেনবার্গের দশা তাঁহারা যদি একবার অনুমানও করিতে পারিতেন তবে শুধু ভয়েই তাঁহাদের মুখের সে জ্যোতিঃ নিমেষে আঁধার হইয়া যাইত।

শুধু একটি মূল্যবান সামগ্রী তাঁহার বংশধরেরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন,—সেটা ঐ চিত্রিতদের মুখের ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য ও অদমনীয় বংশমর্য্যাদা। আল্‌রিক ম্যাগনস্ ও জুলিয়েন্, অন্তরে ও বাহিরে তাহার সম্পূর্ণ অধিকারী।

সেদিন বাহিরে মেঘ নামিয়াছিল; তুষারপাতের অব্যবহিত পরেই,—ঘরখানি অপেক্ষাকৃত শীতল। মধ্যের চিমনিতে আগুন জ্বালাইয়া দুই ভগ্নি আপন আপন কর্ম্মে নিবিষ্ট ছিলেন। প্রথমা অষ্টবিংশ বর্ষীয়া পূর্ণাবয়বা যুবতী, তাঁহার সম্মুখে টেবিলে প্রস্তুত অর্দ্ধ-প্রস্তুত শিল্পসম্ভার, তিনি তখন নিবিষ্ট চিত্তে একটি কৃত্রিম পুষ্পগুচ্ছ রচনা করিতেছিলেন। ইনি সুন্দরী নন কিন্তু বুদ্ধি ও শান্তির সঙ্গে এমন একটি মহত্ত্ব প্রকাশক ভাব তাঁহার সমস্ত মুখশ্রীকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল যাহাতে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই সকলেরই হৃদয়ে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধায় নত হইয়া আসে। অপর আর একটি,—তাঁহার ট্রেচেনবার্গ বংশের বিবর্ণবিশিষ্ট,—ইতর জনোচিত রক্তাভ কেশ; তাঁহার উদার মুখমণ্ডল বেষ্টন করিয়া সেই বংশগত বৈচিত্রের পরিচয় দিতেছিল—ইনিই আল্‌রিক।

দ্বিতীয়া জুলিয়েন; আর পার্শ্বে বসিয়া কতকগুলি লতাপাতা লইয়া পরীক্ষা ও কাগজে সে সম্বন্ধে কি লিখিতেছিলেন। এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল—"লিয়েন!"

জুলিয়েন চমকিয়া, মুখ তুলিয়া উত্তর করিলেন "কি মা!" বলিতে বলিতে জুলিয়েন তাহার হাতের জিনিযগুলি বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকাইয়া ফেলিল, আল্‌রিকও তাঁহার দ্রব্যাদি একত্র করিয়া রুমাল চাপা দিলেন।

প্রফুল্লবদনা কাউণ্টেস্ ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার হাতে একটি সুশ্রী কাগজ মোড়া প্যাকেট। এই পরমা সুন্দরী নারী প্রৌঢ়ত্বের পরিণত অবস্থাতেও যৌবনের নিটোল গঠন ও উজ্জ্বল স্বাস্থ্য হারান নাই, আর এত দৈন্যের মধ্যে তাঁহার বেশভূষাও দিব্য পরিপাটি ও মূল্যবান। যাঁহারা বিলাসিতা ও আমোদপ্রমোদে সর্ব্বস্বান্ত চিরকালের অভ্যস্ত রীতি ছাড়িতে চাহেন না ইনিও সেই দলের একজন। তিনি যে সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা ও প্রসিদ্ধ বংশের গৃহিণী এই গর্ব্ব এখনও তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় জাগিয়া আছে।

কাউণ্টেস্ অগ্রসর হইয়া হাতের মোড়কটি টেবিলে রাখিয়া বলিলেন, "এস লিয়েন দ্যাখ, রাওয়েল্ তোমার জন্য কি পাঠিয়েছেন! আল্‌রিক, এটা খোল।"

মাতার আজ্ঞায় আল্‌রিক তাহা খুলিলেন। তাহার মধ্যে একটি বহুমূল্য রেশমী কাপড়, আলো লাগিয়া তাঁহার চিক্কণ শুভ্র বর্ণ ঝলমল্ করিয়া উঠিল। সানন্দে মাতা বলিলেন, "ইহাতে সুন্দর বিবাহের পোষাক হইবে।" সিল্কটার রূপার পাড়টিতে আরও বাহার খুলিয়াছে নয় কি আল্‌রিক?"

উত্তর না দিয়া আল্‌রিক একটি বাক্স তুলিয়া বলিল, "এটায় আবার কি?" খুলিয়া দেখা গেল, মণিমুক্তা খচিত মূল্যবান একছড়া হার। আনন্দে ও বিস্ময়ে কাউণ্টেসের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; বিহ্বলভাবে তিনি বলিলেন, "ছয় শত গিনির একটিও কম নয়! তোর ভাবী স্বামী—লিয়েন্, এদিকে আয় না বাছা, দ্যাখ্ না কেমন নেকলেস্‌টি পাঠাইয়াছেন তোর জন্যে।"—জুলিয়েন অন্য দিকে চাহিয়াছিল, আল্‌রিক বলিলেন, "এবার তুমি মা?"

"তোল, সাবধানে রাখিয়া দাও; কালই দর্জ্জি ডাকিয়া জুলিয়েনের মাপ দিয়া পোষাক তৈরি করিতে দিতে হইবে। আমি ভাবি নাই আলরিক,—হাঁ আমার কখনো মনে হয় নাই যে লিয়েনের অদৃষ্ট এমন ভাল। যেমন বংশ তেমনি ধন,—আর রাওয়েল—খাসা ছেলেটি, নয়?"

ধীরস্বরে আল্‌রিক উত্তর দিলেন, "কি জানি মা, আমি ত তাঁহাকে বেশী জানি না, তাঁর সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুব অল্প।"

মা একটু বিরক্তভাবে বলিলেন, "জান না? ব্যারণ মাইনোকে এ দেশে কে না জানে? তোমার জানা না জানায় তাঁর কোন ক্ষতি নেই আল্‌রিক!—"

আল্‌রিক বলিলেন, "তা নিশ্চয়; কিন্তু মা—লিয়েনকেও তার স্বামীর সম্বন্ধে যেন কিছুই জানিতে বা ভাবিতে দেওয়া হইল না, ভাবিয়া দেখ।"

কাউণ্টেস্ আরও রাগিয়া গেলেন, তীব্র স্বরে বলিলেন, "যথেষ্ট ভাবিয়াছি! মা তার মেয়ের জন্যে যতটুকু ভাবে, আমি তার একচুলও কম ভাবি নাই, আর বড় বড় বংশের মেয়েদের বিবাহ তোমাদের ওসব প্রেমট্রেমের দিক দিয়ে যায় না তা জান কি? আমার বিবাহের সম্বন্ধ আমার পিতামাতাই করিয়াছিলেন, একেবারে বিবাহের সময় স্বামীর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা,—কিন্তু তাহাতে কি হইয়াছে? আমার সুখের কোন হানি হইয়াছিল? আমি বলিতেছি আল্‌রিক, তুমি লিয়েনের মন ভাঙ্গাইয়ো না, এ সম্বন্ধ তার পক্ষেও আশার অতীত। রাওয়েলের বিদ্যাবুদ্ধির কথা শুনিয়াছ? ধনীর ঘরে কয়টি ছেলে আইন পরীক্ষায় পাশ হইয়া আসে বল দেখি?"—

মাতাকন্যায় আরও কি কথা হইত স্থির নাই, কাউণ্টেসের স্বর ক্রমেই উচ্চ হইতেছিল, কিন্তু মধ্যপথেই তাহা বাধা প্রাপ্ত হইল। কর্ত্রীর পুত্র এবং বর্ত্তমান গৃহস্বামী—ম্যাগনস কাউণ্ট অফ্ ট্রোচেনবার্গ, দ্বার হইতে বলিলেন, "কি মা কি হইতেছে এখানে? কার কথা বলিতেছ?"

"এই যে ম্যাগনস্, এস তোমার সঙ্গেও আমার কথা আছে। লিয়েনের বিবাহের কথাই হইতেছিল, রাওয়েল্ মাইনো কে তুমি জান—"

বাধা দিয়া হাস্যপ্লুত স্বরে ম্যাগনস বলিলেন, "হ্যাঁ তিনি আমার ভাবী ভগিনীপতি, শুধু এইটুকু জানা গিয়াছে, কিন্তু মা, আর এখন সে কথা কেন? আমার সঙ্গে তোমার আর কোন কথা আছে কি?"

"হ্যাঁ আছে। তোমরাই এখন সংসার চালাইতেছ কাজে কাজেই বিবাহের ভোজের ফর্দ্দ মিলাইয়া উদ্যোগ আয়োজন করিবার ভার তোমারই উপর।" বলিয়া কাউণ্টেস্ একটা লম্বা ফর্দ্দ পুত্রের হাতে দিলেন। "নিশ্চয়, এখন হইতে তাহার আয়োজন না করিলে তাড়াতাড়ি পারিব কেন, আমাদের যা লোকজনের অভাব,—আর—" তারপর ফর্দ্দখানির উপর দৃষ্টি ফেলিতে ফেলিতে ম্যাগনস্ ডাকিলেন "শোন আল্‌রিক, এদিকে এস; আমার চেয়ে এ সব তুমিই ভাল বোঝ।"

আল্‌রিক মনোযোগ দিয়া ফর্দ্দ পড়িতে পড়িতে বলিলেন, "এত স্যাম্‌পেন কি হইবে?"

মাতা বলিলেন, "কেন বরযাত্রাদের জন্য, বড় বড় ভদ্রলোকদেরও কি তুমি তোমার ঐ জঘন্য সরাপ খাওয়াইতে চাও নাকি?"

"না, তবে স্যাম্‌পেনের দাম আজকাল—"

"দাম! আল্‌রিক, দিন রাত্রি তোমার মুখে ঐ এক কথা ছাড়া অন্য কথা নাই! দাম—দাম. দাম না দিলে ভাল জিনিষ কোন কালেই পাওয়া যায় না সে সবাই জানে। তোমার হাতে সংসার খরচা পড়ায় খাওয়াদাওয়া যা হইতেছে তাহা আমি—কি করি সব সহ্য করিতেছি; কিন্তু এই জন্মের মধ্যে কর্ম্ম, সিগ্রেনের বিয়ের ভোজ, দস্তুর মত ভদ্রভাবেই করিতে হইবে, এখানে তোমার কোন কথা চলিবে না।"

আল্‌রিক বাক্স হইতে মুদ্রাধানটি বাহির করিয়া মাতার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন. "তুমি কেন রাগ কর মা? এই দ্যাখ আমাদের সম্বল. ইহা হইতে যা হয়—"

কাউণ্টেস্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহাতে বাধা দিয়া ম্যাগনস্ সম্মুখে আসিয়া বলিলেন. "ভয় নাই মা—ভয় নাই আল্‌রিক! এ বিবাহে আমি কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিতে চাহি না, কারণ—থাক্ সে কথা, আর অন্যদিকে—"

"কি বলিতেছ ম্যাগনস্! বন্ধুবান্ধব কাহাকেও নিমন্ত্রণ—"

"না মা কাহাকেও নয়। আমাদের আত্মীয় অনেক, তার মধ্যে কাহাকে বাদ দিব বলুন অথচ তাঁদেরকে আনিয়া—না না মা, সে হইতে পারে না, আমি পারিব না তা।"

"আর বরযাত্রী. তাঁরাও কি রুডিসড্রক হইতে উপবাস করিয়া যাইবেন?"

"নিশ্চয় না। অতিথির সঙ্গে ট্রেচেনবার্গেরা চিরদিন যেমন ব্যবহার করিয়াছেন এখনো তাহার ত্রুটি হইবে না" বলিতে বলিতে ম্যাগনস বাহির হইয়া গেলেন। এই তরুণ বয়স্ক গৃহস্বামী বাদবিসম্বাদ ভালবাসিতেন না, অথচ মাতার প্রকৃতির সহিত সাদৃশ্য ছিল না বলিয়া সর্ব্বদাই তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে গোল বাধিত, তখন তিনি এমনি করিয়া গৃহত্যাগ করিতেন। তাঁহার প্রস্থানে ক্রোধের ক্ষোভের ঝোঁকটা আল্‌রিকের উপর পড়িল। আল্‌রিক সহজে বিচলিত হইতেন না, মাতার কথায় রাগ না করিয়া শান্তভাবে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। জুলিয়েনও মাঝে মাঝে ভগ্নীর সঙ্গে কথা বলিতেছিল কিন্তু তাহাতে ফল আরও খারাপ হয় দেখিয়া বলিল, "আমি যাই আল্‌রিক, লিজি বুড়ি হয়তো এতক্ষণ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।" সে যাইতেছিল হঠাৎ দুয়ারের সম্মুখে ভ্রাতাকে দেখিয়া সহাস্যে বলিল, "ম্যাগনস্"?

অত্যন্ত প্রফুল্লভাবে ম্যাগনস্ বলিলেন, "হাঁ জিয়েন! এই দ্যাখ এখনি তোমার এই বই ছাপা হইয়া আসিয়াছে। আর এই পঞ্চাশ গিনি তোমার সেই লেখাটার—"

স্বরে আকৃষ্ট হইয়া কাউণ্টেস্ ফিরিয়া বলিলেন "বই? কিসের বই—কৈ দেখি।" বলিয়া হাত বাড়াইতেই ম্যাগনসের প্রসারিত হস্তের বইখানির রচয়িতার নামটির উপর দৃষ্টি পড়িল।

খড়ের অগুনের মত জ্বলিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি? তোমার লেখা এ? ম্যাগনস্, দিনে দিনে এ সব কি দেখিতেছি আমি? কাউণ্ট্‌ট্রেচেনবার্গ বই বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে—ইহা দেখিবার আগে আমার মৃত্যু হইল না কেন? কোন্ বংশে তোমার জন্ম, তোমার মাতামহেরা কে,—সব ভুলিয়া গিয়াছ কি? আমার গর্ভে এ সব নীচ স্বভাব সন্তান কেন হইল ভগবান! লোকের কাছে আমি মুখ দেখাইব কি করিয়া?"

মাতার তিরস্কার ম্যাগনসের মুখ হাস্যশূন্য হইল। ধীরভাবে বলিলেন; "ব্যস্ত হইয়ো না মা, এ আমার লেখা নয়, বইটা লিয়েনের। নভেল নাটকও নয় কতকগুলো উদ্ভিদ বিষয়ের প্রবন্ধ একত্র করিয়া ছাপানো হইয়াছে।"

"লিয়েনের? তবে ত আরও চমৎকার! মেয়ে মানুষ বই ছাপাইয়া বিক্রয় করে—"

"যাদের পয়সার অভাব তারা কারু কাছে হাত না পাতিয়া ঋণের দায়ে মাথা না বিকিয়ে এ রকম উপার্জ্জন করিলে কোন দোষ নাই মা। আর লোকের কথায় কান দিয়া কি হইবে তাহারা কি কেউ আমার অভাব মোচন করিতে আসিবে মা? যাক্, আলরিক, টাকা কয়টি রাখ দেখি, সম্মুখেই আমাদের অনেক প্রয়োজনে আসিবে।"

আলরিক টাকা ও বইখানি হাতে লইয়া ফিরিতেই কাউন্টেস্ তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলেন। তাহার পরই একটা গর্জ্জন; জুলিয়েন ও ম্যাগনস চমকিয়া উঠিলেন। উগ্রস্বরে কাউন্টেস্ বলিতেছিলেন, "থাম; আমি সব বুঝি! এ সব তোমারই কীর্ত্তি! তোমারি কুমন্ত্রণায় উহাদেরও মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। অন্যের-কুবুদ্ধি! ছোট লোক! যা—তুই আমার চোখের সম্মুখ হইতে চলিয়া যা। আমার বাড়ী হইতে এখনি চলিয়া যা! তোর মুখ দর্শন করিতে চাই না আমি।"—বলিতে বলিতে বইখানি হাত হইতে টানিয়া লইয়া জানালার ভিতর দিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন।

মাতার মুষ্টির চাপে হাত কাঁপিয়া কয়েকটি মুদ্রা আলরিকের হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছিল, মুক্তি পাইয়া তিনি তাহা কুড়াইতে উদ্যত হইতেই কাউন্টেস্ আরও চীৎকার করিয়া বলিলেন,—

"আবার ঐ টাকায় হাত? তুই যদি আবার এ বাড়ীর কিছুতে হাত দিস্ আলরিক—যা—যা বলছি!"

ম্যাগনসের মুখ কালো হইয়া উঠিতেছিল। তিনি আসিয়া গিনি কয়টি কুড়াইয়া আলরিকের হাতে দিয়া বলিলেন, "যাও আলরিক তোমার কাজে যাও। আর মা, বাধ্য হইয়াই তোমায় জানাইতেছি, আমি,—এ বাড়ী বা তার যা কিছু, সবই এখন আমার; দিদি আলরিক আমার চিরদিন,—হাঁ যতদিন আমি বাঁচিব ততদিন, এমনি ভক্তি স্নেহ ও আদরের সঙ্গেই আমার কাছে থাকিবে। না না বিরক্ত হ'য়ো না তুমি, অনর্থক ঝগড়া বিবাদ আমি ভালবাসি না জান ত। অনর্থক—মা শুধু শুধু কাহারো উপর রাগ করায় এখন আর কোন লাভ নাই, পূর্ব্বে যদি তোমরা একটুও সতর্ক হইতে একটু বিবেচনা করিতে তবে আর—" বলিতে তাঁহার দৃষ্টি আলরিকের উপর পড়িল, তিনি বিষণ্ণ ও বিপন্ন মলিন হাসিটির সহিত ভ্রাতার প্রতি চাহিতেই ম্যাগনসের স্বর নীরব হইয়া গেল। মাতা তখন চেয়ারে বসিয়া হাঁফাইতেছিলেন, তাঁহার জলন্ত চক্ষু তখন নত হইয়া গিয়াছে। তিনি চিরদিন যে সমাজে বাস করিয়াছেন, সেখানে মানসিক শক্তি বলিয়া কোন সামগ্রীর অস্তিত্ব ছিল না; তাই আজ নিজের সন্তানের আকৃতিতে সেই তেজের ঔজ্জ্বল্য, দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য ও ভীত হইয়া উঠিলেন।—ম্যাগনসও আকস্মিক ক্রোধের মুখে মাতাকে মনঃপীড়া দেওয়ার জন্য কষ্ট বোধ করিতেছিলেন। যেমন ঝড় থামিয়া গেলেও সমস্ত আকাশ বাতাস জুড়িয়া একটা ক্ষুব্ধ অবসাদের ভাব সমস্ত পৃথিবীটাকে স্তব্ধ করিয়া রাখে, এই ঘরখানিতেও তেমনি শ্রান্তি, তেমনি মৌনতা উপস্থিত হইয়াছিল। জুলিয়েনের মুখ শুখাইয়া উঠিয়াছে, ম্যাগনস নীরবে সংবাদ-পত্রে চোখ বুলাইতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণের পর ম্যাগনস্ একটু চঞ্চলভাবে মুখ তুলিলেন, স্তব্ধতা তাঁহার ভাল লাগিতে ছিলনা। সম্মুখে টেবিলের উপর সেই মোড়কটি তখনও পড়িয়াছিল, টানিয়া লইয়া তিনি বলিলেন, "এ আবার কি? মা ইহাতে কি আছে জান?"

শিথিল প্রকৃতি কাউণ্টেসের ক্রোধও এই অল্প সময়ের মধ্যেই জুড়াইয়া আসিয়াছিল, বিশেষত তাঁহার বাঞ্ছিত প্রিয় প্রসঙ্গটি উপস্থিত হওয়ায় আগ্রহ ভরেই তিনি বলিলেন, "দেখ নাই তুমি? রাওয়েল, লিয়েনকে এ সব উপহার দিয়া পাঠাইয়াছেন যে!"

ম্যাগনস্ খুলিয়া খুলিয়া জিনিষ কয়টি দেখিলেন মাত্র, কোন কথা বলিলেন না। কিন্তু সে অভাব তাহার মাতাই পূরণ করিলেন, উপহৃত বস্তুগুলির ঔজ্জ্বল্যে তাঁহার মুখ আবার পূর্ব্ববৎ হাস্যোজ্জ্বল; বস্ত্রাদির মূল্য বিচার ও রুচির প্রশংসা করিয়া, শেষে কন্যার প্রতি চাহিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "মাইনোরাই এখন দেশের মধ্যে সবারি উপর মাথা তুলিয়াছেন, তাঁহারা যে এখানে বিবাহ করিতে এত আগ্রহ দেখাইতেছেন সে কেন জান ম্যাগনস্? কেবল আমার লিয়েনের এই সুন্দর মুখখানির জন্য! দেখ দেখি এমন চুল এমন মৃণালের মত বাহু—আর এই মিষ্ট সুন্দর মুখখানি কি রাজরাণীর যোগ্য নয়?"

ম্যাগনসও সানন্দ নয়নে ভগিনীর প্রতি চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে ছিলেন। মাতা আবার সগর্ব্বে বলিলেন, "আমি জোর করিয়া বলিতে পারি এ মুখ এ চুল সে তোর মাতৃকুল হইতেই পাইয়াছে! লিয়েন, মা—নেকলেস ছড়াটি তোর পছন্দ হইয়াছে নিশ্চয়?"

লিয়েন কথা কহিল না। মা বলিলেন, "আচ্ছা একবার গলায় পর দেখি, কেমন মানায় দেখা যাক্।" বলিয়া হারটি তুলিয়া তাহার সম্মুখে ধরিলেন।

এবার জুলিয়েন বিরক্তভাবে তাহা হাত দিয়া সরাইয়া বলিল, "মাপ কর মা, ও আমি পরিতে পারিব না।"

"কেন? পরিতে পারিবে না কেন?"

"না, ওসব আমার ভাল লাগিতেছে না।"

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া মাতা বলিলেন, "কি ভাল লাগিতেছে না—এই হারটা না—"

"ও কিছুই ভাল লাগে না আমার। তিনি কেন এসব পাঠাইলেন তাহার আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! ম্যাগনস্, বল—এ সব সত্যিই আমাদের অপমান নয় কি?"

কাউণ্টেস্ আবার রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "অপমান? লিয়েন!"

"হাঁ মা এ আমাদের দারিদ্র্যকে অপমান আর—আর আমাকেও অপমান।" বলিয়াই জুলিয়েন নিকটের দ্বার দিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। মাতা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে চাহিয়া পুত্রকে বলিলেন "শুনিলে ম্যাগনস্, তোমার বিদুষী ভগ্নীর কথায় মর্ম্ম বুঝিলে? আমি স্থির করিতেছি বলিয়া এ বিবাহ উহাদের পছন্দই হইতেছে না।"

হাসিয়া ম্যাগনস্ বলিলেন, "তা হোক মা, বিবাহটাই যখন হইতেছে তখন আর অন্য কথায় প্রয়োজন কি আমাদের?"

"হাঁ আন্তরিক যদি বাধা না দেয়!" বলিয়া কাউণ্টেস একটি নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জর্ম্মণ রাজবংশীয় ডিউক অফ্ মন্টিগই প্রকৃত প্রস্তাবে এ প্রদেশটির রাজা ছিলেন। তিনি রাজ-প্রতিনিধি ও শাসন কর্ত্তা হইয়া এ দেশেই বাস করিতেন। হ্রদ তীরে তাঁহার সুরম্য গ্রীষ্মাবাসে দুইটি শিশু পুত্রকে লইয়া তাঁহার বিধবা পত্নী এখনও বাস করিতেছেন, ডিউক অকালে পরলোকগত।

প্রথানুযায়ী তাঁহার শোকচিহ্ন স্বরূপ দেড় বৎসর, এই স্থান। অধিবাসীরা কোন আমোদে কেহ যোগ দেয় নাই, সাজসজ্জার বাহুল্য দেখায় নাই, ভিতরে যাহাই থাকুক, বাহিরে ডিউকের বিরাট প্রাসাদ নীরবে নিরানন্দেই কাটাইয়াছে। এত দিনে সে দীর্ঘ শোকের অবসান, গত কল্য ডাচেস্ ও প্রিন্সদ্বয় কৃষ্ণ বসন ত্যাগ করিয়াছেন। আর আজ এই লিণ্ডেন রোপণ উৎসবটিকে শোক মুক্তির সূচনা করিয়া অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার আরও বাহুল্য আরও সমারোহে এই দিনের উৎসবায়োজন হইতেছে। সহরের ও বাহিরের গণ্যমান্য সকল পরিবারেরই ভোজের নিমন্ত্রণ; মেলা দেখিতে অন্য লোকও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

প্রাসাদের সম্মুখের বিস্তীর্ণ মাঠটি ক্ষুদ্র বৃহৎ লিণ্ডেন বৃক্ষে পরিপূর্ণ। শ্যামল সুন্দর দৃশ্য, ছায়াময় স্নিগ্ধ-শীতল স্থানটিতে দেশের সম্ভ্রান্তবংশীয়েরা প্রায় সকলেই উপস্থিত আছেন। আর তাঁহাদের মধ্যে স্বয়ং গৃহস্বামিনী ডচেস্ অফ্ মন্টিগ, তাঁহার অতুল্য রূপও অপরাজেয় যৌবনশ্রীকে চাকচিক্যময় শুভ্রোজ্জ্বল বসনে সজ্জিত করিয়া হীরকমুক্তায় দীপ্ত করিয়া সন্ধ্যার শুকতারার ন্যায় রূপে আলো করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

তিনি চিরদিনই সমবেত অতিথিবৃন্দের অভ্যর্থনায় মনোযোগী। সহচরীগণে বেষ্টিতা হইয়া তিনি প্রত্যেকের সহিতই হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, আরও কাহারও প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠায় তাঁহার মন চঞ্চল। বারবার তাঁহার দৃষ্টি দূরের পথ প্রান্তে ঘুরিয়া আসিতেছে।

ক্রমশঃ বেলা শেষ হইয়া আসিল, পুরোহিত ব্যগ্রতার সহিত জানাইলেন, লিণ্ডেন রোপণের এই শেষ সময়! ডচেসের জ্যেষ্ঠ পুত্র—অষ্টম বর্ষীয় শিশু ডিউক অগ্রসর হইয়া আসিল।

বর্ষে বর্ষে এই তিথিতে লিণ্ডেন রোপণ, এই বংশের চিরাগত প্রথা। উপযুক্ত অধিকারীর অভাবে সেই বালক রাজকুমারই সে পবিত্র উৎসবের অনুষ্ঠান শেষ করিলেন। সকলে আনন্দধ্বনি করিয়া নূতন ডিউক ও এই কল্যাণ-কার্য্যের অভিনন্দন করিলে, এ ব্যাপারের ভূমিকা সমাপ্ত হইল।

আনন্দধ্বনির প্রতিধ্বনি তখনও মিলায় নাই, সমবেত জনতার উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য গম্ভীর লিণ্ডেন ক্ষেত্রটিকে উতরোল করিয়া দিয়াছে, ঠিক সেই সময়—সকল স্বরকে ছাড়াইয়া একটি সুতীক্ষ্ণ সুমিষ্ট বালকণ্ঠ চীৎকার করিয়া বলিল, "সকলে হুররে দিল তুমি যে বড় দিলে না? বেয়াদবি?" সঙ্গে সঙ্গে চাবুকের আঘাত শব্দও বাতাসে ছুটিয়া গেল।

সকলের দৃষ্টিই সেই দিকে আকৃষ্ট, দেখা গেল প্রহারকারী বালক একটি পঞ্চম বর্ষীয় শিশু, কিন্তু তাহার পরিপুষ্ট সুন্দর বলিষ্ঠ আকৃতি দেখিলে, বালকের শারীরিক শক্তি সম্বন্ধে মন পরিতৃপ্ত হইয়া উঠে; মুখশ্রীও তেজোব্যঞ্জক লাবণ্যে রঞ্জিত। কিন্তু প্রহারিত বালকটি ইহার বিপরীত, তাহার বয়ক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণপ্রায় হইলেও তাহার ক্ষীণ দুর্ব্বল গঠনে অল্প বয়স্ক বলিয়া বোধ হইতেছিল। তবু সকলে দেখিলেন, সেই স্বল্পরক্ত ম্লান

মুখটি অপরূপ সুন্দর ; সুদীর্ঘ কৃষ্ণ চক্ষু দুটিতে তার এমন একটি শান্ত করুণ বিষাদ ছায়া নত হইয়া আছে, অযত্ন লুণ্ঠিত ঘন কুঞ্চিত কেশরাশিতে আবৃতপ্রায় মুখখানিতে যে ম্লান হাসিটুকু লাগিয়া আছে,—তাহারই জন্য সকলেরই বিস্ময় দৃষ্টি তাহার উপর বদ্ধ হইয়া থাকিল। আঘাত পাইয়াও সে কোন কথা না বলিয়া ব্যথা প্রকাশ না করিয়া ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া গেল।

এমন সময় ডাচেস্ থামিয়া প্রথমোক্ত বালকটির নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন ; "কি হইয়াছে লিয়ো ? এত রাগ কার উপর ?"

দ্বিতীয় বালকের প্রতি অঙ্গুলি দেখাইয়া লিয়ো বলিল, "দেখুন ঐ গেব্রিয়েল—লিণ্ডেন পোঁতার পর জয়ধ্বনি দিল না, সবাই দিয়াছে ও দিবে না কেন ? ভারি অসভ্য, ভারি বেয়াদব !"

শিশু তাহার মাথা দোলাইয়া দোলাইয়া কথাগুলি বলিতেছিল, দেখিয়া ডচেসের মুখ কোমল আনন্দ জ্যোতিতে পরিপ্লুত হইয়া গেল, লিয়োর সম্মুখে নীচু হইয়া বসিয়া দুই হাতে তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া স্বর্ণ সূত্রের ন্যায় সুন্দর কেশমণ্ডিত ক্ষুদ্র মাথাটিতে বার বার চুম্বন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি জানি কেন চঞ্চল শিশুটীর এ উগ্র অকস্মাৎ আদর ভাল লাগিল না, সে দুহাত ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপ করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া আদরকারিণীর স্নেহপাশ মুক্তির চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিল। হঠাৎ ডচেসের মুখ দিয়া বাহির হইল, "রাওয়েল্ !—তাঁর ছেলে !"

লিওয়া তখন সবলে তাঁহার বুকে ধাক্কা দিয়া দূরে দাঁড়াইয়া বলিল, "আমার বাবা ? কৈ এখনও ত তিনি আসেন নাই ? আমি এখনি বাড়ী চলিয়া যাই।" বলিতে বলিতেই সে ছুটিয়া চলিয়া গেল। রমণী কিছুক্ষণ সেই ধাবমান শিশুর প্রতি চাহিয়া থাকিলেন, তাহার পর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কেন এল না ?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। রুডিগার হারমারের ক্ষুদ্র ও সুন্দর গাড়ীখানি অসময়েই ডাচেসের উদ্যান ত্যাগ করিয়া আসিল। পথের দুইধারে ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষ ও লতা, পাশ দিয়া একটি স্বল্পকায়া স্রোত-ধারা চলিয়াছে। রুডিগার স্বয়ং শকট চালনা করিতেছিলেন, হঠাৎ বলগা টানিয়া দাঁড়াইয়া, বলিয়া উঠিলেন, "মাইনো! মাইনো যে !"

পথের একপাশ দিয়া রাউয়েলই চলিতেছিলেন বটে। গাছ হইতে ঝুলিয়া পড়া একটা লতা হঠাৎ তাঁহার মাথায় পড়ায় তিনি শঙ্কায় শব্দ করায় হারমারের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি ফিরিল। রাওয়েল্ বন্ধুকে দেখিয়া হাসিয়া নিকটে আসিলে হারমার আবার বলিলেন, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি ? সকলে তোমার অপেক্ষা করিয়া করিয়া অবশেষে—হাঁ তুমি ভুলিয়া গিয়াছিলে কি যে লিণ্ডেন রোপণের সময় একজন মাইনোর উপস্থিতি প্রয়োজন ? ডচেস্ বলিতেছিলেন—"

বাধা দিয়া রাওয়েল্ বলিলেন, "মাইনো ? কেন আমার লিয়ো ছিল ত, সেকি মাইনো নয় ?"

"লিয়ো ? চমৎকার মাইনোটি ভাই ! যেমন ডিউক অফ্ মণ্টিথ তেমান ব্যারণ মাইনো, খাসা মানাইয়াছে বটে !" বলিয়া উচ্চ হাসিতে হাসিতে রুডিগার নামিয়া রাওয়েলের হাত ধরিয়া বলিলেন, "তা চলিয়া যাইতেছ কেন, তোমার গাড়ী কৈ ?"

"গাড়ী ছাড়িয়া দিলাম।"

"তবে এস আমার গাড়ীতে উঠ—"

"তুমি যে ফিরিতেছিলে রুডিগার ?"

হাসিয়া রুডিগার বলিলেন, "আবার না হয় যাইব।"

"তাই চল।" বলিয়া রাওয়েল অগ্রসর হইতেই রুডিগার বলিলেন,—"গাড়ীতে উঠিবে না ?"

"না না, এইটুকুর জন্য আর গাড়ীর প্রয়োজন কি ?" বলিয়া কৌতুক হাস্যের সহিত রাওয়েল বলিলেন, "আমরাও এখনও বুড়া হই নাই হারমার, বাতেও ধরে নাই ; এস না এটুকু চলিয়াই যাই।"

সহিস্ গাড়ী ফিরাইল। ছায়াশূন্য পথটিতে চলিতে চলিতে হারমার বলিলেন, "সত্য সত্য বল ত রাওয়েল্, তুমি আজ এত বিলম্ব করিলে কেন ?"

মৃদু মৃদু হাসির সহিত রাওয়েল্ বলিলেন, "সত্যই বলিতেছি রুডিগার, বাহিরে আমার কাজ ছিল।"

হারমার আর কিছু না বলিয়া কৌতুকভরে বন্ধুর মুখে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, মুখে একটি প্রশ্নসূচক হাসি দেখিয়া রাওয়েল বলিলেন, "কি হইল—অত হাসিতেছ কেন ?"

"হাসি ? আমি ভাবিতেছি যে তুমি হয় অত্যন্ত ধূর্ত্ত, নয় তেমনি মূর্খ!"

"কেন বল দেখি—ধূর্ত্ত হইলাম কিসে ?"

"ধূর্ত্ত ? তোমার চালাকী কি আমি বুঝি না মনে কর রাওয়েল্ ? প্রণয়িনীর প্রেমপাশে অনায়াসে ধরা দেওয়া তোমার ইচ্ছা নয়, আগ্রহের আদরের পরিপূর্ণ মাত্রাটি নিঃশেষ করিয়া তবে তোমার তৃপ্তি হইবে। কিম্বা হরিণীকে ফাঁদে আনিয়া খানিকটা শিকার খেলা—ওঃ বন্ধু আমার ! তোমার মনোবাঞ্ছা যে কেমন ভাবে পূর্ণ হইয়াছে তাহা দেখিবে চল। ডচেসের সে পথ চাওয়া যদি দেখিতে !" বলিয়াই রাওয়েলের হাতখানিতে নাড়া দিয়া, হারমার প্রফুল্ল স্বরে বলিতে লাগিলেন ; "ভগবানই তোমার পথ পরিস্কার করিয়া দিতেছেন মাইনো, নতুবা তোমাদের বাল্যকালের বন্ধুত্ব, যৌবনের তেমন ঘনিষ্টতা, এমন কি বিবাহ সম্বন্ধের পরও যখন কুমারী ওফেলিয়াকে ডিউক বিবাহ করিতে আসিলেন, কুমারীও তাহা স্বীকার করিলেন—"

অবরুদ্ধ প্রায় কণ্ঠে রাওয়েল্ বলিলেন, "কেনই বা করিবে না সে যে রাজকুমার—ধনী !"

"হাঁ ডিউক তাঁহার পিতার জ্ঞাতিপুত্র বলিয়া আরও জোর চলিয়াছিল। তাঁর পিতারও একান্ত ইচ্ছা ছিল যে তাঁহাদের রাজবংশের কন্যার সহিত বিবাহ হয়। শুধু কন্যার অত্যন্ত ইচ্ছাতেই—"

বাধা দিয়া তাচ্ছিল্য ভঙ্গিতে রাওয়েল্ বলিলেন, "চুলায় যাউক ! আজ সে কথায় প্রয়োজন কি রুডিগার ? কেন এ সব কথা উঠিল ?"

অপ্রতিভ হাসির সহিত রুডিগার বলিলেন, "না, শুধু ঘটনাচক্রের কথা বলিতেছি। তুমি বিবাহ করিয়াছিলে—সে স্ত্রীও লোকান্তরে, আবার ভাগ্য নির্ব্বন্ধে ডচেসও আজ ইচ্ছা ও ক্ষমতার উপর সম্পূর্ণ স্বাধীনা—"

একটু বিদ্রূপ হাঁসির সহিত রাওয়েল্ বলিলেন,—"তার পর ?"

হাসিয়া রুডিগার বলিলেন, "তারপর ? তারপর কি তাহাও বলিয়া দিতে হইবে না কি ? তোমার মন কি আমি জানি না রাওয়েল্ ? এই দীর্ঘ নয় বৎসর ;—এ দিন যে তোমার কি করিয়া কাটিয়াছে—"

রাওয়েলের উচ্চ হাসিতে রুডিগারের কথা থামিয়া গেল। দ্রুত স্বরে ব্যারণ বলিতে লাগিলেন, "ধন্যবাদ, হারমার মশায়! ধন্য তুমি! আমার সে বিরাট দুঃখে তোমার এ সহানুভূতির জন্য তোমায় অগণ্য ধন্যবাদ, কিন্তু আর, কিছু বলিবার নাই কি তোমার? এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে, তুমি আমায় মূর্খ বলিয়াছ, সে কথার অর্থ শুনিতে পাই কি?"

"মূর্খ তুমি ইচ্ছা করিয়াই সাজিয়া থাক, কিন্তু সব কথাই হাসিয়া উড়াইলে ত চলিবে না মাইনো! তুমি আজ রুডিসবার্গ গিয়াছিলে কেন বল দেখি?"

"কাজ ছিল; কিন্তু আমি যে সেখানে গিয়াছি তাহা তুমি জানিলে কেমন করিয়া?"

"তোমার দুরন্ত ছেলেটি যে আজ শুধু সেই কথাই বলিয়া বেড়াইতেছে সেখানে। ডচেস্ তাইতে আরও দুঃখিত যে এখানে আস নাই কিন্তু অন্যত্র স্বচ্ছন্দে গিয়াছ কি করিয়া!"

"আমোদ অপেক্ষা কর্ত্তব্যের দাবী অগ্রগণ্য নয় কি হারমার?"

"বটে তাই না কি? এমন কাজের লোক কবে হইতে হইলে? তুমি যে আমায় আশ্চর্য্য করিয়া দিলে মাইনো?"

রাওয়েল উত্তর না দিয়া হাসিতে লাগিলেন। রুডিগার বলিলেন, "আঃ—তবে তুমি নিশ্চয় ঠকিয়াছ, যতদূর বুঝিলাম—আজিকার উৎসবের এত পারিপাট্য এত আয়োজন, এ সবই তোমার জন্য। মনের আনন্দে গর্ব্বিতা ডচেস্ যেন আজ মুক্ত আকাশের পাখীর মত ভাসিয়া চলিয়াছেন। তবু শেষের দিকটায়—তুমি না আসায় ও লিয়োর সেই কথায় তিনি কিছু ম্লান হইয়াছেন। দেখিবে চল না, সে কি সজ্জা আর কি রূপ! এ কথা সত্য বন্ধু, ডচেস্ ওফেলিয়ার তুল্য সুন্দরী এ দেশে আর নাই।"

রাওয়েল একবার দন্তে ওষ্ঠ চাপিলেন, তৎক্ষণাৎ স্বভাবসিদ্ধ হাসির সহিত বলিলেন—

"তোমার এ কথা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিলাম; কিন্তু এইবার ইতি দাও ভাই, দ্যাখ আমরা বাগানের পথে আসিয়া পড়িয়াছি যে।"

সত্যই, তাঁহারা অন্যমনস্কভাবে প্রায় সেই সজ্জিত স্থানটীতে উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু ডচেস্ বা অন্য কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি কেহ সেখানে ছিলেন না। "লিয়ো কৈ?" বলিয়াই রাওয়েল অন্য পথ ধরিলেন!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

লিয়ো যে সেই ছুটিয়া পলাইয়াছিল, সেখান হইতে খানিকটা দূরে গিয়াই চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল "গেব্রিয়েল, আমার গেব্রিয়েল কোথায় গেল? ও গেব্রিয়েল!"

হ্রদের এক পাশে বসিয়া গেব্রিয়েল মুখে জল দিতে ছিল, ছুটতে ছুটতে লিয়োর নিকটে আসিয়া বলিল, "এই যে আমি!"

লিয়ো দুইহাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, "ও গেব্রিয়েল, আমি কি দুষ্ট কি বদমাইস্ ছেলে বল দেখি? তোমার গাল কেটে গেছে যে ভাই, রক্ত পড়েছে? কতটা রক্ত পড়েছে গেব্রিয়েল?"

বালককে কোলে তুলিয়া গেব্রিয়েল বলিল, "কৈ না, রক্ত ত পড়েনি লিয়ো।"

"পড়েনি ? একটুও না ?"

"না, একটুও না ।"

"তবে অত লাল হইয়াছে কেন ?" বলিয়া লিয়ো তাহার গালে হাত বুলাইয়া দিল। তাহার পর অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, "আর আমি তোমায় মারিব না গেব্রিয়েল ! কথনো না—"

"না না না, ছোট্টো প্রভুট আমার ! তুমি আবার আমায় মারিয়ো,—বার বার মারিয়ো ! তোমার হাতের আঘাত আমায় লাগে না, কথনো না ।"

"দূর, তাকি হয় ? এই যে লম্বা দাগ, উঃ গেব্রিয়েল দ্যাখ কি ভয়ানক লাল দাগ !"

"তাতে আর যন্ত্রণা নাই লিয়ো ; কিন্তু—"

"সত্য বলিতেছ গেব্রিয়েল ?"

"নিশ্চয় সত্য বলিতেছি ! কিন্তু আর এখানে নয়, চল ওধারে গিয়া আমরা খেলা করি,"

"কোথায় ?"

"ঐ খোলা মাঠটিতে ঐ হ্রদের ধারে ।"

তখন গেব্রিয়েলের কানের কাছে মুখ রাখিয়া মৃদুস্বরে লিয়ো বলিল, "কিন্তু ঐ যে ডচেস্‌রা আছেন, ওখানে নয় গেব্রিয়েল ?" হাসিয়া গেব্রিয়েল বলিল, "আচ্ছা ।"

সুবিস্তৃত দীর্ঘ হ্রদের এক পার্শ্বে ডচেসের পুত্রদ্বয় ও অন্যান্য বালকবালিকাগণ ক্রীড়া করিতেছিল, গেব্রিয়েল লিয়োকে আনিয়া সেইখানে ছাড়িয়া দিল। তাহারই অনতিদূরে কুঞ্জভবনের সম্মুখে হ্রদের মর্ম্মর সোপানের উত্তরে ডচেস্‌ ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধব, কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া সূর্য্যাস্তের দৃশ্য ও আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন।

কুহেলিশূন্য আকাশে আরক্ত সুন্দর সন্ধ্যা, কিম্বা দূর দিগ্বলয়ের পরিস্ফুট চিত্র দর্শন, সেখানে সুলভ নয়। সে দিনের উৎসব-লীলার সহিত প্রকৃতির এই অপ্রত্যাশিত আনন্দ-বিকাশ ডচেসের বিমল চিত্তকে রক্তিম আনন্দ-আভায় আরক্তিম করিয়া ফেলিয়াছিল ; কাজ শেষ হইয়া গেলেই রাওয়েল যে নিশ্চয়ই আসিবেন, এ আশা তাঁহার আবার জাগিয়াছে। সান্ধ্য বেশভূষায়, হীরকের পরিবর্ত্তে কুসুম-সজ্জা-প্রাচুর্য্যে, সেই নীল-সলিল-তটান্তে দণ্ডায়মানা সুন্দরীকে দেখিয়া নিখিল-চিত্তহারিণী মোহময়ী দেবী ভিনাস্‌কে স্মরণ হইতেছিল।

দূরে দাঁড়াইয়া রুডিগার ও রাওয়েল সেই দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। ব্যারণ সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "অফেলিয়া !"

"হাঁ—ঐ যে তিনি ! কি হইল চলনা !"

এমন সময় লিয়ো দূর হইতে পিতাকে দেখিয়া "বাবা, বাবা"—বলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে দেখিয়া রাওয়েল অগ্রসর হইয়া তাহাকে তুলিয়া লইলেন।

বালকের চীৎকারে ডচেস্‌ও মুখ ফিরাইয়াছিলেন। রাওয়েলকে দেখিয়া তাঁহার অন্তরে অন্তরে স্পন্দন বাজিতেছিল ; বুকের ভিতরে যে শোণিত চাঞ্চল্য প্রখর হইয়াছে তাহা সুন্দরীর কম্বুধবল গ্রীবা ও কমনীয়

মুখখানিতে সহসা-আবির্ভূত গাঢ় রক্তিমা দেখিয়া স্পষ্ট অনুভূত হইতেছিল। কিন্তু ইচ্ছা হইলেও রাওয়েল সে দিকে আর চাহিলেন না বা এক পদও অগ্রসর হইলেন না।

পুত্রকে আদর-চুম্বনে পরিতৃপ্ত করিয়া খানিকক্ষণ পরে রাওয়েল ধীরে ধীরে হ্রদতীরে আসিতেই সমবেত মহিলাগণ সানন্দ সমাদরে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। ডচেস্ ও তাঁহার ইতিহাস কাহারও অবিদিত না, মধ্যে যে ব্যাপারই থাক্—যাহাই হউক, দুটি মনঃপীড়িত ভারগ্রস্ত হৃদয় যে আজ মুক্তির পথে মিলন স্বর্গে মিলিত হইতেছে; এ কল্পনায় সকলেই আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন।

রাওয়েল মধুর হাস্য ভঙ্গিতে তাঁহাদের উদ্দেশে সম্মান জানাইয়া—ধীর পদে ডচেসের সম্মুখে দাঁড়াইলেন; তারপর রাজরাণীর তুল্য সম্মানে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন;—"আমায় মার্জ্জনা করিবেন, আমি যথা সময়ে উপস্থিত হইতে পারি নাই!"

নারীর চক্ষে দুর্জ্জয় অভিমান যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তিনি প্রথমে একটি কথাও কহিলেন না বা রাওয়েলের উদ্দেশে হস্ত প্রসারণও করিলেন না। কিন্তু রাওয়েল সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া সহাস্য বদনে যখন অন্য একজনের সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন, তখন আর ডচেস্ আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না; শ্লথগতিতে মাইনোর নিকটে আসিয়া রুক্ষ গম্ভীর স্বরে বলিলেন; "তোমায় একটা প্রশ্ন করিতে চাই, শুনিবে ত?"

সসম্ভ্রমে মাইনো বলিলেন, "আদেশ করুন!"

ডচেস্ আরও জ্বলিয়া উঠিলেন। "আদেশ? রাওয়েল তুমি—" পরক্ষণেই ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন, "থাক্ সে কথা, এখন আমার জানিতে ইচ্ছা হইতেছে যে—রুডিস্‌ডর্কে হঠাৎ তোমার কি কাজ পড়িল? আর সে এমন কি অলঙ্ঘ্য গুরুতর কার্য্য যাহাতে তুমি এই দিনটিরও অপেক্ষা করিতে পারিলে না? জান না কি লিগেন পর্ব্বে মাইনোরা চিরদিন যোগ দিয়া আসিতেছেন, তা ছাড়া তোমায় আমি নিমন্ত্রণ"—

ডচেসের গলার স্বর ভাঙ্গিয়া গেল, তখন শান্তভাবে রাওয়েল্ উত্তর করিলেন; "আপনার নিমন্ত্রণ আমি রক্ষা করিতেই ত আসিয়াছি, তবে কিছু বিলম্ব হইয়াছে বটে; সে জন্য আপনি আমায় ক্ষমা করুন। মাননীয়া ডচেস্, আপনাকে ত বলিলাম,—আমার কাজ ছিল।"

"কি কাজ ব্যারণ মাইনো? সেই কথাই বল না শুনি।"

"একটা প্রতিশ্রুতি রক্ষা। আপনার নিমন্ত্রণের পূর্ব্বে আমি সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি।"

"এই উৎসবের ও আমার নাম করিয়াও কি সে নিমন্ত্রণ তুমি এড়াইতে পারিতে না?"

"না, কারণ সে কাজের জন্য এই দিনই নির্দ্দিষ্ট ছিল।"

রাওয়েলের নীরস উত্তরগুলি শুনিয়া ডচেস্ যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "রুডিস্ ডর্কে,—কাহার বাড়ীতে এ নিমন্ত্রণ রাওয়েল্?"

"কাউন্ট ভন্ ট্রেচেনবার্গের বাড়ীতে।"

"ট্রেচেনবার্গ? যাহারা এখন গরীব হইয়া গিয়াছে?"

"হাঁ, রাজমহিষি!"

রাওয়েলের শ্লেষ হাস্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই ব্যগ্রভাবে ডাচেস্ বলিলেন, "তাহারা তোমায় ডাকিয়াছিল কেন ?"

"কাউন্টের কনিষ্ঠা ভগিনী জুলিয়ান ট্রেচেনবার্গের সহিত আমার বিবাহের বাগ্‌দান ক্রিয়াটি শেষ করিবার জন্য। ভাবিয়াছিলাম শীঘ্রই সে কাজ চুকিয়া যাইবে, কিন্তু তাহা হইল না, সমস্ত শেষ করিয়া ফিরিতে আমার বিলম্ব হইয়া গেল। জানেন ত, ঘোড়ার গাড়ীতে রুডিসডর্ফ হইতে এখানে আসিতে বেশ একটু সময় লাগে।"

রাওয়েলের কথায় ডাচেস্ নিরাশায় বিস্ময়ে কি হইয়া গেলেন,—সহসা যদি সেখানে বজ্রপাত হইত, কিম্বা সম্মুখের হ্রদের গভীর জলরাশি চক্ষের নিমেষে শুকাইয়া যাইত, তাহা হইলেও তিনি এরূপ অভিভূত হইতেন কি না সন্দেহ। তিনি এতদিন ধরিয়া কল্পনায় আশায় যে চিত্রখানি অঙ্কিত করিয়া আসিতেছেন, এক পলকে কে যেন তাহাতে ঘনকৃষ্ণ মসিরাশি ঢালিয়া দিল। কাহারও মুখ দিয়া কোন শব্দ বাহির হইল না, স্থানটির প্রমোদ-উল্লাস এক মুহূর্ত্তে যেন স্তব্ধ হইয়া গেল।

ডাচেস্ও অবাক্ হইয়া রাওয়েলের দিকে চাহিয়াছিলেন, যাহা শুনিলেন তাহা কি সত্য ? তাঁহার মুখখানি মৃতের ন্যায় বিবর্ণ। রাওয়েল আবার বলিলেন "বিলম্বের কারণ শুনিলেন ত ? এখন আমায় মার্জ্জনা করিবেন আশা করি।"

গর্ব্বিতা অফেলিয়া তখন অমানুষিক বলে আপনার চিত্ত দমন করিতেছিলেন, রাওয়েলের কথার উত্তর না দিয়া,—মাথার পুষ্পগুচ্ছটি খুলিয়া সহচরীর হাতে দিয়া বলিলেন ;—"এ কেমন ফুল দিয়াছিলে, এত শীঘ্র শুকাইয়া উঠিল ? যাও মায়ের ফুলগুলি বদলাইয়া আন।" পরে রাওয়েলের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "নিশ্চয় ! তোমার এ কথা শোনার পরও—আর কেহ বোধহয় রাগ বা অভিমান রাখিতে পারিবে না, যথেষ্ট হইয়াছে !

ইহার অল্পক্ষণ পরেই স সহচরী ডাচেস্ সে স্থান ত্যাগ করিলেন। ব্যারণও পুত্রের হাত ধরিয়া উদ্যানে উঠিয়া গেলেন এবং অবশিষ্ট ভদ্রলোক ও মহিলাগণ এই অসম্ভব ঘটনায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রথমে যেমন স্তম্ভিত ও নীরব ছিলেন, এখন আবার তেমনই বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া রাওয়েল জুলিয়েন ও ট্রেচেনবার্গ বংশের সম্বন্ধে বিচিত্র আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। অবশেষে লাল চুলো ট্রেচেনবার্গ কন্যা নব্য ফ্যাসান বিরোধী 'জুলিয়ান' নাম্নী রমণীর উদ্দেশ্যে হাস্যস্রোত তুলিয়া হ্রদের স্থির জল পর্য্যন্ত যেন ঝিক্‌মিকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

পথে আসিতে আসিতে রুডিগার বলিলেন, "সত্যই মাইনো, তুমি আজ আমাকেও আশ্চর্য্য করিয়াছ।"

"তাই না কি ? এমনি অদ্ভুত কাজ করিয়াছি আমি ?"

"অদ্ভুত, নিশ্চয় অদ্ভুত ! আমি বুঝিতে পারিতেছি,—এ তুমি প্রতিশোধ লইলে, নয় কি ?"

"প্রতিশোধ ? না না রুডিগার, শোধ নয়—বরং আত্মরক্ষা বলিতে পার।"

"আত্মরক্ষা—মান ?"

"মান, ইহার স্বামীর মৃত্যুর পরই আমি বুঝিলাম যে এইবার সে আমায় আক্রমণ করিবে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর আর আমার বিবাহের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ঐ ছলনাময়ীর ছলনায় যদি প্রলোভনে পড়ি এই ভয়েই—"

আশ্চর্য্যভাবে রুডিগার বলিলেন, "প্রলোভন—ভয়—এ সব তুমি কি বলিতেছ রাওয়েল্? তুমি কি বলিতে চাও যে তাহাকে তুমি আর ভালবাস না?"

"তা জানি না, আমার মনের ভিতরটায় কি আছে না আছে—তাহা আমি লক্ষ্য বা বিচার করিতে মোটেই চাই না বন্ধু! তবে এটুকু বুঝিয়াছি যে ঐ স্ত্রীলোককে কখনও আমি স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না। কিন্তু এ কথা আর নয় রুডিগার, এ প্রসঙ্গ আমার ভাল লাগে না।"

"দরকারই বা কি, যাহা হইবার তাহা তো হইয়াই গিয়াছে। এখন তোমার ভাবী পত্নীর কথা বল।"

"বেশ সে ভাল কথা, তাই বল।" কথার সঙ্গেই রাওয়েলের মুখে পরিহাসের প্রচুর হাসা উদ্গত হইল।

"না হাসি নয়—বল, তোমার—সেই কুমারী ট্রেচেনবার্গকে কেমন দেখিলে বল।"

"কেমন? এই লালচুলো ট্রেচেনবার্গরা যেমন হয় তেমনি আর কি! একটা লম্বা রোগা মেয়ে,—কথা বলিতে জানে কিনা বুঝিতে পারিলাম না, তবে বোবা নয় তাহা জানিয়াছি। আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।"

"কি বলিতেছ রাওয়েল? জানিয়া শুনিয়া এমন মেয়েকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিবে?"

"সুখ? না রুডিগার, আমি বেশ বুঝিয়াছি সুখ পৃথিবীর একটা সুস্বপ্ন মাত্র, তার স্থায়ীত্ব কোথা বা নির্ভর করিবার মত তাহাতে কি আছে? অন্তত এই আমার বিশ্বাস। তার জন্য আমার আর আশাও নাই দুঃখও নাই। তবে এ বিবাহটা,—শুধু আত্মরক্ষা! ঐ কুহকিনীর মায়া হইতে বাঁচিবার জন্য. দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে তার পুরাণো ভঙ্গীর নূতন অনুকরণ, লীলা কলা—লাস্যভঙ্গিমা একেবারে থামাইয়া দিবার জনাই আমি সম্মুখে যাহাকে পাইলাম তাহাকেই আনিয়া এ ব্যবধানের সৃষ্টি করিলাম।"

"কি আশ্চর্য্য?"

রাওয়েল বলিলেন, "না হারমার, শুধু আশ্চর্য্য হইলে চলিবে না, আমার বিবাহে তোমায় সঙ্গী হইতে হইবে, যাইবে ত?"

"কেন যাইব না? এ আর বেশী কি রাওয়েল্?"

লিয়ো পিতার অন্যমনস্কতার সুযোগ পাইয়া সরিয়া গিয়া গেব্রিয়েলের কোলে বসিয়াছিল। সে বলিতেছিল, "জান গেব্রিয়েল, আমার বাবা বিবাহ করিবেন, সে মেয়েটি খুব লম্বা, খুব রোগা আর একটিও কথা বলিতে জানে না! আমি তাহাকে চাবুক মারিব!" শিশুর কথায় গেব্রিয়েল মৃদু হাসিয়া বলিল, "চুপ চুপ ওকথা বলিতে নাই, তিনি যে তোমার মা হইবেন লিয়ো!"

ক্রমশঃ—

শ্রীহেমনলিনী দেবী

শেষ !

—*—

আজি এসেছে জোয়ার খুলে দেরে তরী ভয় নাই
জল-দল-তল কল-কল চলে কয় তাই
জলে থই থই উঁচুনীচে
নাহি কোন' ফাঁক আগে পিছে
এবে কূল খোঁজা শুধু মিছে
কোটালের ডাক আলোতে জলেতে সব ঠাঁই
এমন দিনেও ছুটি নিতে তোর ভয়, ভাই ?

কা'ল হ'তে পুন পর্ব্ব বিধুর হবে ক্ষয়
এমন জ্যোৎস্না অমার আঁধারে পাবে লয়
পলে পলে সেই মরা চেয়ে
মরিব আজিকে তরী বেয়ে
আলোতে জলেতে নেয়ে নেয়ে
যাত্রী-বিহীন ঠাঁইটি আঁকড়ি দেহময়
অকূল ডেকেছে—কূলে বসে থাকা কিছু নয়।

চঞ্চল-চল জল কর ছানি বার বার
ডাকিছে অকূল অপলক আঁখি পরপার।
তোমার এপারে মোর সব
বৃথা ভিক্ষার 'দেহি' রব
যেচে জমা করা' বৈভব
রহিল বন্ধু, হাসি মুখে চাও একবার
মানুষের মুখে মুখোসের কিবা দরকার ?
যে যে করেছিলে অবহেলা ঘৃণা মুখভার
জলে শাদা হোক্ সেই লাল চোখ সবাকার ;
হতভাগ্যেরে ক্ষমা কর'
থাক' থাক' তুমি চির বড়
যত হতভাগা হোক্ জড়'

তব কৃপা লাগি আঁধার করিয়া তব দ্বার—
এ সৌভাগ্য ফিরায়ো না বৃথা সখা আর !

ভালবেসেছিলে যে যে বান্ধব প্রাণ দিয়া
তোমাদের দ্বারে রহিল পড়িয়া মোর হিয়া
　　যদি কোন' দিন ফিরে আসি
　　আগে তব পাশে যাব হাসি
　　তোমরা ডাকিবে ভালবাসি
এই ভরসায় আবার আসিব ছেড়ে গিয়া—
খাতক তোদের পলাবে কোথায় ধার নিয়া ?

এই যাওয়া আসা করিতেছি যে গো চিরদিন
কত বার গেছি আবার এসেছি শেষ হীন !
　　দাও ছুটি তবে এবারেও
　　আজি কি ক্ষুব্ধ থাকে কেউ ?
　　তুলিছে তরণী লাগি ঢেউ—
ঘন-বন-ছায়া-স্নিগ্ধ-কোমল এ পুলিন
শেষের মায়ায় লাগে আঁখিছায় বিমলিন !

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

স্যাড্‌লার কমিসন এবং শিক্ষার মধ্যস্তর।

(The Sadler Commision and the Secondary stage of Education.)

(ক) মধ্য শ্রেণীর কালেজ।

—:*:—

আজকাল যে সকল শিক্ষা মন্দিরগুলিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কালেজ (Intermediate College) বলা হয়, উহাদের এবং প্রথম শ্রেণীর কালেজগুলির (First grade College) নিম্নতম দুই শ্রেণীর (First and Second year classes) উন্নতি সাধনই, স্যাড্‌লার কমিসন বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষা সংস্কারের মুখ্যতম সাধনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সংস্কার, তিনটি উপায়ে সাধিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয়গুলির

(High English Schools) মধ্যে, যেগুলি অপেক্ষাকৃত উন্নত, যাহাদের শিক্ষা এবং ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সুন্দর, সেগুলিকে মধ্যশ্রেণীর কালেজে পরিবর্ত্তিত করা। দ্বিতীয়তঃ, অনেকগুলি মধ্যশ্রেণীর কালেজ, উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা, এবং ইহাদের সহিত উক্ত উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়গুলি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত; এই বিদ্যালয়গুলিকেও, কমিসনের অনুমোদিত প্রণালী অনুসারে, মধ্যশ্রেণীর কালেজে পরিণত করা। যে যে স্থলে এরূপ কালেজের সহিত স্কুলের সম্বন্ধ থাকিবে সেই সেই স্থলে উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রথম দুই শ্রেণী (First & Second Classes.) কালেজের দুই শ্রেণীর সহিত সংযুক্ত হইতে পারে। সাধারণতঃ প্রত্যেক জেলার প্রধান সহরে, একটি উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট মধ্যশ্রেণীর কালেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তৃতীয় প্রকার মধ্যশ্রেণীর কালেজ, সাধারণতঃ, কলিকাতা, ঢাকা, রংপুর, রাজসাহী, চট্টগ্রাম ও গৌহাটী সহরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অন্যান্য স্থানেও এরূপ কালেজ থাকিবার বাধা কিছুই নাই। এই সব কালেজে কেবল মাত্র দুই শ্রেণী থাকিবে এবং এগুলিতে নানা প্রকার শিক্ষার বন্দোবস্ত হইবে, আবশ্যক হইলে অতিরিক্ত শ্রেণী (Continuation Class) সংযুক্ত করিয়া, এখানে ব্যবসায় শিক্ষার নানা বন্দোবস্ত করা যাইবে।

উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা (Matriculation Examination) উত্তীর্ণ হইয়া, যে সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রবেশ করে, তাহারা সাধারণতঃ প্রশস্ত শিক্ষা (Liberal education.) লাভ করিবার উপযুক্ত হয় না। তাহাদের আরো কিছু দিন স্কুলের ছাত্ররূপে শিক্ষা পাওয়া আবশ্যক। সেই জন্য কালেজের প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর বক্তৃতা-মূলক শিক্ষাপ্রণালী এইরূপ ছাত্রদের উপযুক্ত নয়। তাহাদের শিক্ষায় প্রত্যেকের উপর যেরূপ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক, এক একটি শ্রেণীতে একশত পঞ্চাশ জন ছাত্র থাকিলে, অধ্যাপকেরা সেরূপ মনোনিবেশ করিতে পারেন না। এই নিমিত্ত ঐ শ্রেণীগুলিকে সঙ্কুচিত করিয়া ইহাদের অধ্যাপনায় স্কুলের প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কমিসন মনে করেন যে প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ত্রিশ জনের অধিক ছাত্র থাকা উচিত নয়। কোন কোন অবস্থায়, অথবা কোন বিশেষ বিষয়ের অধ্যাপনার সময়, ছাত্র সংখ্যা যে কিছু অধিক হইতে পারে না এমন নয়, কিন্তু সাধারণতঃ এক শ্রেণীতে ত্রিশ জনের অধিক ছাত্র থাকিলে সুশিক্ষা হইতে পারে না।

কালেজগুলির প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, ইহাদিগকে মধ্যশ্রেণীর কালেজ (Intermediate College) নামে অভিহিত করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পৃথক রাখিতে হইবে। স্কুল এবং কালেজের শিক্ষা প্রণালীর পার্থক্য অত্যন্ত অধিক। একই বিদ্যালয়ে দুই প্রণালীর শিক্ষা দেওয়া, স্কুলের শিক্ষার পক্ষেও সুবিধা জনক নয়, এবং উচ্চ শিক্ষার পক্ষেও সুব্যবস্থা হইতে পারে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; পৃথিবীতে এত বড় বিশ্ববিদ্যালয় আর নাই। এই ছাত্র সংখ্যার সমস্যাই, শিক্ষার সকল সমস্যার মূল। কমিসন মনে করেন যে কালেজের নিম্নতম দুই শ্রেণী, উক্ত রূপে বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, উচ্চ শিক্ষার একটা বড় সমস্যা অনেকটা সরল হইয়া যাইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় আর, উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয় এবং মধ্যশ্রেণীর কালেজগুলির উপর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনরূপ আধিপত্য করিবেন না। এখন যেমন উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়গুলি হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কালেজে প্রবেশ করিতে হয়, ভবিষ্যতে মধ্যশ্রেণীর কালেজ হইতে মধ্য কালেজ পরীক্ষা (Intermediate College examination) উত্তীর্ণ হইলে, তবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ হইবে। এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে কি কি

বিষয়ে কিরূপভাবে শিক্ষা লাভ হইলে, এখানকার উত্তীর্ণ ছাত্র প্রশস্ত শিক্ষার উপযুক্ত হইবে, বিশ্ববিদ্যালয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন; এইরূপ দৃষ্টি রাখিবার অনুকূল বন্দোবস্ত থাকিবে।

দেখা যায়, যেসব ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য পরীক্ষায় (Intermediate Examination) উত্তীর্ণ হয়, তাহাদের অনেকে উচ্চতর পরীক্ষায় উপস্থিত হয় না। অনেকেই জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু এই ব্যবহারিক জীবনের জন্য তাহারা প্রকৃতপক্ষে কোনরূপ শিক্ষা লাভ করে না। কেরাণীগিরি সহজ, সেই জন্য সেই দিকেই যায়। যাহারা এদিকে যায় না অথবা যাইবার সুযোগ পায় না তাহারা হয় অপেক্ষা করিয়া থাকে, অথবা সঙ্কটে পড়িয়া কিছু কিছু শিক্ষা পায়, এবং যেমন তেমন একটা কাজের সুযোগ হইলে, কর্ম্মজীবনে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া, ব্যবহারিক শিক্ষারও যৎকিঞ্চিৎ সুবিধা করিয়া লয়।

কমিসন মনে করেন যে বাঙ্গলার অর্থসমস্যা এবং জীবন-সংগ্রামের সমাধান-কল্পে, মধ্যশ্রেণীর কলেজগুলির শিক্ষা নূতনভাবে এবং নূতন উদ্দেশ্যে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। এখানে ছাত্রদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও শিক্ষাদান করিতে হইবে, এবং ব্যবহারিক জীবনের জন্যও শিক্ষাদান করিতে হইবে। কিন্তু এই দুই প্রকারের শিক্ষায় দুর্লঙ্ঘনীয় ব্যবধান থাকাও বাঞ্ছনীয় নয়।

বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যপরীক্ষার জন্য, ছাত্রদিগকে কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বাধ্যতামূলক (Compulsory),—সেগুলি সকল ছাত্রকেই শিখিতে হইবে; আবার কতকগুলি স্বেচ্ছাধীন (Optional),—এই বিষয়গুলি ছাত্রেরা ইচ্ছামত নির্ব্বাচন করিয়া লয়। অনেক কালেজেই এই নির্ব্বাচনের সীমা আছে; কিন্তু সীমা নির্দ্দেশে মূলে প্রায়ই সুবিবেচনা পরিলক্ষিত হয় না। কোথাও অধ্যাপকের অভাব, কোথাও সরঞ্জামের অভাব, কোথাও গৃহের অভাব এবং সর্ব্বত্রই অর্থের অভাব প্রযুক্তই বোধ হয়, সকল বিষয়ের অধ্যাপন হয় না; এবং সেই জন্য ছাত্রেরাও যথেচ্ছা নির্ব্বাচন করিতে পায় না, কিন্তু প্রায় তাহারাই নির্ব্বাচন করে, এবং কখন কখন, ভবিষ্যতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের সহায় হইবে মনে করিয়া, কয়টি নির্দ্দিষ্ট বিষয় মনোনীত হইলেও, যে বিষয়গুলি নির্ব্বাচন করিলে, সহজে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে, সেই সেই বিষয়গুলি নির্ব্বাচিত হয়।

এইরূপ নির্ব্বাচনের ফলে "পাশ" করা সহজ হইলেও, শিক্ষা কার্য্যকরী অথবা অর্থকরী হয় না। সেই জন্য কমিসন নির্ব্বাচন-সাপেক্ষ বিষয়গুলিকে কয়েকটি গুচ্ছে (Group) বিভক্ত করিতে বলেন। এক একটি গুচ্ছের অন্তর্গত বিষয় নির্ব্বাচন কালে দেখিতে হইবে যে সেগুলি এমনভাবে সম্মিলিত, যে একটির জ্ঞান অপরগুলির জ্ঞানকে আরো বিশদ করিয়া দেয়, এবং গুচ্ছান্তর্গত বিষয়গুলির জ্ঞান কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে ফলপ্রদ হয়। গুচ্ছগুলি এরূপভাবে সজ্জিত ও নির্ব্বাচিত হইলে, একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সাহিত্য (Arts) অথবা বিজ্ঞান (Science) বিভাগে প্রবেশ করা যাইতে পারিবে, অন্য দিকে সেইরূপ শিক্ষকতা (Teaching), ডাক্তারি (Medicine), পূর্ত্তবিদ্যা (Engineering), কৃষিবিদ্যা (Agriculture) বাণিজ্য (Commerce), শ্রমশিল্প (Industry), প্রভৃতি ব্যবহারিক এবং ব্যাবসায়িক বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার প্রথম সুযোগ লাভ হইতে পারিবে।

মধ্যশ্রেণীর কালেজগুলিতে, এইরূপ বিষয় বিভাগ দ্বারা, দুইটি বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের ব্যবস্থা থাকিলেও, সকল ছাত্রই মধ্যকালেজ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করিবে। তবে, কখনও

কখনও, বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোমত বিষয় নির্ব্বাচনের জন্য, এক বা ততোধিক নূতন বিষয়ে, মধ্যকালেজ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে হইবে এবং মধ্যশ্রেণীর কালেজ হইতে এইরূপ অতিরিক্ত বিষয়ে পরীক্ষাদানের বন্দোবস্ত থাকিবে।

কমিসন বিস্তৃতভাবে মধ্যশ্রেণীর কালেজগুলির পাঠ্য-তালিকা আলোচনা করেন নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, যে সমিতির উপর মধ্যশিক্ষার সম্পূর্ণ ভার থাকিবে, সেই সমিতিই সকল দিক বিবেচনা করিয়া পাঠ্য-তালিকা প্রস্তুত করিবেন। কমিসন খুব মোটামুটি ভাবেই এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

তাঁহাদের মতে মধ্যশিক্ষায় সাহিত্য (Arts) এবং বিজ্ঞানের (Science) দিক দিয়া দুইটি ভিন্ন পরীক্ষা থাকিবে না; একটি মাত্র পরীক্ষা থাকিবে, এবং তাহার নাম হইবে "মধ্য কালেজ পরীক্ষা" (Intermediate College Examination) বিভিন্ন গুচ্ছে সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয়গুলি নানাভাবে সম্মিলিত ও নির্ব্বাচিত থাকিবে।

মধ্য কালেজের শিক্ষা প্রধানতঃ প্রশস্ত শিক্ষারই (Liberal education) অন্তর্গত থাকিবে বলিয়া, ইংরাজি ভাষা এবং বাঙ্গালা সাহিত্য, এই দুইটিই বাধ্যতামূলক বিষয় হইবে এবং সকল ছাত্রকেই এই দুই বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে। বিষয় দুইটি উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া, ইহাদের শিক্ষাদান প্রণালীর অভাব কমিসনের বিবরণীর নানা স্থানে আলোচিত হইয়াছে। কমিসনের অন্যতম সভ্য হার্টগ সাহেবের "ইংরাজি রচনা—" (Hartog—The writing of English—Clarendon press) নামক পুস্তিকায় মাতৃ-ভাষারূপে ইংরাজি ভাষা শিক্ষার কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রণালীর আলোচনা আছে। কমিসন ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন, ইহা তাঁহার মতের সংক্ষিপ্ত পুনরুক্তি মাত্র। মাতৃভাষা এবং অধুনিক বিদেশী ভাষা শিক্ষার প্রথম প্রণালী যে ভাষা শিক্ষা, সাহিত্য শিক্ষা নয়,—কমিসন ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং সেই জন্য ছাত্রেরা যাহাতে ইংরাজি ভাষা ভাল করিয়া পড়িতে, লিখিতে, এবং বলিতে পারে কমিসন প্রথমে সেই দিকে মনোযোগ দিতে বলেন। সকল ছাত্রই বর্ত্তমান যুগের ইংরাজি সাহিত্য আলোচনা করিবে; এবং সংক্ষিপ্তসার, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিয়া ও আলোচনা করিয়া, ভাষা ব্যবহারের শক্তি-অর্জ্জন করিবে। সেইরূপ তাহারা মাতৃভাষায় ও বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য আলোচনা করিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগে প্রবেশ করিতে হইলে, ছাত্রেরা প্রথম বৎসর বিজ্ঞানের ভূমিকার সহিত সাধারণভাবে পরিচিত হইবে। উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়গুলিতে এইরূপ জ্ঞান লাভের সুবিধা হইলে, বিষয়টি আর পাঠ্য তালিকার অন্তর্গত থাকিবে না। দুইটি বাধ্যতামূলক বিষয় এবং বিজ্ঞান ব্যতীত, তাহাদিগকে আরো চারিটি বিষয়ের সহিত পরিচিত হইতে হইবে;—একটি প্রাচীন প্রাচ্যভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, ইংরাজি সাহিত্য ও সমালোচনা (Criticism) তর্ক-বিজ্ঞান (Logic) অর্থশাস্ত্র (Economics), এবং গণিত (Mathematics) এই সাতটি বিষয় হইতে চারিটি বিষয় নির্ব্বাচিত হইবে। যে সকল মুসলমান ছাত্রের মাতৃভাষা উর্দ্দু নয়, তাহারা একটি প্রাচীন প্রাচ্যভাষার পরিবর্ত্তে উর্দ্দু ভাষা নির্ব্বাচন করিতে পারিবে।

সাহিত্য শাখায় একটি প্রাচীন প্রাচ্যভাষা বাধ্যতামূলক কি নির্ব্বাচনমূলক হইবে, কমিসন সে বিষয়ে বিশিষ্ট মত প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা আশা করেন, নূতন বিশ্ববিদ্যালয় সে বিষয় বিবেচনা করিয়া মত প্রকাশ করিবেন। একটি প্রাচীন ভাষা বাধ্যতামূলক হইলে, নির্ব্বাচন সাপেক্ষ বিষয় হইবে মোট তিনটি। বিজ্ঞান শাখায়

নির্ব্বাচন সাপেক্ষ বিষয় থাকিবে দুইটি এবং দুইটিই বিজ্ঞান। ভূগোল এবং গণিত, বিভিন্ন বিজ্ঞানের সহিত, এই শাখার অন্তর্গত থাকিবে।

পাঠ্যতালিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, একটু ভয় হইবার কথা। কিন্তু কমিসন মনে করেন, স্কুলের প্রণালী অবলম্বিত হইলে, প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা অল্প হইবে, সপ্তাহে প্রত্যেক ছাত্র আটাশ ঘণ্টা অধ্যয়নের সময় পাইবে, এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষাদান কার্য্য পরিচালিত হইলে, যথার্থ ভয়ের কারণ থাকিবে না; ইহার উপর আবার যদি কোন কোন বিষয়ের পরীক্ষার প্রয়োজন না হয়, এবং কোন কোন বিষয়ে যদি মৌখিক পরীক্ষার বন্দোবস্ত থাকে, তাহা হইলে পাঠ্য বিষয়ের আধিক্য সত্ত্বেও, শিক্ষায় সুফল ফলিবে আশা করা যায়।

কমিসন ব্যবহারিক শিক্ষার নিম্নলিখিত পাঁচটি বিশিষ্ট রূপ কল্পনা করিয়াছেন;—(১) চিকিৎসাবিদ্যা, (২) পূর্ত্তবিদ্যা, (৩) কৃষিবিদ্যা, (৪) শিক্ষতত্ত্ব, এবং (৫) বাণিজ্য। বিজ্ঞান শাখায় বিষয় নির্ব্বাচন দ্বারা অপরাপর শ্রমশিল্পের প্রাথমিক শিক্ষার সুবন্দোবস্ত অনায়াসে হইতে পারিবে।

নূতন পরিবর্ত্তনে উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়গুলি শিক্ষার উন্নতি হইলে, মধ্যশ্রেণীর কালেজে কতকগুলি ছাত্র চিকিৎসাবিদ্যার প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার (Preliminary Scientific Examination.) বিষয়গুলি দুই বৎসরেই আয়ত্ব করিতে পারিবে এবং অপরাপর ছাত্র এই স্থানেই আরো এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া ঐ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। সাধারণতঃ প্রশস্ত শিক্ষার বিষয়গুলির আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বিশিষ্ট বিষয়গুলির অধ্যাপনা হইবে। সকল কালেজেই এইরূপ শিক্ষা সম্ভব হইবে না; তবে কলিকাতায় একটী অথবা দুইটি, ঢাকায় একটি, পশ্চিম বঙ্গের জন্য বাঁকুড়ার ন্যায় স্থানে একটি, এবং উত্তরবঙ্গের জন্য রাজসাহী অথবা রংপুরে একটি এইরূপ মধ্যশ্রেণীর কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এই কালেজগুলির উত্তীর্ণ ছাত্র চিকিৎসা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পারিবে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় কিছুদিনের জন্য, চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত ছাত্রেরা মধ্য কালেজ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া মেডিক্যাল কালেজের (Medical college) প্রথম বর্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবে, অথবা অন্য কোন বিশিষ্ট কালেজের বিজ্ঞানাগারে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভ করিয়া, মেডিক্যাল কালেজের দ্বিতীয় বর্ষিক শ্রেণীতে প্রবেশ করিবে।

এখানে উচ্চাঙ্গ-গণিত (Higher Mathematics) রসায়নী বিদ্যা (Chemistry) পদার্থ-বিদ্যা (Physics) এবং যন্ত্রমূলক অঙ্কন (Mechanical Drawing) পূর্ত্ত-বিদ্যার প্রথম সোপান স্বরূপ, একটি গুচ্ছের আলোচ্য বিষয় হইতে পারে, এবং সেই গুচ্ছে শিক্ষা লাভ করিয়া ছাত্রেরা পূর্ত্ত-বিদ্যালয়ে (Engineering College) রেলওয়ে কোম্পানীর চাকরীতে এবং যন্ত্র নির্ম্মাণের কারখানায় প্রবেশাধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

তৃতীয় গুচ্ছে রসায়নী-বিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা, ভূমি-পরিমাপ (Land Surveying) কৃষিবিদ্যার মূলসূত্র (Introduction to the Principles of Agriculture), এবং মহাজনী হিসাব (Book-keeping) আয়ত্ত করিয়া, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্গত কৃষিবিভাগে প্রবেশ করিতে পারিবে, অথবা নানারূপ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার সুযোগ লাভ করিবে।

শিক্ষাতত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতির অধ্যাপনায় মধ্যশ্রেণীর কালেজগুলির একটি বিশিষ্ট কার্য্য হইবে। সকল কালেজে এইরূপ শিক্ষায় বন্দোবস্ত থাকিলে, তবেই দেশের শিক্ষার উন্নতি হইবে, কমিশন এই মত প্রকাশ

করিয়াছেন। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, আজকালকার উচ্চইংরাজি এবং নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়গুলির সর্ব্বপ্রধান অভাব। এই অভাব পূরণকল্পে বর্ত্তমান শিক্ষকদিগের শিক্ষাতত্ত্বে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের জন্য শিক্ষা-বৃত্তি (bursary) প্রদান, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাবিভাগ স্থাপন, উপাধি (degree) পরীক্ষায় শিক্ষা বিজ্ঞানের সম্যক আলোচনা, নানা স্থানে শিক্ষকদিগের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, এবং মধ্য-শ্রেণীর কালেজগুলিতে শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষা-প্রণালীর অধ্যাপনা প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

মধ্যশ্রেণীর কালেজের পাঠ্যতালিকার এক শাখায় শিক্ষার্থীরা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের অধীতব্য কতকগুলি বিষয়ের গভীরতর জ্ঞান লাভ করিবে, স্বরাত্মক পদ্ধতি (Phonetic Method) অবলম্বন করিয়া ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনা করিবে। সর্ব্বত্র মনোবিজ্ঞানের আবশ্যক হইবে না এবং শিক্ষার ইতিহাসও এ-গুচ্ছের অন্তর্গত করিবার প্রয়োজন হইবে না। এইরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া উত্তীর্ণ ছাত্রেরা দুই এক বৎসর শিক্ষকতা করিয়া, শিক্ষকদিগের বিদ্যালয়ে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া নিম্নশ্রেণীর (Licentiate in Teaching) অথবা উচ্চ শ্রেণীর (Bachelor of Teaching) উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

বিষয় তালিকার পঞ্চম শাখায় বাণিজ্য শিক্ষার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে। এই গুচ্ছে বাণিজ্য ভূগোল (Commercial Geography), বর্ণনামূলক প্রাথমিক অর্থনীতি (Elementary Descriptive Economics) উচ্চতর গণিত বিশেষতঃ উচ্চতর পাটীগণিত, মহাজনী হিসাব জমাখরচ (Accountancy), আধুনিক যুগের ইতিহাস, সঙ্কেতলিপি (Short-hand), এবং মুদ্রণাক্ষর লিখন (Type-writing) এই কয়েকটি বিষয় অধীত হইবে। এই শিক্ষা লাভ করিয়া ছাত্রেরা একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বাণিজ্যবিষয়ক উপাধির জন্য প্রস্তুত হইবার সামর্থ্য লাভ করিবে এবং অন্যদিকে সরকারী ও বেসরকারী নানারূপ কর্ম্মের জন্য অধিকতর উপযুক্ত হইবে।

কালেজের এইরূপ বিভিন্নমুখী শিক্ষাই ছাত্রদিগের পূর্ণ শিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অধ্যাপনা-গৃহের বাহিরে, তাহাদিগকে যে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, তাহার উন্নতির জন্য বিবিধ সুচিন্তিত উপায় অবলম্বনীয়। ছাত্রাবাসগুলির উৎকর্ষ সাধন নানা কারণে অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। উপযুক্ত বাসগৃহ, উপযুক্ত তত্ত্বাবধান, উপযুক্ত আহার, স্বাস্থ্যপরীক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত ইত্যাদির ভিতর দিয়া এক দিকে যেমন তাহাদের ব্যক্তিগত-জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, অন্য দিকে সেইরূপ নানা প্রকার ক্রীড়া, ব্যায়াম, পরস্পর সম্মিলন ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে তাহাদের সমষ্টিগত সামাজিক জীবনের উন্নতি সাধন করিতে হইবে।

উপরের আলোচনা হইতে বেশ বুঝা যায় যে উন্নতির তালিকাও যেমন দীর্ঘ, ব্যয়ের তালিকাও তাহার অনুরূপ হইবে। একটি মধ্যশ্রেণীর কালেজের জন্য বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হইবে, এবং বিদ্যালয়-গৃহ, সরঞ্জাম ইত্যাদির নিমিত্ত রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রায় আট লক্ষ টাকা ব্যয় হইতে পারে। কমিসন হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা মূলধনে এরূপ একটি কালেজ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অবশ্য এখানে উপযুক্ত ছাত্রাবাস, ক্রীড়ার ময়দান, ব্যায়ামাগার ইত্যাদি, একটী আদর্শ মধ্যশ্রেণীর কালেজের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার সমস্তেরই ব্যবস্থা থাকিবে।

ব্যয়ের পরিমাণ ভীতিপ্রদ ; সরকারের সাহায্য এবং জনসাধারণের দানশীলতা ব্যতীত শিক্ষার এরূপ উন্নতির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। ছাত্রদত্ত বেতন হইতে উচ্চশিক্ষার সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় সঙ্কুলন হইবে না। দেশের মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা পুত্রদিগকে উচ্চশিক্ষা দান করিবার জন্য নানারূপ ত্যাগস্বীকার করেন—ইহা খুব সত্য কথা এবং খুব সুখের বিষয়। কিন্তু শিক্ষার্থীদের অবস্থানের ব্যয় অথবা তাহাদের বেতন অসঙ্গত হারে বর্দ্ধিত করা সুযুক্তির কার্য্য হইবে না। মাসিক বেতন পাঁচ টাকার অধিক হইতে পারে না। উচ্চশিক্ষার উন্নতিকল্পে ব্যয়-বাহুল্য যদি পরোক্ষভাবেও শিক্ষার পথ সঙ্কীর্ণ করে, তাহা হইলে দেশের এবং রাষ্ট্রের কল্যাণ হইবে না। সমাজে উচ্চশিক্ষার যে আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাকে সুপথগামী, উন্নত এবং দেশের ও সমাজের উন্নতির জন্য সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। দেশের রাজশক্তি এবং লোকশক্তি এক যোগে কাজ করিলে দেশের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

উপরেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে মধ্যশিক্ষার উচ্চতর স্তর বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পরিচালিত হইবে না ; মধ্য-কালেজ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ হইবে ;—সেই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐরূপ শিক্ষার সহিত যা' কিছু সম্বন্ধ থাকিবে তাহা এই পরীক্ষা লইয়া। বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চয়ই দেখিবেন, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষার্থীরা এখানকার শিক্ষার উপযুক্ত হয় কি না। সেই জন্য যা' কিছু সম্বন্ধ তাহা এই উপযুক্ততা লইয়া, এবং এই নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিপত্য প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে ফলপ্রদ হইবে।

প্রকৃত আধিপত্য থাকিবে একটী বিশিষ্ট সমিতির উপর এবং ইহার নাম হইবে—"মধ্যশিক্ষাসমিতি"। সরকারী শিক্ষাবিভাগ হইতে এই সমিতির পৃথক সত্তা থাকিবে। একজন বেতনভোগী কর্ম্মচারীকে সরকার ইহার সভাপতিরূপে কয়েক বৎসরের জন্য নিযুক্ত করিবেন। শিক্ষাবিভাগের নায়ক (Director of Public Instructions) ইহার একজন স্থায়ী সভ্য থাকিবেন। বঙ্গ প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার বে-সরকারী সভ্যগণ তাঁহাদের একজনকে এই সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ জন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জন, প্রতিনিধি-সমিতির সভ্য থাকিবেন। অবশিষ্ট আট জন কিম্বা পাঁচ জন সভ্য সরকার-কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। এই কয়জন সভ্য নিয়োগের সময় যাহাতে কৃষি, বাণিজ্য, শ্রমশিল্প, চিকিৎসা লোক-স্বাস্থ্য, মধ্যশ্রেণীর কালেজ, উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়, স্ত্রীশিক্ষা, ফিরিঙ্গিদিগের শিক্ষা প্রভৃতি মধ্যশিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা যাহাতে উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞ প্রতিনিধির সাহায্য প্রাপ্ত হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নির্ব্বাচিত এবং মনোনীত সাধারণ সভ্যেরা তিন বৎসরের জন্য নিযুক্ত থাকিবেন, এবং এই সময়ের পরও পুনর্ব্বার সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন।

এইরূপে গঠিত একটি সমিতির উপর মধ্যশিক্ষার নিম্ন ও উচ্চ স্তরের সম্পূর্ণ ভার থাকিবে। শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষার আংশিক ভার ইহার উপর ন্যস্ত থাকিবে, এবং যখন প্রয়োজন বোধ হইবে, মধ্য শিক্ষার নিম্ন ও উচ্চতর বিভাগে শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া, এই সমিতি সম্প্রসারিত নূতন শ্রেণীতে (Continuation Classes) উক্তরূপ শিক্ষার বিভিন্ন প্রকার বন্দোবস্ত করিবেন, এবং শিক্ষকদিগের শিক্ষার আংশিক আয়োজন ইহার একটি বিশেষ কার্য্য হইবে।

(খ) উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়।

স্যাডলার কমিসন এই সমিতির উপরোক্ত বিভিন্ন কার্য্যের বিস্তৃত আলোচনা করেন নাই ; কারণ এটি তাঁহাদের কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। ইঁহারা কেবলমাত্র উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষার সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন।

এই বিদ্যালয়গুলিতে নিম্নশ্রেণীতে প্রকৃতিপাঠ (Nature study) এবং সর্ব্ব শ্রেণীতে অঙ্কন (Drawing) ও হস্তশিল্প (Manual training) শিক্ষা দিতে হইবে। বিজ্ঞানও একটি পাঠ্য বিষয় হইবে। মাতৃভাষাই অধ্যাপনার ভাষা হইবে; কেবলমাত্র প্রথম চারি শ্রেণীতে ইংরাজি ও গণিত ইংরাজি ভাষার ভিতর দিয়া শিক্ষা করিতে হইবে। এই দুই বিষয়ে পরীক্ষার ভাষাও হইবে ইংরাজি। অপরাপর বিষয়ে মাতৃভাষায় অথবা ইংরাজি ভাষায় পরীক্ষা গৃহীত হইবে। যে বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষক থাকিবে সেখানে ইচ্ছা করিলে উচ্চ শ্রেণীগুলিতে সকল বিষয় ইংরাজি ভাষায় মধ্য দিয়া শিক্ষাদান কার্য্য চলিতে পারিবে। কমিসনের বিবরণী পাঠে জানা যায় যে বঙ্গীয় মুসলমানগণের আগ্রহাতিশয্যে মাতৃভাষা সর্ব্বত্রই পরীক্ষার ভাষারূপে গৃহীত হয় নাই।

বর্ত্তমান প্রবেশিকা (Matriculation) পরীক্ষার পরিবর্ত্তিত হইয়া উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা (High school examination) নামে অভিহিত হইবে। ইংরাজি ভাষা, বাঙ্গালা ভাষা, গণিত, এবং ভূগোল—এই চারিটি বিষয়ে সকল ছাত্রকেই পরীক্ষা দিতে হইবে। প্রাকৃতিক ভূগোল, ভূগোলের অন্তর্গত থাকিবে। কয়েকটি বিষয়ে ছাত্রদিগকে পরীক্ষা দিতে হইবে না, কিন্তু প্রধান শিক্ষককে একটি স্বীকার পত্রে লিখিয়া দিতে হইবে যে পরীক্ষার্থীরা এই বিষয়গুলিতে নিয়মিত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিষয়গুলি এই :—(১) প্রাথমিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Introduction to Natural Science) প্রাথমিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব (Elementary Hygiene) (২) ভারতবর্ষের ও ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস, এবং (৩) অঙ্কন ও হস্তশিল্প। আরো একটি অতিরিক্ত বিষয় পরীক্ষা দিতে হইবে এবং পরীক্ষার্থীদিগকে নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বিষয়টি নির্ব্বাচন করিতে হইবে :—(১) একটি প্রাচীন ভাষা, (২) যে কোন একটি বিজ্ঞান, (৩) অতিরিক্ত গণিত, এবং (৪) ভারতবর্ষ ও ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস। ইচ্ছা করিলে একটি ষষ্ঠ অতিরিক্ত বিষয় এই তালিকা হইতে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে। বিষয় নির্ব্বাচন কালে যে সকল মুসলমান ছাত্রের মাতৃভাষা উর্দ্দু নয়, তাহারা প্রাচীন ভাষার পরিবর্ত্তে উর্দ্দু ভাষায় পরীক্ষা দিতে পারিবে। বিজ্ঞানের একটি অনুমোদিত তালিকা থাকিবে, এবং সকল পরীক্ষার্থীকেই এই তালিকা হইতে বৈজ্ঞানিক বিষয়টি নির্ব্বাচন করিতে হইবে। বিজ্ঞানের সাধারণ ভূমিকা বিজ্ঞান তালিকার অন্তর্গত একটি বিষয়রূপে গৃহীত হইবে। বর্ত্তমান প্রবেশিকা পরীক্ষায় অঙ্ক বিদ্যায় যথেষ্ট গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। ইংরাজি সম্বন্ধেও এইরূপ হইয়া থাকে। নূতন পরিবর্ত্তনে গণিত পরীক্ষায় গভীরতর জ্ঞানের প্রয়োজন হইবে এবং ইংরাজি পরীক্ষার বিষয়-বিভাগ ও পাঠ্য তালিকার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইতে পারে। ইংরাজি পরীক্ষায় কতিপয় নির্দ্দিষ্ট পুস্তক থাকিবে কিনা, পরীক্ষার প্রশ্ন এই পুস্তকগুলি হইতে কতগুলি থাকিবে, ইত্যাদি বিষয় মধ্য শিক্ষা সমিতি কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে স্থির করিবেন।

শেষ পরীক্ষা কিরূপে হইবে, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে আবশ্যক। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে মধ্য-শিক্ষায় প্রধানতঃ দুইটি পরীক্ষা গৃহীত হইবে, একটি মধ্য-কালেজ পরীক্ষা এবং অপরটি উচ্চ-বিদ্যালয় পরীক্ষা। কমিসন মনে করেন যে বঙ্গদেশে ত্রিশ হইতে চল্লিশটি মধ্যশ্রেণীর কালেজ থাকিলে যথেষ্ট হইবে; এবং মধ্য কালেজ পরীক্ষায় লিখিত ও মৌখিক দুই প্রকার পরীক্ষার সুবিধা হইবে। লিখিত পরীক্ষার জন্য সকল বিষয়ে সকল ছাত্রের নিমিত্ত একই প্রশ্ন পত্র থাকিবে। কিন্তু মৌখিক পরীক্ষার জন্য, প্রত্যেক কালেজে পরিদর্শনকারী পরীক্ষক (Visiting Examiner) আসিয়া এই কার্য্য সমাধা করিবেন। প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যেক ছাত্রকে পরীক্ষার দুই ভাগেই উত্তীর্ণ হইতে হইবে, এবং মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার পৃথক পৃথক পূর্ণ সংখ্যা (marks) নির্দ্ধারিত থাকিবে। বিষয় ভেদে মৌখিক পরীক্ষার প্রকার ভেদ হইবে; যেমন ইংরাজি ভাষায় উক্ত ভাষায়

কথোপকথন ক্ষমতার পরীক্ষা থাকিবে, বিজ্ঞানে ব্যবহারমূলক (practical) পরীক্ষার প্রয়োজন হইবে, এবং শিক্ষাতত্ত্বে পরীক্ষার্থীদিগকে এক একটি ছাত্রশ্রেণীতে শিক্ষাদান করিতে হইবে।

উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয়ে, উপরোক্ত নূতন প্রণালীতে পরীক্ষা গ্রহণ একরূপ অসম্ভব। কারণ বিদ্যালয়গুলির সংখ্যাধিক্য ও যাতায়াতের অসুবিধা বশতঃ পরিদর্শনকারী-পরীক্ষকদিগের সংখ্যা বাহুল্য, ব্যয় অত্যন্ত অধিক হইবে, এবং বিদ্যালয়গুলির এরূপ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে অনেক সময়, অনেক পরিবর্ত্তন ও অনেক অর্থের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু এইরূপ পরীক্ষা পদ্ধতিই থাকিবে আদর্শ। মধ্য-শিক্ষা-সমিতি উপযুক্ত বিদ্যালয়গুলিকে এইরূপ পরীক্ষা প্রদানের অধিকার দিলে সুফলের খুব সম্ভাবনা; যে সব ছাত্র এইরূপ উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় হইতে এই প্রণালী অনুসারে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবে, তাহাদের অভিজ্ঞান পত্রে (Certificate) বিদ্যালয়ের নাম, পরীক্ষিত বিষয়গুলির নাম, এবং মৌখিক পরীক্ষার বিষয়গুলির নাম থাকা বাঞ্ছনীয়। এখানে নির্ব্বাচনসাপেক্ষ বিষয়-গুলিতে, মৌখিক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পরিদর্শক-পরীক্ষকেরা লিখিত পরীক্ষাও গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবং এইরূপ লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পরীক্ষার্থীদিগকে সাধারণ পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে হইবে না।

কিন্তু সকল বিদ্যালয়ে এইরূপ পরীক্ষা যখন অসম্ভব, তখন সর্ব্ব বিষয়েই সমস্ত ছাত্রের জন্য একই প্রশ্ন পত্র দ্বারা লিখিত পরীক্ষা গৃহীত হইবে। উত্তীর্ণ ছাত্রেরা দুই বিভাগে বিভক্ত হইবে, এবং প্রথম বিভাগের জন্য শতকরা ষাট অথবা ছয়ষট্টি নম্বর রাখিতে হইবে। পরীক্ষিত বিষয়গুলি অভিজ্ঞান পত্রে উল্লিখিত থাকিবে, এবং যদি কোন ছাত্র কোন বিশেষ বিষয়ে শতকরা পঁচাত্তর নম্বর রাখিতে পারে, তাহাও ঐ পত্রে উল্লিখিত হইবে। বর্ত্তমান সময়ে যেমন কেবলমাত্র প্রত্যেক বাধ্যতামূলক বিষয়ে উত্তীর্ণ হইতে হয় এবং ঐরূপ কোন এক বিষয়ে উৎকৃষ্ট নম্বর পাইলে অন্য এক বিষয়ে কতক নম্বরের জন্য অনুত্তীর্ণ হইলেও ছাত্রদিগের উত্তীর্ণ বলিয়া মনে করা হয়, নূতন পরিবর্ত্তনে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে না।

পরীক্ষা গ্রহণ শিক্ষার একটি বৃহৎ এবং জটিল সমস্যা। উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয় হইতে বৎসরে প্রায় ষোলহাজার ছাত্র পরীক্ষা দেয়। এই পরীক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য একটি "পরীক্ষা সমিতি" থাকা বাঞ্ছনীয়। যাঁহারা পরীক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, অথবা কিছুদিন পূর্ব্বে এইরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, এইরূপ লোক লইয়া এই সমিতি গঠিত হইবে। সমিতির কোনরূপ পরিচালন ক্ষমতা থাকিবে না, কিন্তু অনুসন্ধান ও পরিদর্শন করিয়া পরামর্শ দিবার ক্ষমতা থাকিবে। এতগুলি পরীক্ষার্থীকে দুই বা ততোধিক সমষ্টিতে বিভক্ত করিয়া পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে কি না, সে বিষয়ে কমিসন কোন নির্দ্দিষ্ট মত প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু স্থান বিভাগ দ্বারা এইরূপে বিভক্ত করিলে যে মন্দও না হইতে পারে এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। বিভক্ত হইলে প্রত্যেক বিভাগের প্রশ্ন-পত্র বিভিন্ন হইবে কি না, সে সম্বন্ধেও কমিসন নির্দ্দিষ্ট মত প্রকাশ করেন নাই। মধ্য শিক্ষা সমিতি বিশেষ এবং সুপরিচালিত অনুসন্ধান দ্বারা এই সকল গুরুতর সমস্যার সমাধান করিবেন।

কমিসন স্বীকার করিয়াছেন যে শিক্ষক সমস্যাই মধ্যশিক্ষার সর্ব্বপ্রধান সমস্যা এবং সেই জনই এ বিষয়ে কমিসনের মত কেবল সংস্কারের দিকে নয়, আমূল পরিবর্ত্তনের দিকে।

বাঙ্গালায় নানা প্রকারের উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয় পরিদৃষ্ট হয়। ইহাদের কতকগুলি সরকারী (public) এবং কতকগুলি বেসরকারী (private)। সরকারী বিদ্যালয়গুলি আবার দুই শ্রেণীর,—কতকগুলি খাস শাসন তন্ত্রের (Local government) অধীন, আবার কতকগুলি স্থানীয়সঙ্ঘ শাসনের (local bodies) অধীন। এই দ্বিতীয়

প্রকারের বিদ্যালয়ে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকেরা কর্ম্মশেষে এককালীন অবসর বৃত্তি (superannuation) লাভ করিয়া থাকে। এখানে কখনও কখনও সরকারী শিক্ষকও পরিদৃষ্ট হয়। বেসরকারী বিদ্যালয়ের কতকগুলি সরকারী সাহায্য ; অপর কতকগুলি এই সাহায্যপ্রার্থী নয় অথবা এরূপ সাহায্য পায় না, এবং তাহাদিগকে সাধারণের সামান্য দান ও ছাত্রদত্ত বেতনের উপর নির্ভর করিতে হয়।

উচ্চইংরাজি-বিদ্যালয়গুলিতে সর্ব্বত্রই শিক্ষকদিগের অবস্থা শোচনীয় ; তবে সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে বেতনের হারও কিছু অধিক, চাকুরীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও ভয়ের কারণ থাকে না। সর্ব্বত্রই শিক্ষকদিগকে বেতনের উপর নির্ভর করিলে কালাতিপাত হয় না, এবং বাধ্য হইয়া একাধিক ছাত্রের গৃহশিক্ষা প্রদান করিয়া জীবনধারণ করিতে হয়। সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সরকারী শিক্ষা বিভাগ কতকটি প্রধান স্তরে (serivce) বিভক্ত, এবং প্রত্যেক স্তরে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সোপান (Grade) আছে। সাধারণতঃ সর্ব্ব নিম্ন স্তরের সর্ব্ব নিম্ন সোপানে নূতন শিক্ষককে চাকুরী গ্রহণ করিতে হয়, এবং ভবিষ্যতে বিবিধ সোপানগুলি যথাক্রমে অতিক্রম করিয়া পরবর্ত্তী উচ্চতর স্তরে উত্তীর্ণ হইবার আশা থাকে। বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ অনেক সময় শাকসবজী ও মৎস্য বিক্রয়ের অনুরূপ মাত্র ; যত কম বেতনে শিক্ষক পাওয়া যায়, এবং সেই বেতনে যতদূর উৎকৃষ্ট শিক্ষক পাওয়া যায়, তাহার দিকেই দৃষ্টি রাখা হয়। প্রথম নিয়োগের পর উন্নতির আশা কমই থাকে, এবং অনেক সময় চাকরী পরিত্যাগের উপর উন্নতি নির্ভর করে। শিক্ষার প্রকৃত ভার যাঁহাদের উপর, তাঁহাদের জীবনোপায় যখন এপ্রকার, তখন শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা যে কি, তাহা অনুমান করিবার নিমিত্ত খুব বড় কল্পনা শক্তির প্রয়োজন হয় না। শিক্ষকেরা প্রায়ই "অশিক্ষিত" —আমি এমন বলিতেছি না যে লেখাপড়া না জানিয়াই তাঁহারা শিক্ষক—তবে ইহাও সত্য যে শিক্ষক হইতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বা ততোধিক ছাপ ছাড়া, বিশেষ কিছু শিক্ষার, বিশেষ কিছু চেষ্টার প্রয়োজন যে আছে, এটা শিক্ষকেরাও বড় একটা মনে করেন না, তাঁহাদের নিয়োগকারীদিগেরও সে বিষয়ে দৃষ্টি খুব অল্পই থাকে।

এই অবস্থাটি এইরূপে আলোচনা করিয়া কমিসন শিক্ষকদের উপর যেরূপ প্রখর দৃষ্টি দিয়াছেন, বেচারাদিগকে লইয়া যেরূপ তোলপাড় করিয়াছেন, এমন বুঝি আর কাহারো ভাগ্যে ঘটে নাই। শিক্ষার বিশেষতঃ মধ্য শিক্ষার যদি উন্নতি করিতে হয়, শিক্ষকদিগকে বিশেষভাবে তাঁহাদের ব্যবসায় শিক্ষা দিতেই হইবে, শিক্ষক নিয়োগে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে, এবং এই নূতন নিয়ম দ্বারা চাকুরীর স্থায়িত্ব, বেতনে পর্য্যাপ্ততা ক্রমোন্নতির আশা, ও অবসর-বৃত্তির নিশ্চয়তার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের ভিতর অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান থাকিবে না। প্রয়োজন হইলে এক শ্রেণীর বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অপর শ্রেণীতে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারিবেন। এইরূপ স্থান পরিবর্ত্তন সর্ব্বাবস্থাতেই শিক্ষকদিগের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে, পরিবর্ত্তনের জন্য অবসর বৃত্তির সুযোগ নষ্ট হইবে না এবং পূর্ব্বার্জ্জিত বৃত্তি হইতেও তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন না। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রত্যেক পদে উপযুক্ত নিম্নতম বেতনের হার (miminium Salary) নির্দ্ধারিত থাকিবে এবং এইরূপে উচ্চতম বেতনের হার নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও ভাল হয়। পদের উপযুক্ত গুণপনা, অভিজ্ঞতা, ও দায়িত্বের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে, এই হারের হ্রাস বৃদ্ধি হইবে। শিক্ষক নিয়োগের সময় প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হইতে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবেন। শিক্ষকদিগের বেতনের নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে, অবসর-বৃত্তির জন্য সঞ্চিত রাখিতে হইবে, এবং নিয়োগকারীকেও উপযুক্ত অনুপাতে, প্রত্যেক শিক্ষকের অবসর বৃত্তির জন্য অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। বৃত্তির সঞ্চিত অর্থ, মধ্য-শিক্ষা সমিতির তত্ত্বাবধানে, কোন বীমাকোম্পানিতে সঞ্চিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। শিক্ষক

নিয়োগের এক একটি যুক্তিপত্র থাকিবে এবং এই পত্রগুলিও সমিতির নিকট গচ্ছিত থাকিবে। সরকারী অথবা ভবিষ্যৎ সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ে বেতন ও অবসর-বৃত্তির হার, সাহায্যপ্রাপ্ত ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের বেতন ও বৃত্তির হার অপেক্ষা অধিক হইতে পারিবে এবং বেসরকারী বিদ্যালয়গুলি অবসর-বৃত্তির বন্দোবস্ত করিবেন কি না তাহা উহাদের পরিচালক সভার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। সরকারী বিদ্যালয়গুলির বর্ত্তমান শিক্ষকেরা ইচ্ছা করিলে, উপরোক্ত নিয়োগ প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন, অথবা তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন না করিয়া শিক্ষাবিভাগে কর্ম্ম স্তর গ্রহণ করিতে পারিবেন।

মধ্যশিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থায় একটি বিশিষ্ট শিক্ষক সম্প্রদায়ের প্রয়োজন হইবে। তাঁহারা বঙ্গদেশের বাহিরে বিশেষতঃ ইউরোপ ও আমেরিকায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন। ইংরাজি ভাষা, শিক্ষাতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের অধ্যাপনার নিমিত্ত এইরূপ শিক্ষকের আবশ্যক হইবে, এবং তাঁহাদের বেতন ও অবসর-বৃত্তির হারও অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে। এইরূপ শিক্ষকের নিয়োগ প্রণালী উপরোক্ত প্রণালী হইতে কিছু কিছু স্বতন্ত্র হইলেও, উহারই অনুরূপ হইবে। শিক্ষার উন্নতির জন্য ইহারা মধ্যশিক্ষা সমিতি কর্ত্তৃক বিভিন্ন বিদ্যালয়ে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইবেন। উন্নত পদ্ধতির পরীক্ষাকার্য্যে, ও বিদ্যালয় পরিদর্শনের নিমিত্ত ইহাদিগকে নিযুক্ত করিতে হইবে। কোন বেসরকারী বিদ্যালয়ের পরিচালকগণ এইরূপ শিক্ষক নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সমিতি সেখানেও ইহাদিগকে স্থায়ী অথবা অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। চাকুরী লইয়া নিয়োগকর্ত্তাদিগের সহিত অনেক সময় নিযুক্ত শিক্ষকদিগের বিরোধ উপস্থিত হয়। ভবিষ্যতে একটি বিশেষ আদালতে (Special tribunal) এরূপ বিবাদের নিষ্পত্তি হইবে। আদালত সরকার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইবে। এখানকার বিচারের আর পুনর্ব্বিচার হইবে না, এবং উভয় পক্ষকে ইহার নিষ্পত্তি মানিয়া লইতে হইবে।

ব্যয়ের কথা উল্লেখ করিয়া কমিসন অনুমান করেন যে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়গুলিতে সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে, প্রত্যেক বালকের জন্য বাৎসরিক ষাট টাকা ব্যয় করিতে হইবে। ইহার ত্রিশ টাকা ছাত্র-দত্ত বেতন হইতে আদায় হইতে পারে, এবং বাংলাদেশের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার, বেতনের হার ইহা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। সেই নিমিত্ত বাকি টাকা সাধারণের দান ও সরকারী রাজস্ব হইতে সরবরাহ করিতে হইবে। এই খরচ যদি রাজস্ব হইতে দিতে হয়, তাহা হইলে কেবল বালকদিগের শিক্ষার জন্য এক শত তের লক্ষ টাকা বাৎসরিক ব্যয় হইবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়।

সুদূর।

—:*:—

হে সুদূর ! যৌবনের স্বপ্ন সুমধুর !

গোপন অন্তরচারি ! হে রহস্যপুর !

বুঝি না, কি ভাব তুমি জাগাও এ মনে,

স্নেহ পুরাতনে কিম্বা মোহ সে নূতনে।

ভাবি যবে, ছোট তুমি—হীন অপ্রকট,
হেরি মহামহিমায় একান্ত নিকট !
বিষামৃতে মাখা তব তীক্ষ্ণ মৃদু তান—
ব্যথা ভরা কি আনন্দে পূর্ণ করে প্রাণ !
মানসের তীরে কোথা বিপিন বিজন—
রসপূর্ণ যেন দুটি প্রাণ চিরন্তন—
মিলিত হইয়া সেথা সু-চির মিলনে,
নিত্য নব নব খেলা খেলে ফুল্ল মনে !
হে সুন্দর ! চিরন্তন ! অন্তরের ধন !
মোহভরা স্নেহ তব ভুলাল এ মন !

শ্রীদ্বিজচরণ মিত্র।

লছমনঝোলা।

-:*:———

তীর্থদর্শন, তীর্থস্পর্শন আর্য্যবংশে বিখ্যাত। রামায়ণ, মহাভারতে কতরূপে এই সমুদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যই, আধ্যাত্মিক রাজ্যে এক অতুলনীয় শোভার বর্ণনা আছে, তাহা এই তীর্থ! যখন একা সাধন-ভজনে মানব অক্ষম তখন বিনা আয়াসে ভূ-স্বর্গে প্রবেশ করিয়া দেখ,—এই সেই তীর্থস্থান, সেই জন্যই যুগযুগান্তরে ভারতের নরনারী তীর্থদর্শন পরম সৌভাগ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন।

স্নেহের সহোদরার বিশেষ উদ্যোগ ও আহ্বানে আমি হৃষিকেশ তীর্থ স্পর্শ করিব ভাবিয়া পুলকিত। দেরাদুন হইতে কোনও মেল প্রাতে হৃষিকেশ যায় না, সুতরাং এক মালগাড়ীতে আমাদের প্রথম শ্রেণীর কয়খান গাড়ী হৃষিকেশে কাটিয়া রাখিয়া যাইবে এরূপ বন্দোবস্ত হইল। রাত্রে আহারাদির পর আমরা গাড়ীতে উঠিলাম। আমরা দুই ভগিনী, ভগিনীর দুইটি শিশু সন্তান, অন্য একটি ভগিনার কন্যা এক গাড়ীতে এবং বন্ধুবান্ধবেরা অন্য অন্য গাড়ীতে রাত্রি যাপন করিলাম, প্রাতঃকালে হৃষিকেশে গাড়ী থামিল। আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ঘোড়ার গাড়ীর জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। হরিদ্বার হইতে গাড়ী আসিল। সেই সময় রাস্তার ধারে মিষ্টান্নের দোকানটি পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। কত কত যাত্রীর ক্ষুধা নিবারণ করিবার জন্য এই দোকান। সেই প্রত্যুষেই দোকানদার সুস্বাদু মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত, গরম গরম মিঠাই, ক্রেতাগণ আনন্দে ক্রয় করিয়া

অরুণ করিতেছে, আমাদের গাড়ী আসিয়া পঁহুছিল, দলটি বিভাগ করিতে হইল ; কেহ গাড়ীতে, কেহ টঙ্গাতে এইরূপে সকলে স্বর্গাশ্রমের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। গাড়ীখানি আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর মত, পথ দুর্গম, ছোট ছোট শিলারাশিতে পূর্ণ, সুতরাং সে জীর্ণকায় গাড়ীখানি সোজা চলিতে অক্ষম হইল! প্রকৃতির শোভা আনন্দময়, তরুণ সূর্যের নব-রশ্মিতে হৃষিকেশ হাসিল, আমাদের প্রাণগুলি "স্বর্গদ্বার" প্রবেশ করিতে ছুটিল। দশটা হইবে তখন গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পথে মন্দির কয়েকটি দেখাইবার জন্য কয় জন ব্যস্ত, কিন্তু বিশ্ব-মন্দিরের শোভা সেদিন ধরা পূর্ণ করিয়াছে, ক্ষুদ্র মন্দির প্রবেশ করিবার আর ইচ্ছা হইল না। গঙ্গাতীর প্রশান্ত, দুইখানি তরণী, ঘাটে যাত্রীদের পরপারে লইয়া যাইবে বলিয়া উপস্থিত। স্বচ্ছ গঙ্গানীর, দুই পার্শ্বে কত বিটপীদল নিজ নিজ প্রতিবিম্ব জলরাশিতে দেখিবার জন্য স্থিরভাবে দণ্ডায়মান, সূর্য্যের আলো ঝিকমিকি করিয়া শান্ত-হিল্লোলে লুকোচুরি খেলিতেছে, প্রাতঃ-সমীরণ, নীরবে কি স্বর্গের বার্ত্তা শুনাইয়া ঈষৎ হাসিয়া, গঙ্গাকে হাসাইয়া, চলিয়া যাইতেছে। কি শোভা! আমরা কয় জন নৌকাতে উঠিয়া পরপারে চলিলাম। গভীর জল নিম্নে ; উপরে নীল আকাশ, ভাবিলাম এমনই করিয়া শেষের দিনে আনন্দে কি ভবপার হইতে পারিব! ছিল সঙ্গে সামান্য অর্থ, জলে ফেলিয়া বলিলাম,—"শেষের দিনে বিনা মূল্যে কি অল্প মূল্যে পার করিয়া দিও"।

স্বর্গদ্বারে পঁহুছিলাম, সোপান অতিবাহন করিয়া স্বর্গাশ্রমে প্রবেশ করিলাম। এ কি সুন্দর স্থান, শান্তি বিরাজ করিতেছে, কোলাহল নাই, ব্যস্ততা নাই, সংসারের কোনও গোল নাই। সকলেই শান্ত— স্থির। চারিদিকে গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসীদল, তাঁহাদের মূর্ত্তি পবিত্র এবং প্রশান্ত। আমাদের জন্য একটি বাড়ী (বোধ করি ইহা অতিথিদিগের জন্য আছে) দিয়াছিলেন, সেইখানে কিছু ফল মিষ্টান্ন আহার করিলাম। গরম দুগ্ধ সেখানকার মহাত্মা পাঠাইয়া দিলেন। অল্পক্ষণ পরে সেই সেবাশ্রমের মহাত্মা আমাদের কাছে আসিলেন, ফুল ও ফল সঙ্গে আনিয়াছিলেন, দান করিলেন এবং নানাভাবে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কি আনন্দ-মূর্ত্তি! "সাধুদর্শনে পুণ্য" এ-কথা যে ভাবুক বলিয়াছেন, নিঃসন্দেহ সে ভাবুক, সাধুর ভিতরে ব্রহ্মদর্শন করিয়াছেন। উক্ত মহাত্মা আমাদের আহারাদি করিতে বলিলেন। আমরা জানাইলাম আমরা লছমনঝোলা হইতে ফিরিয়া আসিব। ডাণ্ডি প্রস্তুত ছিল, উঠিয়া লছমনঝোলা দেখিতে চলিলাম। স্নিগ্ধ প্রাতর্বায়ুরাশি ধীরে ধীরে কেমন সেই সম্মুখের পবিত্র স্থানে কীর্ত্তন করিতে লাগিল! এই স্বর্গাশ্রম তপস্যাভূমির অন্তর্ভূত, সমস্ত স্থানটির নাম "তপভূমি বা তপস্যাভূমি"। শোভা নয়ন তৃপ্তিকর। পর্ব্বত প্রাচীর হইয়া সেই তপভূমিকে রক্ষা করিতেছে। তপস্বীর ধ্যান ভঙ্গ করে কাহার সাধ্য? সংসারের অতীত, কোলাহলের অতীত—সেই তপস্যাভূমি, সকল উত্তাপ দূর করিয়া যাত্রীদিগকে শান্তি দিবার জন্য এই তীর্থস্থান যেন কোল প্রসারিত রাখিয়াছে। পথে দেখিলাম কেবল সন্ন্যাসী এবং কয়েকটিমাত্র লোক, সে বিজনে কেবল তপস্যাচরণে রত রহিয়াছে। একটিমাত্র স্ত্রীলোক কি বালিকা দেখিতে পাইলাম না! রন্ধন করিবার উদ্যোগ কোথাও নাই, দৌড়াদৌড়ি, ব্যস্ততা কিছুই দেখিলাম না, চারিদিকে কেবল শান্তির ব্যাপার, স্নিগ্ধতা, শীতলতা। প্রায় আধ ঘণ্টা কাল ডাণ্ডির পথ অতিক্রম করিয়া লছমনঝোলায় পঁহুছিলাম। এই পুণ্য-ক্ষেত্রের ইতিহাস—সেই ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র প্রতিজ্ঞা রক্ষা কারণে যখন তাঁহার পরম স্নেহের ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন তখন লক্ষ্মণ তপস্যায় দেহত্যাগ মানসে এই তপস্যা-ভূমিতে আসিয়াছিলেন। সম্মুখে ভাগীরথী দেখিলেন, পার হইবেন কিরূপে ভাবিতেছিলেন এমন সময় এক কাষ্ঠফলক ঝুলিতেছে দেখিয়া সেই ফলক অবলম্বন করিয়া নদীর পরপারে গেলেন। সেই সময় হইতে এই স্থানের নাম লছমনঝোলা। পূর্ব্বে রজ্জুর সেতু ছিল, সম্প্রতি সুর্য্যমল নামক এক মহাজন কাষ্ঠের সেতু করিয়া দিয়া যাত্রীদিগের তীর্থ দর্শনের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

আমরা সেতু পার হইলাম। ধ্রুবঘাট নামে একটি ঘাট এই স্থানে আছে। সুনীতি-নন্দন ধ্রুবচাঁদ যখন ধ্যান করিতেছিলেন গঙ্গার স্রোতের শব্দ শুনিলেন, গঙ্গাকে সম্বোধন করিয়া তখন বলিলেন "মা গঙ্গে, তোমার এত ধ্বনিতে আমার যে ধ্যানে ব্যাঘাত হয় মা, আমি বিষ্ণুপদ ভাবিব কিরূপে? তোমায় নীরব হইতে হইবে।" ভক্তের কথা! জাহ্নবী নীরব হইলেন। দক্ষিণে ও বামে কুলু কুলু ধ্বনিতে স্রোত বহিতেছে কিন্তু যে শিলাখণ্ডে বসিয়া ধ্রুব তপস্যা করিয়াছিলেন সে অল্প কয়েক হস্ত প্রসারিত গঙ্গা নীরবে বহিতেছেন। সত্যই বড়ই আশ্চর্য্যকর সেই অল্প পরিমিত স্থানে দুই দিকে প্রতিধ্বনি করিয়া স্রোত বহিতেছে আর ধ্রুবঘাটের নিকটে নীরব নিঃশব্দে গঙ্গা কোল পাতিয়া ধ্রুবের তপস্যাসন রক্ষা করিতেছেন। আমরা ধ্রুবঘাটের নিকট স্নান করিয়া মন্দির দর্শন করিতে গেলাম। মন্দিরটি ছোট, ভিতর অন্ধকার; মনে হইল এক ভৈরবী দ্বারদেশে আসীনা, যাত্রীদিগের অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। ঠাকুর দেখাইতে ব্যস্ত হইয়া ভৈরবী কত কি বলিলেন। এই উচ্চ স্থানের মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। যেখানে লক্ষ্মণ তপস্যা করিয়াছিলেন, যেখানে ধ্রুব সিদ্ধ হইয়াছিলেন সেখানে এই ক্ষুদ্র মূর্ত্তি কেন? কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তর কেহ দিতে পারিল না। ভৈরবী আমাদের অল্প কয় টাকা দান দেখিয়া বলিলেন "এত বড় ধনী গৃহিণীদিগের নিকট আশা করিয়াছিলাম অনেক পাইব", আমি বলিলাম "অনন্তের দর্শনে আসিয়াছি, দিব অল্প লইব অনেক" ভৈরবীর কথাটা বোধ হয় ভাল লাগিল, হাসিলেন। ধ্রুবের মূর্ত্তি আর এক মন্দিরে, সেখানে গিয়া দেখি ধ্রুবের কাল মূর্ত্তি, বড়ই নিরাশ হইলাম। ধ্রুবচাঁদ যে গৌর বর্ণ পঞ্চম বর্ষীয় শিশু, কাল পাথরের এক ভয়ের মূর্ত্তি কেন করিয়াছে বুঝিলাম না। পরে লক্ষ্মণের মূর্ত্তি দেখিবার আর এক উচ্চ পর্ব্বতে উঠিলাম। দেখিয়া মনে হইল ঐ মন্দির প্রাচীন। লক্ষ্মণের শ্বেত মূর্ত্তি, চক্ষু উজ্জ্বল, সুন্দর গঠন। এই স্থানে তপস্যায় লক্ষ্মণ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। কি সুন্দর প্রকৃতির শোভা, সে যেন নূতন পৃথিবী! এ পৃথিবীর অতীত স্থান, যাঁহারা তপস্যা করিতে চাহেন তাঁদের জন্যই এ স্থান নির্ম্মিত। আবার স্বর্গাশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। পূজা করিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। সেই বিজনে, সেই আশ্রমে মহাত্মার এবং স্বামীজির অনুগ্রহে অতি পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিলাম। আহারের পর সেবাশ্রমে গেলাম, সেই গৃহের এক কোঠরে বেদ পাঠ হয়, সে ঘরটি পুণ্যের পরিচয় দিতেছে। যেখানে অতিথিদিগের জন্য পাক হয়, দেখিলাম সকলই পরিপাটি, প্রতিদিন তিন চার শত লোককে আহার দেওয়া হয়। কমলাকান্ত বাবা এই সেবাশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, হৃষিকেশে তাঁহার ধর্ম্মশালা আছে। সন্ন্যাসীদলকে রুটি তরকারী দিয়া সেবা দান হইতে লাগিল, দেখিয়া, আমরা সেখানকার স্বামীজির সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। স্বামীজি বাঙ্গালী, কণ্ঠস্বরে এক শান্ত ধ্বনি উঠিল, জীবনকে এক গভীর সাগরে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন বুঝিলাম। কিছুক্ষণ সেখানে থাকিয়া ষ্টেশনে ফিরিবার জন্য ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। সে যে কি মনোহর দৃশ্য! তখন সূর্য্য অস্তমিত কিন্তু স্বর্গারশ্মিকে যেন গঙ্গা ছাড়িতে চাহেন না, সন্ধ্যার বায়ুহিল্লোলে রবির সে লাল কিরণগুলি বহিয়া যাইতেছে, সন্ধ্যার আঁধার আসিতে চাহে, রবির কিরণ স্বর্গাশ্রম ছাড়িতে চাহে না! এই সময়ে ছোট ছোট অনেকগুলি বালক, দীপহস্তে সংস্কৃত ভাষায় গঙ্গার বন্দনা করিতেছে। সে নীরব গগনে, বিজন বনে যেন সমস্ত প্রকৃতি এক স্বর হইয়া বালকদিগের সঙ্গে গঙ্গার মহিমা গাইল। সকল ভক্ত-প্রাণকে সে ধ্বনি স্পর্শ করিল। শুনিলাম যে ঘাটে দাঁড়াইয়া বালকগণ বন্দনা করিতেছে, ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র সেই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন এবং গঙ্গার বন্দনা করিয়াছিলেন।

সু, দে।

নারী।

—:*:—

তোমারে দেখেছি শুভে! সরল, সুন্দর
মূর্ত্তিমতী ভক্তি রূপে, নিরানন্দ গেহে;
অকুণ্ঠিত সেবাব্রতে, শ্রমে অকাতর,
পুণ্যে স্বচ্ছ আঁখিনীল, বুক—ভরা স্নেহে।

তোমারে দেখেছি লক্ষ্মি! মুক্ত গৃহদ্বারে,
অনুরাগে প্রসারিত সোহাগ অঞ্চল;
ফিরিছ অম্লান, চির স্নিগ্ধ প্রীতিহারে
তুষি' ভাই ভগিনীরে, করুণ, কোমল।

তোমারে দেখেছি দেবি! যাচি' সন্তানের
নিত্য সুখ, রাজ' গৃহে প্রসন্ন-আনন;
স্বর্গ হ'তে গরীয়সী——সারা আলয়ের
সকল কল্যাণ-কেন্দ্র তব শ্রীচরণ।

তোমারে দেখেছি রাণি! হৃদয়-মাঝারে,
সুখে দুঃখে অনুগতা, অতুলনা প্রেমে;
জীবন্ত প্রতিমা মরি! এ বিশ্ব-সংসারে,
মৃত্যুঞ্জয় সতীত্বের,——অচঞ্চলা ক্ষেমে।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

আধুনিক স্ত্রী শিক্ষা

——:*:——

শুনহ, "বালিকে, দেখ বিদ্যার কৌশল
বিদ্যা শিখে কর সবে জনম সফল।"

শিক্ষায় দেবতারা শুনিয়া বলিলেন:—"সাধু!" পঠন পাঠনের নূতন বিধান অমনি রঙিন পতাকা বহিয়া "তেলেঞ্জিন", "ভাপেঞ্জিনে" মত গাঢ় কৃষ্ণ ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে চলিল। বিধাতৃগণ অক্লান্ত শ্রমের ফল স্বরূপ পাঠের ধারা-নিরূপণ-পত্র অর্থাৎ "কারিকুলাম" বাহির করিলেন। সরল, সহজ প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইল—কারণ, কৌশলে শিক্ষা "ছয়দণ্ডে চ'লে যাবে ছ'দিনের পথ।" কর্ত্তৃপক্ষেরও বুঝি "মরসুম" পড়িল কাজের

আদম্বটা বেজায় ভারি হইয়া দেখা দিল। "স্কীম" করিতে কাল বিলম্ব হইবার উপায় নাই—Specific organisation আরম্ভ হইল, স্ত্রীশিক্ষা সংক্রান্ত ছোট বড় স্বতন্ত্র আপিস বসাইলেন; মূল ও সহকারিণী দুই রকমের পরিদর্শিকা (Inspectress) নিযুক্তা হইয়া আসিলেন। ইস্কুলের জন্য "টাইপ প্ল্যানে" বড় বড় বাড়ী খাড়া হইল—অর্দ্ধেক রুধির তার—গৌরী সেনেদের অর্থাৎ সেই গ্রামের বা সহরের অধিবাসীদের বাধ্য হইয়া যোগাইতে হইল। গ্রন্থ কর্ত্তৃগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য "রিডার", বিদ্যালয়ের "শকুন্তলা", কত "বালিকার বিনোদিনী" ঝটপট হাত ঝাড়িয়া লিখিলেন। পুস্তক নির্ব্বাচন-সমিতি তার প্রথম পৃষ্ঠায় ছবি আর শেষ পৃষ্ঠায় ধর্ম্মানুরাগের কবিতা দেখিয়া উত্তম বলিয়া মঞ্জুর বা "অ্যাপ্রুভ" করিয়া গেজেটের পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দিলেন। বিভাগ বলিলেন:—"রীতিমত শিক্ষা করি" হওহে "পণ্ডিত"—পরিদর্শিকারা বলিলেন:—"হাঁ হইবে পণ্ডিত—দস্তুর মত দেখিয়া শুনিয়া, শিক্ষকের মাথায় মন্তব্য ঠুকিয়া খবরদারি করিতেছি (যেমন ভংসনে বা নৈহাটী ষ্টেসনে রেলগাড়ীর চাকা ঠুকিয়া শিকলে শিকলে ঘোড়ের মুখ টানিয়া টুনিয়া দেখা হয়)। আর "মাষ্টারেড্ কৌপকরা" পৌনে ষোল আনা ফাঁকি দিয়া—"সকল ধনের সার বিদ্যা মহাধন।"—এক পয়সা দান করিয়া তিন পয়সা হারাইয়া দেখাইতেছেন বিদ্যার কি অপূর্ব্ব কৌশল—অভিভাবকেরা মুগ্ধ হইয়া বলিতেছে:—

"চমৎকার দেখি আঁখি মেলিতে মেলিতে"
কেমন শিখিল এরা লিখিতে পড়িতে।

এ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতায় সাক্ষাৎ দৃষ্টিতে—সন্ধানে, গবেষণায় অর্থাৎ রিসার্চে যাহা যাহা পাইয়াছি তার অবিকল তালিকা দিলাম। আপনারা দেখুন সুকুমারী প্রণালী স্ত্রী শিক্ষার বিধান।

ইহার মৌলিক উদ্দেশ্য:—

আধ্যাত্মিক—"সচ্চিদানন্দ"—ভাঙ্গিলে তিন:—

১। জ্ঞানলাভ বিদ্যাচর্চ্চা—সৎ। ২। চিত্তশুদ্ধি—চিৎ। প্রসাধন (স্বাস্থ্য, ক্রীড়া, কলা, শিল্প প্রভৃতি ইহার মধ্যে অঙ্গাঙ্গিক ভাবে জড়িত)—আনন্দ।

মোটামুটি চারিটী পর্য্যায়।

১। প্রাথমিক। ২। মধ্য। ৩। উচ্চ। ৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা।

সংজ্ঞাদি সংক্রান্ত কথা।

পাঠশালা, প্রাথমিক, শিষ্যা, ছাত্রী, ও সব old nonsense—এ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যরক্ষার যুগে চলিবে না। পড়ার জায়গা—তক তকে, ঝকঝকে হইবে—সুতরাং স্কুল, কলেজ, ইন্‌ষ্টিটিউসন, একাডেমী ইত্যাদি নামকরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। "পাঠশালা" বাপ্‌রে! ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার সদ্য বিষ ঐ নামের মধ্যে;—বলিতে হইবে—Primary Institution.—"পণ্ডিত মশায়"—খঞ্জ, পাড়াগেঁয়ে, ভয়ানক ভুঁড়ি, বেজায় টিকি,—তামাকখোর; চেয়ার না বলিয়া বলেন "মাচা"—এ সভ্যতার দিনে তাঁদের দিয়া কাজ চলিবে না—এঁরা মোটেই "ট্রেনিং" পান নাই। এ জন্য "ইন্‌ষ্টিটিউসনে"—যতদিন "ট্রেন্‌ড্ ম্যান" না পাওয়া যায় ততদিন অভিজ্ঞ "পণ্ডিট্"রা (যেমন বৈদপুর বা ধরিয়া

বলিতে হইবে—"সেড্‌পো"—) কাজ করিবেন। ক্রমশঃ উচ্চতর বিভাগ সকলে—টীচার, মিষ্ট্রেস, প্রোফেসার, (লেডী) প্রিন্সিপাল প্রভৃতি শিক্ষাকে ঝরঝ'রে করিবেন।—"গুরুমা" কথাটা ভয়ানক গম্ভীর—ও কী একটা ঘোমটা-পরা "আইডিয়া"—তাঁকে একদম মফঃস্বলে নির্ব্বাসিতা করিয়া—নলিনী দি, ক্ষীরো দি, সুরমা দি, এঁদের আনিতে হইবে। ডাকের পরিভাষা বেশ কোমল করিয়া গড়া দরকার। নেহাৎ পক্ষে কামিনী মাসিকে মানিয়া লওয়া যায়, তিনি বেড়ে মিষ্টি "সাপরোঁ" (Chaperon).

এখন পর্য্যায় চারটির খতিয়ান এক এক করিয়া দেখা যা'ক :—

প্রথমতঃ—প্রাথমিক শিক্ষা ওরফে প্রাইমারী এডুকেশন (Primary Education)—প্রাইমারী স্কুলে (Primary Schoolএ) হয়। এসব ইস্কুল ছেলেদের প্রাইমারী ইস্কুল হইতে কিছু বিশিষ্ট। "আপার" অর্থাৎ উচ্চ অভিধান পাইবার ইহার দাবী নাই—আবার লোয়ার প্রাইমারী বা নিম্ন প্রাথমিক বলিয়াও ইহাকে নীচু করা চলে না। স্বর্গেও না, মর্ত্ত্যেও না, তবে কি পাতালে? তাও না, বোধ হয় ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। সহরে ইহার নাম—"আর্ব্বন"—মফঃস্বলে একটা "রমলা," "কমলা" গোছের মহিলা নামের সঙ্গে যোড়া—Primary School. আধগণ্ডা হইতে পোণে একগণ্ডা শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী শিক্ষা দানও বিধান করেন। সাধারণতঃ ৫টী শ্রেণী। "ম্যারেড্-কোপল" প্রায়শঃই বিদ্যার পঞ্জা বেজায় চেটালো হওয়া—যাঁরা "নাস্তি গতিরন্যথা" অবস্থায় বিদ্যা দান মহাব্রত গ্রহণ করেন এ সব ইস্কুলে তাঁদের বেশ মহরম! তবে পরিদর্শিকাদের রক্ত চক্ষুর উত্তরে নিরুত্তর অবনত মুখ নামাইয়া থাকিতে হয়, মাঝে মাঝে এই যা গ্রহ বৈগুণ্য,—অবশ্য তারও স্বস্ত্যয়ণ আছে। থাক্, এখন শিক্ষার কথা বলি।

মোটামুটি পাঠ্য নির্ঘণ্ট।

১। পাঠ। অ। হাতে কলমে (Practical)। আ। পুঁথিগত (Theoretical) ২। গণিত অ। মৌখিক। আ। স্লেটিক (?) বা কাগজিক (?) ইহা সৎ—উদ্দেশ্য মূলক। ৩। ভূগোল—(শিক্ষা হাতে কলমে হইবে) ৪। গল্প ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, গ্রামিক, সাহরিক—নগ্ন রুক্ষ, নানা বিবরণের। গাছ বীজ, বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠ ও এই শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত।) ইহা চিৎ উদ্দেশ্য মূলক। ৫। কলা—বুনন, সীবন, কুর্দ্দন ঝম্ফন (ড্রিল) গীতবিদ্যা, চিত্র-শিল্প প্রভৃত—চৌষট্টীর চতুরঙ্গ। ইহা আনন্দ উদ্দেশ্য মূলক।

শিক্ষা যতদূর সম্ভব মৌখিক, বাস্তব (Concrete) ও সত্য হইবে। ১ নং পাঠের শিক্ষায়,—শব্দ মানচিত্র প্রকারে ম্যাপের আদলই আসে,—আবার Look and Say method বা Reading Sheetএর সাহায্যে দিতে হইবে। হাত আড়াই পরিমাণ এক লাঠী লইয়া শিক্ষয়িত্রী (ট্রেন্‌ড্ হইলে ভাল হয়) পড়িয়া যাইবেন—মেয়েরা উচৈঃস্বরে তাহার প্রতিধ্বনি করিবে। বানান বা বর্ণের বিশ্লেষণ জিজ্ঞাসা করা নিষেধ—কারণ ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায়ই নিহিত।

থিওরিটিক্যাল—"বালিকা বিনোদিনী" তার "অরুন্তুদ" বা "মুর্দ্দুর দাহ"ত বালিকাকে বিনোদিয়াই তুলিবে—মানে বলিয়া দেওয়া নিষেধ, শিক্ষা Cancrete হওয়া চাই কিনা! 'ল আর মরে করে' কি জিনিষ, শিক্ষা দিবার সময় ইস্কুল ঘরের সহিত বারান্দা থাকিলে শিক্ষক সদ্য হইতে আঙিনায় আসিয়া পড়িবেন। পরিদর্শিকারা দেখিবেন—"ক্লাশ ক্লাম" "কলোড্" হইল কিনা।

গণিত (মৌখিক) একবারের বেশী দুই বার প্রশ্ন করা হইবে না। বালিকাদিগকে শুনিয়াই চট করিয়া—(Directly Direct Methodষে।) উত্তর দিতে হইবে—ব্যাকরণে সন্ধির সূত্রের (সূত্র বালিকারা প্রস্তুত করিবে এই কারিকুলাম) ন্যায়—উপায় ও নিয়ম বালিকারাই আবিষ্কার করিবে। তারপর নামতা মুখস্থ করিলে বালিকাগণ দণ্ডনীয় হইবে। ৫ সাত্তা কত হয় বালিকারা আপনা আপনি নিরূপণ করিয়া গুণ করিবে:—৭৮৬৫ × ৪৭৭৭ = সুতরাং উত্তরেও তারা ৪৯র।

চিত্তবৃত্তির পরিস্ফুরণ, সূক্ষ্মবোধ, ব্যাপ্তি, বিস্তৃতির জ্ঞান, বৈরাট্যের অনুমান, দেশ দেশান্তরের সন্ধানের মধ্য দিয়া—হৃদয়কে তৈয়ার করিয়া লওয়া ইত্যাদি ভূগোল শিক্ষার উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ বাঁশের চেটা দিয়া ফুটরুল বা মাপকাঠী প্রস্তুত করিয়া এই সূক্ষ্মবোধ "এস্তামি" করিয়া বালু, পাথর প্রভৃতি দ্বারা দ্বীপ ও পর্ব্বত গড়িয়া অন্যান্য বৃত্তি সকলের উন্মেষ করিবে।

বাবিলনের রাজা তাঁর স্ত্রীর জন্য ঝুলন্ত বাগানে ফুল ফুটাইয়াছিলেন—বাঙ্গলা দেশ এমন অধম—ফুল দূরে থাক্ হাসি ফুটাইতেও চায় না। (বেদনা ও অনুকম্পার ভাব, রস ঈষৎ করুণ)

"বিজ্ঞান-শিক্ষা কোরেলেটিভ" হইবে। "কিণ্ডারগার্টেন" অর্থাৎ "কুমার কানন" (গার্টেন মানে কানন ?) আইনের প্রথম ধারা অনুসারে। সমসাময়িক বস্তু মনের উপর জোরে ভর করিবার দাব রাখে—সুতরাং বিষয় :—

এরোপ্লেন ; Coxrelationএ গতি, বিদ্যুৎ প্রভৃতির কথা টানিয়া আনিয়া নায়াগ্রা জলপ্রপাতের "হাইড্রো ইলেকট্রি স্কিম" (ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞানের যুগপৎ) বর্ণন করিতে হইবে। কিম্বা সেটাকে দেশীয় উদাহরণের মধ্য দিয়া বেশী জলন্ত করিয়া তুলিবার জন্য—কাপড়ের কথায়—বোম্বাইএর কলের সংস্রবে "টাটার" টাবরাইন ইলেকট্রিসিটি হইলে আরও চমৎকার হয়। সম্ভব হইলে—একখানি "এরোপ্লেন"—অথবা উহার "ফটোগ্রাফ" আর ১৩২৬ সনের ভাদ্র মাসের "ভারতবর্ষ" এক সংখ্যা সংগ্রহ করিতে হইবে—নতুবা "ডিরেক্‌ট মেথড" ফলো না করার অপরাধে "ম্যারেড্ কোপল" বরখাস্ত হইবেন। ময়ূরার মহামাননীয় মহারাজ বাহাদুর শীঘ্রই একখানি উড়োকল কিনিবেন—মূল্য ২০০০০ পাউণ্ড বা তিন লক্ষ টাকা এইরূপ গুজব—শিক্ষা দান কালে একটু পুনশ্চ করিয়া জুড়িয়া দিতে হইবে—নতুবা পাঠ দান তন্ত্রের একটা অঙ্গ আংশিক পঙ্গু থাকিয়া যাইবে।

এইবার কলা বিদ্যার কিন্নরী কথা কিছু আলোচনা করি।

কঠোর বস্তু ও তন্ত্র শিক্ষার অবসাদ লঘু করিবার জন্য কোমল, মনোময় কলা শিক্ষা অবশ্য প্রয়োজন (যেমন "কুইনিন্ মিকশ্চার" খাইবার পর—দু' চারটে কিসমিস মুখে দিয়া তিতটা কমাইয়া লওয়ার বিধান আছে) বুনন, সীবন প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত ভাবে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, কারণ "আর্ব্বন স্কুলে"—মেয়াদ বড় কম।

কেরোসিন বিভীষিকা ক্রমশঃই "এপিডেমিক" হইয়া উঠিতেছে বলিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার আগুনের পাঠ আগে পড়াইতে হইবে—কাপড় জলিয়া উঠিতেই তারা যেন মাটীতে গড়াগড়ি দিবার বুদ্ধি পায়। ম্যালেরিয়ার দুই প্রকার মশার চিত্র আঁকিয়া চিনিয়া রাখিবে আর কুইনিনের একটা শিশি কিনিয়া আনিবে। কলেরা হইলে বাড়ী ছাড়িয়া পালাইবে—বসন্ত দেখা দিলে তো কথাই নাই—একেবারে "পুর পরিখার" ওপারে।

চিত্র-বিদ্যাদিও ঐ প্রকারেই শিক্ষা করিবে—বিশেষ কিছু বলিবার নাই—এখন—গানের কথা :—

প্রতিভা থাকুক আর নাই থাকুক গান গাহিতেই হইবে। সে সব "Lydi an air" আবার "married to immortal verses" নমুনা :—

"কুকুর ডাকে ঘেউ ঘেউ শিয়াল হুয়াক্কা হুউ"

"কুক্কুরৎ কোঁ ডাকে মোরগ কোকিল ডাকে কুউ।" (মিস্‌গ্যারেটের শিক্ষক সহচর) অলঙ্কার—বীভৎসের সহিত "কোকিল ডাকে কুউ"—এই কোমল রসের সঙ্কর।

সঙ্গীতের সহিত মেয়েদিগকে অভিনয় শিক্ষা দিতে হইবে।

প্রণালী।

শিশুরা হাত ধরাধরি করিয়া বৃত্তাকারে দাঁড়াইবে। শিক্ষক প্রত্যেক শিশুকে পৃথক পৃথক ভাবে ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর ডাক ডাকিতে বলিবেন। শিক্ষক তৎপরে এক একটী জন্তুর নাম করিবেন, শিশুরা একযোগে ঐ জন্তুর ডাক ডাকিয়া উঠিবে। ঐ ডাক ডাকিবার সময় শিশুরা ঐ জন্তুর অঙ্গ সঞ্চালন অনুকরণ করিবে।" (মিস গ্যারেট প্রণীত শিক্ষক সহচর হইতে)

অর্থাৎ :—

কুকুর প্রভুকে দেখিলেই লেজ নাড়ে—শিক্ষক কাপড় বা কাগজ দিয়া লেজ তৈরি করিয়া কুকুরের অভিনেত্রী বালিকাদলের প্রত্যেকের অঙ্গে আঠা বা পিনের সাহায্যে আটকাইয়া দিবেন—তারপর শিশুগণ গাহিবে আর শিক্ষক শিসদিলে কৃত্রিম লেজ আন্দোলন করিবে।

উদ্দেশ্য কুকুরের জ্ঞান তাহার ডাক ও লেজের সহিত পরিচয় স্থাপন। আবার গরু ঢুঁ মারে—"হাম্বা" বলিয়া ডাকিয়াই শিক্ষককে তাড়া করিবে—তিনি "ত্রাহি মাং তারিণি", অবস্থার সম্যক জ্ঞান জন্মাইবার জন্য ছাতি বগলে লইয়া ভোঁ দৌড়ে একদম রাস্তায়।

নয় বৎসরের বাঙ্গালী মেয়ের শিক্ষার এই বিধান—ইহার বিরুদ্ধে আর "আপীল" চলে না—একেবারে "হাইকোর্টের" নিষ্পত্তি। নূতন নিয়মের নূতন ধারা—নূতন কায়দায় তুলার "প্যাডে" চকচকে বাঁধাই—মেয়ে শিখিবেই—"ফেলিওর" বাপ্‌রে! অসম্ভব।

২নং পর্য্যায়—মধ্যশ্রেণীর শিক্ষা—Middle Schoolএ হয়। সাধারণতঃ বড় বড় মফঃস্বল সহরে (অর্থাৎ রাজধানীর বাইরে) এ সকল ইস্কুলের স্থিতি। মধ্য অর্থাৎ "ইণ্টার মিডিয়েট ক্লাস"—কাপড়ের গদি আঁটা। কোনো খানে খাঁটি বাঙ্গলা মত স্থানে স্থানে আবার ইংরাজীর বুকনী আছে—পদবী মাইনর। শিক্ষাদান প্রণালী এক ও শাশ্বত কেবল ইংরাজীর বেলায়—ফার্ষ্ট টার্ম, সেকেণ্ডটার্ম এমনি সব টার্ম বা বুলির বই নির্দ্দিষ্ট আছে।

৩নং পর্য্যায়—উচ্চ শিক্ষা—High English Schoolএ হয়।

"ফার্ষ্ট পিরিয়ডে" ক্ষীরোদ দি অঙ্ক করাইয়া গেলে নলিনী দি ইংরাজী পড়াইতে আসেন। বেশ মিঠা পড়ান কিনা—এক পিরিয়ডে কুলায় না—সুরমা দি দোরে আসিয়া রোজই দাঁড়াইয়া থাকেন। একদিন একটু বিরক্ত হইয়া বলিবেন :—"এ রকম বেশী টাইম নেয়া আপনার অন্যায়।" নলিনী দির কানে তখনো বাজিবে :— My right there is none to dispute"—তিনি চটিয়া গিয়া বলিবেন :—"এ রকম স্পষ্ট অপমান করবার আপনার কি "রাইট আছে ?" নারদ! নারদ! শেষ কালে Head mistress আসিয়া মীমাংসা করিবেন :— "টাইম লিমিট"—নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠদান Examination Paper লেখা—এযে ইউনিভারসিটীর ফাণ্ডা-মেণ্টাল প্রিন্সিপল"—নিয়ম তাকে ছাড়িয়ে চ'লতে তো আপনারা পারবেন না।—

ইত্যাদি গোলমালের অবসরে ছাত্রীদের গল্প বেশ জমিয়া উঠিবে।

এ সব ইস্কুলে ইংরাজী সাধারণ ভাষা—মানে বুঝিতে, বিদায় চাহিতে, টেনিস্ খেলিতে এমন কি মাতৃভাষার প্রশ্নোত্তর লিখিতেও ইংরাজী। নীচের শ্রেণীতেও—"What is this ?" That's an egg." "How does it look ?" "Round ইত্যাদি Do and say----Methodএর শিক্ষাদান বাঙ্গালা ভুলেও উচ্চারণ করিবেন না। সকলের চেয়ে চমৎকার বাহিরে যাইতেও "May I go out madame" (মাদাম) ?

তারপর চার নম্বর পর্য্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা Advancement of learing নারী-শিক্ষা ইমারতের গথিক গম্বুজ। Botany, Logic. Mathematics, History, Philosophy, Economics, ইত্যাদি নানা বিষয়ের নানা সমান্তরাল জ্ঞান—বিস্তৃত কিন্তু "গভীর" নয়।

B. A. পর্য্যন্ত মেয়েদের স্বতন্ত্র কলেজ আছে। (অবশ্য ইচ্ছা করিলে বাড়ীতে বসিয়াও ইহারা পরীক্ষা দিতে পারেন আর তা দুই বৎসরেই ছেলেদের মত ইঁহাদের "মাষ্টারি করা" "তিন বৎসর পড়া" ইত্যাদি আপদ নাই--)

কর্তৃপক্ষ অধিকাংশস্থলেই মেম্। Post Graduate Class তো Universityতে। ফিলজফি পড়িয়াও যাঁহারা মনস্তত্ব পুরা দস্তর আয়ত্ত করিতে পারিবেন না--তাঁহাদের জন্য University College of Scienceএ Experimental Psychology পড়াইবার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। ইহার পরে আবার ক, খ !

(ক) শিক্ষকতা শিক্ষা :—

ট্রেনিংক্লাস—গুরুট্রেনিং এর কমনীয় সংস্করণ ঢাকা মহা নগরীতে স্থাপিত। কলিকাতার "সিনিয়র" "জুনিয়র" অনেকটা ঐ এক গোষ্ঠীর। ট্রেনিং ক্লাসে দিন কতক রঙিন চক আর কুকুর, বিড়ালের ছবি লইয়া ঘাঁটা ঘাঁটি।

অবশেষে কলেজ। ৯ মাসের শিক্ষা। তিন মাস তার "ভ্যাকেসন" বা ছুটী। বাকী ছয় মাসের অর্দ্ধেক যায় Research Schemeএ অর্থাৎ "নাগ বোংয়া বোং" গোছের যন্ত্র বানাইয়া "সায়েন্সকোর্সে" "সাউণ্ডের" শিক্ষাদান প্রণালীতে "ওরিজিনালিটী" বা মৌলিকতা দেখাইবার চেষ্টায় অথবা চিত্রের সাহায্যে ইতিহাস শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে ভীমের কল্পিত চরণ দীর্ঘে প্রস্থে ১॥০ ফিট মাপিয়া আঁকিতে। বাকী থাকে তিন মাস তারও ১॥০ মাস যায় ভাবিতে কিরূপে মিষ্ট্রেসদের শিক্ষাদানের তদ্বির করিব - কি বলিলে ধমকানিটা কড়া হইয়া লাগিবে। আর ১॥০ মাসে শিক্ষকের সকল যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া অধিকারের চরম পত্র, অকাট্য প্রমাণ ঝাণ্ডার স্বরূপ লইয়া আসিয়া দাবী করিলেন :—শিক্ষাবিভাগের চাকরীগুলি। আমাদের ডিগ্রি আছে—এলটি, বীটি ইত্যাদি। শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি—তাহা "খরো"—আর যাহা বলি তাহা একান্ত খাঁটী।

(খ) ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি কার্য্যকরী শিক্ষা।

বি, এল, ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া তিন বৎসরে যথারীতি উত্তীর্ণ হইলে ডিপ্লোমা পাইবেন—কিন্তু আদালতে বাহির হইতে পারিবেন না—হাইকোর্টে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে।

ডাক্তারি উত্তম ও উৎকৃষ্ট। সত্যই প্রয়োজন। আমাদের কিছু বলা চলিবে না।

মহাকালী পাঠশালা গুলিতে—শিবার্চ্চনা, পুষ্পচয়ন, স্তোত্রপাঠ—একেবারে তূর্য্য, পরম, তাপসব্রত—ব্যস্। এ শিক্ষায় "নাইকো মৃত্যু নাইকো জরা,—চিরশ্যামল বসুন্ধরা চিরস্নিগ্ধ মধুমাসে।"

নানা বিষয়িণী কথা।

নিয়ম বন্ধনের জ্ঞান, (ডিসিপ্লিন।)—সঞ্চালন, আস্ফালন প্রভৃতি দ্বারা অঙ্গ সবল, দেহ দৃঢ়, প্রত্যঙ্গাদি শক্তিশালী করা আবশ্যক—তাই এক নূতন বিজ্ঞাপন জারী করা হইয়াছে—ছেলেদের-ইস্কুলের মত মেয়ে-ইস্কুলেও সকল ছাত্রীর উপরে একজন মোড়ল বা Captain থাকিবে—তাহার ইঙ্গিত মত চলিয়া প্রত্যেক মেয়েকে ডিসিপ্লিনের ট্রেনিং পাইতে হইবে। ছুটীর সময় সারি দিয়া দাঁড়াইলে শিক্ষয়িত্রী বলিবেন—'মার্চ্চ' মেয়েরা ৪০ নং Bengali Regimentএর কায়দায় পা ফেলিয়া চলিবে।

প্রত্যেক মেয়ে ইস্কুলেই "মোটর" বা গাড়ীর বন্দোবস্ত থাকিলে ভাল হয়—যেন "লেখা পড়া করে যেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই" এ সাধু বাক্যের প্রত্যক্ষ শিক্ষার কোনও ব্যাঘাত না ঘটে। দুইজন নিতান্ত পক্ষে একজন ঝি থাকিবে—সে কাছে কাছের খুকীদের আনিবে আর "ম্যারেড্ কোপলের" খুকীদের খেলা দিবে। বড় বড় ইস্কুলে যেখানে এ সব বালাই নাই সেখানে "দারোয়ানজীর জিউ আচ্ছা হ্যায়" কিনা তার খবর লইবে—মেয়েদের জলছবি কিনিয়া আনিয়া দিবে—প্রয়োজন হইলে লীলাকে বা শৈলদিকে ডাকিয়া দিবে। আত্মীয়রা দেখা করিতে আসিয়া শ্লেটে লিখিয়া দিবেন—"Lila's.........যা হয় একটা সম্বন্ধ—Wants to see her."

এগারটা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ইস্কুলের কার্য্য কাল—৪৫ মিনিটে এক এক "পিরিয়ড।" মোট ছয়টী পিরিয়ড—আধ ঘণ্টা টিফিন। টিফিনের সময় মেয়েরা চীৎকার শব্দে "কম্পাউণ্ড" কাঁপাইয়া দৌড়াদৌড়ি খেলিবে। (অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবল হওয়া দরকার।)

উপসংহার :—

শিক্ষা জ্ঞানের জন্য—অজ্ঞানকে ভুলিয়া সত্য—"সৎ" যাহা তাহা লাভ করিতে হইবে—বিদ্যা সুতরাং রন্ধন-শিক্ষা গৃহকর্ম্ম এ সব শিক্ষা যতটা সম্ভব ভুলাইবার চেষ্টা করা দরকার। রন্ধন-শিক্ষার কোনও বই পাঠ্য থাকিবে না। তাহারা হাতে কলমে অর্থাৎ "প্র্যাক্‌টিকাল শিক্ষা" দেওয়া অপ্রয়োজন কারণ পাঁড়েজী তো নূতন শিক্ষার আদিশূরী মতে চালানে চালান আমদানী হইতেছে।

চিত্ত শুদ্ধি জনিত শিক্ষার ফলে প্রতিবেশী মেয়েদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া কথা কহিবে না (যদি তাঁহারা শিক্ষিতা হন্ তাহা হইলে এ বিষয়ের পরিবর্ত্তন চলিবে—ফুটনোট)—দু একটা হুঁ—অ্যাঁ—হ্যাঁ—ইত্যাদি বলিয়া বিদায় হইতে হইবে। (শিক্ষার ফল চিত্তরোধ ও গাম্ভীর্য্য)

এইবার প্রসাধন সংক্রান্ত ইহা আবার (১) (বাহ্যিক বিবরণ) অবশ্য করণীয় (Compulsory) ও (২) মর্জ্জি-মোতাবেক (Optional) এই দুই প্রকারের।

১। প্রাথমিক বা Primary Education.

(ক) নীচের দিকে :—

(অবশ্য করণীয় বা কম্পালসারী)

১। কাপড়; (মোটা)

২। জামা ও সেমিজ

মর্জ্জিমোতাবেক :—

১। ইজার বা পাজামা "জাষ্টপিপিং-আউট অবধি"—

৩। চুড়ি, হার ইত্যাদি—

২। ফ্রক—লেস-ললিত, লেস-বিরহিত, ফ্রিল-কম্বশোভিত বা প্লীট পরিনিবদ্ধ—নানা প্রকারের।

৩। 'জুতা' (মোজা পরা পায়)

৪। পিছনের দিকে একটী বেনী ঝুলান—মাথার মাঝখানে (সাম্‌নের দিকে) রিংএগাঁথা রেশমী ফিতার টায়রা—দুইদিকে "বো"—ময়না পাখীর মত।

সাড়ী,—পাইনেপল, ডুরেদার, ক্রেপ, হাওয়া, ঢাকাই, বেলডাঙ্গা, শান্তিপুরের মিহি—ছোট দুটী ইয়ারিং ইত্যাদি সৌখীনং পর্ব্বে টর্ব্বে বা মেম আসিলে পরিবে।

ফল :—

"অবশ্যই" যাহাদের অতি কষ্টে জোটে—তাহাদের উপর। কষ্টে সৃষ্টে একটা বেল্ট বা কোমরবন্ধ কিনিয়া তাহার সহিত কাপড় চার দিকে কোঁচাইয়া কোঁচাইয়া আটকাইবে। জামার উপর আঁচলটা 'ড্রেসের ধরণে' টানিয়া দিয়া বুকের কাছে কোঁচার সাম্‌নেটার মত করিয়া বাঁধিবে—যদি জোটে একটা সেপ্‌টীপিন (জাপানী টিনের অবশ্য) দিয়া আঁটিবে। আহা! বেচারীরা! উপরের দিকে সাত মিশালী এও আছে জ্যাকেট পরিতেও দেখা যায়—ব্লাউজ নিয়া ফেরিওয়ালাও তাহাদের বাড়ীর কাছ দিয়া বৃথা হাঁকিয়া যায় না।

ক্রমশঃ উচ্চতর শ্রেণী, ইস্কুল, কলেজ প্রভৃতিতে ক্রমশঃ উন্নততর সজ্জা ব্যবস্থা। বেনী সংক্রান্ত উদাহরণ কিছুদিন পূর্ব্বে "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে উজ্জ্বল ভাবে দেখানো হইয়াছে। লেখক :—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন। অন্যান্য কথা আমরা সংক্ষেপে কিছু কিছু বলিতেছি।

১। অবশ্য (Compulsory)

(ক) সাড়ী (ঢাকাই হইলে কোরা)

(খ) সেমিজ (লেস বিরহিত)

(গ) কসা জ্যাকেট।

(ঘ) তার উপরে ঢিলা সিল্কের বা সূচী-কারুর ব্লাউজ (এমব্রয়ডার ড্রন্ থ্রেড্ ওয়ার্ক প্রভৃতির) বাহার দেওয়া—অপ্‌স্যানালের অন্তর্গত।

(ঙ) পেটিকোট ছাঁটের নয়; হাতে বোনা ব্রেসেলেসের ঝালর দেওয়া।

(চ) সাবান।

(ছ) জুতা (হিলতোলা)

(জ) ব্রোচ; (হীরার অপ্‌স্যানাল)

(ঝ) রিষ্টওয়াচ অথবা বুকের উপরে ব্রোচটীর ঠিক উপরে ঝুলমান একটী ছোট ঘড়ি—মেডেলের মত। (র‍্যাও-সোনার অপ্‌স্যানাল)

(ঞ) দু'গাছি সরু চুড়ি সোনার। (হীরার দুটী ফুল বা দুল অপ্‌স্যানল)

(ট) একছড়া নেক্‌লেস। (পাথর বসানো অপ্‌স্যানাল)

(ঠ) একটী ঝুলানো পার্স।

(ড) ছোট একটী ছাতা।

ফরাসী সুগন্ধ, ভ্যাজলিনস্নো, গন্ধতেল ইত্যাদি অপ্‌স্যানল।

বিংশ শতাব্দীর এই "ধ্বান্তারি সর্ব্ব পাপঘ্ন" শিক্ষার দীপ জ্বলিয়াছে—স্বয়ং সরস্বতী আপন হাতে সোনার দেশলাইএর কাঠী দিয়া যেমন করিয়া প্রদীপ জ্বালিতেছেন—"শিশির পাবলিসিং হাউসের" কর্ত্তৃপক্ষ তাহার স্বপ্নপ্রাপ্ত চিত্রখানি ১৩২৬ সনের ফাল্গুন মাসের ভারতবর্ষে বেশ স্পষ্ট করিয়া নিপুণ কলায় আঁকিয়া দিয়াছেন অল্প, অনুসন্ধানেই দেখা যাইবে।

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

এখনো লো রয়েছে যৌবন

(১)

এখনো লো রয়েছে যৌবন,
এস সখি এস ত্বরা　　থাক পড়ে ঘট ভরা
থাক তব দেবালয়ে পূজা আয়োজন।
থাকুক চন্দন ঘষা　　থাক পড়ে দীপ-দশা
থাক পড়ে শঙ্খ ঘণ্টা ধূপ গন্ধ ডালা
মিছা মিছি সারাবেলা　　যৌবনেরে কর হেলা
কেন এত তাড়াতাড়ি পূজা পর্ব্ব পালা ?
কেন এত উপবাস　　ব্রতাচার বারো মাস
এখন হইতে কেন মন্দির মার্জ্জন ?
এ সব সাধন তরে　　বহুদিন আছে পড়ে'।
একবার চলে গেলে ফিরেনা যৌবন

(২)

এখনো যে রয়েছে যৌবন
এস সখি হাসি মুখে　　আমার তৃষিত বুকে
মুকুল শুকালে হবে বৃথাই গুঞ্জন।

করি মুখ মসীমাখা অকাল জলদ ঢাকা
থাক তুমি নিশিদিন কোন ভাবনায় ?
নীরবে কেন বা রও— হাস, হাস, কথা কও—
অকালে গম্ভীর মুখ কেন কর হায় ?
পল্লব গৌরব গেলে কুঞ্জে আর সুধা ঢেলে
কোকিল করিবে'কিগো প্রণয় কূজন ?
বিষময় বিষাদের সময় মিলিবে ঢের
ফিরিয়া পাবে না আর অমিয় যৌবন ॥

(৩)

এখনো লো যায়নি যৌবন,
ফেলেদিয়ে সব কাজ এস সখি এস আজ
ব্যর্থ করোনাক এই প্রণয়ি-জীবন।
গৃহকাজ খুঁটী নাটী নষ্ট হোক হোক মাটী
হিসাব নিকাশ সব যাক্‌গে চুলোয়।
যার তরে এ সংসার বাধা যদি হয় তার
তেমন সংসার তবে মিশাক ধূলোয়।
গৃহ গেলে গৃহ হবে যৌবন ফিরেছে কবে ?
গৃহ যায়,—তরু তল হইবে ভবন।
জীবন সার্থক হলে সহিব গাছেরো তলে।
সহিব কেমনে বৃথা যাইলে যৌবন ?

(৪)

এখনো লো খেলিছে যৌবন
তোমার বরাঙ্গ ঘেরি, তবে আর মিছে দেরী
থাক পড়ে অঙ্গ রাগ সজ্জা প্রসাধন,
থাকুক কুণ্ডল বাঁধা বিনোদ কবরী ছাঁদা
সুগন্ধ তেলের শিশি ক'রে দাও দূর
আলতা, টীপ পরা নিয়ে সহেনাক দেরী, প্রিয়ে
তোরঙে তুলিয়া রাখ' বালা হার চুড়

যৌবন হইলে শেষ করিও মোহন বেশ
তখনি ভূষার বড় হবে প্রয়োজন,
পোকায় কাটিলে শাড়ী আবার কিনিতে পারি,
ফিরিবে না, চলে গেলে মধুর যৌবন।

(৫)

এখনো যে রয়েছে যৌবন
এখনো বসন্ত আছে কোয়েল গাহিছে গাছে
এখনো ছুটিছে গন্ধ, দখিনা পবন
দীর্ঘ নিদাঘের বেলা খুলিও সজ্জার মেলা
যত পারো করো স্নান, অঙ্গের মার্জ্জন।
শ্রাবনে বরিষা পাবে থাকিও বিষণ্ণ ভাবে,
শরৎ প্রভাতে কোরো পূজা আয়োজন।
জীবনের পৌষে প্রিয়ে থেকো গৃহ কাজ নিয়ে
লক্ষ্মী মোর কোরো গৃহ লক্ষ্মী নিকেতন,
মধু মাসে কথা রাখো দূরে দূরে থেকো না-ক—
কাছে এস কর মোর সার্থক যৌবন।

শ্রীকালিদাস রায়।

একটি ছেলে।

——:॰:——

লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল বিনোদ বাবু ও পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনভোগী কেরাণী সতীশ বাবু দুইজনে সহোদর ভাই। তাঁহাদের পৈত্রিক একটী বাড়ী, এখন পাশাপাশি দুইটী বাড়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দক্ষিণের একতলা, মলিন, শেওলাধরা, পুরানো বাড়ীখানি এখন সতীশ বাবুর, আর উত্তরের সদা চূনকাম-করা ধপ্‌ধপে সাদা তেতলা প্রকাণ্ড নূতন বাড়ীখানি বিনোদ বাবুর। সতীশ বাবুর যেখানে বাঁশের লাউমাচায় গুটিকতক লাউ ফলিয়া থাকিত বিনোদ বাবুর সেখানে বহু যত্ন পালিত গাছটিতে ফলের বদলে ফুটিয়া থাকিত—ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা—বিলাতী ফুল। সতীশ বাবুর কঞ্চিঘেরা ছোট বাগানটিতে যখন থাকিত—শাক, বিনোদ বাবুর মেহেদীর ঘের দেওয়া বাগানে তখন ফুটিত বিচিত্র বর্ণ প্রজাপতির মত অজস্র সিজন ফ্লাওয়ার। তবে প্রায়ই যেমন দেখা যায় মা লক্ষ্মী আর মা ষষ্ঠী দুজনে বিপরীত পথেই চলেন, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। বিনোদ বাবুর একটি মাত্র সবে-ধন মানিক ছাড়া আর কোনও ঝঞ্ঝাট বালাই ছিল না ; আর সতীশ বাবুর ঘর হইতে যখন পিলপিল করিয়া কচি

কাচার দল বাহির হইত তখন কোন্‌টি ছোট কোন্‌টি বড় চেনা দায় হইত। ভোরে শয্যা ত্যাগ করিয়া বিনোদ বাবুর গিন্নি সাবান দিয়া হাত মুখ ধুইতে ধুইতে ঘৃণায় মুখ বাঁকাইয়া দেখিতেন তাঁর ছোট জা বিমলা একরাশি গোবর মাখিয়া ঘুঁটে দিতেছেন। গরিবের ঘরে যাতে একটুও সচ্ছল হয়, বিমলা সর্ব্বদাই সেই চেষ্টায় থাকিতেন। বিমলার বড় ছেলে বিভূতি, আর বিনোদ বাবুর ছেলে মানিক, প্রায় সমবয়স্ক, দুইজনে স্কুলে এক ক্লাসেই পড়িত। দুইজনে বেশ বন্ধুত্বও ছিল বটে, কিন্তু ছুটির সময় হইলে মানিক বাড়ী ফিরিত ঘরের গাড়ী চড়িয়া, আর বিভূতি অন্য বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে পায়ে হাঁটিয়াই বাড়ী আসিত। শত অনুরোধেও মানিক তাহাকে গাড়ীতে নিজের পাশে বসাইতে পারিত না। মানিক বড় লোকের আদুরে ছেলে, সকলতাতেই তার আদর আবদারের অন্ত ছিল না, তবু তার কেবলি মনে হইত, বিভূতি তার চেয়ে বেশী সুখী। মানিক যে ওই অপরিস্কার নোংরা বাড়ীতে গিয়া ওই ছেলেদের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা করে, এ রকম ইচ্ছা তার মা একেবারেই করিতেন না বটে, কিন্তু তাঁর আদুরে একগুঁয়ে ছেলের 'হাত পা' হওয়ার পর আর তাঁর সে ইচ্ছাটা বড় সফল হইতে পারিত না।

মানিক আর বিভূতি এক ক্লাসে পড়ে তাই মানিকের প্রাইভেট মাষ্টারের কাছে বিভূতিও পড়িত। দুটি ছেলে একসঙ্গে পড়িলে পড়া ভাল হয় বলিয়া বিনোদ বাবুই এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ফলে একসঙ্গে পড়া একসঙ্গেই স্নানের পর আহারটাও একসঙ্গে সারিবার ইচ্ছা, আবদার, মানিকের প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল ও মধ্যে মধ্যে বিভূতি বাধ্য হইয়া মানিকের সঙ্গেই খাইতে আসিত। বিমলাও তাঁর গরীবের ছেলের বড়লোকদের সঙ্গে বেশী মেশা পছন্দ করিতেন না, কিন্তু মানিকের কথার উপর কথা কহা মানে বড় মানুষ জা-ভাশুরের সঙ্গে 'লাগিতে যাওয়া'; কাজেই চুপ করিয়াই থাকিতেন।

বেলা দশটা, গিন্নি পুজাহ্নিকের যোগাড় করিতেছিলেন। ছোট 'বল' টাকে ব্যাটের ঘায়ে ঠেঙাইতে ঠেঙাইতে মানিক আসিয়া ডাকিল 'মা, ওমা, মা'। হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া গিন্নি বাহির হইয়া আসিলেন, বলিলেন 'কি রে?' মানিক বলিল 'বিভূতি আজ আমার সঙ্গে খাবে মা, তুমি বল'। গিন্নির মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল তিনি বলিলেন 'রোজ রোজ বিভূতি তোমার সঙ্গে খাবে কেন?" মানিক না-ছোড়, বলিল "কেন খাবে না? আচ্ছা, আমি তা হলে ওদের বাড়ী খাইগে?" গিন্নি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন কহিলেন "ওরে না, না, আচ্ছা ডাক্ বিভূতিকে আমি বল্‌চি।" সঙ্গে সঙ্গে বিভূতিকে বলাইয়া লইয়া তবে মানিক ঠাণ্ডা হইল।

খাইতে আসিয়া মানিক দেখিল খাবার কাছে মা বসিয়া আছেন, আর দুজনকার খাবার দেওয়া আছে। মানিক চুপ করিয়া একবার থালার দিকে দেখিয়া লইয়া মায়ের মুখ পানে একটা কঠোর দৃষ্টি হানিয়া খাইতে বসিল, গিন্নি হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন 'ওটায় কেন তুই বসলি? তুই কি অত ভাত খেতে পারবি?' বিভূতি থতমত খাইয়া গেল। মানিক মুখ বাঁকা করিয়া বলিল "তুই খা-না বিভূতি, আমি না খেতে পারি ভাত ফেলা যাবে, তোর তাতে কি?" গিন্নি অসহ্য ক্রোধে হাত নাড়িয়া বলিলেন "ফেলা যাবে? তাইতো! ভাত ফেলবার জিনিষ কি না?" মায়ের এই আহারের ব্যবস্থা করার ভিতর যে কৌশল টুকু ছিল তাহা যে মানিক ধরিয়া ফেলিয়াছে আর মায়ের এই গোপন ব্যবস্থা টুকুর মর্য্যাদা না রাখিয়া সে ভায়ের পক্ষ ধরিল ইহাতে তাহার স্নেহগর্ব্বিতা মায়ের ক্ষোভের আর সীমা থাকিল না। খাইয়া যাইবার ঘণ্টা দুই না হইতে হইতে মায়ের কাছ হইতে মানিকের ডাক আসিল। ছেলেকে কোলের কাছে বসাইয়া কাঁচের আলমারী খুলিয়া মা এক রাশি খাবার খাওয়াইতে বসিলেন। মানিক বলিল "আমার বলে এখন ক্ষিদেই পায় নি," মা বলিলেন "না, ক্ষিদে আবার নাকি পায় নি, নিজের হাতের

থালা দিদি পরকে আজ কি তোর পেট ভরেছে রে ?" "কেন ভরবে না মা খুব ভরেছে, কিন্তু ঐ রকম ক'রে তুমি আমাদের থেকে দিও না" তা বলে দিচ্চি বলিয়া সে উঠিয়া গেল। খাবারের রেকাবের উপর ঢাকা চাপা দিয়া মা গুম হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, ছোট বৌ এম্‌নি করিয়া কি শেষটা তাঁহাকে হারাইবে নাকি? দিন কয়েক পরে একদিন সন্ধ্যা বেলা মানিক বিভূতিকে আটক করিল, বলিল "চল একসঙ্গে খাইগে।" বিভূতি জানিত যে তার দাদার ছেলে মানুষি নিতান্ত হালকা কথা নয়, তাই সে শক্ত হইয়া বলিল 'না আমি আমাদের বাড়ীতেই খাবো ভাই, আজ আর টানাটানি কোর না।' মানিক রাগ করিয়া বলিল 'আমাদের বাড়ী খেয়ে বুঝি তোর পেট ভরবে না' বিভূতি হাসিতে হাসিতে বলিল 'কেমন করে ভর্‌বে? আমরা খাই ভাত আর তোমরা খাও লুচি।' 'আচ্ছা, আমিও ভাত খাবো তোকেও তাই খাওয়াব, তা হ'লে ত খাবি?' বিভূতি বলিল "কি মুস্কিল!" মানিক জেদ ধরিল সে ভাত খাইবে। গিন্নি দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন "ওমা সে কি রে? কোনও কালে অভ্যেস নেই" "তা হোক আমি ভাতই খাব।" তবুও মানিকের সামনে যখন লুচিই আসিল, তখন সে রাগ করিয়া পা দিয়া থালাটা সরাইয়া উঠিয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া একেবারে দরোজা বন্ধ করিয়া দিল! পাছে কান্নাটা কেহ দেখিয়া ফেলে! পুরুষ মানুষের কান্না! লজ্জার কথা যে! শত সাধাসাধনায় আর কেউ সে দুয়ার খুলাইতে পারিল না; তখন বিভূতি গিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল 'দাদা!' খট্ করিয়া শিকল খুলিয়া মানিক বাহির হইয়া আসিল।

(২)

এক সঙ্গে বেড়াইতে যাইবে বলিয়া বিভূতির আশায় বসিয়া বসিয়া মানিকের সন্ধ্যা লাগিয়া গেল। মাঠে গিয়া উড়াইবার জন্য যে ঘুড়িখানা ঠিক করা ছিল, সেই খানা পাড়িয়া লইয়া সে বিভূতিদের বাড়ী যাইবে বলিয়া উঠিতেছিল। এই ঘুড়ি খানা সম্বন্ধে সে সারাদিন বাড়ীশুদ্ধ লোককে সতর্ক করিয়াছে, মাকে পর্য্যন্ত বলিয়াছে "মা এখানা আমার মাঠে ওড়াবার ঘুড়ি, দেখো নষ্ট কোরনা যেন।" মা তখন হাসিয়া বলিয়াছিলেন "বাবাঃ! তোমার ঐ সাত রাজার ধন ঘুড়ির ওপরই বিশ্বশুদ্ধ চোখ্ প'ড়ে আছে নাকি?" এখন ভরা সন্ধ্যায় ছেলেকে বাহির হইতে দেখিয়া শঙ্কিত মুখে বলিলেন "কোথায় চল্‌লি রে?" "চল্লুম যেখানে খুসী।" গিন্নি রাগিয়া উঠিলেন "বটে! উঠ্‌বো, দেখ্‌বি? হতভাগা কোথাকার!" ঘরের ভিতর ইজিচেয়ারে শুইয়া বিনোদ বাবু তামাক টানিতেছিলেন কাজেই মানিক চাঁদ আর বেশী আগাইতে সাহস করিলেন না; ঘুড়ী, লাটাই, সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিলেন। গিন্নি রোষভরে বলিলেন "যত রাজ্যের হতভাগা ছেলের দলে মিশে এটাও বাঁদর হয়ে যাচ্ছে। দেখ, তুমি বিভূতিটাকে বারণ ক'রে দিও, ও যেন পড়া শুনো যা করে নিজের ঘরে বসেই করে, আর মাষ্টারের কাছে না আসে। দেখ্‌ছি ঐ সঙ্গ দোষেই দিনকের দিন ছেলে আমার অবাধ্য হ'য়ে উঠ্‌ছে--" মানিকের কান ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। সে আদুরে দুলাল, সহ্য করিবার শক্তি তার অত্যন্ত কম। মনের জ্বালায় তার শিরা উপশিরার রক্তের স্রোত আগুন হইয়া ফুটিয়া উঠিল। তা ছাড়া জীবনে মায়ের কোলই তার মস্ত একটি সাহস, পরম জুড়াইবার স্থান, মায়ের মনের এই সঙ্কীর্ণতায়, যেন তাঁর ছেলের বাহাদুরিটুকুও কমিয়া গেল। চাকর আসিয়া বলিয়া গেল যে বাইরে মাষ্টার বাবু ডাকছেন! হাতের উল্টা পিঠে চোখ মুছিতে মুছিতে মানিক বাহিরে চলিয়া গেল! কিন্তু এক ঘণ্টার পরও বিভূতি আসিল না কাজেই মানিক উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "আজ আর আমি [illegible] না মাষ্টার মশাই" মাষ্টারটি তাহাকে জানিতেন, তিনি তাহাকে আদর করিয়া বলিলেন "কিন্তু, হাফইয়ালি যে

এসে পড়লো ব'লে।" "পড়ুক গে যাক্" বলিয়া মাষ্টারের আগেই মানিক তড়াক্ করিয়া এক লাফে গোটাকতক সিঁড়ি পার হইয়া বিভূতিদের বাড়ী গিয়া ঢুকিল। সেখানে মেটে রান্না ঘরের ভিতর উনুনের কাছে বসিয়া বিমলা রান্না করিতেছিলেন আর কাঁপিতেছিলেন। বিভূতি ম্লান মুখে মাটির উপরই থার্ম্মোমিটার হাতে করিয়া বসিয়া আছে। খুব আস্তে আস্তে গিয়া মানিক বিভূতির পিঠের কাছে দাঁড়াইল, বিভূতি তখন বিমলাকে বলিতেছিল "না, মা, আমি মামা বাড়ী যাবো না, তুমি আগে সেরে যাও, তখন বাবাকে বলো, এখানেই বেশ পড়া হবে আমার, দেখো তোমরা।" বিমলা কহিলেন "ছিঃ বাবা, অমন করতে আছে! আমার আর অসুখ কি? ভগবান যেমন রেখেছেন তেমনি আছি, তোমরা ওঁর মনে যেন কষ্ট দিও না, নাইবা পড়লে, মাষ্টারের কাছে!" "পড়তে ত চাইনা মা, কেবল দাদার জ্বালায়......" মানিক আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, যথেষ্ট ঝাঁঝের সঙ্গে বলিয়া উঠিল "ইস্! আমার জ্বালায়? আমি বুঝি তোকে খোসামোদ ক'রে বেড়াই? মাষ্টার মশাই যাই দয়া করে পড়ান তাই—" বিভূতি মুখ রাঙা করিয়া মুখ ফিরাইতেই মানিক চোখ মুছিতে মুছিতে পালাইয়া গেল! মাতা পুত্রের বেদনা বহ আলোচনা স্থগিত হইয়া গেল।

(৩)

মানিকের মায়ের অগাধ স্নেহ বাৎসল্যের মধ্যেও প্রকাণ্ড একটা দুর্ব্বলতা ছিল একটি যায়গায়, যেখানে তাঁর তপস্যার নিধি 'খোকার' স্থান। যদি কখনো খোকা তাঁর কোল হইতে কোনও ঝি চাকরের কোলে বেশী প্রীতিবোধ করিত, তাহা হইলেই তিনি জ্বলিয়া উঠিতেন। এমন কি এই নিমকহারামির দোষে 'বত্রিশ নাড়ী ছেঁড়া' ধন খোকাকেও কতবার চড়চাপড়টা খাইতে হইয়াছে। আর সে হতভাগা ঝি বা চাকরের অন্ন তো উঠিতই। মায়ের চেয়ে যে কেহ বড় হইয়া উঠিবেন ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এটা তাঁর জানা ছিল না যে মায়ের জন্য বিধাতা যে অচল অটল স্বতন্ত্র আসন রাখিয়াছেন সেটা মা ইচ্ছা করিলেই জোর করিয়া, টানিয়া, বুনিয়া বাড়াইতে পারেন না।

বিভূতি মামার বাড়ীই গিয়াছিল। আর সে মামার বাড়ী গিয়া অবধি মানিক আর বড় একটা ও বাড়ী যাইত না। এমনি করিয়া একটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সে দিন বৈকালে প্লে গ্রাউণ্ডে পরম উৎসাহে খেলিতে খেলিতে মানিক হঠাৎ তার র‍্যাকেট খানা হাতে করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, রাস্তা দিয়া বিভূতি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে, ব্যাপার কি? তার খেলায় সেদিন সেখানেই দাঁড়ি পড়িয়া গেল। সে বাড়ীপানে চলিল। পথে তার বাবার খানসামা তাহাকে জানাইয়া গেল যে মা ডাকিয়াছেন; সে বরাবর মায়ের কাছে গিয়া বলিল "কি বোলছো?" মা বলিলেন 'চারদিকে বড্ড অসুখ বিসুখ হচ্চে, কোথাও বড় একটা বেরুসনে যেন।' সে 'আচ্ছা' বলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াই দেখিল বিভূতিদের বাড়ী একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া; তাড়াতাড়ি গিয়া সে বিভূতির কাছে দাঁড়াইল, দেখিল তার মুখ একেবারে ব্যথায় কালো হইয়া উঠিয়াছে, অতিকষ্টেই সে চোখের জল চোখে চাপিয়া দাঁড়াইয়া আছে; আর তার কাকা বাবু কাঠের মত শক্ত হইয়া কেবল দাঁড়াইয়া আছেন; শুনিল কাকীমার অসুখ; বিভূতির হাত ধরিয়া টানিয়া সে বিমলার বিছানার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বিমলার কপালে দুঃখ জিনিষটাই লেখা ছিল, তাই যতক্ষণ না প্রাণটা একেবারেই ছাড়িয়া যায়, ততক্ষণ আর তাঁর নিস্তার নাই, মরণ কালেও, এক পাল কচি কচি শিশু, তাঁর তক্তপোষ ঘিরিয়া চেঁচামেচি জুড়িয়া দিয়াছিল। তারা সেদিন সারাদিন খায় নাই, তাই পেটের জ্বালায় ভাবিতেছিল চেঁচাইয়াই যদি মাকে উঠাইতে পারে। নিরুপায় মায়ের

চোখের জল চোখের নীচে যে কোটর হইয়াছিল তাহাতেই জমিতেছিল। বিমলা মানিককে দেখিয়া বড় তৃপ্তিই পাইলেন। তিনি তার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন "বাবা, তুমিই এদের বড় ভাই, এদের যখন মা থাকবে না—" মানিক রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল "আমার মাকে আমি দিয়ে দোব এদের;" বলিয়াই নিজের মাকে মনে করিয়া লজ্জিত হইল। সেত তার মাকে ভাল রকমই চিনিত। তিনি যে বিশ্বে তাঁর নিজের এই একটি ছেলে ছাড়া আর কিছুই চেনেন নি। বিভূতি বিমলার পায়ের কাছে বসিয়া ছিল, মানিক ও গিয়া সেখানেই বসিল। ঘর ভরা ঘুমন্ত শিশুগুলি যেখানেসেখানে লুটাইয়া পড়িল, মানিক একদৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। এই সারা দিনকার অভুক্ত শিশুগুলিকে দেখিয়া আর তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা জাগিল না, সে আর বাড়ী গেলনা। বাহিরে ঝম্ ঝম করিয়া বৃষ্টি নামিয়া অন্ধকার, রাত্রির ভীষণ মূর্ত্তি জমকালো করিয়া তুলিল। প্রমত্ত ঝড়ো হাওয়া, ঘরের জানালায় ঘা দিয়া দিয়া যাইতে লাগিল। ঘরের ভিতরকার স্তব্ধ হাহাকার যেন বাহিরে দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছিল। চাকরেরা ডাকিতে আসিয়া ফিরিয়া গেল, মানিক উঠিল না। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ যেমন চিরদিন শোক তাপহীন, অতি সুখ-পালিত হইলেও এই চরাচর বিশ্বজগতের দুঃখ পীড়িত, মৃত্যু, ব্যাধি, জরাগ্রস্ত মূর্ত্তির তাপ জ্বালা তাঁর প্রাণে ও গিয়া বাজিয়াছিল; রাজাধিরাজের অশেষ সতর্কতায়ও এ মূর্ত্তির প্রভাব রোধ করা যায় নাই; তা সামান্য গিন্নির সতর্কতা সত্বেও যে কিশোর মানিকের চোখ খুলিয়া যাইবে এ আর আশ্চর্য্য কি? ভোর বেলায় যখন, হতভাগা শিশুগুলার বুকফাটা আর্ত্তনাদের ভিতর দিয়া বিমলার শবদেহ বাহির হইয়া গেল, তারপর মানিক তার সেই মা-হারা ছোট ভাইদের সঙ্গে লইয়া নিজের মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তার সেই বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া, মা আর তখনই কিছু বলিতে পারিলেন না।

(৪)

অনেক গোলমাল সেই দুরন্ত একগুঁয়ে বালকের মাথার উপর দিয়া কাটিয়া গিয়া আপাততঃ দুদিন একটু থামিয়াছিল। তার মা ছিলেন, আদর, আবদার, সকল কিছুরই ঠাঁই ছিল। বিভূতির অনাদর মানিকেরও বাজে, তাতে সে আবার গোলমাল বাধাইয়া বসে, তাই বিভূতিরও যথা সম্ভব আদরযত্ন ছিল; কিন্তু বাকী অসহায় শিশুগুলা গিয়া পড়িল ঝি চাকরদের দলে। সকালবেলা তাহারা মুড়ী আর কাঁচা শশা খাইতেছিল। সময়টা খারাপ, চারদিকে খুব কলেরা হইতেছে বলিয়া মানিকের খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে অনেক ধরা কাটা চলিতেছিল। মানিক তাহাদের কহিল "ঐগুলো খেয়ে মরছিস্ কেন?" ছেলেরা সন্ত্রস্ত হইয়া হাত গুটাইয়া লইল। সে বলিল "কেন, তোরা খাবার খাসনি?" একটা ঝি বলিল "খাবারইত খাচ্চে বাপু, তুমি যে দিচ্চোনা খেতে—" মানিকের মা তখন ভাঁড়ার ঘরে বসিয়া পূজা করিতেছিলেন। মানিক গিয়া বলিল "মা, আমায় চাট্টি মুড়ী দাও তো।" মা বলিলেন "তুই মুড়ী কি করবি?" "খাবো।" "তুই তো এক্ষুণি খাবার খেলি, মুড়ী টুড়ি তোর সইবেনা, যা—" মানিক দৃঢ়স্বরে বলিল "না সয় বড়জোর মরণ হবে।" মা 'ষাট্ ষাট্' করিয়া উঠিলেন, বলিলেন "ওমা আমার সবেধন নীলমণি—" মানিক বাঁকিয়া দাঁড়াইল "মা, এই সবে ধন নীলমণি না ম'র্লে তো তুমি বুঝতে পারবেনা যে তোমার এই মণিই কেবল মানুষ নয়, ওরা ও মানুষ, ওরা ও তোমার ছেলে; সে সব শুনছিনে, তুমি দাও আমায় মুড়ী। ওদের দিতে পার, আর আমার পারো না?" একটা ছেলের বাটি কাড়িয়া মানিক মুড়ী খাইতে বসিল। মা ত্যক্ত হইয়া বলিলেন "করগে যা বাপু, যা তোর খুসী" মানিক মুখ খিঁচাইয়া বলিল "ম'রবো ই তো!" "তার এ ঔদ্ধত্যের কথাটা বিনোদ বাবুর কানে উঠিলে বড় সুবিধার হইত না, কিন্তু কথাটা গিন্নিই চাপিয়া গেলেন। কর্ত্তা বাড়ীর ভিতরকার

খবর বড় রাখিতেন না। যাই হউক; এই মুড়ী আর কাঁচাশশা মানিক হজম করিতে পারিলনা। মুড়ী জিনিষটা এমন কিছু বিষ নয় যে হজমের ব্যাঘাত হইবে. যে বালকগুলি খাইতেছিল তারা রোজই খায় এবং নির্ব্বিঘ্নে হজম করে. কিন্তু একেবারে অনভ্যস্ত বলিয়াই হউক, অথবা দৈব প্রতিকূল বলিয়াই হউক, মানিক বাড়ীশুদ্ধ সকলকার ত্রাস লাগাইয়া দিল। মায়ের ভয় দেখিয়া প্রথমটা তার মুখে বেশ কঠোর একটু বিজয় আনন্দ ফুটিয়াছিল কিন্তু ক্রমশঃ সে মায়ের বুকের উপরই এলাইয়া পড়িতে লাগিল। দর্পিতা, অহঙ্কারের মূর্ত্ত ছবি, গিন্নি তখন দীনাদপি দীনা কাঙ্গালের মত তেত্রিশ কোটী দেবতার কাছে এই ভুলের ক্ষমায় বুকের বাছা ফিরাইয়া দিবার প্রার্থনা করিতেছিলেন। অপরাধীর মত কুণ্ঠাম্লান বিভূতি সমস্ত ভাইগুলি লইয়া তার পাশে হাঁটু পাতিয়া বসিয়াছিল। তার তখন প্রতি মুহূর্ত্তকে যুগান্ত বলিয়া মনে হইতেছিল। মানিক প্রবল প্রলাপে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া রক্ত জবার মত চোখ মেলিয়া বলিতেছিল "আমার মা, সবাইকার মা, জানিস্ বিভূতি? হাঁ মা তাই না? তুমি সব্বাইকার মা নও?" গিন্নি তখন তাঁর বড় উঁচু মাথা মাটিতে কুটিতে কুটিতে কাঁদিয়া বলিলেন "ওরে বাপ্‌রে তুই আমার কোল জোড়া হয়ে থাক্, আমার মা ডাক বজায় থাক্"—মায়ের এ রোদনে বিধাতার উদাত্ত বজ্র টলিল না। মায়ের বুকের ক্ষীর সাগর দলিয়া, পিষিয়া সেখানকার কোহিনূরটুকু জ্বালাইয়া দিয়া গেল। দুই চক্ষে হাসি ভরিয়া বাছা তাঁর বিশ্ব মায়ের কোলে ঘুমাইয়া পড়িল। হায় সর্ব্বব্যাপী মহাশিক্ষক!

মূর্চ্ছিতা গৃহিণী, যখন চাহিলেন, তখন এ পৃথিবীর কোন ও খানেই সে মানিক ধন তাঁর আর নাই. বিশ্ব ভুবন শূন্যময়, শূন্য মায়ের বুক হা—হা করিয়া কাঁদিতেছে, সহসা দেখিলেন আশে পাশে তাঁর পাঁচ সাতটি অভুক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে! আর তো এদের সে নাই কে খাওয়াইবে? দুই হাত বাড়াইয়া গিন্নি তাঁর শূন্য বুকে মা-হারা সেই কচি ছেলেটাকে টানিয়া লইলেন। এ বিশ্ব সংসারের যে রাজা তাঁর আইনে বুঝি এই হওয়ারই দরকার ছিল!

শ্রীনীহারবালা দেবী।

ধরা।

—:*:—

বিশালা বিপুলা বিস্ময়ময়ী সুন্দরী তুমি ধরা।
ছন্দে ছন্দে অঙ্গে তোমার সলিল নাচিয়া ছুটে;
তৃণ-পুলকিত বক্ষ তোমার আবেগে উছসি উঠে
চিরকাল ধরি সুন্দর তুমি বিমল মাধুরী ভরা।

শ্রীগনেশচন্দ্র রায়।

সাজি

রূপের চর্চ্চা।

মুখের রং যদি ফর্সা রাখ্‌তে চান্ তবে একটা উপায় বলে দিই। ত্রিশ গ্রেণ সালফারেটেড পটাস, ত্রিশ গ্রেণ জিঙ্ক সালফেট, দু' আউন্স গোলাপ জলে মিশিয়ে স্নানের পর প্রত্যহ মুখে মাখ্‌লে মুখের রং পরিষ্কার হয়।

আর একটি ব্যবস্থা একটি বিলাতি কাগজের সম্পাদক দিয়েছেন যে রোদে ফর্সা মুখের রং পুড়ে কালো হয়ে যায় তাই মাথায় ধর নীল রংএর ছাতা আর মুখে লাল কাপড়ের ঘোমটা।

আবার যদি বর্দ্ধিত লোমকূপের জন্যে মুখের রং কালো হয়ে যায় তার এক ঔষধ হচ্ছে গরম জলে এক চামচ সোহাগা মিশিয়ে নিয়মিতভাবে প্রতিদিন মুখ ধোয়া, পুরাণ রং আবার ফিরে আস্‌বে।

অনেকে মুখের ফাটার জন্যে গ্লিসারিণ ব্যবহার করেন কিন্তু সকলের চামড়ায় গ্লিসারিণ সমান ফল দেয় না। অনেকের গায়ে আবার এতে যেখানে সেখানে চুল বেরয়। অতএব এবার থেকে সাবধান!

কিন্তু এই যে সব রোদের তাতের জন্যে রং খারাপ হবার কথা বল্‌লুম কালো চামড়ায় এর ভয় নেই। ফর্সা রং যেমন এই রোদের তাতে পুড়ে যায় কালো লোকের সে বালাই নেই, রোদের তাপকে কালো রং শুষে নিয়ে চামড়ার তলায় রেখে দেয়।

তারপর শরীরের কথা না ভেবেই আমরা আমাদের মনের প্রবৃত্তি চালনা করি কিন্তু তার ফল শুন্‌বেন? রাগ ত খবর্দ্দার কর্‌তে নেই! এ কথাটি একেবারে খাঁটি জানা গেছে যে রাগের দ্বারা মানুষের আয়ু কমে যায়। রাগ মানুষের স্নায়ুযন্ত্রকে বিগড়ে দেয়, তার ফলে জীবনীশক্তি দুর্ব্বল হয়ে পড়ে; তাই রাগের পরে এমন শ্রান্তি আসে।

অলস লোকেদের জন্যে একটি নূতন খবর দেওয়া যাচ্ছে যা নিশ্চয়ই তাদের শ্রুতিসুখকর হবে না। এটাও প্রমাণিত সত্য হয়ে গেছে যে মাথা খাটিয়ে যারা কাজ কর্‌তে জানে তারাই বেশী দিন বাঁচে আর যতদিন বাঁচে ততদিন যৌবন রাখতে পারে। বুদ্ধি-বৃত্তি না খাটালে চোখের জ্যোতি মরে যায় তাইতে মানুষকে বুড়ার মত দেখায়। উল্টা কথা বটে!

নরচরিত্র নিয়ে যাঁরা খাঁটাখাঁটি করেন তাঁরা বলেন নাদুসনুদুস্ মোটা লোকেরা প্রায়ই কোন হীন অসৎকাজ করে না। অতএব রোগা হবার সৌখিন ইচ্ছা সকলের ত্যাগ করা উচিত।

ঘরকন্নার কথা।

আমরা জন্মাবধি দুধ খেয়ে জীবন ধারণ করি, রোগে ভোগে দুধ খেয়ে প্রাণ বাঁচাই বটে কিন্তু দুধের আসল তথ্য খুব অল্পই জানি। গরুর বাঁট থেকে এক রকম জীবাণু দুধের সঙ্গে মিশে যায়, প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় তাদের দশ লক্ষ করে বংশ বৃদ্ধি হয়। এই জীবাণু দুধ নষ্ট করে দেয়। খুব ভাল করে রেখেও দেখা গেছে একটি ছোট চামচে ভরা দুধে এই জীবাণু আছে ষাট লক্ষ। এর মাঝে কতকগুলি ইষ্ট এবং কতকগুলি অনিষ্টকারী; সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে নষ্ট দুধ আর মাখন থেকে হাতির দাঁতের মত এক রকম জিনিষ তৈরী হয়. তা দিয়ে ছাতার বাঁট, চিরুণী, সিগার আর সিগারেটের পাইপ, বোতাম ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে। আবার দুধ সম্বন্ধে আরো অনুসন্ধান করবার জন্যে নয় লক্ষ টাকা খরচ করে একটি দুগ্ধ-গবেষণা মন্দির স্থাপিত হয়েছে।

চা খোরেদের উপযোগী খবর বটে! লেবুর শুথ্‌নো খোসা চায়ের পেয়ালায় রেখে দিলে চায়ের গন্ধ অত্যন্ত চমৎকার হবে।

লেবু কাট্‌বার আগে একবার গরম জলে ধুয়ে নেওয়া ভাল কারণ খোসার উপরে যে কালো দাগগুলি দেখা যায় তা প্রায়ই কীট পতঙ্গের ডিম ও বাসা।

টিনের জিনিষ যদি আবার নূতনের মতন ঝকঝকে চকচকে করতে চান তবে আগে ফুটন্ত সোডার জলে ডুবিয়ে তুলে কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে তা ঘষ্‌তে থাকুন তারপর একটি পাত্‌লা কাপড় দিয়ে তা মুছে নিলেই আবার যেমন কার তেমন হবে।

চস্‌মার কাঁচ পরিষ্কার করবার এমন উপায় আর নেই। এক এক ফোঁটা করে Benzine দিয়ে পরিষ্কার কাপড়ের দ্বারা ঘসে নিলেই হল।

মস্‌লা।

মুক্তর কদর যাঁরা বোঝেন তাঁরা বলেন গোল মুক্তই সব চেয়ে বেশী দামী, তারপর দ্বিতীয় হচ্ছে পেয়ার ফলের আকারের মুক্ত, ডিমের আকারের মুক্ত তৃতীয়।

রোমের পোপের প্রাসাদে একটি পুস্তকালয় আছে এখানে যত বেশী পুরাণ পুঁথি আছে এমন পৃথিবীর কোথাও না। ত্রিশ হাজার পুরাণ পাণ্ডুলিপি, দু'হাজার পাঁচশো পঞ্চদশ শতাব্দীতে ছাপান বই, আর তা ছাড়া সব বইয়ের সংখ্যা আছে দু'লক্ষ কুড়ি হাজার!

আমরা বর্ষাকালের বৃষ্টিতেই পাগল হয়ে উঠি, কিন্তু চেরাপুঞ্জীর মত এমন বৃষ্টি কোথাও হয় না। গড়পড়তায় বছরে সেখানে বৃষ্টি হয় ৬০০ ইঞ্চি; অর্থাৎ হপ্তায় এক ফুট!

শীতের দেশেই নাকি যমক সন্তানের জন্ম বেশী হয়। আবার পঁচিশ থেকে ত্রিশের মাঝেই যমক সন্তান বেশী জন্মায়।

পৃথিবীতে কোন্ কোন্ প্রধান জাতির লোকের কিসে অভিরুচি তা জান্‌বার কৌতুহল যদি কারুর হয়ে থাকে তবে এখানে একটু চোখ বুলিয়ে দেখ্‌বেন। অষ্ট্রেলিয়ান ভালবাসে চা, ইংরাজ ভালবাসে মাংস দিনেমার বাসে ধূমপান আর আমেরিকান বাসে লবণাক্ত আচার!

আমরা দিন দিন গয়লার দুধ খেয়ে মনে করছি গরুগুলি আজকাল দুধ দেয়, না জল দেয়? কিন্তু দুধের হিসাব শুনবেন একবার? বিলাতের ডিভন সায়ারের গয়লারা দেশকে ৩০০০০০০ গ্যালন অর্থাৎ এক কোটি পাঁচসের পরিমাণ দুধের যোগান দেয়!

প্রতিধ্বনি আবার সন্ধ্যাবেলায় জোরাল শুনায়। বাতাস শান্ত থাকে বলে এক এক সময়ে একটি প্রতিধ্বনির কুড়িটি পর্য্যন্ত ধাক্কা শোনা যায়!

পকেট ঘড়ি বল্‌তে আমরা এখন যা বুঝি আগেকার দিনে তেমন ছিল না। সম্রাট পঞ্চম চার্লসের একটি এমনি ঘড়ি ওজনে ছিল সাড়ে তের সের! বাস্‌রে বাস্, তবে বোধহয় তখনকার দিনে লোহার পকেট তৈরী হ'ত!

রং বেরংএর প্রভাব যে মানুষের মনে কত প্রবল তা এই ঘটনা থেকে বোঝা যাবে, যে বিলাতের লর্ড রোজবেরি শ্রোতাদের কাউকে পাটকিলে রংএর পোষাক পরতে দেখ্‌লে আর বক্তৃতা করতে পারেন না।

চিকিৎসকগণ কোন রোগে কত মরেন?—চিকিৎসকগণের শতকরা ৪০ জন হৃদ্‌রোগে, ২০ জন স্নায়বিক রোগে, ২০ জন মরফিয়ার বিষে, ৭ জন যক্ষ্মা রোগে মারা যান।

ফিজি দ্বীপের ভারতবাসীর লাঞ্ছনার অবসান।

ফিজি দ্বীপে ভারতবাসী কিরূপ নির্ম্মমভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত, অধঃপাতিত হইয়াছে, এই সাম্য-নীতি উদ্ভাসিত বিংশ শতাব্দীতে যে কি করিয়া মানুষ—মানুষ হইয়া মানুষের প্রতি এরূপ অমানুষিক ব্যবহার নির্ব্বিবাদে করিতে পারিয়াছে, আশ্চর্য্যের কথা! ইউরোপীয় জাতীর কলঙ্ক ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গ বণিক অর্থমোহে অন্ধ হইয়া অধিকাংশ উপনিবেশে যে নারকীয় অভিনয় করিয়া স্বজাতী স্বদেশ ও মনুষ্যের নামে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াছে তাহার জন্য সমগ্র সভ্যজাতীকে অধঃমুখ হইতে হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়াবাসী, বিশেষতঃ তথাকার সহৃদয়া নারী-সমাজ সে অত্যাচার কাহিনী শ্রবণে লজ্জা ঘৃণায় উন্মত্ত প্রায় হইয়া তৎপ্রতিকারে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন; মহাত্মা এণ্ড্রুজ মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা পরিচারিকায় একাধিক বার আলোচিত হইয়াছে।

এত দিনে বুঝি ফিজিদ্বীপবাসী ভারতীয় নরনারীর সে দুর্গতির অবসান হইতে চলিল ; অন্ততঃ যাহাতে ভারতবাসী ফিজিতে মানুষের মত ব্যবহার প্রাপ্ত হয়—তাহার বিধিব্যবস্থা ভারতগবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন।

ভারত-সচিব প্রকাশ করিয়াছেন যে ইংলণ্ডের উপনিবেশ-মন্ত্রী-ফিজি গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে মিঃ সি. এফ. এণ্ড্রুজ প্রস্তাবিত সংস্কার যে সকল বণিক এখনও প্রবর্ত্তন করেন নাই, তাঁহাদের অধীন ভারতীয় শ্রমজীবিগণ ১৯২০ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে সর্ব্বপ্রকার চুক্তি মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিবে।

১। ভারতীয় কুলিগণকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইলে প্রত্যেক কারখানায় কুলিদের বাসস্থান এমন ভাবে নির্ম্মাণ করিতে হইবে যে বিবাহিত কুলিগণ প্রত্যেকে স্বতন্ত্র বাড়ীতে পরিবার লইয়া সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া বাস করিতে পারে।

২। প্রত্যেক কারখানা সংসৃষ্ট হাসপাতালের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন স্ত্রীলোক রাখিতে হইবে। তত্ত্বাবধায়িকার সেই হাসপাতালেই বাস করিতে হইবে।

৩। ভারতীয় নারীগণ যখন মাঠে কাজ করিতে যায়, তখন তাহাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য কোন অবিবাহিত পুরুষকে নিযুক্ত করা হইবে না।

৪। যে সকল হাসপাতালে নারী তত্ত্বাবধায়িকা নাই, তথায় কোন অবিবাহিত যুবক ডাক্তারকে রাখা যাইবে না।

মিঃ এণ্ড্রুজের আর একটী নির্দ্ধারণ ইহাই ছিল যে, যে সকল স্থলে উপরি উক্ত নিয়মানুসারে কার্য্য হইবে তথাকার-ভারতীয় কুলিগণ যদি চুক্তি মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইতে চায়, তবে তাহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। উপনিবেশ-মন্ত্রী বলিয়াছেন, ভারতগবর্ণমেণ্ট যদি ইংরেজ মুনিবদের ক্ষতি পূরণ করিতে সম্মত হন, তবে তাহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে।

ভারতগবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাম করিয়া জানিতে চাহিয়াছিলেন ১লা জানুয়ারী তারিখে ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ কুলিদিগকে স্বাধীন করিতে হইলে কত টাকা দিতে হইবে। অদ্যাপি সে প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। ভারত-বাসীরা বিদেশে যাইয়া অর্থোপার্জ্জন করুক, ইহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু ইহার কুফল এই যে কুলিদিগকে দেখিয়া বিদেশী লোকরা মনে করে, ভারতের সমস্ত লোকই কুলি ব্যতীত আর কিছু নহে। উপনিবেশবাসীদের মনে ঐ ধারণা দৃঢ় হওয়াতে তাহারা ভারতবাসীকে ঘৃণা ও উপেক্ষা করিয়া থাকে। কাজেই বিদেশে কুলি প্রেরণ করা বন্ধ করাই উচিত। অর্থোপার্জ্জনের জন্য ভারতের কোন কুলির বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। ভারতের কলকারখানা ও কৃষি শিল্পের জন্য যত লোকের প্রয়োজন তাহা পাওয়া যাইতেছে না। ভারতের কুলি স্বদেশে থাকিয়াই জীবিকার্জ্জন করিতে পারে, অতএব কুলি চালান বন্ধ করাই কর্ত্তব্য।

নারীজাতীর অধিকার।—গত ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে নারীগণ উকীল ব্যারিষ্টার হইতে পারিবেন, এইরূপ এক আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। রাজা জর্জ্জ সেই আইনে সম্মতি দিয়াছেন।

নারীগণ উকীল ব্যারিষ্টার হইবার অধিকার পাইয়াছেন, নারীগণ জজ ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইতেছেন। যাহারা আপনাদিগকে হীন করিয়া রাখিয়াছিল, নবযুগে কেহ আর নারীকে ছোট মনে করিতে পারিবে না।

সঞ্জীবনী।

শিশুর মৃত্যু ।

—:*:—

পুনঃ পুনঃ একই কথা আলোচিত হইতেছে, তবু কাহারও চৈতন্য হইতেছে না। মূর্খের চৈতন্য না হইবারই কথা কিন্তু শিক্ষিত লোকেরও যে চৈতন্য হইতেছে না, ইহা অতি পরিতাপের কথা। এদেশে চিন্তার সহিত কার্য্যের সহিত মহা বিচ্ছেদ হওয়াতে লোকে যাহা ভাল মনে করে, তাহা কাজের বেলা করে না, তাই শিশুর মৃত্যুর হ্রাস হইতেছে না। ১৯১৮ সালে ১বৎসরের কম বয়স্ক শিশু কোন্ জেলায় কত মারা গিয়াছে, তাহার তালিকা প্রকাশ করিতেছি, সকলে তাহা পাঠ করুন এবং শিশু হত্যা নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হউন।

জেলা	বালক	বালিকা
বর্দ্ধমান	৭২৮৮	৬৩৯২
বীরভূম	৫:৫১	৪-৯৩
বাঁকুড়া	৫২২৯	৪৭৮০
মেদিনীপুর	৯৪২৪	৮৯৪০
হুগলী	৪০৭৯	৩৪৫৭
হাওড়া	৩১৮৬	২৮৮৭
২৪পরগণা	৬৬:৩	৫৬০৩
কলিকাতা	২৮.২	২২০৪
নদীয়া	৭৩৮৪	৭৩৪৭
মুর্শিদাবাদ	৭৩৫৪	৬৮৬২
যশোহর	৪৫২৪	৪১১২
খুলনা	৬৪৯৪	৫৬৪৪
রাজসাহী	৬৪৬৫	৫৮১২
দিনাজপুর	৮৩:২	৬৮০৭
জলপাইগুড়ি	৪২১৯	৩৭১৯
দারজ্জিলিং	১২৪৩	৯২৭
রঙ্গপুর	১১:৯২	৯৪৫৮
বগুড়া	৩৫৯৮	২৯৯২
পাবনা	৪৬১৫	৪০৩৭
মালদহ	৩৬৬৯	৩৪৮৩
ঢাকা	১২২৭৮	১০৩০৬
ময়মনসিংহ	১৭০৩৩	১৪৭১১
ফরিদপুর	৮৪৪৪	৭:০২
বাখরগঞ্জ	১১৭০২	৯৫৪৬
চট্টগ্রাম	৫৪৯৯	৪৭৮৮
নোয়াখালি	৫১৩০	৪৭৪৩
ত্রিপুরা	৮৫৮০	৬৯৯৯
	১,৮১,৫৪৭	১,৫৮,১০২

লোকসংখ্যা গণনানুসারে ১বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর মধ্যে ঐ ২৭ জেলায় বালবালিকার সংখ্যা ৭,১৯,৪৭৯। সুতরাং ১৯১৮ সালে ১বৎসরের বালকদের মধ্যে হাজারকরা ৩৩৫৪ জন ও বালিকা

২২০৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। অর্থাৎ বাঙ্গলাদেশে যত শিশু জন্মে তাহার ৪জনের মধ্যে ১জন একবৎসর বয়স না হইতেই মারা গিয়াছে।

আতুরে যে সকল শিশুর মৃত্যু হয়, তাহার কারণ ভাবিলে বাঙ্গালীকে কত ধিক্কার দিতে হয়। ১৯১৮ সালে ১৪,৮৯,১৩৫ শিশুর জন্ম হইয়াছিল, তন্মধ্যে বালক ৭৭১৩১৩ ও বালিকা ৭৭১৮২২। বঙ্গদেশে বালিকা অপেক্ষা বালক জন্মে বেশী।

১৯১৮ সালে ১৪৮৯,১৩৫ শিশুর মধ্যে ৩,৩৯,৭৪৯ জনের শৈশবেই মৃত্যু হইয়াছে। অর্থাৎ ১০০ জনের মধ্যে ২২৮ জন মারা গিয়াছে। ৭,৭১,৩১৩ বালক জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে ১,৮১,৫৪৭ মারা গিয়াছে। ৭১৭,৮২২ বালিকা জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে ১,৫৮,১০২ জন মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে।

পশ্চিম বাঙ্গলাতেই শিশুর মৃত্যু অতি বেশী হইতেছে। বর্ত্তমানে শতকরা ৩০.৭, বীরভূমে ৩০.১, নদিয়ায় ২৯.৬, ও মুর্শিদাবাদে ২৮.৩, এবং কলিকাতায় ২৮.১ জন শিশুর মৃত্যু হইয়াছে, দরিদ্রতা, মূর্খতা, কুসংস্কার, বাল্য-বিবাহ ও শিক্ষিতা ধাত্রীর অভাব হেতু প্রতি বৎসর ১৪।১৫ লক্ষ শিশুর মৃত্যু হইতেছে। অস্বাস্থ্যকর অযোগ্য আতুর ঘর শিশু মৃত্যুর আর এক প্রধান কারণ। ইহা জানিয়াও শিক্ষিত লোকেরাও পশুর বাসের অযোগ্য স্থানে প্রসূতির বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া থাকেন। এই মহা কলঙ্কের কথা স্মরণ করিলেও হৃদয় দুঃখে ও লজ্জায় অভিভূত হয়।

গবর্ণমেণ্ট শিশু হত্যা নিবারণের জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু সভ্যতাশালী আমরা কি করিতেছি।

সঞ্জীবনী।

কচি ছেলেদের খাবার।

দিনকালের এমনই মহিমা, যে কচি ছেলেদের খাবার কি হওয়া উচিত, আর কি হওয়া উচিত নয়, এই কথার আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ, মায়েদের স্তনে দুগ্ধের এমনই অভাব হইয়াছে যে, এখন সেই অভাব কি করিয়া দূর করা যায়, সেইটাই ভাবনার কথা হইয়া পড়িয়াছে। এখনো অনেক বালক জন্মে, যাহারা মাতৃস্তন্য ছাড়িয়াই ভাত ধরে—গো-দুধ, গর্দ্দভী-দুধ বা বিলাতি ফুড খাইবার দুর্ভাগ্য যাহাদের হয় না।

পশ্চিমবাসিনী হিন্দুস্থানী রমণীদের ও বাঙ্গলার পল্লীবাসিনী রমণীদের স্তনে এখনো দুধ যথেষ্ট আছে—নাই কেবল সহরবাসিনী অন্তঃপুরচারিণীদের। যাঁহারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারেন এবং ভগবানের উন্মুক্ত আকাশ ও বাতাস উপভোগ করিতে পান, যাঁহাদিগের শারীরিক পরিশ্রম যথেষ্ট হয় এবং মাতৃত্বের গৌরব যাঁহাদিগের হৃদয় জুড়িয়া আছে, তাঁহাদিগের স্তনে দুগ্ধের অভাব হয় না। সহরের ষোলআনা কৃত্রিমতার মধ্যে বাস করিয়া, নিত্য বাসি খাদ্য খাইয়া, রুদ্ধ স্থানের দূষিত বায়ু সেবন করিয়া, অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ ও নিত্য কোষ্ঠাশুদ্ধি ভোগ করিয়া সহরের রমণীরা যেন বিষদিগ্ধ জীবন যাপন করেন—সহরের রমণীরা আওতায় বাঁচিয়া থাকেন মাত্র। সে দেহে স্বাস্থ্যের লক্ষণ কোথা হইতে হইবে? গড়ের মাঠে বা পর্দ্দাপার্কে হাওয়া খাওয়া সকলের ভাগ্যে না ঘটিলেও নিজ নিজ বাড়ীর ছাদে রীতিমত ভাবে হাওয়া খাওয়া, এবং তদপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, অর্থাৎ ঘরের মধ্যে সদাসর্ব্বদাই হাওয়া খেলিতে দেওয়া, বিশেষতঃ রাত্রিতে,—এরূপ করার আবশ্যকতাই তাঁহাদিগকে বোঝান ভার। তাঁহারা "হাড়ি-হেঁসেল" নতুবা "নাটক-নভেল" মসগুল; তাঁহারা হয় গাড়ী মুদিয়া হাওয়া খান, নতুবা রান্নাঘরের কয়লার ধোঁয়া খান।

আজ মাতৃ স্তন্যের অভাব হওয়ায়, জন্ম হইতেই শিশুকে গো দুগ্ধ, গর্দ্দভী দুগ্ধ, ছাগী দুগ্ধ, বিলাতি টিনে করা গাঢ় দুগ্ধ বা ফুড খাওয়াইয়া জীবিত রাখিতে হইতেছে। এই সকলগুলির সম্বন্ধে দুই চারিটি প্রয়োজনীয় কথা এখানে বলিব।

গর্দ্দভী দুগ্ধ অত্যন্ত পাতলা বা নিরেস; কাজেই, যাহাদের অন্য কোনও রকম দুধ পরিপাক হয় না, সেই শিশুগণকে কিছুদিনের জন্য গর্দ্দভী দুগ্ধ খাওয়াইয়া রাখা হয়। বরাবর (অর্থাৎ ছয় বা আট মাস কাল বয়স পর্য্যন্ত, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত শিশুর দন্তোদ্গম না হয়) গর্দ্দভী দুগ্ধ পান করাইয়া শিশুকে মানুষ করিতে হইলে সে শিশু মানুষ ছাড়া আর কিছু হইয়া উঠে—দুর্ব্বল, অন্তঃসারশূন্য, রুগ্ন বা রোগ-প্রবণ।

ছাগী দুগ্ধের গুণ অনেক। ছাগী দুগ্ধে স্নেহাংশ কিছু কম থাকিলেও, ইহা পুষ্টিকর। গোদুগ্ধের ন্যায়, পেটে যাইয়া, ইহা বড় বড় দলার আকার ধারণ করে না—কাজেই উহা সুপাচ্য না হইলেও, দুষ্পাচ্য নহে। সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধার কথা এই যে, ছাগীকে গৃহে পালন করা যায়, ছাগীর আহারের বন্দোবস্ত গৃহস্থ নিজের হাতে করিতে পারেন এবং ছাগীর স্বাস্থ্যের জন্য যাহ যাহা করা প্রয়োজন, সে সকলই স্বল্প ব্যয়ে গৃহস্থ দ্বারা সাধিত হইতে পারে। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ছাগীর খাদ্য ও স্বাস্থ্যের উপরে দুগ্ধের দোষ গুণ ষোল আনা নির্ভর করে। যেমন ভাল খাবার, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, শারীরিক ব্যায়াম বা ঘরের কোণে মলমূত্র মাখিয়া ছাগী প্রভৃতি অপর গৃহপালিত জীবের পক্ষেও সেই ব্যবস্থা। দিবারাত স্যাঁত-সেঁতে যায়গায় বা ঘরের কোণে মলমূত্র মাখিয়া ছাগী বা গরুকে রাখিলে, তাহাদের শরীর ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাদের ক্ষয়কাশ ব্যারাম হইতে পারে। সুখের বিষয় এই যে, যেমন অতি সহজেই গরুর ক্ষয়কাশ ব্যারাম ধরে, ছাগীর ক্ষয়কাশ এক রকম হয় না বলিলেই হয়—এই হিসাবে ছাগী দুগ্ধ পান করা আরো নিরাপদ। কিন্তু ক্ষয়কাশ না হইলেও ছাগীর অপর সকল ব্যারামই হয়—সেই রুগ্ন ছাগীর দুগ্ধ পান করিয়া শিশুরও স্বাস্থ্য মন্দ হয়। ফল কথা, গৃহে ছাগী বা গরু পুষিলে, মাতৃজ্ঞানে গৃহিণী বা গৃহস্বামী তাহার যথেষ্ট ও যথার্থ সেবা না করিতে পারিলে, সে ছাগী বা গো দুগ্ধ পান করায় কুফল ফলিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

গো দুগ্ধই বঙ্গদেশে প্রচলিত দুগ্ধ। কিন্তু, আজ গোজাতির যেরূপ অধঃপতন হইয়াছে, গো সেবার ও গোচারণ মাঠের যেরূপ অভাব হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে গো হত্যার যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, বৃষোৎসর্গের যে হারে লোপ ঘটিতেছে—তাহাতে গো দুগ্ধ ভাল থাকে কেমন করিয়া? গরুর সেবা করিব না, গোজাতির উন্নতি সাধন করিব না, যাবতীয় উৎকৃষ্ট বৃষকে সরকারী ময়লা গাড়ীতে যুড়িয়া দিব—অথচ "বিশুদ্ধ গো দুগ্ধ চাই" বলিয়া আকাশ ফাটাইয়া দিব—এ বিসদৃশ দৃশ্য এই দুর্ভাগা বঙ্গদেশেই দেখা যায়। একদিকে বিলাতী শিক্ষার মোহে মুগ্ধ হইয়া গো জাতিকে নির্ম্মূল হইতে দিতেছি, অপর দিকে "দাঁতের টানে" দুগ্ধের জন্য হাহাকার করিতেছি! সাংখ্যের পুরুষের মত দেশের সকল ব্যবসায় সকল ব্যবস্থাই লুপ্ত হইতে দিতেছি, আজ তাই দেশের অবস্থা এই। যে সকল গোয়ালা গোদুগ্ধ বিক্রয় করে, তাহাদিগের হৃদয় নাই, তাহাদিগের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই; কাজেই সুস্থ বা রুগ্ন, সকল প্রকার গাভীরই দুধ, ফুঁকা দেওয়া দুধ, মাটা তোলা ও বাসি দুধ—যে সে পুকুরের জল, বাতাসা, খড়ি প্রভৃতি মিশ্রিত হইয়া গৃহস্থের গৃহে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে! আর আমরা সেই দুগ্ধ পান করিয়া নানা রকমের উদরের পীড়ায় ভুগিতেছি। সুধুই কি তাই? এই দুগ্ধের সঙ্গে সাগু, বালি, শঠির পালো বা জল না মিশাইলে, আমাদের শিশুরা উহা পরিপাক করিতে পারে না! অশ্বত্থামার পিটুলগোলা যে ইহা অপেক্ষা সুস্বাদু ও পুষ্টিকর! যদি গৃহে গো-পালন করিয়া, স্বয়ং সেই গরুর যথার্থ সেবা করিয়া, গো-দুগ্ধ নিজ নিজ শিশুকে একটু সাইট্রেট অব সোডা (আউন্স পিছু ২ গ্রেণ হিসাবে) সংযোগে খাওয়ান, তাহার এক ফল; আর বাজারে যে সে তথাকথিত গোদুগ্ধে সাগু মিশাইয়া খাওয়ানর স্বতন্ত্র ফল কাঁচা দুগ্ধ সেবনের ব্যবস্থা এ দেশে নাই—কিন্তু কাঁচা দুগ্ধই পরম উপকারী। যদি যথেষ্ট সাবধানতা সহকারে গরুর পালন পারিষ্কার করিয়া স্বহস্তে দুগ্ধ দোহন করিয়া কাঁচা, টাটকা দুগ্ধ সেবন করান যায়, তাহা হইলে সেটি পরম উপকারী হইয়া থাকে।

দুগ্ধের দিক ছাড়িয়া দিলে, সাগু, বালি, শঠির পালো প্রভৃতির ব্যবহারের কথা আসিয়া পড়ে। কিন্তু শুধু সাগু, বালি খাওয়াই, ছেলেদের জীবিত রাখা সম্ভবপর নয়। কাজেই, সুধু সাগু বালি খাওয়ানর কথা বলিয়া লাভ নাই। সুধু এই টুকুই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, যে শিশুর উদরে খাঁটি বা জল মিশ্রিত গোদুগ্ধ সহ্য হয় না, তাহার পক্ষে, দুধের সঙ্গে বালি প্রভৃতি মিশাইলে দুগ্ধ সহজ-পাচ্য হয়। সুধু খানিকটা জলের পরিবর্ত্তে, সাগু প্রভৃতি মিশাইলে, দুগ্ধ পরিপাকে সহায়তা করে, দুগ্ধের পুষ্টির মাত্রা কিছু বাড়িয়া যায়। কিন্তু, দুধে জল বা সাগু না মিশাইয়া, সুধু সাইট্রেট অব সোডা মিশাইলে, ফল আরো ভাল হয়।

বর্ত্তমান কালে, বিলাতী আমদানী দুগ্ধ বা ফুড্ খাওয়ানের প্রথা খুব বেশী বাড়িয়া চলিতেছে। এ বৃদ্ধির কারণ তিনটি; প্রথমতঃ সকল চিকিৎসক দূরদর্শী ও চিন্তাশীল নহেন; চিকিৎসকের পক্ষে সেটা অত্যন্ত অগৌরবের কথা। কোন ফুডে কি আছে, কি না আছে, আহার জ্ঞান না লইয়া, বিবেচনাহীন মূঢ়ের মত অনেক চিকিৎসক নিঃসঙ্কোচে ফুড খাওয়াবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, এই দুর্ভাগ্য, রোগ ও জরা-

রোগপীড়িত দেশে, রোগের ও জরার অনুপাতে, যাহারা কখনো কোনরূপ চিকিৎসা শাস্ত্রানুশীলন করে নাই এমন উপদেষ্টা, হিতার্থী ও চিকিৎসা-বিদ্যা দৃপ্ত লোকের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী ; সেই সকল "সবজান্তা" লোকের অযাচিত পরামর্শ-বাহুল্যে ফুড প্রচলন-বহুলতা ঘটিয়াছে। তৃতীয়তঃ, বিলাতী বিজ্ঞাপনের চটকেই অনেক গৃহস্থ মুগ্ধ হইয়া পড়েন। এই সকল কারণে ফুডের মাত্রা মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিলাতী যত রকমের দুগ্ধ আসে, তাহারা চারি প্রকারের ; প্রথমতঃ, এক দফা চিনি মিশ্রিত, আর এক দফা চিনি মিশ্রিত নহে ; দ্বিতীয়তঃ এক দফা মাটা তোলা, আর এক দফা মাটাতোলা নহে। সাধারণতঃ, এমন কি এদেশের শিক্ষিত লোকেরাও একথা সকলে জানেন, কি ? তাঁহারা বিলাতী দুধ ত বিলাতী দুধই জানেন, তাহাদিগের জাতি গোষ্ঠির খবর রাখেন না। মাটাতোলা নয় এমন দুধ যদি শর্করা মিশ্রিত না হয়, তবে, সেই দুধ নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করা চলে—তাও বরাবরের জন্য নহে, কালে ভদ্রে, দরকারে অদরকারে ব্যবহার করিতে হয়। আর তিনজাতীয় দুধ ব্যবহারে ষোল আনা কুফল ফলে। সেগুলিকে আইনমুসারে এদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা উচিত।

"ফুড" নামধেয় বিলাতী গুঁড়া খাদ্যগুলির সম্বন্ধে এদেশে আরো বেশী অজ্ঞতা পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, সেগুলির উপাদান কি, তাহা কয়জনে জানেন ? বাসি ছোলার ছাতু বা গমের গুঁড়া ও দুধ একত্র মিশাইলে যাহা হয়, ধরিতে গেলে ঐ ফুড্ মাত্রেই তাহাই। দ্বিতীয়তঃ, সেগুলির প্রকার-ভেদ কত তাহা কতজনে জানিবার চেষ্টা করেন ? মোটামুটি ভাবে ধরিলে, সেগুলি তিন শ্রেণীর যথা, (১) যে খাদ্য পরিপাক করিতে হয় না, পরিপাক করা অবস্থাতেই বিক্রীত হয়। এই জাতীয় খাদ্য সংখ্যায় খুব অল্প ; তন্মধ্যে বেঞ্জার্স ফুড এদেশে সুপরিচিত। (২) যে খাদ্যে শ্বেতসার (starch) শর্করায় পরিবর্ত্তিত (dextrose) হইয়া গিয়াছে ; এবং (৩) যে খাদ্যে আস্ত শ্বেতসার বর্ত্তমান আছে। আমি কোনও ফুড বিশেষের নাম দিলাম না। তবে গৃহস্থের এই তিনটি শ্রেণী বিভাগ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য ; এবং সেই সঙ্গে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে শিশুদিগকে শ্বেতসার না খাওয়ানই ভাল। সাগু, বার্লি, প্রভৃতি শ্বেতসারের দৃষ্টান্ত। তবে বহু জন্মজন্মান্তরাবধি বাঙ্গালী শ্বেতসার (ভাত) খায় বলিয়া বোধ হয় বাঙ্গালার ছেলের পেটে সাগু বার্লি সহ্য হয় কিন্তু সাগু, বার্লি, শঠি সহ্য হয় বলিয়া, বাসি শ্বেতসার-বহুল বিলাতী ফুড কি দুঃখে খাওয়াইব ? যাহাদের পেটে সাগু বার্লি মিশ্রিত দুধ সহ্য হয় না, তাহাদি কেই ফুড খাওয়াইবার প্রয়োজন হয়। তবে কেন সে রকম স্থলে শ্বেতসার-বহুল ফুড খাওয়াইব ? দন্তোদ্গমের পূর্ব্বে ঐরূপ শ্বেতসার-বহুল খাদ্য না খাওয়ানই ভাল।

বিলাতী দুধ বা ফুড খাওয়ানর গুণ :—(১) ঐগুলি দেখিতে সুদৃশ্য, উহাদের বিজ্ঞাপনগুলি বড়ই মনোহর এবং উহাদিগের ব্যবহারে গৃহস্থের শ্রম-লাঘব হয়। (২) পথে ঘাটে, রেলে ষ্টীমারে যাতায়াতের সময়ে, বাজারের দুধের অপেক্ষা ঐগুলি বহু অংশে নিরাপদ খাদ্য। (৩) ব্যারামের সময়ে, অথবা অপর অসময়ে (যখন দুধ থাকে না, যেমন, ভোরে কচি ছেলেকে খাওয়াইবার জন্য) ঐ খাদ্য বড়ই উপযোগী। (৪) ঐ খাদ্য খাওয়াইলে ছেলেরা দেখি হৃষ্টপুষ্ট হয়—অর্থাৎ তাহা দর গায়ে চর্ব্বি লাগে (মাংস লাগে না)। বিলাতী ফুড বা দুধ খাওয়ানর দোষ :—ঐ খাদ্য যদি রীতিমত বা কিছু কালের জন্য একটানা খাওয়ান যায় তবে (১) ছেলেরা অন্তঃসার-শূন্য ও রোগ-প্রবণ হয়। তাহাদিগের গায়ে মাংস বা রক্ত ভাল বাঁড়ে না। (২) স্কার্ভি নামক এক রকমের পীড়া দেখা দেয়,—তাহাতে দাঁত পানসে হয়, কথায় কথায় রক্তস্রাব হয়।

এখন সকল কথাই বুঝিলাম—কিন্তু কর্ত্তব্য কি ? কর্ত্তব্য (১) মা জননীগণকে মাতৃত্বের গুরুতম দায়িত্ব অনুভব করিয়া, সংসারের অবজ্ঞনা না খাইয়া, রমণীকে ভাল খাইতে নাই" এই মারাত্মক ভ্রম ভুলিয়া, নিজ নিজ শরীরের যত্ন করিতে হইবে। রমণীকেও ব্যায়াম করিতে হইবে, মুক্ত বায়ু সেবন করিতে হইবে। তাঁহাদিগের স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে তবে বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্য ভাল হইবে। (২) গরুকে মাতৃ ও গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জ্ঞানে পূজা ও যত্নে সেবা করিতে হইবে। অভাবে ছাগীকে তাহাই করিতে হইবে। এদেশের পুরুষগণকে দেহতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, মাতৃতত্ত্ব ও শিশুতত্ত্ব সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। ঘরে ঘরে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ঐ সকল বিষয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রচলন করিতে হইবে। শুধু রাজনীতি অথবা বক্তৃতা লইয়া থাকিলে চলিবে না। দেশের আজ তিনটি বড় কায বাকী আছে— লোককে বাঁচিতে দাও (রোগ নিবারণ), খাইতে দাও ও সুশিক্ষিত হইতে দাও।

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়।

(নব পর্য্যায়)
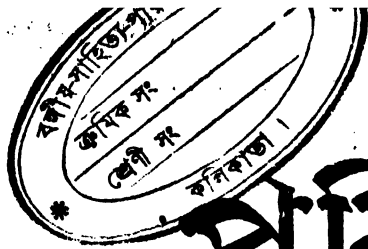
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৪র্থ বর্ষ। | ফাল্গুন, ১৩২৬ সাল। | ৪র্থ সংখ্যা।

একাদশী।

—:*:—

প্রতিপদ

কত দিন ছাড়াছাড়ি তোমায় আমায়
কত দিন দুই জনে হয় নাই দেখা
আমারে পাঠায়ে দিলে এ জীবনে একা
ইহ পরকালে মেলা সেই মোহানায়।

সে যেন ছিলাম দোঁহে কোন্ ছায়ালোকে
দুজনার মাঝে যেন দু'জনে মিলিয়া,
বিশাল ধরণীখানি বুকে আগলিয়া
বিশ্বপ্রেম ঢেকেছিনু দুজনার চোখে ;

চাঁদের সকল আলো ছিল সেথা নেমে,
মন্দারের পারিজাত সুগন্ধ অপার,
ফুটেছিল কত চারু কুসুম-সম্ভার,
স্তব্ধ ছিল চরাচর আমাদের প্রেমে,—

স্বপনের ছবি সম মনে পড়ে সব
মূৰ্চ্ছিত হৃদয় আজি বিরহ নীরব।

দ্বিতীয়া

কত দিন দেখি নাই ও মধুর হাসি
কত দিন দেখি নাই ও মোহন মুখ,
কত দিন ভরে নাই শূন্য মোর বুক
তোমার ও অনুপম স্নিগ্ধ রূপরাশি!

কিছুতে ফিরিয়া মনে আনিতে না পারি
কেমন ও আঁখি দুটি কেমন অধর,
কোমল ও বাহুলতা কেমন নধর,
তোমার ও নয়নের দৃষ্টিসুধাবারি।

এইটুকু মনে পড়ে কল্পনা-আলোকে
তুমি সর্ব্ব জগতের রূপের আধার,
তুমি সর্ব্ব হৃদয়ের প্রেমের পাথার,
এত প্রেমরূপ নাই ত্রিভুবনলোকে!

আর শুধু এইটুকু মনে পড়ে বঁধু
তোমার যে আগাগোড়া সবটুকু মধু!

তৃতীয়া

সে মধু যে পাই নাই কত দিন প্রাণে
বিচ্ছেদের দিন নাহি গুণে হয় শেষ,
নাই আর নাই দেব বিন্দু সুখলেশ
একটি আশার শিখা নাই কোনখানে।

কেহ ত তোমার কথা কিছু নাহি জানে
তোমার বারতা হেথা কেহ না শুনায়,
আশার ছলনা দিয়ে কেহ না ভুলায়
কালের সীমানা টানি মিলনের পানে।

দিয়ে গেছ এ জীবনে এ ঘর সংসার,
এই ধন, এই মান, এই যশ পদ,
এই হাসি এই গান এ সুখ সম্পদ,
খেলিবার হাসিবার এই অধিকার।

বড় দুঃখে বুঝিয়াছি একথা সরল
তুমি বিনা এ যে মোর দারুণ গরল!

চতুর্থী।

বিরহ গরলে আজ জর্জ্জরিত হিয়া
তুমি হারা হৃদয়েতে কিছু নাহি রুচে,
নয়নের অশ্রু মোর কিছুতে না ঘুচে
তোমার অভাব প্রাণে পূরাব কি দিয়া?

চাঁদের অভাব সে কি প্রদীপেতে যায়,
বারির অভাব কভু মিটে কি ঝারিতে,
দাসীর প্রয়াসকরা যতনবারিতে
মা-হারা শিশুর কভু হৃদয় জুড়ায়?

হ'ল না হ'ল না তাই পূরিল না প্রাণ,
এ ধরার সুখে কভু ভরিল না বুক!
অজানা অচেনা সব বিদেশীর মুখ
সান্ত্বনার সুধাধারা করিল না দান!

কারেও না চিনি হেথা কারেও না জানি
কাহারে দেখাব মোর শূন্য হিয়াখানি?

পঞ্চমী।

দূরে রাখা এই যদি তোমার বিধান
তোমার বিধান তবে কে করে খণ্ডন,
তোমার আদেশ তবে কে করে লঙ্ঘন?
তাহে মোর থাকে থাক্ যায় যাক্ প্রাণ!

বিচ্ছেদের দিনগুলি করিব যাপন
—অনন্ত এ কাল সিন্ধু অপার অতল
মানব জীবন তাহে কতটুকু পল ?
সে জীবন কাটাইব সতীত্বে আপন !

কে মোরে দেখায় ভয় কে মোরে শাসায়
জগতের মোহময় প্রলোভন পথে ?
ষড়রিপু ভুলাইছে মোরে নানা মতে
শুনায় মোহিনী বাণী পাপের ভাষায় !

তোমার ও ব্রহ্মতেজ বুকে মোর দাও
সতীর পরম-গতি বাঁচাও বাঁচাও !

ষষ্ঠী।

জীবন যে কত ভুল কত ভ্রান্তি ভরা
পদে পদে প্রাণ ফাটা কত হাহাকার,
স্খলন পতন কত মোহের আঁধার
দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে পলে পলে মরা !

কতবার পড়িয়াছি ডুবিয়াছি পাপে
কতবার ভুলিয়াছি তোমার ও আঁখি,
আমার এ সর্ব্ব দেহে অনিমেষ থাকি
বাঁচায়ে তুলেছে পুন আপন প্রতাপে।

এখনও তরুণ প্রাণ রূপের ভিখারী,
এখনও ছলনা বাণী ভুলায় শ্রবণ,
এখনও প্রেমাভিলাষী হৃদয় গোপন,
এখনও নিরাশা আনে নয়নেতে বারি।

নিজ মুখে নিজ পাপ করিনু স্বীকার
রাখ কিবা মার সে ত তব অধিকার।

সপ্তমী।

সর্ব্বনাশ হতে মোরে তুমি ত বাঁচাও
আগুনের শিখা তুমি জ্বেলে দাও প্রাণে
পদতলে টেনে রাখ হৃদয়ের টানে
শরণাগতের প্রাণে শক্তি ঢেলে দাও।

তোমার ও অনুরাগ সিন্দূরের রাগে
সিঁথীর সীমায় মোর উঠে যে জ্বলিয়া
লোহার বলয় রূপে রাখে আগলিয়া
মণিবন্ধ চেপে ধরি গোপন সোহাগে!

কে বলেরে নাই তবে নাই তুমি নাই,
—এত বড় মিথ্যা আর কি আছে জগতে?
আপনারে প্রকাশিছ তুমি নানা মতে
এ সত্য কেমনে আমি কাহারে দেখাই?

অন্ধ সেও বুঝিবে যে তুমি আছ ব'লে
হৃদয় জ্বলিছে সদা প্রেমের দেউলে!

অষ্টমী।

তুমি আছ এই সত্য জেনেছি যেমন
জানি নি এমন কিছু আমার জীবনে,
হৃদয় জুড়ায় যত তোমার চরণে
জুড়ায় না জুড়ায় না কিছুতে এমন।

তথাপি কোথায় কি যে রহিয়াছে বাধা
তোমার আমার দোঁহে মিলনের পথে,
কাটায়ে উঠিতে এ যে নারি কোন মতে
তাই এত হাহাকার তাই এত কাঁদা!

পাব কি না পাব ফিরে কে বলিতে পারে
তোমার গোপন ঐ বুকের আশ্রয়,
তোমাতে আমাতে মিলে এক সত্তাময়
তুমি আমি দোঁহে মিলি রব একাধারে?

এ ঘটন ঘটিবে কি কে বলিতে পারে
এ জীবনে কিবা এই জীবনের পারে ?

নবমী।

জীবনে অনেক কাঁদা কেঁদেছি হে নাথ
অশ্রু বুঝি নাহি আর আঁখির ভাণ্ডারে,
ব্যথা বুঝি নাহি আর হৃদয়ের দ্বারে
এ জীবন বিভাবরী হবে কি প্রভাত ?

ভোগের বসন ভূষা ত্যজেছি জীবনে,
অনুরাগ সিন্দুরের বিন্দু মুছি ভালে,
তোমার বিরহ টীকা লিখেছি কপালে
উদাসী হয়েছি প্রভু হৃদি-বৃন্দাবনে !

বাসনা কামনা প্রাণে নাই কিছু আর
চিতার আগুনে শুধু জ্বলিতেছে হিয়া,
বিরহ বেদনা মোর জুড়াব কি দিয়া
তোমার ও নাম গান করিয়াছি সার।

শূন্য দেহ শূন্য প্রাণ শূন্য সবঠাঁই
প্রভুহারা হয়ে মোর নাই কিছু নাই !

দশমী।

প্রতিদিন আসি যাই এইটুকু বুঝি
ব্যর্থতার কাছে নহে এ মোর ক্রন্দন,
হৃদয়ে মাখায়ে দিয়ে দুখের চন্দন
হৃদয়ে রয়েছে যারে হৃদয়েতে পূজি।

সে কোথায় সে কোথায় না পাই সন্ধান
তবু সে লুকায়ে আছে আমারি মাঝারে
প্রতিদিন দেখা দিয়ে যায় বারে বারে
প্রতিদিন ভাঙ্গাপ্রাণ করে খান খান।

তবু ও তাহার দেখা পুন ফিরে চাই
আমার এ হৃদয়ের নিভৃত গোপনে
তার সাথে মিলনের আশার স্বপনে
আয়োজনে ভরে রাখি মোর সর্ব্ব ঠাঁই।

সফল সে হয় কিনা জানে মোর মন
আর জানে সে আমার মনের রতন!

একাদশী।

একবার দিনে দেখা তোমায় আমায়
ততটুকু পেলে তবু বাঁচে মোর প্রাণ,
হবিষ্যের অন্ন দিয়ে রেখেছিলে মান
তার বেশী কি চাহিব শ্রীচরণছায় ?

নিও না নিও না তাহা ; দিন শেষে তবু
একবার দেখা দিও এ মোর পরাণে,
উপবাসী হৃদয়েরে বিন্দু জল দানে
এক মুঠি অন্ন দিয়া বাঁচাইও প্রভু !

একি হ'ল !—হায় এযে তোমারে না হেরি
ক্ষুধায় জ্বলিছে মোর জীবন জঠর,
একি সাজা দিলে তুমি কঠিন কঠোর
দেখা দাও দেখা দাও নাহি সহে দেরী !

নিরম্বু এ উপবাস নাহি সহে আর
রাখ রাখ এ জীবন জন্ম বিধবার !

বিদুষী মহারাণী ভানুমতী।*

-:*:-

১৬শ শতাব্দীর কামরূপ, কামতা বা বিহার রাজ্য সমসাময়িক ভারতের ইতিহাসে কিরূপ বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, ইতিহাস পাঠক মাত্রই তাহা অবগত আছেন। প্রাদেশিক ইতিহাস অনুশীলনের দ্বারা ঐ সমস্ত চিত্র একদিকে যেমন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে, অন্য দিকে তেমনি অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত বর্ণ অপসৃত হইয়া চিত্রের প্রকৃত অবস্থা লোকলোচনের গোচরীভূত হইতেছে। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে কামরূপ-ক্ষেত্র জ্ঞানালোচনায় ভারতের বিদ্বজ্জন সমাজে যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাৎকালিক কামরূপরাজগণ পার্শ্ববর্ত্তী গৌড় ও মিথিলা দেশে ভাষার নিয়ামক বলিয়া সমধিক সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে সুনাম কেবল প্রতিবেশী রাজ্যেই আবদ্ধ ছিল না, সুদূর ভারত রাজধানীস্থিত পণ্ডিত সমাজও তাহা অবগত ছিলেন। কামরূপের সে প্রশংসিত সময়ের বিবিধ উন্নতির সহিত একজন নারীর কিরূপ সংস্রব ছিল, তৎসংক্রান্ত দুই এক কথা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে।

স্ত্রীজাতির মধ্যে রাজ্য শাসন ও জ্ঞানালোচনায় মৌলিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, যদিও এরূপ দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসে দুষ্প্রাপ্য নহে, তথাপি অত্যন্ত বিরল মনে হয়। কথিতা মহিলা মহারাণী ভানুমতী নামে পরিচিতা ছিলেন। ভানুমতী অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার সে নশ্বর দেহের প্রশংসাবাদ এখন আর শুনিতে পাওয়া যায় না। কামরূপবাসী তাঁহার নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে বসিয়াছে; কিন্তু তাঁহার মানস সৌন্দর্য্যের যে ছটা বিকীর্ণ হইয়াছিল তাহা অবিনশ্বর হইয়া রহিয়াছে। তাহা যে কতশত লোককে জ্ঞানমার্গ প্রদর্শন করিয়াছে ও করিবে কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে? বিদুষী ভানুমতী কোচবিহার রাজবংশের শিরোমণী স্বরূপা ছিলেন। বিশ্বসিংহ বংশের যে শাখা হইতে কোচবিহার রাজবংশের উদ্ভব, সেই শাখার আদিপুরুষ মহারাজ মল্লদেব বা নর নারায়ণের তিনি যোগ্যা পত্নী ছিলেন। বিশ্বসিংহ বংশের অন্যতম শাখা দরঙ্গ-রাজপরিবারে রক্ষিত প্রাচীন বংশাবলী অবলম্বনে ভানুমতীর বিলুপ্তপ্রায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণিত হইতেছে।

১৬শ শতাব্দীর সুবৃহৎ কামতা রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যে সমস্ত শক্তিশালী ভৌমিক বা সামন্ত রাজা বিদ্যমান ছিলেন, গৌহাটীর নিকট পাণ্ডু নামক স্থানের প্রতাপ ভৌমিক তাঁহাদের অন্যতম। বিদুষী ভানুমতী এই প্রতাপ ভৌমিকের কন্যা। কামতা রাজ্য খেন বংশের হস্তচ্যুত হইলে অধীন সামন্ত রাজগণ নীরবে অবস্থান করেন নাই। অধিকাংশই ভাগ্য পরীক্ষায় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। খুটাঘাটের ভৌমিক পুত্র অদ্ভুতকর্ম্মা বিশুর ভাগ্যাকাশ এই বিপ্লবে অনেকটা পরিষ্কার হয়। বিশুর হস্তে প্রতাপের ভ্রাতা শেতমান বিনষ্ট হইলে প্রতাপ সপরিবারে আহম-রাজের আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। বিশু ক্রমশঃ প্রতিদ্বন্দ্বীহীন হইয়া পাঠানগণকে উচ্ছেদ করিয়া বিশ্বসিংহ নাম ধারণ করেন এবং কামতাপুরে একটি স্বাধীন রাজত্বের পুনঃ সূত্রপাত করিয়া যান। বিশ্বসিংহের পরে তৎপুত্র মল্লদেব যখন কামতাপুরের রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন, সেই সময় রাজ্যহীন প্রতাপ তাঁহার আশ্রয়ে আগমন করিয়া, স্বীয় কন্যা ভানুমতীকে তাঁহার করে অর্পণ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। মল্লদেব সসম্মানে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে

---

* কোচবিহার সাহিত্য-সভায় ১ম বার্ষিক দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত।

ভানুমতীর সহিত যথারীতি তাঁহার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সুন্দরী ভানুমতীর রাজমহিষী হওয়ার পরে তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যই লোকের অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিল। তিনি বিদ্যোৎসাহীতা, ধর্ম্মাচরণ, রাজ্যশাসন ও পররাষ্ট্রনীতিতে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী নামের যথার্থতা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। শুক্লধ্বজের অসি ও ভানুমতীর মন্ত্রণা মহারাজ মল্লদেবকে পূর্ব্বোত্তর ভারতে দিল্লীশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

মহারাজ মল্লদেবের আজ্ঞায় অনুবাদিত ও সঙ্কলিত পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত অষ্টাদশ কৌমুদী, রামসরস্বতী কৃত রামায়ণ, মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণ, শঙ্করদেব কৃত দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবত, শ্রীধর দৈবজ্ঞ কৃত জ্যোতিষিক গ্রন্থ ও বকুল কায়স্থ কৃত অঙ্ক শাস্ত্রগুলি উদ্ধার হইলে বিদুষী ভানুমতীর নিপুণ হস্তের অনেক চিত্র খুব সম্ভব তাহাতে দৃষ্ট হইত। দুঃখের বিষয় কোচবিহার রাজ্যে ঐ সমস্ত গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে। আসাম গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী কামরূপ রাজগণের কীর্ত্তি রক্ষায় মনোযোগী হইয়াছেন। গৌহাটী নগরে স্থাপিত কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতিও এই মহৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহাদের কল্যাণে মহারাজ মল্লদেব ও মহারাণী ভানুমতীর অনেক কীর্ত্তি আমরা দেখিতে পাইব বলিয়া সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি।

মহারাজ মল্লদেবের সভা পণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ সঙ্কলিত রত্নমালা ব্যাকরণের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন, কেহ কেহ দেখিয়াও থাকিবেন। এই ব্যাকরণ মহারাজ মল্লদেবের আজ্ঞায় সঙ্কলিত। গ্রন্থের আরম্ভে এইরূপ মুখবন্ধ আছে।* মহারাণী ভানুমতীর ব্যাকরণ শাস্ত্রে কিরূপ অধিকার ছিল, এই রত্নমালা প্রণয়নে তাঁহার সংশ্রব ব্যক্ত হইলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। দরঙ্গরাজ গন্ধর্ব্ব নারায়ণের বংশাবলীতে লিখিত আছে;—

> নৃপতির প্রিয়তমা ভানু পাটেশ্বরী
> ভট্টাচার্য্য আগে কথা কহিলা সাদরী।
> পাণিনির বর্ণ ক্রম গ্রন্থে না লেখিবা
> মহেশের কৃত কলাপের ক্রম দিবা। †

পণ্ডিত পুরুষোত্তম রত্নমালার মুখবন্ধে ভানুমতীর নামোল্লেখ করেন নাই। স্বামীর আদেশে স্ত্রীর উপদেশে গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে বলিয়াই কি স্ত্রীর প্রসঙ্গ ত্যক্ত হইয়াছে? না স্বামীর গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে ভানুমতী ইচ্ছা করিয়াই আত্মগোপন করিয়াছেন? রত্নমালায় কোন প্রতিরোধক বাক্য না থাকায় গন্ধর্ব্ব নারায়ণের

* শ্রীমল্লদেবস্য গুণৈক সিন্ধো র্নৃপস্য মহেন্দ্রস্য যথা নিদেশম্।
যত্নাৎ প্রযোগোত্তম রত্নমালা বিতনাতে শ্রীপুরুষোত্তমেন ॥

এই ব্যাকরণ এখনও কোচবিহার ও আসামের চতুষ্পাঠী সমূহে অধীত হইয়া থাকে। কলিকাতার ঠাকুর জমিদারগণ এই পুরুষোত্তমের বংশোদ্ভব। স্বনামখ্যাত ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার উপযুক্ত বংশধর।

† এই পুথি দরঙ্গবংশীয় রাজা প্রসিদ্ধ নারায়ণের নিকট প্রাপ্ত হওয়ায় স্যর ই এ গেইট সাহেব তাঁহার Koch king of Kamrup ও Report on the progress of Historical research in Assam নামক পুস্তকে "প্রসিদ্ধ নারায়ণের বংশাবলী" নামে পুথির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ নারায়ণের পূর্ব্ব পুরুষ গন্ধর্ব্ব নারায়ণের আদেশে এই পুথি রচিত হইয়াছিল।

বংশাবলীর উক্তি গ্রহণে কোন বাধা দৃষ্ট হইতেছে না। উহা অত্যুক্তি দোষে দুষ্ট বলিবারও কোন হেতু বিদ্যমান নাই। ভানুমতীর পিতৃব্যপুত্রী চন্দ্রপ্রভা শুক্লধ্বজের পত্নী ছিলেন। গন্ধর্ব্ব নারায়ণ চন্দ্রপ্রভার গর্ভজাত রঘুদেবের বংশধর। পূর্ব্বপুরুষের অযথা প্রশংসায় গৌরববোধ প্রবৃত্তি থাকিলে গন্ধর্ব্ব নারায়ণ চন্দ্রপ্রভাকে পরিত্যাগ করিয়া ভানুমতীর নামোল্লেখে আগ্রহান্বিত হইতেন না।

মহারাণী ভানুমতী কেবল এই এক দিক দিয়াই ব্যক্ত ছিলেন না। ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি স্বামীর সঙ্গিনী ও মন্ত্রণাদাত্রী ছিলেন। মহারাজ মল্লদেবের আসাম বিজয় কালে ভানুমতী তাঁহার সঙ্গে গমন করিতে পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক সময় তাঁহার সিদ্ধান্ত সর্ব্বোপরি কার্য্যকর হইত। আহমরাজকে পরাজয় করিয়া শুক্লধ্বজ ত্রিপুরা অবধি সমগ্র আসাম স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন। বিজিত রাজগণের প্রত্যেকের সহিত ভিন্ন ভিন্ন সন্ধি হইয়াছিল। অধিকাংশ রাজাই মুদ্রা প্রচারে নিষেধ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। খাইরম রাজ বীর্য্যবন্ত এইরূপে ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া মহারাণী ভানুমতীর শরণাপন্ন হন। তিনি মহারাণীর নিকট মুদ্রা প্রস্তুতের অনুমতি প্রার্থনা করিলে—

"হেন শুনি পাটেশ্বরী বুলিলা বচন, মারিও মোহর তুমি নাহিক দোসন।
আমার স্বামীর নাম সাছতে লেখিবা, তোমার নামক কদাচিৎ না লেখিবা।
খৈরামে বোলয় আই শুনিও বচন, মোহরত নাম থৈবো মল্ল নারায়ণ।"

গন্ধর্ব্ব নারায়ণের বংশাবলী।

মহারাণী ভানুমতীর জীবনে স্বামীর সহধর্ম্মিণী নামেরও সার্থকতা প্রমাণিত হইয়াছে। মহারাজ মল্লদেব কর্ত্তৃক কামখ্যা মন্দির পুনর্নির্ম্মাণের উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। ইচ্ছা সত্ত্বেও এই সুবৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহাকে অনেক বিলম্ব সহ্য করিতে হইয়াছিল। মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্যও নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হয় নাই। উক্ত কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর অত্যাচার ও অর্থ অপহরণাদি নিবারণের নিমিত্ত তিনি প্রথমতঃ শুক্লধ্বজকে নীলাচলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যতশীঘ্র সম্ভব কার্য্যশেষ করিতে তাঁহার প্রতি আদেশ ছিল। অবশেষে মহারাজ নিজেও তথায় গমন করেন। এই সময় রাজ দম্পতির বয়স অধিক হইয়াছিল। রাজধানী হইতে নীলাচলে গমন করিতে হইলে সাত দিনের পথশ্রম আবশ্যক হইত। তথাপি সমস্ত কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া ভানুমতী স্বামীসহ তথায় গমন করিয়াছিলেন। মহারাজ মল্লদেব সস্ত্রীক উপস্থিত থাকিয়া কামাখ্যা মন্দির উৎসর্গ করেন। সমুদ্র নারায়ণের বংশাবলীতে এই ব্যাপারে "সাত কুড়ি পাইক দিলা উৎসর্গ করি" লিখিত আছে।* খড়্গনারায়ণের বংশাবলীতে কেবল "বহু নর উৎসর্গীয়া দিয়া" এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। যাহাই হউক এই ঘটনায় মহারাণী ভানুমতীর মাতৃহৃদয়ের যথোচিত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। হইতে পারে কূট রাজনৈতিক চিন্তা ও সদা সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহের সংশ্রবে থাকা হেতু তাঁহার অন্তর অপেক্ষাকৃত শুষ্কভাব ধারণ করিয়াছিল। অথবা ধর্ম্মবিশ্বাসের অনুরোধে তিনি ঐ ব্যাপার সমর্থন করিয়া ছিলেন। মল্লদেবের সংশ্রবে না আসিলে ভানুমতীর প্রতিভা তেমন ভাবে বিকসিত হইতে পারিত কি না কে বলিতে পারে! ভানুমতীকে

* দরঙ্গবংশীয় রাজা সমুদ্র নারায়ণের আদেশে সূর্য্যখরী দৈবজ্ঞ কর্ত্তৃক এই বংশাবলী রচিত। স্যর ই এ গেইট সাহেব সমুদ্র নারায়ণের বংশধর লক্ষ্মীনারায়ণের নিকট প্রাপ্ত হইয়া তাহার "লক্ষ্মীনারায়ণের বংশাবলী" নাম করণ করিয়াছেন।

বুঝিতে হইলে মল্লদেবের পরিচয় আবশ্যক। ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সযত্ন রোপিত জ্ঞান বৃক্ষের বীজ কতবড় মহাক্রমে পরিণত হইয়াছিল, তাহা বলিতে অনেক সময়ের আবশ্যক।

মহারাণী ভানুমতীর গর্ভজাত সন্তানের মধ্যে এক মাত্র মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের উল্লেখ কোন কোন বংশাবলীতে দৃষ্ট হয়। সমসাময়িক আকবর-মন্ত্রী পণ্ডিত আবুল ফজল তাঁহার স্বরচিত আকবর নামায় লক্ষ্মীনারায়ণের এক ভগ্নীর উল্লেখ করিয়াছেন। সুবাদার মানসিংহের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।* জয়পুরে মাড়ওয়ারী ভাষায় লিখিত বংশতালিকায় তাঁহার প্রভাবতী নাম লিখিত আছে ? কোচবিহার বংশাবলী রাজোপখ্যানে প্রকাশ "মহারাজ মল্লদেবের এক অসাধারণ বুদ্ধিমতী পত্নী ছিলেন। তিনি স্বামীর রাজ্য লাভের পূর্ব্বেই পরিণীতা হন এবং তাঁহারই বুদ্ধিবলে মল্লদেব সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন।" মল্লদেবের পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রের বহুপত্নীর বৃত্তান্ত প্রায় সমস্ত বংশাবলীতেই লিখিত আছে; কিন্তু তাঁহার নিজের একাধিক পত্নীর উল্লেখ কোথাও দৃষ্ট হয় না। এমতাবস্থায় জয়পুর রাজ মানসিংহের পত্নী প্রভাবতী মহারাণী ভানুমতীর গর্ভজাতা হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা অনুমান বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রীআমানতউল্যা আহমদ।

উপহার।

—:*:—

যে তুমি আমার গোপন মরম
আঁধারে দিয়াছ ঢাকি',
যে তুমি তোমার করুণ স্মৃতিটী
মানসে গিয়াছ রাখি',
যে তুমি আমার সফল জীবন
বিফল করিয়া আজ
ব্যাকুল বেদনা দিয়াছ ভরিয়া
আকুল বক্ষ মাঝ,
যে তুমি আমারে দলিয়া চরণে
নিবিড় আড়াল খানি
কল্পনা ঘৃণায় দোঁহাকার মাঝে
আপনি দিয়াছ টানি,

* "লছমীনারায়ণ (লক্ষ্মীনারায়ণ) নে কুছ্ দিনোঁকে বাদ আপনী বহিন্‌কি সাদি রাজা (মানসিংহ) কে সাথ করদী" আকবর নামা, উর্দ্দু সংস্করণ ২৪৪ পৃঃ।

? প্রবাসী ১৩২১ সন, আশ্বিন ৬৭৯ পৃষ্ঠা ও অগ্রহায়ণ ২৩০ পৃষ্ঠা।

যে তুমি আমার পরায়ে অশ্রু
বাড়ায়ে দিয়াছ জ্বালা;
সে তুমি আমার—পর গলে আজ
এই অশ্রু মালা!

শ্রীরেণুকা দাসী।

প্রিয়তমা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মাঝে ছয়টি সপ্তাহ অতীত হইয়া গিয়াছে, আজ জুলিয়েনের বিবাহ দিন। কোনরূপ ব্যস্ততা বা আড়ম্বর প্রকাশ না করিলেও আল্‌রিক্‌ ও ম্যাগনস্ এ বিবাহ ও তাঁহাদের সম্ভ্রমরক্ষার উপযোগী সমস্ত সামগ্রীই ধীরে ধীরে সজ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন। কাউণ্টেস্ মাঝে মাঝে আসিয়া খুঁৎ ধরিতেন, কিন্তু কার্য্য শেষে প্রশংসা না করিয়াও থাকিতে পারিতেন না। স্বয়ং পাত্রী—জুলিয়েনও বেচারা নিজের বিবাহের সকল কার্য্যেই দিদির সঙ্গে যোগ দিয়া চলিয়াছে। সদা, উৎকৃষ্ট, আহারাদির আয়োজন প্রচুর ও রাজভোগ্য: উৎসব সাজে প্রাসাদের কিয়দংশ সংস্কৃত ও সজ্জিত। এই সকল দেখিয়া কাউণ্টেসের মন অনেকটা প্রফুল্ল।

ভাবি জামাতার অভ্যর্থনার জন্য তিনি ও ম্যাগনস গেটের অনতিদূরে অপেক্ষা করিতেছিলেন ও "আল্‌রিক জুলিয়ান কখন আসিবে,"—বলিয়া মাঝে মাঝে দ্বারের প্রতি চাহিতেছিলেন। আজ কাউণ্টেসের সাজসজ্জা অত্যন্ত আড়ম্বর যুক্ত, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের মূল্যবান উৎসব-বসন তিনি পরিধান করিয়াছেন।

'বরযাত্রী কে কে আসিবে, ডপ্‌ মার্শেলন আসিবে কিন',—এমনি দু'চারিটা প্রশ্ন সূচক কথা কখনো আপন মনে কখনো পুত্রের উদ্দেশে উচ্চারণ করিতেছেন, এমন সময় দেখা গেল দুইটি প্রকাণ্ড অশ্বযোজিত একখানি গাড়ী দ্বারে প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে বসিয়া আছেন একমাত্র বরযাত্রী,—রুডিগার হারমার ও পার্শ্বে স্বয়ং বর রাওয়েল্‌ মাইনো।

তাঁহারা সাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। কাউণ্টের বিনীত ও প্রীতিপ্রদ সম্ভাষণে মুগ্ধ হইয়া রুডিগার, দাস দাসী বা কন্যাপক্ষের লোকাভাবের কথা—বলিতে একটু পূর্ব্বেও তাঁহার চক্ষু অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়াছিল,—তাহা বিস্মৃত হইয়া উৎফুল্লভাবে বলিয়া উঠিলেন;—"কিন্তু আপনার ভগ্নী, আমাদের ভাবি ব্যারনেস্—তিনি কোথায় কাউণ্ট? তাঁহাকে দেখিতেছি না যে।"

কাউণ্টেস বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "আমিও ত তাই ভাবিতেছি, দ্যাখত কি অন্যায় তাহাদের!"

প্রফুল্লকণ্ঠে ম্যাগনস্‌ বলিলেন, "না, ঐ যে তাহারা আসিতেছে মা, এস আল্‌রিক, এস জুলিয়েন।"

"একি লিয়েন ?" কাউন্টেসের মুখ দিয়া হঠাৎ বিরক্তি ও বিস্ময়ের অস্ফুট চীৎকার শোনা গেল। ত্বরিত স্বরে বলিতে লাগিলেন, "তুমি কি পাগল হইয়াছ লিয়েন ? এ কি কাপড় পরিয়াছ ? এ কোন পোষাক—কেন এটা পরিয়াছ ? ফিরে যাও—ফিরে যাও, শীঘ্র বদলাইয়া এস।"

আগন্তুকদ্বয় চাহিয়া দেখিলেন যে ভাবি বধূ তখন সাদা মসলিনের একটি সাধারণ বস্ত্রেই সজ্জা শেষ করিয়াছেন। বুকে ও মাথায় দুটি পুষ্পগুচ্ছ মাত্র তাঁহার আভরণ ; এবং কন্যার এই সামান্য বেশভূষাই মাতার ক্রোধোদ্দীপন করিয়াছে। জুলিয়েন কিন্তু নড়ল না—মাতার নিকট হইতে সামান্য দূরে নত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

মাতা আবার বলিলেন "বলিতেছি তবু যাইবে না লিয়েন ?"

লিয়েন একবার মাতার প্রতি চাহিল, তখন রাওয়েলই অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"কোন প্রয়োজন নাই জুলিয়েন, এ কাপড়ে তোমায় সুন্দর দেখাইতেছে।"

অতি অল্পক্ষণের মধ্যে যিনি তাহার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম আত্মীয় হইবে, যাঁহার নিকট সে আপনার ভবিষ্যৎ সুখ ও দুঃখ জীবন মরণ সমর্পণ করিতে চলিয়াছে, তাঁহারই মুখে,—অথচ অপরিচয়ের সমস্ত দ্বিধা ও কুণ্ঠার মাঝ দিয়া সেই চিরাভ্যস্ত সম্বোধনটি, জুলিয়েনকে চমকিত ত্রস্ত করিয়া তুলিল। সে নিজের অজ্ঞাতসারেই চোখ দুটি তুলিয়া সম্বোধনকারীর মুখের দিকে চাহিয়া ফেলিল। কিন্তু নিমেষ মাত্র একটি মৃদুমন্দ হাসি ছাড়া আর কিছুই সে দেখে নাই।

রাওয়েলের ব্যস্ততায় গিরজার ব্যাপারটি শীঘ্র শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। পরিণাম চিন্তার কোন অবকাশ বা স্বামীর সম্বন্ধে কোন আভাস মাত্র পাইবার পূর্ব্বেই জুলিয়ান, বেদীর সম্মুখে ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা পাঠ করিল, মন্ত্রচালিতের ন্যায় পুরোহিতের নির্দ্দিষ্ট সকল অনুষ্ঠান শেষ করিয়া লিয়েন যখন দাঁড়াইল, তখন তিনটিমাত্র শব্দ তাহার বুকের শিরায় শিরায় বাজিয়া চলিয়াছে ; "নূতন জীবন—ভবিষ্যৎ—স্বামী !"

সে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী, শিক্ষা সে প্রতিভাকে আরও উজ্জ্বল করিয়াছে, কিন্তু আজিকার এই সময়টিতে তাহার সে দীপ্ত জ্ঞানজ্যোতিঃ, এক স্বচ্ছ বাষ্পজালে ঢাকিয়া গিয়াছিল, মাতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—কঠিন আজ্ঞা ব্যতীত এই ব্যাপারে আর কোথায় কি আছে তাহা সে অনুভব করিতে পারিল না।

আহারের পর রুডিগার জেদ্ করিয়া ম্যাগনসকে লইয়া তাঁহাদের বাগান দেখিতে চলিয়া গেলেন।—তাহার পর আলরিকও ভগিনীকে ইঙ্গিত করিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, ঘড়ি খুলিয়া রাওয়েল বলিলেন "আর এক ঘণ্টা সময় জুলিয়েন, শীঘ্রই ফিরিতে হইবে ; সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শোন্‌ওয়ার্থে পৌছিতে হইবে।"

"আমার আধ ঘণ্টাও বিলম্ব হইবে না।"

পাশের ঘরে আসিয়া আলরিক কনিষ্ঠাকে বলিলেন "তবে আর সময় কৈ ? তুমি কাপড় বদলাইয়া লও লিয়েন্।"

জুলিয়ান কথা না বলিয়া টেবিলের পাশে নীরবে দাঁড়াইয়া ছিলেন ; আলরিক অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া শান্তভাবে বলিলেন, "মন সুস্থ কর লিয়েন—মন স্থির কর। যতদূর দেখিলাম তোমার স্বামী মন্দ লোক নহেন, আশা করি শোন্‌ওয়ার্থে তুমি সুখেই থাকিবে।"

সে আশা যে নব বিবাহিতা জুলিয়েনের মনেও ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুচ্চাঞ্চল্যের আলোক-লীলার ন্যায় চলিতে ছিল না এমন নয়. তবু আজন্মের সাথী ভ্রাতা ভগিনীর সঙ্গ ছাড়িয়া অপরিচিত নূতন ঘরের অজানিত রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে এই স্বাভাবিক শঙ্কায় তাহার স্নেহ-বিয়োগ-বিধুর কোমল চিত্তটি বিক্ষুব্ধ—দোলায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী! শুধু এই একটি পরিচয়ের রঙীন আবরণ দিয়া যে আলোকরশ্মি ছুটিয়া আসিয়া তাহার নব যৌবন-তরল হৃদয়খানিতে মুহুর্মুহু রামধনুর ছায়া ফেলিয়া যাইতেছিল, একটি দীর্ঘ বলিষ্ঠ সুঠাম আকৃতি সুমিষ্ট হাসিমুখে তাহার মানস-পটে ভাসিয়া ভাসিয়া উঠিতেছিল; তাহারই পার্শ্বে এ স্নেহময়ী আলরিকের সারা জীবনের অজস্র প্রীতির অজস্র বর্ষণ স্মৃতি-মধুর ভাবটি উদয় হইতেই, জুলিয়েনের নূতনের মোহাবিষ্ট প্রাণও সবেগে বলিয়া উঠিল, "না না না—এমন কোথাও নাই, এ সামগ্রী আর কোথায় পাইব?"

আলরিক ভগিনীর অন্তরের এই সন্দেহ বেদনার বিপন্ন-মধুর মূর্ত্তিটি লক্ষ্য করিয়াই দেখিতেছিলেন, তাঁহার নিজের হৃদয়েও একটি দোলায়মান ব্যথা ঘুরিয়া ফিরিয়া যাওয়া আসা করিতেছিল, কিন্তু সবলে তাহার গতিরোধ করিয়া তিনি জুলিয়েনের নিকটে আসিয়া পিঠে আদরের করাঘাত করিয়া বলিলেন "আর না, আর সময় নাই রে দিদি, চল্ তোর কাপড়চোপড়গুলা ঠিক্ করিয়া দিই, তুই ততক্ষণ কাপড় ছাড়িয়া আয়।"

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই জুলিয়েন বাদামী রঙ্গের একটি সাধারণ পোষাক পরিয়া ভগিনীর নিকট আসিয়া বলিলেন "আলরিক চল না ভাই আমরা একবার সেই ছবির ঘরটা দেখিয়া আসি।"

সেই প্রকাণ্ড ঘরের পূর্ব্বাপর সমস্ত চিত্রের সম্মুখেই দিয়ন একবার দাঁড়াইল যেন ভক্তিভরে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছে! অবশেষে পিতার মূর্ত্তির নিকট আসিয়া তাহার মন আর বাধা মানিল না, দুই চক্ষু ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

আলরিক এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া ছিলেন, এইবার সরিয়া জানালার কাছে গিয়া বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইলেন, তাঁহার চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। সময় চলিয়া যাইতেছে অশ্রুসংবরণ করিয়া জুলিয়েনও ধীরে ধীরে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

সম্মুখে বৃহৎ উদ্যান, গৃহস্বামীদের সঙ্গে তাহারও যে পূর্ব্বের গৌরব নষ্ট হইয়াছে তথাপি মাদাম ও জুলিয়েনের আন্তরিক যত্নে এখনও তাহাতে বৃক্ষলতাবহুল ঘন গম্ভীর শ্যামশ্রী বর্ত্তমান; সে দিকে চাহিলেই চক্ষু জুড়াইয়া আসে।

জুলিয়েন নিকটে আসিয়া বলিল "কি দেখিতেছ?"

"তোমার স্বামী!"—বলিয়া আলরিক হাসিয়া মুখ তুলিলেন।

সমস্ত প্রাসাদটি বেষ্টন করিয়া একটি স্বল্প পরিসর পথ, উদ্যানের ভিতর হইতে তিন চারিটা পথশাখা আসিয়া তাহাতে মিশিয়াছে। এই বাতায়নলগ্ন নীচের পথে, রাওয়েল ও কভিগার দাঁড়াইয়া সিগারের ধূমের সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন।

জুলিয়েন চলিয়া যাইতে উদ্যতা হইতেই শুনিল তাঁহারা যেন তাহারই সম্বন্ধে কি বলিতেছেন; তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেইখানে দাঁড়াইয়া আলরিকের ন্যায়ই মনোযোগী হইয়া কথাগুলি শুনিতে লাগিল। স্বামী তাহাকে কি চক্ষে দেখিলেন এটুকু জানিবার জন্য স্ত্রীলোক মাত্রেরই কৌতূহল থাকে।

কডিগার বলিলেন, "কৈ মাইনো, তুমি যেমন বলিয়াছিলে—তোমার স্ত্রী তো তেমন বিশ্রী নন্! কোথায় সে পাংশা পাংশা লাল চুল? একটু পূর্ব্বে যে তিনি চুল খুলিয়া বসিয়াছিলেন; দেখিয়াছ কি,—এমন রেশমের মত চিকন সুন্দর—লতার মত কুঞ্চিত চুল যে খুব কম দেখা যায় ভাই!"

এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া তাঁহার অভ্যস্ত পরিহাসের হাসির সহিত রাওয়েল বলিলেন "হাঁ, লাল চুলো ট্রেচেনবার্গ-দিগের চেয়ে একটু ভাল বটে!"

"থাম, তোমার হাসি আমার ভাল লাগিতেছে না রাওয়েল, এতই যদি অপসন্দ—তবে তাঁহাকে বিবাহ করিলে কেন?"

"বিবাহ? কতবার তোমায় এ কথার উত্তর দিব কডিগার, বিবাহ কি আমি পসন্দ অপসন্দ বা অননি কোন হিসাবে করিয়াছি? শোনৃওয়ার্থের গৃহিণী নাই, ইহাকে লইয়া গিয়া আমি সেই অভাব পূরণ করিব। লিয়োর গবর্ণেস বিবাহ করিয়া শীঘ্রই চলিয়া যাইবে তখন তাহাকে দেখিবার জন্য একটি স্ত্রীলোকের প্রয়োজন, তুমি জান ত আমি বাড়ীতে থাকিতে ভালবাসি না। কিন্তু লিয়োর জন্য বাহির হওয়া কঠিন হইয়াছে। এবার ইহার হাতে সংসার দিয়া আমি নিশ্চিন্তে পূর্ব্বাঞ্চল যাত্রা করিব।"

সর্ব্বনাশ! স্ত্রী নয়—তুমি তবে গবর্ণেস লইয়া যাইতেছ বল?"

"এক রকম তাই। আমার পুত্রের যত্ন ও সংসারের শান্তির জন্য—"

"রাওয়েল—রাওয়েল, কি বলিতেছ তুমি? ঐ শান্ত বিনীত স্বভাবা সুন্দরী স্ত্রীকেও তুমি ভালবাসিতে পারিবে না!"

"আবার ঐ কথা! এ বিবাহে ভালবাসাবাসির যে কোন সম্বন্ধ নাই এ কথা তোমায় সেই দিনই জানাইয়া দিই নাই কি? কেন বার বার সে কথার উল্লেখ করিয়া—"

আর শোনা হইল না, আলরিকের কণ্ঠ হইতে অস্ফুট চীৎকার বাহির হইল, "লিয়েন—লিয়েন, কি ভয়ানক! এ কি হইল?"

জুলিয়েনের মুখও পাংশু বর্ণ, চক্ষু অস্বাভাবিক। কিন্তু আলরিক যখন তাহাকে জড়াইয়া থর থর কাঁপিতে লাগিল, তখন সে প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল, মৃদু স্বরে বলিতে লাগিল "ভালই হইল আলরিক, তুমি এত বিচলিত হইলে কেন? নিজের অবস্থার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকা অপেক্ষা এই ভাল নয় কি? ইহার পর—এই সব কথা শোনার পর, আমি আমার নূতন জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সাবধান ও প্রস্তুত হইতে পারিব। স্থির হও দিদি আমার স্থির হও।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া আলরিক মুখ তুলিলেন, নীচের পথে জননীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া দুই ভগিনীই আবার উৎকর্ণ হইয়া সেই দিকে চাহিলেন। কাউণ্টেস তখন তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠা প্রিয়তমা কন্যার বিদায় উপলক্ষে অনেক দুঃখ এবং সে যে উপযুক্ত স্থানে যাইতেছে সে জন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিতেছিলেন, "মেয়ে আমার বড় শান্ত কিন্তু বড় অভিমানী রাওয়েল, তুমি তাকে ক্ষমা করিয়ো, তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিয়ো।"

হাসিয়া রাওয়েল বলিলেন "কেন এ কথা বলিতেছেন আপনি? আমায় দেখিয়া কি অভদ্র মনে হয় আপনার? তাহার সহিত অসদ্ব্যবহার—না না সে হইতেই পারে না। সে আমারই স্ত্রী, এ সম্মান তাহার সম্পূর্ণ থাকিবে, তবে

যদি আপনি সাধারণের মত ভালবাসার কথা বলেন, সে তো আমি আপনাকে বলিয়াছি, ও সব আমি ভালবাসি না। আর এত মূর্খও নই যে অকারণে—বিবাহ করিয়াছি মাত্র এই দাবাতে স্ত্রীর কাছে ভালবাসার দাবী করিব!"

"না না, ও সব ভালবাসা টাসা আমারও ভাল লাগে না। ও সব শুধু ঢঙং, বাজে লোকদের বিবাহের পূর্ব্বের একটা বাঁধা গৎ মাত্র। সংসারে যদি সুখ থাকে—"

"হাঁ তাহাই আমি চাই, সংসার নির্ঝঞ্ঝাটে আর শান্তিতে থাকে এই আমার ইচ্ছা।"

হাসি মুখে কাউণ্টেস্ বলিলেন "তাহার জন্য তোমার কোন ভাবনা নাই, আমার লিয়েনকে আমি যতদূর জানি, সে তোমার শান্তি ভঙ্গ করিবে না। কিন্তু রাওয়েল্, একটা কথা,—তুমি তাহাকে পকেট খরচ কত দিবে?"

কাউণ্টেস্ লক্ষ্য করিলেন না কিন্তু উপর হইতে জুলিয়েন ও আল্‌রিক দেখিলেন,—যুবা ব্যারণের মুখে ঘৃণার বিদ্রূপ হাস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। জুলিয়েন সরিয়া গিয়া বলিল, "আর না আল্‌রিক্, আর না! চলিয়া এস ওখান হইতে।"

আল্‌রিক প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় অচল হইয়া জুলিয়েনের দিকে চাহিয়াছিলেন। নাচ হইতে রাওয়েলের স্বর শোনা গেল, "আমার পূর্ব্ব স্ত্রীকে যাহা দিতাম, চারিশত গিনি,—ইঁহাকেও তাহাই দিব।"

"চারিশত গিনি? এ টাকা সে স্বয়ং খরচ করিতে পাইবে?" মাতা বলিলেন।

"নিশ্চয় পাইবে, সে জন্য স্ত্রীর নিকট আমি হিসাবও চাহিব না!"

রাওয়েলের উত্তেজিত প্রফুল্ল কণ্ঠ জুলিয়েনেরও কর্ণে আসিল, সে চলিয়া যাইতেছিল, আল্‌রিক তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "লিয়েন, মার হাসিটা দেখিয়া যাও, ভগবান্! জুলিয়েন্"—

বিকৃতকণ্ঠে জুলিয়েন বলিল, "হাঁ প্রথমে যাঁহার নাম করিলে তাঁহাকে ডাকিয়া দেখ তিনি যদি তোমার এ লজ্জার পরও মনে শান্তি দিতে পারেন ত দিন্, আর শোনওয়ার্থের বেতনভোগিনী গৃহকর্ত্রী তাহার প্রভুর কার্য্যে চলিল, সে আর তোমাদের কেহ নয়।"

জুলিয়েন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়াছিলেন, এমন সময় পাশের ঘরের সম্মুখ হইতে ম্যাগনসের স্বর শোনা গেল;—"বুঝিয়াছি; তোমরাও ঐ সমস্ত কথাই শুনিলে; নয় আল্‌রিক?"

আল্‌রিক উত্তর দিলেন না কিন্তু ভ্রাতার মুখের দুরন্ত লজ্জা, সহনাতীত বেদনার কালিমামূর্ত্তি দেখিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "শুনিয়া আর কি করিব ম্যাগনস্, মাকে ত জানই।"

"আমি মার কথা বলিতেছি না, কিন্তু থাক আর সকল কথাই,—যাহার উপায় নাই সে জন্য—লিয়েন, বোনটি আমার! তোমার যাইবার সময় হইয়াছে, উঁহারা গাড়ীবারান্দার দিকে গেলেন। এস, একবার তোমার দাদার কাছে এস দিদি!"

লিয়েন নিকটে আসিলে তাহার উভয় স্কন্ধে হাত রাখিয়া স্নিগ্ধ করুণ স্বরে ম্যাগনস্ বলিলেন, "সংসারে যদি কিছুই না পাও লিয়েন্, তবু মনে করিয়ো—এই রুডিসডর্ফ তোমায় প্রাণপণে স্নেহ দিতেছে, আর—"

কাউণ্টের স্বর গাঢ় হইয়া গেল। আল্‌রিক মুখ নীচু করিয়াছিলেন,—ভ্রাতার স্নেহপাশ হইতে মুক্তি পাইয়াই লিয়েন তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল, ব্যগ্রভাবে বলিল, "যতই কাজ থাক যাই হোক্ তুমি আমায় পত্র দিতে বিলম্ব করিও না দিদি!"

"তুমি কি বল লিয়েন, আমার কায"—

আল্‌রিকের কথা শেষ হইল না, সিড়ি হইতে মাতার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ডাকিল,—"ম্যাগ্‌নস্—ম্যাগ্‌নস্, কোথায় ইহারা? রাওয়েল বলিতেছেন যে আর সময় নাই।"

"চল।" বলিয়া জুলিয়েন তাহার বিবাহের ওড়নাখানি তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইল। সঙ্গে পদশব্দ না শুনিয়া সে দ্বারের নিকটে গিয়া ফিরিয়া দেখিল, ভ্রাতা ও ভগিনী তখনও স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়াই আছেন;—তখন আবার ডাকিল, "কি হইল,—তোমরা এস ম্যাগনস্।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ফিরিবার সময় তাঁহারা ট্রেণে আসিতেছিলেন। ষ্টেশনের বাহিরে ব্যারণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্ব-শকট তাঁহাদের জন অপেক্ষা করিতেছিল। এই গাড়ীখানি অত্যন্ত মূল্যবান, আসন পর্দ্দা ইত্যাদি শুভ্র সাটিনে মণ্ডিত, পাদপীঠে বিচিত্রবর্ণ দীর্ঘ লোমশ পশুর চর্ম্মে আবৃত।

রাওয়েল স্ত্রীকে তুলিয়া দিয়া নিজে অশ্বরশ্মি ধরিলেন। রুডিগার সম্মুখে বসিলেন। সে দিনটি পরিষ্কার, সন্ধ্যা পূর্ব্বাহ্নের রক্তিম আলোকে চারিদিক প্রসন্ন। শুষ্ক পথ বহিয়া বেগবান অশ্ব ছুটিয়া চলিয়াছে। উন্নত সেই প্রফুল্ল মুখ ব্যারণ মাইনো আপন মনে তেজস্বী অশ্বকে সম্বরণ করিয়া যাইতেছেন। সেই শোভন সুন্দর চাকচিক্যময় শকটে, দিব্যকান্তি পুরুষের পার্শ্বে সামান্য পরিচ্ছদ পরিহিতা ক্ষীণাঙ্গী জুলিয়েনকে বড় বিসদৃশ দেখাইতেছিল। সে স্বামীর নিকট হইতে যথাসম্ভব দূরেই বসিয়াছে, কিন্তু তাহাতে সে পরিণয় যাত্রাটি আরও শ্রীহীন হইয়াছিল। রুডিগার অন্যমনস্ক, অন্য দুইজনও এ পর্য্যন্ত বাক্যালাপও করেন নাই।

গাড়ী সহরের পথ ছাড়িয়া মাঠের পাশ দিয়া চলিয়াছে, এমন সময় অদূরে দ্রুতগামী অশ্বপদশব্দ শোনা গেল; মাইনো আপনার শকটের গতি ধীর করিয়া পাশ দিয়া চলিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সসহচরী ডাচেসের সজ্জিত অশ্বদ্বয় তাঁহাদের পার্শ্বে উপস্থিত;—মুহূর্ত্তমাত্র,—রুডিগার ও রাওয়েল টুপি তুলিয়া ধরিলেন, জুলিয়েনও বিস্মিত দৃষ্টিতে সেই অপরূপা সুন্দরীর দিকে চাহিয়াছিলেন। নিমেষ মধ্যেই তাঁহারা অদৃশ্য হইলেন কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লিয়েন দেখিলেন নিমেষ মধ্যে সেই সুন্দরীর চক্ষুদ্বয় জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। ভয়ে সে স্বামীর প্রতি মুখ ফিরাইতেই দেখিল, বিদ্রূপের উচ্ছ্বসিত হাসিতে তাঁহার বদনকান্তি প্লাবিত, চক্ষুতে যেন বিজয় গর্ব্ব ফাটিয়া পড়িতেছে! সে বুঝিল ইঁহারা পরস্পরে সুপরিচিত এবং—সে ভাবটি নানাবিধ ঘনিষ্ঠ বন্ধনে সুখদুঃখ জড়িত।

ডাচেসের অশ্বশকট সম্মুখ হইতে একটু দূরে সরিতেই শোনা গেল সহচরী বলিতেছে, "ব্যারণের পাশে এই সন্ন্যাসিনীর মত—ওটি কে?"

দূর হইতে ডাচেসের হাস্য বিজড়িত কণ্ঠ শোনা গেল, "সেই লালচুলো ট্রেচেনবার্গ—" জুলিয়েন আর একবার স্বামীর প্রতি চাহিল, তিনি কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ না করিয়া আরও বেগে অশ্ব চালাইতে লাগিলেন।

ক্রমে দূরে শোন্‌ওয়ার্থের উচ্চ অংশগুলি দেখা যাইতে লাগিল; জুলিয়েন দূর হইতে এ দৃশ্যটি পূর্ব্বেও দেখিয়াছে, কিন্তু ক্রমশঃ যত নিকটে আসিতেছিল প্রাসাদসমূহের অভিনব দৃশ্যে সে ততই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইল। নিজের তাৎকালিক অবস্থা বা ঘটনা ক্ষণকাল তাহার মন হইতে মুছিয়া গিয়া সেই দৃশ্যে সে অভিভূত হইয়া পড়িল।

সত্য, সেই প্রাসাদ সম্মুখের উদ্যানাংশের আকৃতি প্রকৃতি সমস্তই নূতন ধরণে রচিত. সেখানের বৃক্ষ লতা, সজ্জা প্রণালী, সমস্তই প্রাচ্যদেশসুলভ। উদ্ভিদ পরিচিতা জুলিয়েন চিনিল, সে তরুগুল্মের অধিকাংশ সুদূর ভারতবর্ষের। উদ্যান হইতে নানাবিধ পক্ষীর কলরব শোনা যাইতেছিল, স্বরে বোঝা গেল তাহারাও সেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসী। উদ্যানের মধ্যভাগে, তেমন নূতন ছাঁদের একখানি ক্ষুদ্র বাসগৃহ, অনুমানে বোধহয় তাহাও নূতন অবস্থায় অত্যন্ত সুশ্রী ছিল কিন্তু সংস্কার অভাবে শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

লিয়েনের আশ্চর্য্য ভাব দূর হইতে না হইতে গাড়ী সে বিহগকুজিত স্থানটি ছাড়িয়া সেতুর উপর দিয়া চলিল। শোনওয়ার্থ প্রাসাদ ও সেই কুঞ্জভবনটির মাঝ দিয়া একটি প্রশস্ত ঝিল্ উদ্যানের মধ্যে বহিয়া গিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বকে সংযুক্ত করিতে মাঝেমাঝে সেতু; দুইটি ভবনকে এক করিবার জন্য যে সেতুটি,—তাহা সুদৃশ্য কিন্তু অনতিদূরের প্রশস্ত সেতু—যানবাহনাদির জন্য প্রস্তরে সুদৃঢ় নির্ম্মিত।

তখন প্রায় সন্ধ্যা; নবনির্ম্মিত শোনওয়ার্থের শোভা ও সম্পদ রাজভবনোচিত, জুলিয়েন বুঝিল, তাহার স্বামীর ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে তাহার যা ধারণা ছিল, তিনি তাহা অপেক্ষা আরও অনেক—অনেক উচ্চে; বিলাস ও আহারের প্রচুর আয়োজন তাঁহার মুখ চাহিয়া রহিয়াছে।

গাড়ী দ্বারে আসিতেই পরিচারকেরা প্রভুর সম্বর্দ্ধনা করিতে ছুটিয়া আসিল। কোচম্যানের হাতে রাশ ফেলিয়া মাইনো আগেই নামিয়া পড়িলেন। ভৃত্যের উদ্দেশে বলিলেন, "কৈ কমলা লেবুর ফুল—মালা, সে সকল কোথায়?"

"সে সকল—প্রভু,"—

"নাই? আরনেষ্ট, তোমরা কি পাগল হইয়াছ না কি? বিবাহের পর—"

"হাঁ প্রভু তা সকলই জানি, আনিতেও ছিলাম, কিন্তু—"

"ইহার মধ্যে আবার কিন্তু কি হইল! বিবাহ দিনে যা হইয়া থাকে তাহার—"

ব্যারণের রক্তবর্ণ চক্ষুর প্রতি চাহিয়া সভয়ে ভৃত্য বলিল, "মার্জ্জনা করুন প্রভু, আমাদের কোন দোষ নাই, হুপ্ মার্শেল আদেশ দিয়াছেন যে এ বিবাহে কোন আনন্দ প্রকাশ করিতে পাইবে না। বলিলেন—আজ স্বর্গীয়া ব্যারণেসের জন্য শোক প্রকাশের প্রয়োজন, আজ—"

"হাঁ বুঝিয়াছি, থাক্!—" বলিয়া রাওয়েল্ স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন; "আমি তোমার কাছে লজ্জিত হইতেছি জুলিয়েন, আজিকার উপযুক্ত অভ্যর্থনা আমি তোমায় দিতে পারিলাম না। কিন্তু একটি কথা; ঐ যাঁহার নাম শুনিলে, হুপ্ মার্শেল—, তিনি আমার কাকা এবং তিনিই আমার প্রথমা স্ত্রীর পিতা। বুঝিয়াছ আমার কথা?"

জুলিয়েন তাহার প্রতি চাহিয়া ঘাড় নাড়িল। রাওয়েল আবার বলিলেন, "আমরা এখন তাঁরই কাছে যাইব,—বুঝিলে? দেখিয়ো----মনে থাকে যেন!—"

"হাঁ থাকিবে।—" বলিয়া জুলিয়েন নামিতে উদ্যত হইলে রাওয়েল্ নিকটে আসিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন।

শান্ত ও সবল হৃদয়া জুলিয়েন এতক্ষণ নিজের অবস্থার সহিত আপনাকে স্থিরভাবেই সহ্য করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু এইবার তাহার সে নিস্তরঙ্গ হৃদয়ে কল্লোল বাজিল। কিছুদিন পূর্ব্বে সে তাহার এক সখীর বিবাহে সঙ্গিনী ছিল, সে বিবাহের বর বধূর হাতকে গাড়ী হইতে নামাইয়া আপনার ঘরে লইয়া গেল;—সে দিনের সেই দৃশ্যটি

আজ হঠাৎ লিয়েনের মনে পড়িল। রাত্রির অন্ধকার আগ্রহে প্রদীপকে বরণ করিয়া লয়, তেমনি সে ব্যগ্র আনন্দ, তেমনি আলোকদীপ্ত মুখ,—সে বাহু প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে যুবকের সমস্ত প্রাণটি যেন লুইয়া পড়িয়াছিল!—

আর তাহার দিকে যে হস্ত অগ্রসর হইয়াছে? রাওয়েল্ তখন পত্নীর দিকে এক হাত দিয়া অন্য হস্তের আঙ্গুলি নির্দ্দেশে সম্মুখের সমস্ত আলোগুলি জ্বালিয়া দিবার জন্য ভৃত্যদিগকে আদেশ দিতেছিলেন! জুলিয়েন আর ভাবিতে পারিল না, বিনীত ভদ্রভাবে স্বামীর হাতে হাতটি দিয়া নামিয়া আসিল।—

সোপান শেষ হইলে সুবিস্তৃত ড্রইংরুমের ভিতর দিয়া তাঁহারা অন্য দিকে যাইতেছিলেন। গৃহের দুই পার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ দর্পণ, তাহাতে দুই জনেরই পূর্ণ মূর্ত্তির ছায়া পড়িতেছে ; দৃষ্টি পড়িতেই জুলিয়েন্ চমকিত হইল। যথার্থই ত, তাহার সঙ্গী ঐ পরমসুন্দর পুরুষ ; ভাবভঙ্গী-সাজসজ্জা-গতি ও দৃষ্টি, প্রত্যেকটিতেই যাঁহার উন্নত মহিমার উচ্চ গরীমা স্ফুটতর হইতেছে ; তাঁহার আর পার্শ্বে কি এই চিন্তাক্লিষ্টা, বিষণ্ণ নতনয়না—সামান্য বেশ পরিহিতা লিয়েন কে শোভা পায়?—এই দৃষ্টির মধ্যেই সহসা জুলিয়েন দেখিল, তাহার স্বামীর চক্ষুও দর্পণের ভিতর দিয়া তাহার দিকে চাহিল!—তাহাতে ভ্রূক্ষেপ জিনিষটি অতি সামান্য কিন্তু সেই হাসি!—কিসের ও পরিহাসহাস্য? কার উদ্দেশে?—

আরও একটি সোপান উঠিয়া তাঁহারা একটি সজ্জিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। একটি চক্রযুক্ত বৃহৎ অ সনে বৃদ্ধ হপ্‌মার্শেল বসিয়াছিলেন, বাতের বেদনায় তাঁহার সর্ব্বশরীর অবশ,—গতি শক্তি নাই বলিলেই হয় তাই সর্ব্বদাই এই কোমল মখমলমণ্ডিত চেয়ারটিতে বসিয়া থাকেন ও ভৃত্যেরা সেটিকে টানিয়া এঘরে ওঘর লইয়া যায়। যন্ত্রণায় তাঁহার মুখ বিকৃত, হাতের আঙ্গুলগুলি অসম্ভবভাবে বাঁকাইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধকে দেখিয়া লিয়েনের মন পীড়িত হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিতে বাধ্য হইল, সেখানে একটি শীর্ণকায় সুন্দর বালক জানু পাতিয়া বসিয়া আছে—তাহার দুইহাতে দুটি বিষমভারযুক্ত প্রকাণ্ড পুস্তক স্থাপিত ; দেখিলেই বোধ হয় বালক অত্যন্ত কাতর হইয়াছে, মুখখানি নীল হইয়া আসিতেছে—কষ্টেই সে অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া আছে।—

বালকের পাশেই দাঁড়াইয়া আর একটি শিশু, তাহার হাস্যমধুর মুখটি দেখিয়াই লিয়েন বুঝিল এই সেই ব্যারণের মাতৃহীন পুত্র। সে পিতাকে দেখিয়া উল্লাসধ্বনি করিয়া ছুটিয়া আসিল।

রাওয়েল্ বলিলেন, "কাকা, এই আমার স্ত্রী।"

বিকৃত মুখে বিকৃত হাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "তা বুঝিয়াছি ; কিন্তু আমি এই যুবতী লেডীকে কুমারী ট্রেচেনবার্গ বলিয়াই অভ্যর্থনা করিলাম, কারণ তোমার বিবাহকে আমি এখনও ধর্ম্ম বিবাহ বলিয়া স্বীকার করি না রাওয়েল্! আমরা ধার্ম্মিক কাথলিক, ঐ নাস্তিক্ বেল্লিক প্রটেষ্টাণ্ট মতে বিবাহকে—বিবাহ বলিতেও চাহি না।"

তাঁহার কথায় রাওয়েল্ বিরক্তভাবে বলিলেন ; "থামুন কাকা, এ অন্যায় হইতেছে! আমি যাঁহাকে স্ত্রী বলিয়া ঘরে আনিয়াছি তাঁকে—তাঁর সম্মুখে এ সকল কথা—"

"না, তাতে তাঁর কোন অপমান হইবে না! আমাদের ধর্ম্মে যা স্বীকার করে না আমিও তা স্বীকার করি না, ইহার মধ্যে অন্যায় কোথাও নাই। তুমি কোর্টচ্যাপ্‌লিন কে খবর দাও, আমাদের চর্চ্চে, আমাদের ধর্ম্মমতে আবার এই রমণীকে বিবাহ করিতে হইবে।"

জুলিয়েন্ মুখ হেঁট করিয়াই ছিল, এই সকল কথায় মাথাটি আরও নত হইয়া গেল। রুষ্টভাবে রাওয়েল বলিলেন, "আমি অত পারিব না, আপনার যা খুসি আপনিই করুন।"

"নিশ্চয় তা করিব।" বলিয়া নিকটের পরিচারককে আদেশ দিলেন যে শীঘ্র চ্যাপ্লেনকে ডাকিয়া আন।"

হঠাৎ রাওয়েল্ বলিয়া উঠিলেন, "ও কি, গেব্রিয়েল্ ওখানে—কি হইয়াছে কাকা? ও কি দোষ করিয়াছে আজ? আঃ—বড় কষ্ট পাইতেছে যে!"

হপ্‌মার্শেল উত্তর দিলেন; "বড় দুষ্ট বড় ধূর্ত্ত বালক ঐ গেব্রিয়েল—"

"না বাবা না, গেব্রিয়েল্ কোন দোষ করে নাই—

দৌহিত্রের কথায় গর্জ্জন স্বরে বৃদ্ধ বলিলেন, "চুপ কর দুষ্ট ছেলে!—তোর বজ্জাতিতেই আমি—হাঁ রাওয়েল, লিয়ো যে আজকাল এত দুষ্ট এত অসভ্য হইয়াছে, কেবল ঐ ছোটলোক চাকরটার দোষে। এত অবাধ্য—মুখের উপর যা খুসি তাই বলা, সব ঐ নষ্ট ছোক্‌রার নষ্টামিতে, তাই আজ উহাকে এই দণ্ড দিয়াছি, দিনমান ও অমনি-ভাবে বসিয়া থাকুক তাহা হইলে বুঝিবে যে নষ্টামির শাস্তি কেমন?

এই অদ্ভুত বিচার দেখিয়া লিয়েন স্তম্ভিত হইল, বালক গেব্রিয়েলের ক্রমশঃ বর্দ্ধিত যন্ত্রণাও যেন আর দেখা যায় না; এমন সময় কঠিন স্বরে রাওয়েল বলিলেন "বটে, এত দুষ্ট এ?—আচ্ছা আজ গেব্রিয়েল—যা উঠিয়া যা।'

বালক মুক্তি পাইয়া বাঁচিল তা ভর্ৎসনায় হোক্ আর যাই হোক্। সে চলিয়া যায়—লিয়োও তাহার সঙ্গে চলিয়াছে দেখিয়া রাওয়েল ডাকিলেন "এদিকে এস লিয়ো, শোন!"

"কি?" বলিয়া শিশু ছুটিয়া তাঁহার জানু জড়াইয়া ধরিল। "তোমার মা আসিয়াছেন যে, তাঁহার কাছে যাইবে না?—জুলিয়েন, এই আমার লিয়ো—

হপ্‌মার্শেলের মুখ রাক্ষসের ন্যায় বিকট হইয়া উঠিয়াছে, তিনি কি বলিতে উদ্যত,—কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই জুলিয়েন সেই চপল শিশুকে কোলে তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন। অভাগিনী নারীর মনে কি হইতেছিল জানি না, কিন্তু সেই বালকের বোধহীন অন্তর তাহার স্পর্শে কি মধু রস পাইল,—অপরিচিতার মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া খানিকক্ষণ কি দেখিল; তাহার পর হঠাৎ ক্ষুদ্র দুটি বাহুতে জুলিয়েনের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিয়া উঠিল; "মা,—তুমিই আমার মা?—খুব সুন্দর মা ত', গেব্রিয়েল—গেব্রিয়েল, আমার মা দেখবে এস!"

রাওয়েল হাসিয়া ফেলিলেন, লিয়েনের ম্লান মুখেও মৃদু হাসি দেখা দিয়াছিল; সে লিয়োর মুখচুম্বন করিয়া বলিল,—"পাগলা ছেলে!"

লিয়ো উত্তর করিল "না আমি পাগলা নই,—রাস্তার সেই বেন্ বুড়া পাগল! দেখিয়ো মা, আমি খুব ভাল ছেলে, তোমায় খুব ভালবাসিব; বাবা তো তোমায় একটুও ভালবাসেন না, বলেন—তুমি খুব বিশ্রী, লম্বা—হাঁ বাবা ঠিক আমার মার চুল ত রাঁধুনী আনার মত লাল নয়,"—বলিতে বলিতে লিয়ো থামিয়া গেল; পিতার মুখের বিরক্ত ক্রুদ্ধ ভাব বুদ্ধিমান বালক বুঝিয়া ফেলিয়াছে। উপস্থিত সকলেই লিয়োর এই নীরবতার কারণ বুঝিয়াছিল, ক্রূর-হৃদয় হপ্‌মার্শেলের মুখে পিশাচের বক্রহাসি খেলা করিয়া গেল। তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন এ বিবাহে রূপ গুণ বা ভালবাসার কোন সম্বন্ধই নাই।

জুলিয়েনকে সেইখানে বসিতে বলিয়া রাওয়েল তাঁহাদের পুনর্ব্বিবাহের আয়োজনে বাহির হইয়া গেলেন। বৃদ্ধের নিকট বসিয়া থাকিতে লিয়েনের কেমন ভয় হইতেছিল। সে ভাবিয়াছিল, আর যাই হোক্ এই সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধকে সে নিজের পিতার আসনেই বসাইয়া সেবা ভক্তি উপহার দিবে; কিন্তু তাঁহার ভাব দেখিয়া সে স্নিগ্ধ শ্রদ্ধাটুকু মিলাইয়া গিয়া তাহার মনে আতঙ্ক আসিল।

লিয়োকে ধমক্ দিয়া বৃদ্ধ বলিলেন "কি করিস হতভাগা বালক! উঁহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিলি যে, নামিয়া আয় শীঘ্র।"

বালকের আপত্তি স্বত্ত্বেও লিয়েন তাহাকে নামাইয়া দিলে সে তাহার দাদা মহাশয়কে মুখ ভেঙ্গাইয়া পলাইয়া গেল। তখন তিনি জুলিয়েনের প্রতি চাহিয়া বলিলেন "ভাল কুমারি ট্রেচেনবার্গ, তোমাদের বাড়ীতে কি শিক্ষিতা দাসী নাই যে তোমার ঐ চমৎকার লাল লাল চুল কয়টি ভাল করিয়া সাজাইয়া দেয়? আসিবার সময় আয়নায় মুখটি দেখিয়াছিলে কি, তোমায় যে ঠিক্ নার্সের মত দেখাইতেছে।"

জুলিয়েন উত্তর দিল না, আজ ক্রমাগত লাল চুলের চর্চ্চা শুনিতে শুনিতে সে ক্রমেই অসহিষ্ণু হইতেছিল, এ যে তাহার পিতৃপিতামহের উদ্দেশে পরিহাস! সে ভাবিয়া পাইতেছিল না যে সামান্য চুলের জন্য, নাক মুখ চোখের জন্য মানুষের মনে এত হাস্যকৌতুক সৃষ্টি হয় কি করিয়া! আর যখন তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ বর্ত্তমান ছিলেন তখনও কি এই বিষয় লইয়া লোকে এমনি ভাব প্রকাশ করিত? এবার লিয়েন বুঝিল দোষ চুলের নয় এ অপরাধ দারিদ্রের, নতুবা বীর ট্রেচেনবার্গদের "রক্ত অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্ত" কেশের বর্ণনা যে সে পুরাগীতিতে শুনিয়াছে! তাঁহাদের জীবিতকালে কেহ এ রক্ত-কেশের দিকে লক্ষ্যও করে নাই; তাহারা চাহিয়া দেখিতেছে আজ যখন শত অপরাধে অপরাধী—দারিদ্র্য আসিয়া ট্রেচেনবার্গ বংশের শত গুণ নাশ করিয়া দিয়াছে।

জুলিয়েন আর কাহাকেও দোষী করিল না, দারিদ্র্যকে উপহাস—নির্ম্মম ও করুণ, কিন্তু তাহাও মানুষের স্বাভাবিক, এ কথা লইয়া রুষ্ট হইলে ত চলিবে না? সে স্তব্ধভাবে বসিয়াছিল, বিপুল পক্ষ বিস্তারী ধৈর্য্যের মৌন ম্লান ছায়া, তাহার বক্ষের রৌদ্র তেজকে আবৃত করিয়া তুলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। 'সান্ধ্য ভোজনের আয়োজন হইবে কি না,' প্রভুর নিকট এই প্রশ্নের উত্তরে সম্মতি পাইয়া ভৃত্যেরা তাহার আয়োজন আরম্ভ করিল।

স্বর্ণ রৌপ্য পাত্রে মূল্যবান্ আহারীয় নানাবিধ সুপের পানীয় পুষ্প পল্লবাদিরও প্রচুর উদ্যোগ: দেখিয়া চীৎকার করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "এ কি! তোদের আজ কি হইয়াছে? আমার আদেশ না লইয়া এই সব মহামূল্য খাদ্য আনিয়াছিস্ কেন? পাগল হইয়াছিস্ নাকি?"

প্রধান পরিচারক সসম্মানে জানাইল, এ সকল তাহাদের যুবা প্রভুর আদেশে হইয়াছে। আজিকার দিনের সান্ধ্যভোজনের জন্য তিনি এমনই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"আজিকার দিন—ওঃ; ভাল ভাল তাঁহার আদেশই পালন কর তবে, তাঁহার বোঝা উচিৎ ছিল যে ইহার অপেক্ষা অনেক কম আয়োজন করিলেও ট্রেচেনবার্গ কন্যা তাহা যথেষ্ট মনে করিতেন।"

এই সময় রাওয়েল সেখানে আসিয়া বলিলেন, "এই যে সব প্রস্তুত, ওদিকেও সব হইয়া গিয়াছে। বসুন কাকা, এস জুলিয়েন।"

এতক্ষণে লিয়েন কথা কহিল। স্বামীর প্রতি পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া শান্ত অথচ স্পষ্ট ভাবে বলিল, "আমি কি এখন আপনাদের সহিত আহারে যোগ দিতে পারি? আমায় যে নামে এখানে আনিয়াছেন, বুঝিলাম আমি এখনও সে নামে স্বীকৃতা হই নাই, অতএব"—

স্বল্পভাষিণী মৃদুস্বভাবা জুলিয়েনের মুখে এই স্পষ্ট স্বর শুনিয়া রাওয়েল যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু অবজ্ঞার হাসির সহিত হপ্‌মার্শল বলিলেন "সুন্দরী বালিকা, তুমি রাগ করিতেছ কেন? আমি তো কিছু অন্যায় বলি নাই, তোমাদের ও প্রটেষ্টাণ্ট মতটি যে স্বীকার করে না, সে এ বিবাহ মানিবে কেন? নাও এস, আহারে বস।"—

জুলিয়েন তাঁহার কথায় মনোযোগ না দিয়া স্বামীকে বলিল, "যতক্ষণ আপনাদের ইচ্ছামত সমস্ত গোল না মিটে, ততক্ষণ আমায় একটি আলাদা ঘর দিতে পারেন কি? একটু বিশ্রাম করি ততক্ষণ।" বলিয়াই সে দৃষ্টি অবনত করিল, কারণ ব্যারণ মাইনো তখন বিস্মিতভাবে তাহার প্রতি চাহিয়া ছিলেন।

হপ্‌মার্শেল বলিলেন, "খাইয়া যাও খাইয়া যাও, বিবাহে এখনও বিলম্ব আছে।"

"আমায় মার্জ্জনা করুন, এখন না।"

সম্মুখের এই মলিন মূর্ত্তি তরুণীর স্বরে সুসভ্য গরিমার গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করিয়া রাওয়েল প্রীত হইয়াছিলেন, ধীর ভাবে তিনি বলিলেন, "তাই হোক তবে, এখন চল তোমায় তোমার ঘর দেখাইয়া দিই। বসুন কাকা, আমি এখনই ফিরিতেছি।"—

বাটীর অপর প্রান্তে রাওয়েলের বাস কক্ষ সকল। তাহারই মধ্যে একটি ঘরে তাঁহারা প্রবেশ করিলেন। আকাশের ন্যায় কোমল নীলবর্ণে চিত্রিত সুন্দর গৃহখানি, তাহাতে আবশ্যকীয় নানাবিধ গৃহসজ্জা, নবাগতের আগমন প্রতীক্ষায় সে সমস্ত সুসংস্কৃত হইয়াছে। মাইনো বলিলেন, "এই ঘর এখন তুমি ব্যবহার কর জুলিয়েন, তবে তোমায় বলিয়া দিই, ঘর দ্বারের অপরিচ্ছন্নতা আমি সহ্য করিতে পারি না, তুমি দাসী চাকরদের বলিয়া দিও"--

জুলিয়েন বলিল, "না সে ভয় নাই বাড়ীতে আমি নিজেই সব করিতাম।"

হাসিতে হাসিতে মাইনো বলিলেন, "এখানে তাহার প্রয়োজন হইবে না—চাকরেরাই সব করিবে, তুমি শুধু দৃষ্টি রাখিয়ো। কেন বলিতেছি জান? ভ্যালেরি—আমার প্রথমা স্ত্রী,—তার এদিকে একেবারেই লক্ষ্য ছিল না, দাসী চাকরে যা খুসি করিত,—হাঁ জুলিয়েন তোমায় বলি, এ ঘরটিতে ভ্যালেরি থাকিত, ঐ পাশের ঘরের শয্যাতেই তাহার শেষ হয়।" এইখানে ব্যারণ একবার স্ত্রীর প্রতি সপ্রশ্ন নয়নে চাহিয়া আবার বলিলেন, "ভয় করিও না তুমি, সে তোমায় ভয় দেখাইতে আসিবে না নিশ্চয়, সে ধর্ম্ম কর্ম্ম বড় ভালবাসিত, সকলে তাহাকে চর্চ্চের প্রিয়তমা কন্যা বলিয়া ডাকিত।"—

ব্যস্তভাবে লিয়েন বলিল, "ভগবান তাঁর আত্মার কল্যাণ করুন, আমি ভয় কেন করিব? না না এ অসম্ভব কথা!"

"বেশ সে ভাল কথা, আমার বিশ্বাস যে স্ত্রীলোক মাত্রেই ভূতের ভয় করে।"

এই বার একটু হাসিয়া জুলিয়েন বলিল, "জানেন বোধ হয় প্রোটেষ্টাণ্টরা ভূতের ভয় করে না, ওসব বিশ্বাসও করে না?"

"তাই নাকি? আমি ও সব জানিনা, ধর্ম্মটর্ম্ম লইয়া আমি বেশী মাথা ঘামাই না জুলিয়েন, সবাই যা বলে তাই করি মাত্র। কিন্তু আমার মনে হইতেছে তুমি কিছু বিরক্ত হইয়াছ, নয় কি?"

"বিরক্ত—না" —

"হাঁ বিরক্ত বা অমনি কিছু হইয়াছে তোমার মনে। আমি তো তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে আমার কাকাই আমার পূর্ব স্ত্রীর পিতা, তাঁহার মনের ভাব লক্ষ্য করিলে" —

"সে জন্য নয়, তবে আমার মনে হইতেছে, যেন আমি আপনার উপযুক্তা নই, কি ভাবিয়া আপনি এ কাজ করিলেন জানিনা, কিন্তু আমি এখানে আসায় কেহই সুখী হইবে না তা বুঝিয়াছি।"

"হুঁ!" শুধু এই কথাটি বলিয়া মাইকেল কি ভাবিতে লাগিলেন। জুলিয়েন বলিল, "এখনো সময় আছে, আপনাদের মতে এখনও ত আমি এখানের কেউ নই, আর দ্বিতীয় বার ও সকল অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? আমায় আদেশ করুন আমি এখনি রুডসডর্ফে ফিরিয়া যাই।"

"আমাদের মতে? আমি কি বিবাহ অস্বীকার করিয়াছি জুলিয়েন? আর সে বিবাহ কি আইন সঙ্গত নয় বলিতে চাও? এ গণ্ডগোলটা কাকাই বাধাইয়াছেন, তাঁর পুরোহিতের কথানুসারে কতকগুলা কাজ করিতে তোমার আপত্তি কি বল দেখি?"

"কিছুই না, আমি শুধু আপনাদের অসুবিধার কথা ভাবিতেছি।"

"আমার কিছুতেই অসুবিধা হয় না। কাকার গোলের জন্যই এ হাঙ্গামে আমি মাথা দিয়াছি নতুবা এ সকলের কোন প্রয়োজন ছিল না, বুঝিয়াছ আমার কথা?"

জুলিয়েন কোন উত্তর দিল না দেখিয়া মাইকেল বলিলেন, "আরও একটা কথা, যেদিন বিবাহ সেই দিনই বিবাহচ্ছেদ, এর বড় হাসির কথা জুলিয়েন? ইহাতে হয় তো তোমার লজ্জা হইবে।" বাক্যশেষে ব্যারণ অত্যন্ত হাসিয়া উঠিলেন।

জুলিয়েন ধীরভাবে বলিল, "দেখুন যাহা ভাল হয় তা আপনি—"

"হাঁ তাই করিব; কিন্তু দেখ তুমি আমায় ঐ 'আপনি' 'আজ্ঞা' গুলি বলিয়ো না; সাধারণ লোকে তাহা ভাল বলিবে না, ঘরের চাকর দাসীরাও কি ভাবিবে বল দেখি?"

মৃদু হাসিয়া জিয়েন বলিল, "না আর তা বলিব না।"

"আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়ো।"

"অগত্যাই, কিন্তু—"

"না কিন্তু নয়, যা সকলে করে আমরাও তাই করিব। এখন তুমি প্রস্তুত হইয়া লও, শীঘ্রই কোর্ট চ্যাপলিনের আহ্বান আসিবে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ম্যাওয়েল চলিয়া গেলে একটি পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিহিতা যুবতী আসিয়া জুলিয়েনকে সম্মান জানাইয়া বলিল, "এখন আপনার পোষাক বদলাইতে হইবে কি ?"

লিয়েন বুঝিল এ দাসী, ধীর স্বরে উত্তর দিল, "হাঁ হইবে, তুমি—তোমায় কি বলিয়া ডাকিব বল দেখি ?"

হাসিয়া দাসী বলিল, "আমার নাম হানা ম্যাক্সিম, আপনি হানা বলিয়া ডাকবেন।"

গৃহের দুই চারিটা জিনিষ গুছাইয়া দিয়া হানা লিয়েনের চুল আঁচড়াইতে লাগিল। তখন বাহিরে রাত্রির অন্ধকার ঘন হইয়াছে, দূরের একটা বৃহৎ বৃক্ষে কোথাকার আলোর একটু আভা লাগিয়াছিল, সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া জুলিয়েন কি ভাবিতেছিল, ক্ষডিস্‌ডর্কে ফিরিবার কল্পনা এখনও তাহার মন হইতে মিলায় নাই। উপায় আছে, এখনও পথ আছে ; ব্যারণের নিকট একটু জোর করিলেই তিনি সম্মত হইবেন। তবে কেন ? লোক লজ্জা ? ট্রেচেনবার্গ পরিবার আজকাল এমন অনেক লজ্জাই ত সহ্য করে, তবে ? তবে কি,—কি জানি ? এ ফিরিবার কল্পনাতেও সে একটা বুকফাটা যন্ত্রণা পাইতে ছিল, ক্ষোভে লজ্জায় তাহার চক্ষে জল আসিল।

এমন সময় হানা ও জুলিয়েন এক সঙ্গে চমকিয়া উঠিল। বাতাসে কি একটা অস্ফুট করুণ ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে হানা হাসিয়া বলিল, "ওঃ বুঝিয়াছি ?"

"কি, ও কিসের শব্দ ?" লিয়েন বলিল।

হানা বলিল, "ও একটা বাজনার শব্দ, ব্যারনেসের খুব অসুখের সময় ঐ বাজনাটার শব্দে তাঁর ঘুম আসিত, তাই বাহিরে একটা গাছে সেটা বাঁধিয়া রাখা হয়—বাতাসে আপনি বাজে। বোধ হয় সেটা খোলা হয় নাই।"

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া লিয়েন শব্দটা শুনিতে লাগিল, তারপর ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "না হানা তা নয়, কোন বাজনার শব্দ নয়, শুনিতে পাইতেছ না—ঠিক কান্নার আওয়াজ। বাগানের ভিতর হইতে শব্দ আসিতেছে না ? খুব কষ্টে বড় যন্ত্রণায় মানুষ যেমন গুমরাইয়া কাঁদে,—শুনিতেছ ?

এবার হানা হাসিয়া উঠিল। কৌতুক ভরে বলিল, "বুঝেছি—বুঝেছি ও যে সেই—সেই ইণ্ডিয়ান্ উইচ্! তারি স্বর, ঠিক তারি কান্না !"

বিস্মিত হইয়া লিয়েন বলিল, "সে আমার কে ?"

"তাহাকে আপনি জানেন না লেডি, সে একজন যাদুকরী ডাইনী, আসিবার সময় পথে আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন কি ? নূতন ধরণের বাগান, বাড়ী, তার নাম ইণ্ডিয়ান হাউস, ডাইনীটা সেইখানে থাকে। তারি কান্নার শব্দ, মাঝে মাঝে এমন শোনা যায়।"

"ডাইনী ! হানা, ডাইনী কি ? সত্য সত্য ডাইনী আছে না কি ?"

"আছে বৈকি, ঐ তো সে ভারতবর্ষের ভীষণ ডাইনী, সে বাতাসে ভর করিয়া চলে, নানা রকম মূর্ত্তি ধরে"—

"তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ ?"

"ঈশ্বর রক্ষা করুন ! তাকে যেন আমায় দেখিতে না হয় ! বড় ভয়ানক স্থান লেডি, সেখানে কেহ যাইতে চায় না, ফ্রেলেন্ নাকি বড় সাহসী তাই সে তার সামনে যাইতে সাহস করে।"

"তবে তাহাকে রাখা হইয়াছে কেন? দূর করিয়া দেয় নাই কেন?"

"কি জানি! কিন্তু হপ্‌মার্শেল তাঁহার নাম পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারেন না, কেহ বলিলে তাহার উপর বড় রাগ করেন।"

কেশরচনা শেষ হইয়াছিল, মুখ হাত মুছিতে মুছিতে জুলিয়েন্ বলিলেন "অদ্ভুত গল্প ত!"

"গল্প নয় সত্য কথা, আপনি পরে সবই দেখিবেন। ঠাকুরাণি, আপনার জন্য কোন পোষাকটা বাহির করিব দেখুন ত!"

দাসীর সাহায্যে প্রসাধন শেষ করিয়া জুলিয়েন বাহিরে আসিয়া দেখিল দূরে রাওয়েল্ আসিতেছেন। সে থমকিয়া দাঁড়াইল। নিকটে আসিয়া ব্যারণ বলিলেন, "একি জুলিয়েন্ না কি? দূর হইতে আমি ভাবিতে ছিলাম যে,—অর্থাৎ অন্য কোন সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক আমাদের বাড়ী আসিয়াছেন। এ পোষাক এতো আমাদের বাড়ীর নয়!"

"না, এটা আমার ছিল।" জুলিয়েনের তখনকার পরিধেয়টি অত্যন্ত সুশ্রী ও মূল্যবান। হানার সজ্জা কৌশলে ও শোভাময় পরিচ্ছদে তাহাকে এত সুন্দর দেখাইতে ছিল যে রাওয়েল বিস্মিত হইয়া গেলেন। মৃদু মৃদু হাসির সহিত বলিলেন, "কৈ রুডিস্‌ডার্ক তো তোমায় কখনও এ সব পরিতে দেখিনাই?"

"কোন দরকার হয়নি তাই।"

"অন্ততঃ আজ সকালে—জুলিয়েন, তখনও কি—"

"তখন? আচ্ছা তুমিই বল দেখি, গরীব ট্রেচেনবার্গের মেয়েকে এমনি সাজে দেখিলে তোমার মনেই কি হইত? আমি সত্যই এ সব ভালবাসি না যদিও,—অকারণ এ আড়ম্বর, তবু দেখিলাম তোমরা সাজসজ্জা ভালবাস, তাই—"

"বেশ্ করিয়াছ! সুন্দর দেখাইতেছে।" বলিয়া রাওয়েল হাত বাড়াইয়া দিলেন।—

তাঁহারা আবার সেই মুকুর সজ্জিত কক্ষের ভিতর দিয়া চলিতে ছিলেন। ব্যারণ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, এবার তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনীর উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে তাঁহারই নিজের মূর্ত্তির প্রভাব হীন হইয়া গিয়াছে! বিবাহ সম্বন্ধের পর তিনি জুলিয়েনকে অনেকবার দেখিয়াছেন, কিন্তু সে যে একটি স্ত্রীলোক এই পর্য্যন্তই দেখা, তাহার রূপ গুণ আছে কি না সে বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্যও ছিল না। আজ তাহার প্রকাশিত সৌন্দর্য্যের সহিত চাপল্যলেশশূন্য মর্য্যাদা প্রকাশক গতিভঙ্গী দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, অর্থদারিদ্র উপস্থিত হইলেও রুডিস্‌ডর্কের ট্রেচেনবার্গ নামধারিরা এখনও সেই প্রাচীন উচ্চবংশের গৌরবতপ্ত শোনিত ধারণ করেন।—মাইনোর কৌতুক হাস্যময় মুখ এক পলকের জন্য রাঙ্গা হইয়া উঠিল।—

ক্যাথলিক চর্চ্চে বিবাহ, বাহ্যাড়ম্বর জাঁকজমকের সীমা ছিল না।—সোনারূপার সাজসজ্জায় আলোক-পুষ্প-বাদ্যাদিতে স্থানটি যেন অভিনয় গৃহের ন্যায় দেখাইতেছে, লিয়েনের মনেও অকস্মাৎ সেই রঙ্গস্থলীর আভাষ উদয় হওয়ায় অন্তরে অন্তরে অনুতপ্ত হইল, ইঁহাদের যে এই ধর্ম্ম—এই ব্যবস্থা!—

চেয়ারে হপমার্শেল বসিয়াছিলেন, আর তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মুণ্ডিত শ্মশ্রুগুম্ফ কোর্টচ্যাপলীন হিউগো। ব্যারণ দম্পতিকে দেখিয়া তিনি অগ্রসর হইয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তাঁহার মুখে বিস্ময় চিহ্ন সুপ্রকাশ, এতক্ষণ

ধরিয়া হপ্‌মার্শেলের নিকট 'লালচুল ট্রেচেনবার্গ কন্যার "যা বর্ণনা শুনিতে ছিলেন, এই লাবণ্যময়ী সুন্দরী কি সেই ? তিনি বিমূঢ়ের ন্যায় জুলিয়েনের প্রতি চাহিয়া আছেন দেখিয়া অভ্যস্ত হাসির সহিত রাওয়েল বলিলেন, "চিনিতে পারিলেন না ? ইনিই যে আমার—"

লজ্জিত হাস্যে চ্যাপ্‌লিন্‌ বলিলেন, "হাঁ চিনিয়াছি।"

বিবাহান্তে সকলে বাহিরে আসিলে লিয়ো দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিতেছিল। হপ্‌মার্শেল দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ও কি ?—লিয়ো কোথা হইতে আসিল ? গবর্ণেস্, উহার গবর্ণেস্ কোথায় ? ছেলেকে আট্‌কাইয়া রাখে না কেন সে ?"

"গবর্ণেস নাই" বলিয়া মিষ্ট হাসির তীক্ষ্ণ স্বরের হিল্লোল তুলিয়া বালক পলায়ন করিল। মার্শেল তখনও গর্জ্জন করিতেছিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

রাত্রিতে জুলিয়েনের সেই কক্ষটির দুয়ারে আসিয়া রাওয়েল বলিলেন, "শুভ-রাত্রি ! জুলিয়েন তুমি শয়ন কর গিয়া।" বলিয়াই উত্তরের অবকাশ না দিয়া দীর্ঘ পাদক্ষেপে তিনি চলিয়া গেলেন। জুলিয়েন এত ত্বরার জন্য প্রস্তুত ছিল না তাই প্রথমটা চমকিয়া উঠিল।

নিজের ভাগ্য তাহার অজ্ঞাত ছিল না, তবু এ সংসারে বা স্বামীর নিকট সে কতখানি কি পাইবে তাহা কখনও অনুমান করিতে পারে নাই, এখন এটুকু বুঝিল যে তাহাতে একাকী নিঃসঙ্গ জীবন গ্রহণ করিতে হইবে, স্বামীর সঙ্গে তাহার সংশ্রব থাকিবে না।

হানা আসিয়া তাহাকে শয়নের উপযুক্ত বস্ত্রাদি দিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু লিয়েনের তখন নিদ্রার ভাব বা শয়নের ইচ্ছা মাত্র ছিল না, লিখিবার বাক্স বাহির করিয়া সে একবার লিখিতে বসিল, কিন্তু তাহাতেও মন লাগে না যে ! অবশেষে উঠিয়া পাশের উপবেশন গৃহে আসিয়া হানার সজ্জার উপর নিজেই নিজের জিনিষগুলি গুছাইতে লাগিল।

সেই ঘরে—সম্মুখেই রাওয়েলের সুবৃহৎ তৈলচিত্র লম্বিত, জুলিয়েন ভাল করিয়া স্বামীর মূর্ত্তিখানি দেখিল। ছবির নীচেই একটি ছোট ড্রয়ার টেবিল, উপরেই তাহার চাবিটি ধরা আছে। তাহারই প্রয়োজনীয় কিছু থাকিতে পারে ভাবিয়া জুলিয়েন তাহা খুলিল। মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কাররাশি ! মুখ হেঁট করিয়া সে দেখিল গহনাগুলি পূর্ব্বের ব্যবহৃত ; বুঝিল এগুলি অধিকাংশই ভ্যালেরীর। সাবধানে সে ড্রয়ার বন্ধ করিয়া উপরের ছোটটি টানিল। আঃ এ আবার কি ? তাহার ভিতরে শুধু গিনি, আলো লাগিয়া স্বর্ণমুদ্রা ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল। লিয়েনের মুখ বিবর্ণ ; এখানে আসিবার পূর্ব্বের জননীর সেই প্রশ্ন ও স্বামীর উত্তর তাহার মনে উদয় হইয়াছিল ;—এ সেই—সেই টাকা !

চমকিয়া একটু পিছাইয়া আসিতেই স্বামীর চিত্রখানি আবার তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সুচিত্রিত মূর্ত্তির মুখে সেই কৌতুকতীব্র পরিহাস হাসিটুকু ফুটিয়া আছে,—আঃ ! সে ছুটিয়া পলাইবার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া আবার সরিয়া আসিয়া ড্রয়ার বন্ধ করিয়া চাবিটি কাছে রাখিল।

শয়নগৃহের আলোক নিবাইয়া লিয়েন শয়নের চেষ্টা করিতেছে এমন সময় বাহিরে চঞ্চল চরণের দ্রুত শব্দ শোনা গেল। আশ্চর্য্য হইয়া জুলিয়েন বাহিরে আসিয়া দেখিল খালি পায় অর্দ্ধস্খলিত পোষাকে লিয়ো ছুটিয়া চলিয়াছে। আবরণ মুক্ত হওয়ায় সেই শিশুর পুষ্টসুন্দর বক্ষ স্কন্ধ ও বাহু দেখা যাইতেছে, নবনীত কোমল শুভ্র বর্ণ গতির উত্তেজনায় আরক্ত সুন্দর মুখখানি ;—দেখিয়া জুলিয়েনের মনের সহিত চক্ষু যেন শীতল হইয়া উঠিল। কিন্তু এত রাত্রিতে বালক বাহিরে আসিয়াছে কোথায় ? লিয়েন তাহার নিকটে গিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। "এত রাত্রিতে কোথায় যাইবে লিয়ো ?"

লিয়ো প্রথমতঃ হাসিতে লাগিল, "মা তুমি—মা তুমি" বলিয়া আনন্দধ্বনি করিল। তাহার পর জোর করিয়া জুলিয়ানের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল,—"আমায় ছাড়িয়া দাও মা,—একটিবার—একটিবার—"

"এই এত রাত্রিতে, লিয়ো এখন কোথায় যাইতে চাও বল দেখি ?"

"কোথায় যাব তা বলিব ? তুমি আমায় বকিবে না ?"

"না, একটুও বকিব না বল।"

"গেব্রিয়েলকেও বকিবে না।"

"কাহাকেও বকিব না।"

"তবে তুমি নিশ্চয় খুব ভাল মা ; আমায় যাইতে দাও তবে !"

"কোথায় তা আগে বল।"

লিয়ো জুলিয়েনের দুই জানু জড়াইয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "গেব্রিয়েলের কাছে।"

লিয়েন মৃদু হাসিয়া বলিল, "রাত্রিতে গেব্রিয়েলের কাছে তোমার কি দরকার লিয়ো ? কাল সকালে হইলে চলিবে না ?"

"তা যে হইবে না মা ! আজ কত সুন্দর সুন্দর খাবার হইয়াছিল দেখনি ? আমি গেব্রিয়েলের জন্য এই কখানা চকোলেট আর এই কেক্‌টা লুকাইয়া রাখিয়াছি। সে যে এ সব খাইতে পায় না !"

জুলিয়েনের লিয়োকে আরও নিকটে লইয়া গাঢ় স্বরে বলিলেন, "কাল সকালে—লিয়ো !"

"সকালে ?. সকালে কি করিয়া হইবে ? তখন যে উহারা আমার কাপড় বদলাইয়া দিবে, পকেট হইতে এগুলো কাড়িয়া লইবে।"

জুলিয়েন বলিল, "কিন্তু তোমার গবর্ণেস্ কোথায় ? তিনি কেন—"

"উঃ, গবর্ণেস আজ বড় বেশী মদ খেয়েছে, সে আগুনের পাশে ঘুমাইয়া আছে ;—এখন তুমি আমায় ছাড়িয়া দাও মা।"

"দিই, কিন্তু লিয়ো—আমি যদি খাবার গুলা গেব্রিয়েল্‌কে দিয়া আসি ত ভাল হয় না ?"

"খুব ভাল হয়, তুমি যাইবে ?"

"নিশ্চয় যাইব ! গেব্রিয়েল কোথায় থাকে বল।" ব্যস্ত হইয়া লিয়ো বলিল, "সে ঐ ইণ্ডিয়ান হাউসে থাকে, জান মা—সেখানে একটা ডাইনীও থাকে তাই দাদা মহাশয় আমায় যাইতে বারণ করেন,—ডাইনী নাকি মানুষ খায় ;—কিন্তু সে গেব্রিয়েল্‌কে খায় না, ফ্রোলোন্‌কেও খায় না, তবে আমায় শুধু শুধু খাইবে কেন বল ত ?"

"কাহাকেও থাইবে না, আমি এখনই সেখানে যাইব; কিন্তু তার আগে চল তোমায় তোমার ঘরে দিয়া আসি।"

লিয়োকে ঘরে আনিয়া জুলিয়েন প্রথমে গবর্ণেসের খোঁজ করিল। সত্যই সে পাশের ঘরে চেয়ারে বসিয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। ডাকাডাকিতেও উত্তর দিল না; বিরক্ত হইয়া লিয়েন নিজেই বালকের পোষাক ঠিক করিয়া দিয়া বিছানায় শোয়াইয়া বলিল, "বেশ যা হোক্, রাত্রিতে আর তোমার কাছে কে থাকিবে লিয়ো?"

"কেহই থাকিবে না, আমি একাই থাকিব, ভয় কি?"

"না ভয় আবার কি? তুমি এখন ঘুমাও।" লিয়ো বলিল, "ঘুমাই, তুমি যাইবে ত মা?" তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জুলিয়েন বলিল, "ঠিক্ যাইব, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও।"

"আর—গেব্রিয়েল্‌কে আমার গুড্‌নাইট বলিয়ো তুমিই তবে!"

এই পাষাণপুরীর মধ্যে এই ক্ষুদ্র স্নেহনির্ঝরটির স্নিগ্ধতায় পীড়িত হৃদয়া জুলিয়েনের প্রাণে যেন সান্ত্বনার স্পর্শ লাগিতেছিল; তৃপ্তি আবেগে সে পুত্রের ললাটে ওষ্ঠ দিয়া অত্যন্ত আদরে বলিয়া উঠিল; "দিব, তোমায় সব কথাই বলিব মাণিক আমার! এবার তুমি ঘুমাও দেখি।"

লিয়ো এবার লিয়েনের গলা জড়াইয়া বলিল, "মা মা—তুমি রোজ রাত্রিতে আমার কাছে আসিও, আসিবে ত?"

"আসিব, নিশ্চয় আসিব লিয়ো—"

লিয়ো এবার ব্যগ্রভাবে ঘাড় তুলিয়া বলিল, "আমার সে মা কিন্তু একবারও আসে না—"

ব্যথিত হইয়া জুলিয়েন বলিল, "তাঁর অনেক কায—তাই আসিতে পান্ না, আমি আসিব।"

প্রফুল্ল মুখে শিশু ঘুমাইতে লাগিল; জুলিয়েন অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া অতি সন্তর্পণে একটি চুম্বন করিয়া উঠিয়া আসিল।

কোথায় সে ইণ্ডিয়ান হাউস্? এই রাত্রিতে একা তাহাকে যাইতে হইবে, হাঁ যাইতেই হইবে। বালক তাঁহার আশ্বাসে যে আনন্দটুকু লইয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা গেল, সে বিশ্বাস তাহাকে রাখিতেই হইবে। ঘরে আসিয়া লিয়েন তাহার ক্লোক্ ও টুপি লইয়া বাহিরে চলিল।

গভীর রাত্রি, চারিদিক নিস্তব্ধ। সে চাহিয়া দেখিল অন্ধকার নয়, বাহিরে জ্যোৎস্না শুভ্র হইতে শুভ্রতর হইতেছে। পথ সম্পূর্ণ অপরিচিত; কতক নিজের অনুমানে কতক লিয়োর নির্দ্দেশমত সে উদ্যান পথ দিয়া চলিতে লাগিল। যে মন্দিরে তার বিবাহ হইল, তাহার সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে লিয়েনের মনে হইল, মন্দিরের পাশে যেন কেহ দাঁড়াইয়া আছে। ভয় নয়, তবু এই নির্জ্জন গম্ভীর পথ দিয়া যাইতে তাহার মনে সঙ্কা আসিতেছিল, সন্দেহ দূর করিবার জন্য সে ঘুরিয়া চর্চ্চের নিকটে আসিল; কিন্তু কৈ, কেহই ত নাই! একটু হাসিয়া জুলিয়েন দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

ঝিলের সেতুর উপর উঠিয়া সে আবার চারিদিকে দৃষ্টি ঘুরাইল, নবোদিত চন্দ্রালোকে নদীর জল—আলোক প্রতিফলিত কৃষ্ণ কাচখণ্ডের ন্যায় দেখাইতেছে, কিন্তু নিবিড় বৃক্ষাদির সমাচ্ছন্ন উদ্যান তখনও অন্ধকার; কোথাও জন মানবের সাড়া নাই।

সেতুর ওপারে চাহিতেই ইণ্ডিয়ান হাউসের শুভ্র দৃশ্য সম্মুখে পড়িল ; খড়ের চাল বাঁধা, সুদৃশ্য বারান্দা-ওয়ালা নূতন ধরণের বাড়ী ; লিয়েন দেখিল তখনও তাহার মধ্যে জাগ্রত মানুষের আভাষ পাওয়া যাইতেছে, রুদ্ধ দ্বার জ নালার ভিতর দিয়া আলো বাহির হইতেছে।

সে নিঃশব্দে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, কাহাকে ডাকিবে কি করিবে তাহা সে স্থির করিতে পারিতেছিল না। এমন সময় শুনিল প্রবীণ রমণীকণ্ঠ বলিতেছে, "না, আজ আর একে স্থির করিতে পারিলাম না, সারা রাত্রি এই ভাবেই কাটাইতে হইবে আমায় ?"

করুণ স্বরে উত্তর হইল, "তবে তুমি একটু ঘুমাও লন্, আমি গান গাই এবার।

স্বরে লিয়েন চিনিল, এ গেব্রিয়েলের কথা, অপরাও যে হানার কথিত ফ্রোলন্ তাহাও বুঝিল। বালকের কথায় ফ্রোলন বলিল, "তুমি ? না গেব্রিয়েল আমিই বসিয়া আছি, যাও তুমি ঘুমাও গিয়া।"

"আমি অনেক্ষণ ঘুমাইয়াছি, এবার তুমি যাও ; তোমার অসুখ করিবে লন্ ?"

ঐশ্বর্য্যের কঠোর নিবাসে, হৃদয়হীন কায়দার বাঁধাবাঁধি নিয়মের রাজ্যে এতক্ষণ পর লিয়েন ঐ বালকের মুখে সহানুভূতির মিষ্ট ভাষা শুনিতে পাইল। দ্বারে আঘাত দিয়া সে ডাকিল, "গেব্রিয়েল !"

ফ্রোলন চমকিয়া উঠিল, গেব্রিয়েল বলিল, "কে ?"

জুলিয়েন ভিতরে আসিয়া দেখিল, ঘরখানি বৃহৎ ও পরিচ্ছন্ন। এক পার্শ্বে শয্যার একটি রুগ্না বিছানায় মিশিয়া আছে ; তাহারই পাশে বসিয়া ফ্রোলন চামচায় করিয়া তাহাকে কি খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছিল ; একটু দূরে একখানি ছোট বিছানায় গেব্রিয়েল বসিয়া ; নবাগতা ব্যারনেস্‌কে দেখিয়া সে সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অনুজ্জ্বল আলোকেও বালকের সেই ভীতচকিত ভাব জুলিয়েন দেখিতে পাইল। তখন তাড়াতাড়ি তাহার নিকটে আসিয়া বলিল, "ভয় নাই গেব্রিয়েল, আমি ? আমায় চিনিতে পারিয়াছ ত ?" অভিবাদন করিয়া গেব্রিয়েল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "হাঁ !"

বালক ভয়ে তটস্থ হইয়া আছে দেখিয়া তাহাকে অনুরোধ করিতেছিলে ? তোমার মত এতটুকু ছেলের মুখে ঐ কথাগুলি আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। সত্য সত্যই কি তুমি ঐ রোগীর কাছে সমস্ত রাত্রি জাগিতে পারিবে ?"

ধীর স্বরে বালক বলিল, "পারিব, উনি যে আমার মা—" বলিতে তাহার কণ্ঠ যেন রোদনের বাষ্পে রুদ্ধ হইয়া গেল।

"তোমার মা ? গেব্রিয়েল ?"—লিয়েন হাত বাড়াইয়া বালকের স্কন্ধে রাখিতেই পাশ হইতে লন বলিল "আর না—এ সকল প্রসঙ্গও না ; আপনি হঠাৎ এখানে আসিলেন কেন তাহাও ত বুঝিতে পারি না ?"

"লিয়ো আমায় পাঠাইয়াছে, গেব্রিয়েলকে এই খাবারগুলি দিতে ; কিন্তু তাহাতে কি কিছু অন্যায় হইয়াছে ফ্রোলন্ ?"

"আপনি আমায় চেনেন তবে, হাঁ বহুদিন আমি এই সংসারে আছি লেডি, আমি আপনাকে অনুরোধ মিনতি করিতেছি; এখানে আর এক মিনিট দাঁড়াইবেন না বা এই হতভাগাদের সম্বন্ধে কোন কৌতুহল রাখিবেন না, যান—এখনি যান্ বলিতেছি।"

লিয়েন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল; এই সেবানিরতা নারী, রুগ্নার জন্য যার অতখানি কাতরতা, সে এ কি বলিতেছে? সে এখানে থাকিলে কাহার ক্ষতি? ঐ শায়িতা রমণীর না স্বয়ং তাহার? মূঢ়ের ন্যায় জুলিয়েন দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া ফ্রোলন আবার বলিল।

"কি ভাবিতেছেন আপনি? আমার কথায় আশ্চর্য্য হইয়াছেন ত? হাঁ মা, আপনার মুখ দেখিয়া আমি বুঝিতেছি,—আপনার অন্তরে স্বর্গের আলো এখনও জ্বলিতেছে, পৃথিবীর পাপের ছ্ঃখের ছ্‌য়োর তা মলিন হয় নাই; কিন্তু সে পবিত্রতা কি আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে? এই নির্ম্মম কঠিন অত্যাচারের দেশ, এই পাপের বিজয় রাজ্য—"

ফ্রোলন আর পারিল না, দুই হাতে মুখ চাপিয়া ঘনঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিল।—

বিস্ময় চঞ্চল লিয়েন সভয়ে বলিল, "তুমি কী বলিতেছ ফ্রোলন, কি হইল তোমার?"

গেব্রিয়েলও তাহার নিকট আসিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিল, "লন্—লন্, স্থির হও, কর্ত্রী ঠাকুরাণী ভয় পাইতেছেন!"

সম্বিৎ লাভ করিয়া ধীর স্বরে লন্ বলিল, "ভয়, হাঁ ভয়ই বটে? গেব্রিয়েল, তুমি উহাকে ধন্যবাদ দাও, দয়া করিয়া যে খাবার আনিয়াছেন তাহা লও।"

করুণ হাসির সহিত জুলিয়েন বলিল, "এ দয়া আমার নয়, এই রাত্রিতে সেই খোকাটি আমার, কোলের ছেলে লিয়ো এইগুলি লইয়া ছুটিয়া আসিতেছিল, তাহাকেই ধন্যবাদ দাও গেব্রিয়েল, সে তোমায় শুভরাত্রি জানাইয়া তবে ঘুমাইল।"

গেব্রিয়েল খ্যাদ্যগুলি অঞ্জলীতে লইয়া একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া ছিল, তাহার মলিন মুখে মৃদু হাসির সহিত চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিয়াছে। স্নিগ্ধ স্বরে ফ্রোলন বলিল, "লিয়ো উহাকে বড় ভালবাসে।"

ইতি মধ্যে জুলিয়েন সেই পীড়িতার শয্যার নিকট সরিয়া গিয়া দেখিতেছিল। এই কি গেব্রিয়েলের জননী? লিয়েন স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়াছিল, মৃত্যু তাহার অদূরে, কিন্তু এখনও এতরূপ? শয্যার উপর কে যেন একরাশি গোলাপ ফুল ঢালিয়া রাখিয়াছে; লিয়েনের মনে হইল এমন কমনীয় মুখ যেন আর কখনও তাহার চোখে পড়ে নাই। অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, "আঃ কি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য!"

"হাঁ, ইহার সবই আশ্চর্য্য লেডি, কিন্তু যাহা দেখিলেন তাহার জন্য আর বেশী ঔৎসুক্য রাখিবেন না, আপনি শীঘ্র চলিয়া যান্—"

বাধা দিয়া লন্ বলিল, "কেন ফ্রোলন, তুমি আমায় ও কথা বলিতেছ কেন? এই পীড়িতা স্ত্রীলোক কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কাঁদিতেছিল—আমি শুনিয়াছি, তুমিও রাত্রি জাগিয়া—"

"হাঁ মা, আমি ছাড়া আর—কিন্তু না আর এসব কথা নয়, আপনি আজ নূতন এখানে আসিয়াছেন তাই ইহাদের দুর্দ্দশার জন্য কাতর হইয়াছেন ; বড় অভাগা লেডি, বড় হতভাগ্য ইহারা ? এমন অভিশাপ আর কারু জীবনে ঘটেনি, যে ইহাদের সংশ্রবে থাকে তারও জীবন বুঝি—"

লন্ থামিয়া গেল, লিয়েনের তখন হানার কথা মনে পড়িয়াছিল, সে কাহাকে ডাইনী বলিয়া উল্লেখ করে ? ইহাকেই কি ? সে দেখিতে ছিল রমণীর মণিবন্ধে ও কণ্ঠে দুইটি মহামূল্য অলঙ্কার। লন্ তাহার দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া বলিল, "মিথ্যা, উহার রূপ যেমন মিথ্যা ও অলঙ্কারও তাই। উহা মঠের সম্পত্তি লেডি, এ যে একদিন সুখ ঐশ্বর্য্যে সিংহাসনে রাণী হইয়া বসিয়াছিল ও তাহারই চিহ্ন বটে, কিন্তু উহার আর কোন মূল্য নাই—কোন অধিকারই নাই ইহাদের, মাইনোদের দয়া ভিন্ন জীবন ধারণের কোন উপায় নাই—কিছু নাই ইহার।"

"মঠের সম্পত্তি—মানে ?"

"মানে এই ইহাদের জীবনের বিধান ! এই হতভাগিনীর মৃত্যুর অপেক্ষা মাত্র, তাহার পর ইহার ঐ বালকটি পর্য্যন্ত মঠে গিয়া সন্ন্যাসী হইবে।"

"ঐ বালক ? তুমি কি বল ফ্রোনন ? ওযে এখনও শিশু,—ইচ্ছা অনিচ্ছা জ্ঞান বুদ্ধি কি আছে উহার ? এ বয়সে কি কেউ সন্ন্যাসী হয় ?"

"এই বয়সে, হাঁ মা এই শিশুকে সেই মঠের সন্ন্যাসী হইতেই হইবে, এ ভিন্ন আর গতি নাই উহার !"

"কি বল ফ্রোনন, তাহার মতামতের অপেক্ষা না করিয়া কি—"

লিয়েনের কথায় বাধা পড়িল, দুয়ারের কাছ হইতে গম্ভীর পুরুষকণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "হাঁ উহার মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই বালককে মঠের সেবক করিতে হইবে ! মাননীয়া বারনেস, আপনি জানেন না, বহুদিন পূর্ব্বে বোধহয় উহার জন্মেরও পূর্ব্বে—এই কার্য্যের জন্য উহাকে উৎসর্গ করা হইয়াছে।"

লিয়েন ও লন্ চমকিয়া দেখিলেন, বক্তা সেই কোর্টচাপ্লেন হিউগো। তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া ফ্রোনন্ দুই পা পিছাইয়া শয্যার কাছে গিয়া দাঁড়াইল. কিন্তু চ্যাপ্লেন সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া জুলিয়েনের তীব্র দৃষ্টির উপর মীমাংসা-সূচক কঠিন দৃষ্টি মিলাইয়া স্থিরস্বরে বলিলেন, "আপনি আশ্চর্য্য হইবেন না মাডাম, হয় তো ইহা তাহার পক্ষে কঠোরই হইবে তবু ঐ হতভাগ্যের অদৃষ্টলিপি ঐ, পরাধীন জীবন কখনও আপনার মতের সঙ্গে চলে না, জানেন ত ?"

মৃদুস্বরে লিয়েন বলিল, "আমি ইহাদের কিছুই জানি না।"

"জানিবার প্রয়োজনও নাই, শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যাওয়াই আপনার পক্ষে মঙ্গল." বলিতে বলিতে চ্যাপলিনের চক্ষু রোগিণীর দিকে ফিরিল। সে অজ্ঞান অবস্থাতেও যেন তাঁহার স্বর চিনিতে পারিয়াছিল, দুই হাতে আপনার কণ্ঠ লম্বিত হারে সংলগ্ন রৌপ্য নির্ম্মিত পদকখানি বক্ষে চাপিয়া সে বালিসে মুখ ঘসিতে ঘসিতে অত্যন্ত যাতনাব্যঞ্জক গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল।

"একি ফ্রোনন্ এ আবার কি ? ঐ দুর্ব্বল রোগী গলায় ও প্রকাণ্ড লকেটটা ঝুলাইল কবে ? উহার কষ্ট হইতেছে দেখিতেছ না ? সর ওসব খুলিতে দাও আমায়।"

তিনি নিকটে গিয়া হারে হাত দিতেই রুগ্না বিষম যন্ত্রণায় এমন চীৎকার করিতে লাগিল যে জুলিয়েনও অস্ফুট স্বরে কাতরোক্তি করিয়া উঠিল। ফ্রোলন্ বলিল "একটু থামুন মহাশয়, এখনই উহাকে কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই, দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে ও হার আর বেশী দিন উহার গলায় থাকিবে না, তখন ও সবই আপনাদের হইবে।"

চ্যাপ্লিন হাত সরাইয়া বলিলেন, "তাহার জন্য নয়, কিন্তু ঐ লকেটটা বড় ভারি—"

"কিন্তু রোগশয্যায় পড়িয়া অন্যান্য খেয়ালের সঙ্গেও চিন্ত তাহার রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, দেখুন না কেমন করিয়া চাপিয়া আছে? থাক্, যেমন আছে তেমনি থাক্, এতটুকুর ব্যতিক্রমে সারারাত্রি ঘুমাইবে না, কাঁদবে,—আপনারা ত চলিয়া যাইবেন তখন আমিই বিপদে পড়িব।"

ফ্রোলনের কথায় পাদরী আর কিছুই বলিলেন না; রুগ্নার যাহা কিছু আছে অদূর ভবিষ্যতে সবই তাঁহার অধিকারে আসিবে এই আশ্বাসেই হৌক বা নবাগত জুলিয়েনের সম্মুখে অধিক ধৃষ্টতা প্রকাশে সঙ্কোচ হওয়াতেই হৌক, তিনি আর কথা না বলিয়া ধীরপদে চলিয়া গেলেন।

ফ্রোলন্ তখন পীড়িতার কানের কাছে মুখ লইয়া মৃদুস্বরে বলিল "কোন ভয় নাই—কেউ তোমার হার লইবে না, লইতে পারিবে না।"

রুগ্নার মুষ্টি তখন শিথিল হইয়া আসিল, ফ্রোলন্ ধীরে ধীরে একটি গান গাহিতে লাগিল। জুলিয়েন বলিল,—"সব দিন সারারাত্রি এমনি থাকেন?"

"না সকল দিন এতটা হয় না, তবে যেদিন কিছু হয়, ও ভয় কি কষ্ট পায়, সেদিন রাত্রিতে এমনি কান্না এমনি আক্ষেপ থাকে; গান শুনিলে ভাল থাকে বলিয়া আমি বা গেব্রিয়েল গান গাই তখন।"

জুলিয়েন একদৃষ্টে সেই মুমূর্ষু নারীর প্রতি চাহিয়াছিল, তাহার অপেক্ষাকৃত শান্ত বিশ্রব্ধ মুখখানিতে যন্ত্রণাময় বিষাদরেখা ফুটিয়া আছে বটে, তবু কত সুন্দর সেই বিশাল নেত্রের নিমিলিত রেখাটি আর ততোধিক সুন্দর ঐ রক্তশূন্য অধরের অপরূপ ভঙ্গির সৌকুমার্য্য! তাহার মনে বারবার একটি সাদৃশ্য কল্পনা উদয় হইতেছিল;—তাহা যেন বৃন্তচ্যুত ফুল, যেন ভূলুণ্ঠিত ধূলায় ধূসর চন্দ্র! এ গেব্রিয়েলের মা? আশ্চর্য্য, দেখিয়া ত বালিকা বলিয়া বোধ হয়।

তাহার ভাব লক্ষ্য করিয়া ফ্রোলন বলিল, "আর নয় লোর্ড, এবার আপনি বাড়ী যান, আর আপনাকে সাবধান করিয়া দিই আমি; এই হতভাগাদের দেখিয়া আপনার মনে যে দয়া আসতেছে, তাহাকে মন হইতে দূর করিয়া দিবেন, ইহারা কারু দয়ারযোগ্য নয়।"

"ফ্রোলন?"

"আর নয়—আর নয়, আমায় ক্ষমা করুন আর একটি কথাও নয়। এখানের বাতাসকেও আমি ভয় করি ম্যাডাম্। আপনি শীঘ্র ফিরিয়া যান, রাত্রি হইয়াছে দেখিতেছেন না?"

দশম পরিচ্ছেদ।

জুলিয়েন বাহিরে আসিলে লন্ তাহার পশ্চাতে আসিয়া বলিল, "আপনার সঙ্গে যাই চলুন।" হাসিয়া লিয়েন বলিল, "কেন বল দেখি, কোন ভয়ের কারণ আছে কি?"

ফ্রোলন বলিল, "ভয়ের কারণ নাই, কিন্তু আপনার যদি ভয় পায় কিম্বা —"

"না আমার ভয় পাইবে না, তবে তুমি আসিলে ভালই হয়।"

"তবে একটু অপেক্ষা করুন, আমি গায়ের একটা কিছু লইয়া আসি।"

ফ্রোলন ঘরে ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই রুগ্না উচ্চ স্বরে কাঁদিয়া উঠিল ও গেব্রিয়েলের ব্যস্ত-চঞ্চল স্বর শোনা গেল। ফ্রোলনও মৃদু কণ্ঠে কি বলিতেছিল।—

দুয়ারে দাঁড়াইয়া জুলিয়েন দেখিল, রোগিনী দুই হাতে লনকে জড়াইয়া অব্যক্ত যন্ত্রনায় গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে। কি দুঃখ —আহা, উহার কত কষ্ট! যাহা বলিতে চায় তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই!

তাহাকে পুনরায় কাছে আসিতে দেখিয়া ফ্রোলন ব্যস্ত ভাবে বলিল, "আমি কি আর যাইতে পারিব না, আপনি—না হয় গেব্রিয়েল আপনার সঙ্গে যাক্।"

শান্ত কণ্ঠে লিয়েন বলিল, "কারু প্রয়োজন নাই ফ্রোলন, আমি একাই যাইব, কিন্তু উঁহার এত কষ্ট দেখিয়া কি করিয়া যাই তাই ভাবিতেছি।"

"ওঃ, পাগল আপনি? উহার কষ্টের জন্য ভাবনা করিতে হইবে না আপনাকে, কোন ফল নাই;—আমি ত আছিই দেখিতেছেন, আপনি মিথ্যা—না না শীঘ্র বাড়ী যান্ আপনি—"

ফ্রোলনের অসম্বদ্ধ উক্তির সহিত ভয়ের ব্যগ্র চাঞ্চল্য দেখিয়া জুলিয়েনেরও কেমন আতঙ্ক আসিল; কি এই রহস্যময় ভবন? কোন দুঃখময় রহস্য-আবৃতা ঐ সুন্দরী নারী? ফ্রোলনের এই ভয়, তাহাই বা কেন? সে সহসা কিছু বুঝিতে পারিল না তবু অজ্ঞাত ভয়ে তাহার চিত্ত বিত্রস্ত হইয়া উঠিল। ইণ্ডিয়ান হাউসের সোপান ত্যাগ করিয়া যখন সে মুক্ত আকাশতলে নামিয়া আসিল, তখন তাহার মস্তিষ্কে যন্ত্রনা দিয়া তপ্ত রক্ত স্রোত শিরায় শিরায় ছুটিয়া চলিয়াছে।

বাহিরের শীতল বায়ু শরীরে লাগিয়া সে কিছু সুস্থ বোধ করিল। মনও ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিতেছিল, ক্ষণকাল পূর্ব্বের আকস্মিক ভীরুতার কথা ভাবিয়া লিয়েন একটু হাসিল। কিন্তু এই দৌর্ব্বল্যের ও অপরাধ নাই;—

আজ প্রভাত হইতে এই রাত্রি পর্য্যন্ত যত ঘটনা স্রোত বহিয়া চলিতেছে, তাহার শান্ত জীবন যাত্রা যে অপরিচিত কঠিন পথ ধরিয়াছে, হৃদয়ের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়াও সে এখানে আপনাকে নির্ভীক স্থিরতায় প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিতেছিল না। তাহার উপর এই অভিনব কাণ্ডের অদ্ভুত ভূমিকা, এ কি—ইহার পরিণাম বা কোথায়—এই সকল চিন্তায় সে যেন বাহ্যজ্ঞান শূন্য ভাবে পথ চলিতে লাগিল।

রাত্রি দুই প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, জ্যোৎস্নার সহিত অস্বচ্ছ তুষার জাল মিশিয়া চারিদিকে যেন আবরণ টানিয়া আনিতেছে। কোন মতে আপনাকে টানিয়া লইয়া জুলিয়েন সেতু পার হইয়া আসিল। অনতিদূরে শোনওয়ার্থ প্রাসাদ, অত্যন্ত স্তব্ধতার মধ্যেও সে নিশ্চিন্ত প্রসন্নতা অনুভব করিল।

চর্চ্চের সম্মুখটায় তখন ছায়া পড়িয়াছে, এইখানে আসিতে লিয়েন একটু চমকাইল,—যাইবার সময় ঐ মন্দির পার্শ্বেই না কাহার অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখিয়াছিল সে? নিজের ভ্রম স্বীকার করিয়া লিয়েন আবার সেখানে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

পশ্চাতে অতি মৃদু শব্দে,—কে যেন তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে ! চোখ ফিরাইয়েই প্রথমেই একটি দীর্ঘ ছায়া দেখিয়া লিয়েন সবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল। ও কে ? অন্য কেহ হইলে সেই নির্জ্জন পথে ঐ শ্বেত বসনাবৃত মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইত কিন্তু লিয়েন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া চিনিল, সেই কোর্ট চ্যাপ্‌লিন, শুভ্র গাউনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

"প্রিয় ব্যারনেস্, আপনি নিশ্চয় ভয় পাইয়াছেন ?"

পাদরীর কথায় লিয়েন, উত্তর দিল,—"না ভয় নয় তবে আশ্চর্য্য হইয়াছি যে আপনি এখনও এই বাগানেই আছেন, নিদ্রা যান নাই।"

মৃদু হাসিয়া চ্যাপ্‌লিন বলিলেন, "সে কথা আপনার সম্বন্ধেও খাটে বোধ হয় ?"

"হাঁ, কিন্তু আপনি দেখিয়াছেন, সেখানে আমার কায ছিল।"

"দেখিয়াছি, আরও বুঝিয়াছি যে আপনি সাধারণ স্ত্রীলোকদের অপেক্ষা বিশুদ্ধ ও সাধু হৃদয়া ;—ব্যারনেস্, আপনি আমায় মার্জ্জনা করিবেন,—আপনার কল্যাণের জন্য কতকগুলি কথা আমার বলিবার আছে, তাই আপনি যখন প্রাসাদ হইতে বাহির হন, তখনই আপনার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছি। যাইবার সময় এইখানেই দাঁড়াইয়া ছিলাম, কিন্তু এত রাত্রিতে বাহিরে আপনার কি প্রয়োজন তাহা জানিবার জন্য দেখা দিই নাই। ও কি, আমার কার্য্যে আপনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন বোধ হয় ?"

অতি কষ্টে বিরক্ত ভাব দমন করিয়া লিয়েন বলিল, "না, তবে আমায় কি কথা বলিবেন বলিলেন যে, তাহা কি ?"

"তাহা বলিতেছি, কিন্তু পূর্ব্বে এই কথাটি বলি যে আপনি আর কখনো ঐ ইণ্ডিয়ান হাউস্ বা সেই স্ত্রীলোকটির নিকটস্থ হইবেন না বা তাহাদের সম্বন্ধে সকল চেষ্টা ত্যাগ করিবেন।"

"প্রয়োজন না হইলে নিশ্চয় করিব। আর—আর কি বলিতে চান ?"

হাসিয়া চ্যাপ্‌লিন বলিলেন, "আপনি ব্যস্ত হইতেছেন কেন, শীত বোধ হইতেছে কি ? ঐ বারান্দায় দাঁড়াইলে হয় না ?"

"না না কোন দরকার নাই, আপনি এইখানেই বলুন।"

পাদরি এবার আরও নিকটস্থ হইয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন "আমায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই ; প্রিয় ব্যারনেস্, আপনি সরলা, বালিকার ন্যায় সরল স্বভাব আপনার, সম্মুখে যে বিপদরাশি আপনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য—আমি আপনাকে সতর্ক করিতে চাই, বুঝিলেন ?"

ভীতভাবে তাঁহার প্রতি চাহিয়া লিয়েন বলিল, "না"।

স্নিগ্ধকণ্ঠে পাদরী বলিলেন "কিন্তু বলুন দেখি, শোন্‌ওয়ার্থে আসিয়া অবধি আপনি যাহা দেখিতেছেন ও সকলের যে ভাব যে কথা শুনিতেছেন তাহা কেমন ?"

অপর লোকের মুখে নিজের অবস্থার ইঙ্গিত শুনিয়া হতভাগিনী মুখ হেঁট করিয়া থাকিল ; বিবাহদিনের বাসর-রজনী যে কোথা দিয়া চলিয়াছে একথা স্মরণে আসায় ভারাক্রান্ত বক্ষের উদ্গত নিঃশ্বাসে যেন তাহার কণ্ঠরোধ হইতেছিল।

কোর্টচাপ্‌লিন এক দৃষ্টিতে তাহার মুখভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন, এই করুণ লজ্জাটি দেখিয়া সকরুণ স্বরে বলিলেন "বড় দুরদৃষ্ট আপনার, আপনি জানেন না নিরীহ বালিকা, আপনি এখনও ঠিক্ অনুমান করিতে পারেন নাই যে ঐ পোন্‌ওয়ার্থ কি ভীষণ স্থান, স্ত্রীলোক, বিশেষ আপনার মত উচ্চ প্রকৃতির নারী পদে পদে লাঞ্ছিত হয় ওখানে।

'ফাদার হিউগো—"

জিয়েনের কথায় বাধা দিয়া চ্যাপ্‌লিন বলিলেন "না না আমায় শুধু চার্ হিউগো বলিলেই যথেষ্ট হইবে। হাঁ যাহা বলিতেছিলাম, আপনি স্মরণ রাখিবেন—সর্বদা প্রস্তুত থাকিবেন ব্যারনেস্, পোন্‌ওয়ার্থে আপনাকে সংগ্রাম করিয়া বাঁচিতে হইবে, আর সে যুদ্ধ—একটি প্রবল শক্তির সঙ্গে, দয়া বা কোমলতা বলিয়া কোন কিছুরই সঙ্গে যার দয়া বা কোমলতা বলিয়া কোন কিছুরই সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। একটি নারীর অবস্থা দেখিয়া আসিলেন ত ?"

"চ্যাপলিন—চ্যাপলিন!" জুলিয়েনের কণ্ঠ হইতে অস্ফুট চীৎকার-ধ্বনি বাহির হইল, সে কাঁপিতেছিল, চ্যাপ্‌লিন তাহাকে বাহুর আশ্রয় দিয়া বলিলেন, "ধৈর্য্য ধরুন, স্নেহের ব্যারনেস, অত কাতর হইবেন না। আমি দুঃখিত হইতেছি যে সতর্ক করিতে গিয়া এই নিষ্ঠুর সত্য উচ্চারণ করিয়া আপনাকে উৎপীড়িত করিলাম।"

ক্লিষ্ট স্বরে জুলিয়েন বলিল "না না আমি নিজের জন্য বলি নাই, শুধু ঐ দুঃখিনী স্ত্রীলোকের কথা ভাবিতেছি।"

"হাঁ তাহার জীবনও কষ্টময় বটে ; কিন্তু তবু মনে হয়—সে কোন দূরতম অজ্ঞাতপ্রায় দেশের কুসংস্কারান্ধ হীন শ্রেণীর রমণী, কতকটা নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা ও পাপের ফলও সে ভোগ করিতেছে। কিন্তু আপনি উচ্চ বংশের অনিন্দনীয়া দেবী মূর্ত্তি—"

ম্লান হাসিয়া জুলিয়েন বলিল "আঃ চ্যাপ্‌লিন কি বলেন আপনি ? বংশের উচ্চনীচের সঙ্গে মানুষের দুঃখকষ্ট পৃথক হয় না। আমি নিজের জন্য—"

"নিজের জন্যও ভাবিতে হইবে—হইবে ! এখন পর্য্যন্ত আপনি কিছু বোঝেন নাই কি ? যে কারণেই হোক্ বিপদকালে আপনি আপনার স্বামীর সহায়তাও পাইবেন না এই শত্রু পুরীতে—ভয়ঙ্কর শত্রুর সম্মুখে, আপনি একা—"

সেদিনের সন্ধ্যা ও ঘটনাবলীর চিত্র চকিতের ন্যায় জুলিয়েনের অন্তরে উদিত হইয়া মিলাইয়া গেল। ঈর্ষা—বিদ্রুপ—অবজ্ঞা—তাচ্ছিল্য, কৈ কোথাও যে কিছুমাত্র স্নেহ বা সহানুভূতির আভাষ পাওয়া যায় না ! স্বামী,—ওঃ চ্যাপ্‌লিন যাহা বলিতেছেন তাহা যদি সত্য হয়, তবে কি করিবে সে ?

তাহাকে নীরব দেখিয়া চ্যাপ্‌লিন অতি কোমল কণ্ঠে স্নেহের স্বরে বলিলেন, "এইবার আমার শেষ কথাটি বলিয়া যাই ; ঈশ্বর করুন আপনার অদৃষ্ট সৌভাগ্যমণ্ডিতই হউক, কিন্তু এসংসারে থাকিতে—কোন দিন কোন কাযে বন্ধু বা সহায়তার প্রয়োজন হয়, তবে, প্রিয় ব্যারনেস আমার নাম সেই বন্ধুর মধ্যেই গণ্য করিবেন। এই দুর্দ্ধর্ষ পরিবারে আমার একটু ক্ষমতা আছে, আমি সাধ্যপক্ষে আপনার অনিষ্ট ঘটিতে দিব না।"

এতক্ষণ জুলিয়েনের হাত চ্যাপ্‌লিনের বাহুর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, এবার সে তাহা ছাড়াইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। যেখানে সে স্বামীর নিকটও অপদস্থ, সেখানে অন্য পুরুষের সাহায্য লওয়া অপেক্ষা দারুণ লজ্জা আর কি আছে ? পাদরির শেষ কথা কয়টিতে জিয়েনের মন নিজের উপরই তিক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া

ধীরভাবে বলিল, "ধন্যবাদ—আমার সহস্র ধন্যবাদ, আপনার দয়া আমি ভুলিব না।" বলিয়াই তাঁহাকে নমস্কার করিয়া লিয়েন দ্রুতপদে প্রাসাদের দিকে চলিয়া গেল।

পাদরি তাহার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "প্রটেষ্টাণ্ট-রমণি, এই তেজের জন্যই তোমার জীবন বিষময় হইবে!"

ক্রমশঃ

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

মরণ।

কোন সে অতীতে মরিয়া গিয়াছ তুমি
আমিও মরেছি সেদিন তোমার সাথে,
বেঁচেছ তুমি যে মরণ চরণ চুমি'
আমি যে কেবল ডুবিয়া নয়ন পাতে।

মরণ বরিয়া নবীন জীবন লভি'
ফুটেছ আপনি পেলব কুসুম সম,
আমি যে আমার হারায়ে যা' ছিল সবই
জাগিয়া মরণে নিবিড় আঁধারতম।

বলিয়া গিয়াছ—"আমিই মরেছি আজ
মরণ-পরশ লাগেনি তোমার গায়";
আমি বলি—"না—না—আমারি বক্ষমাঝ
ঘুমায়ে মরণ নিদ্রিত শিশু প্রায়।"

পেয়েছ জীবন মরিয়া নিমেষ তরে
আর ত' তোমার নয়নে আঁধার নাই;
এখন আমি যে তোমারই আশীষ বরে
তোমারই মতন মরিয়া বাঁচিতে চাই।

শ্রীরেণুকা দাসী

স্যাড্‌লার কমিসন এবং শিক্ষার মধ্যস্তর।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:*:—

(গ) অর্থসমস্যা।

প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় মধ্যশিক্ষার সংস্কার-সমস্যা, একটি বিরাট অর্থ-সমস্যা। টাকা থাকিতেই সব জিনিষই ভাল হয়, শিক্ষাও যে ভাল হইবে না, তাহার কোন কারণ নাই। কিন্তু কথা হইতেছে, টাকা আসিবে কোথা হইতে? যদি রাজস্ব হইতে আসে, তাহার সরল অর্থ একটি নূতন শিক্ষা সংক্রান্ত কর ধার্য্য করিতে হইবে। এখানে প্রশ্ন উঠিবে, এই নূতন কর দিবার সামর্থ্য দেশের লোকের আছে কি? একদল লোক এমন কথাও বলিবেন, যে উচ্চ শিক্ষা ত সম্যক প্রসারলাভ করে নাই, কেবল ধনবান ও মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে মধ্য ও উচ্চ শিক্ষার প্রচলন, তখন দেশের সমস্ত লোক এই কর দিবে কেন? সর্ব্বভুক এবং সর্ব্বগ্রাসী ইউরোপের মহা কুরুক্ষেত্র সমরের ফল স্বরূপ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে অর্থ সমস্যায় উপস্থিত হইয়াছি, তাহা বঙ্গদেশের শাশ্বত অর্থ সমস্যা না হইলেও আমরা একটি নূতন কর দিতে সমর্থ কিনা এবিষয়ের আলোচনা করিবার মত অভিজ্ঞতা আমার নাই। সেই নিমিত্ত সে সম্বন্ধে কিছু বলিব না তবে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত লোকেই এই শিক্ষা-কর দিবে, দেশের নিম্নতর স্তর এই করভার পীড়িত হইবে না বোধহয়, এরূপ ভাবেও কর নির্দ্ধারিত হইতে পারে। এই সুজলা-শ্যামলা বঙ্গদেশের অনেক জিনিষ বিদেশে যাইয়া অনেক লোককে কুবের পদবাচ্য করিয়া তুলে, দেশেও এই প্রকার পরার্থজীবী ধনকুবেরের সংখ্যা অধিক না হইলেও একেবারে কম নয়। কর প্রজা সাধারণকে স্পর্শ না করিয়া এই শ্রেণীর লোকদিগের অর্থ মঞ্জুষার কিঞ্চিৎ লঘুত্ব সম্পাদন করিলেও রাজস্ব সন্নিবেশ অসঙ্গত না হইতেও পারে। কমিসনের সহিত ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে বঙ্গদেশের ভাবী উন্নতি ও অর্থ সমস্যার সমাধান, এই মধ্যশিক্ষার উপরই নির্ভর করিতেছে। অর্থাগমের আশায় জলের ন্যায় অর্থব্যয় করে। অধিক দূর যাইতে হইবে না, একবার বঙ্গের উত্তর সীমায় হিমালয় ক্রোড়ে আমাদের নিকটবর্ত্তী রাজাভাতখাওয়ার নূতন মূর্ত্তি স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলেও ইহা বেশ বুঝা যাইবে। কিছু দিন পূর্ব্বে যাহা একটি বন্য ও নগণ্য গ্রামমাত্র ছিল ভবিষ্যৎ অর্থাগমের আকাঙ্ক্ষা তাহাকে সৌধশ্রেণীতে ভূষিত করিয়া আরব্য-উপন্যাসের গল্প স্মরণ করাইয়া দেয়। নূতন কর সহ্য করিয়া আমরাও যদি দেশের ভবিষ্যতের জন্য যথার্থভাবে প্রস্তুত হইতে পারি, অর্থব্যয় নিস্ফল হইবে না, পাকা ব্যবসাদারের মতই কাজ করা হইবে। শিক্ষার উন্নতি যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র হয়, সেই নিমিত্ত কমিসন শিক্ষা-ঋণের (Educational Loan.) উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রকার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য, সরকার যদি এইরূপ ঋণ গ্রহণ করেন, এবং নির্দ্দিষ্ট কএক বৎসরের মধ্যে এই ঋণ শোধ করিবেন, যদি এরূপ সর্ত্ত থাকে, তাহা হইলে উচ্চ ও মধ্য শিক্ষার উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইবে। যাহা হোক স্বীকার করিতেই হইবে যে এই অর্থাভাবই শিক্ষার প্রধান অভাব। একটা কথা এখানে উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক নাও হইতে পারে। আজ কাল ছাত্রদিগের মধ্যে, ছাত্রত্বের এবং ব্রহ্মচর্য্যের এতদূর অভাব পড়িয়াছে যে, ক্ষৌরিক ব্যয়, গন্ধ দ্রব্যের ব্যয়, সৌখিন পোষাক পরিচ্ছদের ব্যয়

প্রভৃতি বিলাসিতার নানা আবদারের উপর বিশেষতঃ সুচিক্কণ কঙ্করের উপর, যদি একটি বড় রকমের কর ধার্য্য হয়, তাহা হইলে ছাত্রজীবনের এবং সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। এই কর ছাত্রদত্ত বেতনের বর্দ্ধিত হারের ভিতর দিয়া সংগৃহীত হইলে, সব দিক বিবেচনা করিয়া, ফল শুভই হইবে বলিয়া অনুমান হয়!

(২) নব সংগঠন।—আমাদের দেশে শিক্ষার কএকটি ক্রম পরিলক্ষিত হয়। প্রথম ক্রম শৈশবশিক্ষা,—বয়স ছয় বৎসর পর্য্যন্ত; দ্বিতীয় ক্রম, প্রাথমিক শিক্ষা,—ইহা দুইটি পর্য্যায়ঃ নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষা—বয়স দশ বৎসর পর্য্যন্ত; তৃতীয় ক্রম, মধ্য বিদ্যালয় শিক্ষা (Middle Vernacular এবং Middle English stage) বয়স বার বৎসর পর্য্যন্ত; চতুর্থ ক্রম, উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষা বয়স ষোল হইতে আঠার বৎসর পর্যন্ত—এই সময় প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হয়; এবং পঞ্চম ক্রম, প্রশস্ত শিক্ষা—ইহাই কালেজের শিক্ষা। স্যাড্‌লার কমিসনের বিবরণী আলোচনা করিয়া আমার মনে হয় তাঁহারা বঙ্গদেশের শিক্ষার প্রধানতঃ তিনটি ক্রম কল্পনা করিয়াছেন; প্রথমটি প্রাথমিক শিক্ষা (Secondary Stage)—বর্ত্তমান উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রথম চার শ্রেণী ও কালেজের নিম্নতম দুই শ্রেনীর শিক্ষা ইহার অন্তর্গত; এবং তৃতীয়টি উচ্চশিক্ষা ইহাই যথার্থ প্রশস্ত শিক্ষা পদবাচ্য—কালেজের উচ্চতম চার শ্রেণীতে এই শিক্ষা প্রদত্ত হয়, এবং নূতন পরিবর্ত্তনে এই শিক্ষার অন্তর্ভূত উপাধি প্রার্থীদিগের (Graduate) শ্রেণীতে তিন বৎসরের শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। কমিসনের মতে মধ্যশিক্ষার দুইটি বিভাগ; একটি উচ্চতর মধ্যবিভাগ (Higher Secondary Stage)—ইহার ভিতর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়গুলির প্রথম দুই শ্রেণী ও কালেজের সর্ব্বনিম্ন দুই শ্রেণী থাকিবে; এবং আর একটি নিম্নতর মধ্যবিভাগ (Lower Secondary Stage) ইহার ভিতর স্কুলের কোন্ কোন্ শ্রেণী থাকিবে তাহা খুব স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নাই। এখানে কথা উঠিবে—যদি মধ্যশিক্ষাসমিতি কেবল মধ্যশিক্ষার পরিচালনা করেন, প্রাথমিক শিক্ষার ভার কাহার উপর থাকিবে? উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়ে বর্ত্তমান সময়ে নিম্নতম শ্রেণীগুলি প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্গত। বোধ হয়, কমিসনের মতে, বর্ত্তমান শিক্ষাবিভাগের (Department of Public Instruction) উপর এই প্রাথমিক শিক্ষার ভার থাকিবে। কিন্তু ইহা হইলেও, আর একটি প্রশ্ন উঠিবে; প্রাথমিক শ্রেণীগুলির উপর যে দুই শ্রেণী মধ্যবিদ্যালয়ের শিক্ষার অন্তর্গত সেগুলির ভার কাহার উপর থকিবে?—এ সম্বন্ধে কমিসন কোন মত প্রকাশ করেন নাই—কারণ এরূপ মত প্রকাশের অবসরও তাঁহাদের ছিল না।

তৃতীয় প্রশ্নে আরো একটি বড় সমস্যা বর্ত্তমান। উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়ে এখন যেমন প্রাথমিক ও মধ্য (উচ্চ), এই দুইটি বিভাগ একত্র আছে, নূতন সংস্কারেও কি এইরূপ থাকিবে! অথবা প্রাথমিক বিভাগ মধ্যবিভাগ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া শিক্ষাবিভাগের পরিচালনার অন্তর্গত করা হইবে! একটি বিদ্যালয়ের দুইটি অংশ, দুইটি বিভিন্ন পরিচালনার অন্তর্গত করিয়া দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিলে শিক্ষায় সুফল ফলিবার কথা নয়। সেই নিমিত্ত দুইটি বিভাগকে হয় পৃথক করিতে হইবে, অথবা তাহাদের সংযোগ সুচিন্তা ও সুবিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মধ্যবিভাগ হইতে প্রাথমিক বিভাগকে পৃথক করিবার সপক্ষে কএকটি সুযুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। শৈশবে অনুকরণ প্রবৃত্তি, গঠন প্রবৃত্তি, বিনাশ প্রবৃত্তি, এবং সর্ব্বোপরি ক্রীড়াশীলতা সর্ব্বপ্রধান প্রবৃত্তি। সেইজন্যই কুমার কানন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ক্রীড়াদ্বারা শিক্ষা প্রদানের উৎকৃষ্ট সময় শৈশব এবং সেই নিমিত্তই তিন বৎসর হইতে ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই পদ্ধতি ক্রমে শিক্ষাদানই উৎকৃষ্ট। আমাদের দেশে ছয় বৎসর

হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত বাল্যকাল। এইসময়ে কর্ম্মচেষ্টা প্রবল থাকিলেও অনুকরণ প্রবৃত্তিও খুব সতেজ এবং মনঃ সংযোগের ক্ষমতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সেই জন্য এই শক্তি সমূহের উন্মেষের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, শিক্ষা দান করিলে অধিকতর সুফলের প্রত্যাশা করা যায়। সময় বিভাগানুযায়ী অধ্যাপনাকার্য্য আরম্ভ করিবার এই প্রশস্ত সময়, কিন্তু একাদিক্রমে অর্দ্ধ ঘণ্টার ঊর্দ্ধকাল মনোযোগ নিবদ্ধ করাইয়া রাখিলে উপকার না হইয়া অপকার হইবার সম্ভাবনা অধিক। সুশিক্ষা দ্বারা দৈনিক পাঠ বিদ্যালয়েই আয়ত্ত করান যাইতে পারে, এবং এইরূপ করাই সুযুক্তি পাইত। এই সকল বিভিন্ন কারণে সুচিন্তিত প্রণালী অনুসরণ করিয়া, পৃথক সময় বিভাগের (Time table) সাহায্যে, প্রাথমিক শিক্ষা স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ে পরিচালিত হইলে, সুন্দর ফল লাভের সম্ভাবনা অধিক। শিক্ষার্থীরা যখন মধ্যবিভাগে উপনীত হয়, তখন তাহাদের বয়স দশ বৎসরের অধিক, এবং এখানে তাহারে এগার হইতে ষোল কিম্বা আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত থাকে। এই কৌমারে তাহাদের কর্ম্মশক্তি দৃঢ়তর হয়, বিচার শক্তির উন্মেষ হইতে থাকে এবং স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা প্রবল হয়। এখন বিদ্যালয়ের সময় বিভাগে এক একটি বিষয়ে পঞ্চাশ মিনিট পর্য্যন্ত মনঃ সংযোগ করিলেও তাহারা ক্লান্তি বোধ করে না; এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীরা নিজেদের চেষ্টায় যত কর্ম্ম করিতে পায় ততই তাহাদের আনন্দ এবং ততই তাহাদের মঙ্গল হয়। সেই নিমিত্ত গৃহেও বিদ্যালয়ে তদনুরূপ কার্য্য দ্বারে শিক্ষার আয়োজন হইলে, সুন্দর ফল পাওয়া যায়। ইহা হইতেই বেশ বুঝা যাইবে মধ্যবিভাগ ও প্রাথমিক বিভাগের জন্য একদিকে যেমন বিভিন্নশিক্ষা প্রণালী অবলম্বিত হইয়া উচিত অন্যদিকে সেইরূপ সময় বিভাগের স্বাতন্ত্র্য একান্ত বাঞ্ছনীয়। সুতরাং মানসিক শক্তি ও প্রবৃত্তির বিকাশের দিক দিয়া আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে মধ্যশিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, এবং শিশুশিক্ষার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত থাকিলে ভাল হয়।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে বেশ বুঝা যাইবে, যে কমিসন মধ্যশিক্ষার সংশ্রবে সম্প্রসারিত শ্রেণী দ্বারা ব্যবহারিক শিক্ষা সম্বন্ধে ইঙ্গিতমাত্র করিয়াছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহিত দুইটি বা চারিটি সম্প্রসারিত শ্রেণী সংযুক্ত হইলে, নিম্নতম শ্রমশিল্প ও অপরাপর ব্যবহারিক শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইবে; এবং মধ্যশিক্ষার নিম্নতর বিভাগে এইরূপ দুই বা ততোধিক সম্প্রসারিত শ্রেণী বর্ত্তমান উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর সহিত সংযুক্ত থাকিলে উচ্চতর শ্রমশিল্প ও আয়োজন সম্ভব হইবে। ব্যবহারিক শিক্ষার এইরূপ বন্দোবস্ত সাধারণ শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত থাকিলে, উভয় প্রকার শিক্ষার আদর্শ সংযত, উন্নত ও শুভ ফলপ্রদ হইবে। বিষয়টি বিস্তৃত, এবং ইহার সম্যক আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; তথাপি এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারাও বুঝা যায় যে ব্যবহারিক শিক্ষার উন্নতি এবং উভয় প্রকার শিক্ষার কার্য্যকারীতার দিক দিয়া বিবেচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষার পৃথক আয়োজন, সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত করিবে।

কিন্তু এইরূপ বিভাগ আদর্শস্থানীয় হইলেও, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিক দিয়াও বিবেচনা করিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাই, গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিত অপেক্ষা, সুপরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা অনেক সময় অধিক উপযুক্ত; প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অপেক্ষা মধ্য বাংলা অথবা মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষা ও সামর্থ্য অধিক; আবার উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংশ্রবে আসিয়া, নিম্নতর শ্রেণীর বিদ্যালয়ের শিক্ষক অপেক্ষা অধ্যাপনা কার্য্যে অধিকতর উপযুক্ত। সুশিক্ষক নিয়োগদ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি সাধন বহুব্যয় সাপেক্ষ। উচ্চইংরাজি বিদ্যালয় হইতে প্রাথমিক শ্রেণীগুলি স্বতন্ত্র করিয়া দিলে,

উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে উহাদের শিক্ষার অবনতি হইতে পারে। আর একটি বিষয় এই সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য। বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যার উপর শিক্ষার্থীদের সমষ্টিগত সমবেত জীবনের শুভাশুভ অনেকাংশে নির্ভর করে। সুশিক্ষা বিষয়ে এই সমষ্টিগত জীবনের উপকারিতা, বিভিন্ন ছাত্র শ্রেণীর জ্ঞানমূলক শিক্ষা অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান। ছাত্রসংখ্যা হ্রাস হইয়া গেলে, এইরূপ শিক্ষার অন্তরায় উপস্থিত হইবার কথা। সেই নিমিত্ত উচ্চইংরাজি বিদ্যালয় গুলিতে, দুইটি বিভাগ সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া দিলে, সকল ক্ষেত্রেই সুবন্দোবস্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এমনকি দুইটি বিভিন্ন পরিচারকবর্গের আধিপত্য সত্ত্বেও, দুই বিভাগ পৃথক করিলে, বর্ত্তমান অবস্থায় সুফল ফলিতে, অনেক অর্থব্যয় ও অনেক বিলম্ব হইবে। একই বিদ্যালয়ে বিভাগদ্বয়ের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া,—বিদ্যালয় পরিচালনার সুবন্দোবস্ত হওয়াও একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। এই অঙ্গাঙ্গী সম্মিলনের ফলে, শিক্ষার সুফল লাভ হইবে, বিদ্যালয়ের সমবেতজীবন পরিস্ফুট হইবে, এবং পৃথক আধিপত্য সত্ত্বেও অধ্যাপনার একত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দ্বন্দ্বসম্ভাবনা তিরোহিত করিবে;—একই শিক্ষক সমষ্টিদ্বারা এদুই বিভাগের কর্ম্ম পরিচালনাও করা যাইবে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বিভাগের শিক্ষা পদ্ধতি ও সময় বিভাগের যথোপযুক্ত পার্থক্যের সুফল লাভ হইতে থাকিবে।

(৩) পাঠ তালিকা—(ক) প্রকৃতিপাঠ। পাঠ্যতালিকার বিষয় গুলিও আলোচিত হওয়া আবশ্যক। এখানে স্বভাবানুসন্ধান (Nature Study) প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বালকদিগের শিক্ষার জন্য, ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রথম সোপান স্বরূপ, এমন সুন্দর বিষয় আর নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ পাঠ দান করিবার উপযুক্ত শিক্ষক কয়জন মিলিবে? শিশুশ্রেণীতে বালকদিগকেও, এরূপ শিক্ষা দিতে হইলে, শিক্ষকদিগের জ্ঞানের গভীরতা আবশ্যক। এরূপ শিক্ষকের বিজ্ঞানের সাধারণ ইতিহাস, ভূবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ভূগোল, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ছাত্রদিগের পুস্তক হইতে কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়া, শিক্ষক সাজিয়া বসিলে, বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানপাঠের (Science Reader) সাহায্যে যেরূপ শিক্ষা হইতেছে, তাহার অধিক কিছুই হইবে না। যে স্থানে সুশিক্ষার সম্ভাবনা অল্প, সে স্থানে পাঠ্যতালিকার দীর্ঘতা অযথা বৃদ্ধি করিয়া, নূতন শিক্ষাযুগের নূতন প্রণালীর অন্ধ-অনুকরণে, তালিকার বাহিক দৃষ্টি চাকচিক্য সম্পন্ন হইলেও, শিশুমস্তিষ্ক অসঙ্গতরূপে ভারাক্রান্ত করার কিছুই কারণ দেখা যায় না। যখন শিক্ষক পাওয়া যাইবে, সেই মুহূর্ত্তেই এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টির শিক্ষার আয়োজন করা যাইবে। শিশু ও বালক-সুলভ অনুকরণপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া উন্নত দেশের উন্নত প্রদ্ধতির মিথ্যা প্রতিচ্ছায়া দ্বারা সুশিক্ষা হইবে না, এবং এরূপ অনুকরণই যে বাঙ্গালার অধ্যাপনাপদ্ধতির বর্ত্তমান অবনতির মূলে, তাহা গ্রামের অঙ্কন প্রকৃতিপাঠ বিজ্ঞান-স্বাস্থ্যতত্ত্ব বস্তুপাঠ শিক্ষকের মাসিক পঞ্চমুদ্রার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে যেমন বুঝা যাইবে, তেমন আর কিছুতেই নয়। সেই নিমিত্ত পুনর্ব্বার বলি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, ভিন্ন দেশের বর্ত্তমান আদর্শের অযথা অনুকরণ সর্ব্বদা এবং সর্ব্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য।

(খ) বিজ্ঞান। বর্ত্তমান অবস্থায় বিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত হইতে পারে—অবশ্য সরঞ্জাম ও পরিক্ষাগারের নিমিত্ত প্রভূত অর্থব্যয় করিতে হইবে।

(গ) প্রাচীনভাষা সংস্কৃত শিক্ষা। পাঠ্য তালিকা একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিলে, একটি বিষয় সম্বন্ধে কমিসনের নির্দ্ধারণ সুবিবেচিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না। উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়ের পরীক্ষা

উত্তীর্ণ হইতে বঙ্গভাষা-ভাষীদিগকে এমন কি হিন্দু সন্তানদিগকেও সংস্কৃত ভাষা শিখিতে হইবে না। আমি খুব সাবধানে কমিসনের বিবরণী আলোচনা করিয়াছি। উচ্চতর শ্রমশিল্প শিক্ষার আলোচনা বাদ দিলে, এমন সুচিন্তিত ও সুবিবেচিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া, শিক্ষার সংস্কার সম্বন্ধে মত প্রকাশ বাঙ্গালা দেশের ভাগ্যে কখনও হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। যদি অন্য কোন দেশে হইয়া থাকে, তাহাও উৎকৃষ্টতায় এই বিবরণীকে ছাড়াইয়া বহুদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে বলিয়াও বোধ হয় না। কমিসন কোন বিষয় সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে, সাক্ষীদিগের অভিমত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন, এবং, বোধহয়, এমন কিছু নূতন সংস্কারের কথা বলেন নাই যাহার আভাস অধিক সংখ্যক সাক্ষীর ভিতর দিয়া পান নাই। কিন্তু কৈ এই প্রাচীন ভাষাকে নির্ব্বাচন-সাপেক্ষ বিষয়ের অন্তর্গত করিবার অনুকূলে সাক্ষীদিগের অভিমত সেরূপ ভাবে আলোচনা করেন নাই, অথবা অধিক সংখ্যক সাক্ষীর অভিমতের উপরও এই নির্দ্ধারণ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এরূপ হইবার কারণ, এমন সুন্দর বিবরণীর এরূপ দুর্ব্বলতা কোথা হইতে আসিল, বেশ বুঝা যায় না। মধ্য-পরীক্ষায় একটী প্রাচীনভাষা বাধ্যতামূলক অথবা নির্ব্বাচন-সাপেক্ষ বিষয়ের অন্তর্গত হইবে কি না এই বিষয়টি মীমাংসা করিবার ভার কমিসন ভবিষ্যৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দিয়াছেন ; এ ক্ষেত্রেও এরূপ ভার ভাবী মধ্যশিক্ষা সমিতির হস্তে দিলেন না কেন তাহাও বেশ বুঝা যায় না।

কমিসনের নির্দ্দেশ অনুসারে উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়ের পরীক্ষায়, ছাত্রদের নিম্নতম বয়স ষোল বৎসর থাকিবে, এবং যে সকল প্রতিভাশালী ছাত্র যশের সহিত, অনায়াসে বিভিন্ন শ্রেণী অতিক্রম করিয়া পনর বৎসর বয়সে উক্ত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবে, প্রধান শিক্ষকের মত থাকিলে, সেই সকল ছাত্রও উক্ত পরীক্ষা প্রদান করিতে পাইবে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরগুলি পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। ডাক্তার ওয়েলটান, প্রশস্ত শিক্ষার নিমিত্ত চারি শ্রেণীর বিদ্যালয়ের উল্লেখ করিয়াছেন,—প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে আঠার উনিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রাখা হয় এবং অধিকাংশ ছাত্রই এখান হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে ; দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়ে বালকেরা ষোল সতর বৎসর বয়সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া নিম্নস্তরের কর্ম্মজীবনে অথবা শ্রমশিল্পের উচ্চতর বিভাগে প্রবিষ্ট হয় ; তৃতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া প্রায় চৌদ্দ বৎসর বয়সে নানা প্রকার শ্রমশিল্পের নিম্নতম বিভাগে প্রবেশ করে ; এবং চতুর্থ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিশুদিগকে প্রাথমিক অথবা মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার উপযুক্ত শিক্ষা প্রদত্ত হয়। (James Welton's Principles of Teaching—University Tutorial Press Page 35.) উদ্ধৃত অংশ হইতে বেশ বুঝাইতেছে যে আমাদের উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়গুলি উপরোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়ের অন্তর্গত। প্রাচীন সুপরিচিত এইরূপ বিদ্যালয়গুলিকে ইংলণ্ডে অনেক সময় "গ্রামার স্কুল" (grammar School), বলে এইগুলিতে সাধারণতঃ দুইটি বিভাগ পরিলক্ষিত হয় একটি প্রাচীন ভাষার বিভাগ (Classical side), এবং অপরটি আধুনিক ভাষার দিক (Modern side), এই দ্বিতীয় বিভাগকে কখন বিজ্ঞান বিভাগ, আবার কখন ব্যবসায় বিভাগ নামে অভিহিত হয়। প্রথম বিভাগে গ্রীক অথবা ল্যাটিন ভাষা পড়ান হয় এবং ছাত্র সংখ্যা, এই বিভাগেই, অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক। দ্বিতীয় বিভাগে কোন প্রাচীন ভাষা পঠিত হয় না, এবং ব্যাবহারিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দিকে অধিক ঝোঁক দেওয়া হইয়া থাকে। জার্ম্মানির অন্তর্গত প্রুসিয়া প্রদেশে, মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া জিমনাসিয়াম (Gymnasiam) ও রিয়াল জিমনাসিয়াম (Real gymnasiam) গুলিতে প্রাচীন ভাষা, এবং ওভার রিয়াল স্কুল (Over real School) ও রিয়াল স্কুল (Real School) গুলিতে নব্য ভাষার, সমধিক চর্চ্চা হয়।

ফ্রান্স দেশেও এইরূপ হইয়া থাকে। বোধহয় ইউরোপীয় পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া, কমিসন প্রাচীন ভাষাকে নির্ব্বাচন সাপেক্ষ বিষয়রূপে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়া থাকিবেন।

এখন কথা হইতেছে, ইউরোপে ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা যে জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়, আমরা কি সে জনাই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করি? ইংলণ্ডের মত স্থানেও ডাক্তার রাউজের মত ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষার শিক্ষক দুর্লভ। মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে, এই দুই প্রধান ভাষার শিক্ষা প্রণালীর আলোচনায় তিনি বলিয়াছেন, "এই দুই ভাষাই ইতিহাসচর্চ্চার সাহায্য করে এবং অতীতের সুস্পষ্ট ধারণা বর্ত্তমানকে উত্তমরূপে বুঝিবার সুযোগ প্রদান করে। ল্যাটিন ভাষা ব্যাকরণের জ্ঞান পরিস্ফুট করিয়া, মানসিক শক্তি দৃঢ়, উন্নত ও মার্জ্জিত করে। "ভাব প্রকাশের বিশুদ্ধি ও শৃঙ্খলা, মনঃসংযোগের স্থিরতা ও একাগ্রতার উপর নির্ভর করে। ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা দ্বারা এইরূপ মনোযোগ এবং এইরূপ ভাব-প্রকাশের শক্তি লাভ করা যায়।" অন্য দিকে গ্রীক সাহিত্যই গ্রীক ভাষার সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ। "সাহিত্যের বিবিধ স্বরূপ (Literary Forms) এই সাহিত্যেই প্রথম পরিস্ফুট হইয়াছে এবং অনেকগুলি এখানেই চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। "গ্রীক সাহিত্যের সৌন্দর্য্য উপভোগ করাই গ্রীক ভাষা শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য" (Adamson's The Practice of Instruction—National Society's Depository Pages 407—409) ইউরোপে এই উভয় ভাষা শিক্ষা দ্বারা যে লাভ, আমাদের এক সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা হইতে সেই লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু কেবল এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই আমরা সংস্কৃত শিক্ষা করি না। আমাদের মাতৃভাষার সহিত সংস্কৃতের যে সম্বন্ধ, ইংরাজি, জারমাণ ও ফ্রেঞ্চ ভাষার সহিত ল্যাটিন অথবা গ্রীক ভাষার যদি সেই সম্বন্ধ থাকিত, তাহা হইলে ইউরোপেও, পূর্ব্বে যেমন ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা করিতেই হইত, এখনও তাহাই থাকিত। প্রচলিত ভাষা শিক্ষায়, ব্যাকরণের উপকারিতায় আজকাল অনেকেই সন্দিহান। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এ বিষয়ে অনেক পরীক্ষা চলিতেছে, এবং তাহার উত্তেজনা ফলে ব্যাকরণের শিক্ষার উত্তাপ অনেক কমিয়া যাইতেছে তথাপি কৌমারের প্রারম্ভ হইতে, রচনা এবং ভাষা বোধের দিক দিয়া, ব্যাকরণের মূলতত্ত্বগুলি শিক্ষা দিলে, মাতৃভাষা শিক্ষায়ও যে অনেক উপকার হয়, ইহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। বাঙ্গালা ভাষার যাহা প্রকৃত শিক্ষনীয় ব্যাকরণ, আজিও তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের রূপান্তর; সংস্কৃত ভাষার একটা মোটামুটি জ্ঞান না জন্মিলে, এই ব্যাকরণ বেশ বুঝা যায় না, এবং বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আজকালকার প্রসিদ্ধ লেখকদিগের রচনায় কিছু কিছু গলদ পাওয়া যায়, এবং তাহার মূলে এই সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষার অভাব। সেই জন্যই কমিসন যখন বলিয়াছেন, মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা ভাল রূপেই করিতে হইবে, তখন সংস্কৃতকে এমন একটা নিম্ন স্থান প্রদান করা, সুযুক্তি সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

সভ্য দেশে দেখা যায় যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে, তাহারা প্রায় সকলেই এক বা ততোধিক প্রাচীন ভাষা চর্চ্চা করে। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের টান এখন ত অনেক অধিক, ভবিষ্যতেও অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য এইরূপ স্নেহই বজায় থাকিবে। কিন্তু যেরূপ ভাবে পাঠ্যতালিকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, অধিকাংশ ছাত্রই সংস্কৃত পরিত্যাগ করিয়া উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবে। প্রায়ই দেখা যায় নিম্নশ্রেণীতে যে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, অধিক সংখ্যক ছাত্রই, শেষ পরীক্ষায় সেই সেই বিষয়ই নির্ব্বাচন করে। যেমন গতি-গণিত (Mechanics) নিম্নশ্রেণীতে পড়া হয় না, শেষ পরীক্ষায় এ বিষয়ে ছাত্র সংখ্যাও কম। এমনও দেখা গিয়াছে ভূগোল অথবা গণিতে অধ্যাপনা নিম্নশ্রেণীতে উৎকৃষ্ট হইলে শেষ পরীক্ষায় এই দুই বিষয়ে ছাত্রসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ভবিষ্যতেও যে এইরূপ হইবে না, তাহার কোন কারণ দেখা যায় না।

প্রত্যেক ছাত্রকে ইতিহাস ও বিজ্ঞান নিম্নশ্রেণীতে পড়িতেই হইবে, কারণ পরীক্ষার পূর্ব্বে প্রধান শিক্ষককে স্বীকার পত্র দিতে হইবে, যে পরীক্ষার্থী ছাত্রেরা এই দুইটি ও অপর কএকটি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছে। সেই জন্য স্বেচ্ছাধীন বিষয়টি নির্ব্বাচন করিবার সময়, ছাত্রেরা সাধারণতঃ এই দুইটি বিষয় হইতে নির্ব্বাচন করিবে। এবং একটি প্রাচীন ভাষা শিক্ষা সর্ব্বত্রই উপেক্ষিত হইবে। শিক্ষার পক্ষে, উচ্চ শিক্ষার পক্ষে, বঙ্গভাষার ভাবী উন্নতির পক্ষে, জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের পক্ষে, এই অবস্থা বড় শুভকর হইবে না।

তবে মধ্য কালেজ পরীক্ষায় যদি একটি প্রাচীন ভাষা বাধ্যতামূলক হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত কুফল না ফলিতেও পারে। কারণ যাহারা প্রশস্ত-শিক্ষা (Liberal) অথবা উচ্চতর শ্রমশিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যবসায় শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার বাঞ্ছা রাখিবে, তাহারা উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়ে অবশ্যই একটি প্রাচীন ভাষার দিকে আকৃষ্ট হইবে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে একটি প্রাচীন ভাষা মধ্য কালেজ পরীক্ষায় বাধ্যতামূলক হইবে কিনা, এ বিষয় মীমাংসা করিবার ভার কমিসন ভবিষৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অর্পণ করিয়াছেন। উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রাচীন ভাষা বাধ্যতামূলক না হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দ্ধারণ কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্ততঃ আশা করা যাইতে পারে, কমিসনের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ও শিক্ষকদিগের মত, শিক্ষা তত্ত্বাভিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মত, দেশনায়কদিগের মত এবং অপরাপর বিশেষজ্ঞদিগের মত লইয়া, এই গুরুতর বিষয়টির মীমাংসা করিবেন।

উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষার দিক দিয়া বিষয়টি আরো একটু আলোচনা করা আবশ্যক। মধ্য ও প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্য বিষয় নির্ব্বাচনের মূল নীতি কি? প্রশ্নটির উত্তরে অনেক কথা আসিয়া পড়ে, শিক্ষা জিনষটা কি এবং কিরূপ হওয়া উচিত? ইহার মূল উদ্দেশ্যই বা কি? ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রশ্নের আলোচনা করিয়া এই দীর্ঘ প্রবন্ধ অযথা ভারাক্রান্ত করিব না। ডাক্তার ওয়েলটনের মত এখানে পুনর্ব্বার উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠ্যতালিকার গঠন আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বলেন "সাধারণভাবে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের এবং বিশেষভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রধান কার্য্য ছাত্রদের সহিত তাহাদের নিজেদের জীবনব্যাপারের যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপন।" এই দৈনন্দিন জীবনব্যাপারের সহিত যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপন যদি মধ্যশিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমাদের নিজ নিজ গৃহের, বংশের এবং সমাজের যাহা সুপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তিস্বরূপ, সেই ধর্ম্মজীবনকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে চলিবে না; এবং যে ভাষার দ্বারা সেই জীবনে প্রবেশলাভ হয়, যাহার সুমধুর ঝঙ্কার ব্রত নিয়মের ভিতর দিয়া, আচার অনুষ্ঠানে মিলিত হইয়া, আনন্দ উৎসবে অনুপ্রাণিত থাকিয়া এবং পূজা অর্চ্চনা মুখরিত করিয়া, আমাদের জীবনসমষ্টির অর্দ্ধাংশ বাক্যমাধুর্য্যে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, সেই ভাষাকে উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষায় উপেক্ষিত স্থানে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিলে সুনির্ব্বাচিত পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত হইতে পারে না। বিদ্যালয়ই শিক্ষার একমাত্র ক্ষেত্র নয়,—পরিবার, সমাজ এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্মকেও মনে রাখিতে হইবে; এবং এখানকার অস্ফুট শিক্ষাকে প্রস্ফুট করিতে হইবে, অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের পূর্ণতায় প্রদীপ্ত করিতে হইবে, এবং বিশৃঙ্খল জীবনবোধকে শ্রেষ্ঠতর ও মহত্তর আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে (Welton's Principle & methods of Teaching Pages 31—34); এবং সেই নিমিত্তই সংস্কৃত ভাষাকে পাঠ্যতালিকায়, উপেক্ষার স্থান নয়, সম্মানের স্থান প্রদান করিতে হইবে।

(ঘ) ইতিহাস। ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও দেখা যায় কমিসন এ বিষয়টির প্রতিও পূর্ণদৃষ্টি দিবার অবসর পান নাই। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জার্ম্মাণিতে, আমেরিকায়—সকল সভ্য দেশেই—এমন কি প্রাথমিক শিক্ষার

পাঠ্যতালিকায় জগতের ইতিহাসের স্থান হইয়াছিল। বাঙ্গলা ভাষায় যখন ইতিহাস চর্চ্চা হইবে তখন আমাদের মধ্যশিক্ষারও এই জাগতিক ইতিহাসের স্থান না হইল কেন? যখন ভূগোল পড়ান হইবে, তখন ত কৈ ভারতবর্ষ ও বৃটীশসাম্রাজ্যের ভূগোলই পড়ান হইবে না। ইতিহাস সম্বন্ধেই এই নিয়ম হইল কেন? সত্য কথা, বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যালয়তে ইতিহাস শিক্ষার অবস্থা শোচনীয় এবং উপযুক্ত শিক্ষাতত্ত্বাভিজ্ঞ শিক্ষকের "অত্যন্তাভাব"। কিন্তু এরূপ অভাব ত সমস্ত পাঠ্য বিষয়েই। ভবিষৎ উন্নতি উপযুক্ত শিক্ষকের উপর নির্ভর করিবে ইহা অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও সত্য এবং ইতিহাস সম্বন্ধেও সত্য। তবে শিক্ষাতত্ত্বাভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব থাকিলেও ইতিহাসাভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব হইবে না। নূতন বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য যেমন পরীক্ষাগার দরকার, নূতন দেশের ইতিহাস আয়ত্ত করিতে সেইরূপ বিশিষ্ট শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। ইতিহাসজ্ঞ শিক্ষক ইচ্ছা করিলেই নিজের চেষ্টায় এরূপ ইতিহাস আয়ত্ত করিয়া লইতে পারেন। তবে একটি কথা জাগতিক ইতিহাস একটি বিরাট ব্যাপার; মধ্য শিক্ষায় পাঠ্যতালিকা অযথা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু সভ্য দেশ সমূহেও ত এই সমস্যা? মধ্য শিক্ষায় যে নিমিত্ত ইতিহাস পড়াইতে হইবে; তাহার মূল নীতির অনুসরণ করিলেই দেখা যায়, জাগতিক ইতিহাস ব্যতীত উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে না কিন্তু আমরা যেরূপ দিন-মাস-বৎসর জন্ম-মৃত্যু-জয়-পরাজয় ইত্যাদি ইত্যাদি সম্বলিত ইতিহাস পুস্তক সাধারণতঃ পড়াইতে অভ্যস্ত, তাহাই যথার্থ ইতিহাস শিক্ষার যথার্থ পুস্তক নয়। নূতন প্রণালীতে ইতিহাস লিখিত হইলে, পাঠ্যতালিকার গুরুত্বের অভিযোগ নাও আসিতে পারে। জাগতিক ইতিহাস অর্থেও এরূপ বুঝাইতেছে না, যে পৃথক পৃথক দেশের ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস সম্পূর্ণ পড়াইতে হইবে। বাঙ্গালা দেশের সহিত এবং ভারতবর্ষের সহিত যে সমস্ত সভ্যতার সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ হইয়াছে, এবং বর্ত্তমান জাতীয় জীবন সংগ্রামে, নানা দেশের ও নানা ভাবের যে জটিল সংমিশ্রণ দেখা যাইতেছে, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ভারতবর্ষের ইতিহাস ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসের সহিত, অধ্যয়ন করিতে হইবে। (Professor James Welton's Principle and methods of Teaching Pages 237—239 Adamson's The Practice of Instruction pages 255—256.) এই উদ্দেশ্যে একটি বিষয় নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিলে বোধহয় পুস্তকের অভাব হইবে না। একই পুস্তকে এই সমস্ত বিষয় স্থান পাইতে পারে এবং এরূপ পুস্তকই পাঠ্যতালিকা ভুক্ত হওয়া উচিত। বর্ত্তমান কালে কোথাও সর্ব্বনিম্নশ্রেণীতে, কোথাও সপ্তম শ্রেণীতে এবং কোথাও ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভারতবর্ষের ইতিহাস আরম্ভ হয়। প্রায়ই আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের সহিত যোগ রাখিয়া বিষয় নির্ঘণ্ট প্রস্তুত হয় না, এবং অধ্যাপনা কার্য্যও সেই রূপে সম্পাদিত হয় না; এটিও খুব বড় সত্য যে এই দীর্ঘকাল, প্রতি সপ্তাহে, দুই ঘণ্টা বা ততোধিক কাল এক ভারতবর্ষের ইতিহাস লইয়াই ব্যস্ত থাকিলেও, শেষে দেখা যায় এই ভারতবর্ষের ইতিহাসের জ্ঞানও, অনেক সময়, অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। এইরূপ হইবার নানা কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও, দীর্ঘকাল একই বিষয়ের চর্চ্চাও তাহার অন্যতম একটি প্রধান কারণ। কৌতূহল ও শ্রদ্ধাই সুশিক্ষার মূল; বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিলে, মনঃসংযোগ থাকে না এবং শিক্ষায় সুফল লাভ হয় না। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাতৃভাষার ভিতর দিয়া, বৈজ্ঞানিক অধ্যাপনা পদ্ধতির সাহায্যে, উপরোক্ত বিষয় নির্ঘণ্ট শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, এবং এইরূপেই, ইতিহাস শিক্ষার সুফল সুখলভ্য হইবে বলিয়া মনে হয় (Welton's Principle of methods of Teaching Page 225—243)

পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন কারণে আমার মনে, হয়, উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান পাঠ্যতালিকা পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিবার পূর্ব্বে, ভবিষ্যৎ মধ্যশিক্ষা সমিতি, গভীরভাবে অনুসন্ধান করিয়া, বিস্তৃত বিষয় নির্ঘণ্ট সম্বলিত পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করিবেন। প্রুসিয়ায় এইরূপ আদর্শ নির্ঘণ্ট আছে। ফ্রান্সেও আছে, আমেরিকায়ও আছে, এবং ইংলণ্ডের বিদ্যালয়গুলিতে ব্যষ্টি-ভাব প্রবল হইলেও, এইরূপ তালিকাও নির্ঘণ্টের পক্ষপাতী বিশেষজ্ঞের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। বিদ্যালয়ে ও শিক্ষায় প্রাণহীন ঐক্য সংস্থাপন এই নির্ঘণ্টের লক্ষ্য হইতে পারে না। নির্জ্জীব ঐক্য অবনতির প্রথম সূচনা এবং মরণের পূর্ব্বাভাস। স্বাতন্ত্র্যই জীবন;—নবীনতাই সরস আনন্দের উৎস, উৎকর্ষের পূর্ব্বরাগ। বিদ্যালয়গুলির স্বাতন্ত্র্য, শিক্ষার সরলতা, পদ্ধতির অভিনবত্ব, আদর্শের সজীবতা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, বিষয় নির্ঘণ্টের ভিতর দিয়া, মধ্যশিক্ষার একটি জ্যোতিষ্মান স্বরূপ শিক্ষক সমাজে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে হইবে: এবং নবসংস্কারে এই একনিষ্ঠ উপাসকবৃন্দের সাধনার ফলে, এই স্বরূপের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণচ্ছটা দেশে, রাষ্ট্রে, সমাজে, পরিবারে নব জীবনের নূতন জাগরণ ঘোষিত করিবে।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়।

নব বিবাহ।

আজ্‌কে আমি তোমায় ওগো
নতুন করে' চিনেছি
চিরকালের মতন এবার
মৃত্যু-মূলে কিনেছি!
সাক্ষী আগুন, আকাশ ভরা তারা,
স্তব্ধ নীরব দৃষ্টি পলক-হারা,
অন্ধকারের ছান্‌লা-তলায়, তোমায়
স্বয়ম্বরে জিনেছি।

আজ বিধাতা পুরুৎ মোদের
প্রাণে প্রাণে বেঁধেছে,
হাতের বাঁধন পড়্‌লো খুলে
ছাইয়ের গাদায় কেঁদে যে!
শন্'শন বনের শীতল হাওয়া,
নদীর জলে জলতরঙ্গ গাওয়া,
ক্বচিৎ পাখীর চকিত কাকলীতে
বিয়ের মন্ত্র সেধে।

এলাম নিয়ে ঘরে বধূ
অনন্ত-যৌবনা
হৃদয় আমার উঠ্‌লো ভরে
পরাণ কি উন্মনা !
শূন্য গৃহ পূর্ণ হয়ে গেল
আঁধার ঘোরে পৌর্ণমাসী এল'
ব্যথা বিধুর স্মৃতি-মধুর হ'য়ে
ছড়াল' লাজ-কল্পনা !

সত্য করে' এবার, ওগো,
তোমায় বিয়ে করেছি
তোমার সত্বা আপন করে'
নিজের মাঝে ভরেছি !
ঘুচে গেছে দেহের ব্যবধান
প্রাণ পেয়েছে প্রাণের সন্ধান
বিরহহীন এই মিলনে, আমি
সকল বাধা তরেছি !

বৃহৎ ছিলে ছোট্ট' হয়ে'
আজকে ধরা দিয়েছ
ক্ষুদ্রটুকু বৃহৎ হয়ে'
অনন্ত রূপ নিয়েছ !
গান ছেড়ে আজ স্বরটি তুমি শুধু
পরাণ-বিহীন কেবল গন্ধ-মধু !
দৃষ্টি ছেড়ে নিত্য চোখের তারায়
সগৌরবে দাঁড়িয়েছ !

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পরীক্ষা।

রাজভবনে মহা সমারোহ। যুবরাজ হেমন্তকুমারের রচিত 'ভাস্করদেব' নাটক অভিনীত হইবে। স্বয়ং রাজকুমার ও তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু ও বান্ধবীগণ পাত্র পাত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। এ অভিনয় সাধারণের জন্য নহে, রাজকুমারের বন্ধুগণই ইহার দর্শক।

মালবের রাজা উপযুক্ত পুত্র হেমন্তকুমারের হস্তে সকল কার্য্য সমর্পণ করিয়া শান্তি উপভোগ করিতেছেন, নামে যুবরাজ হইলেও হেমন্তকুমারই মালবের কার্য্যনিয়ন্তা।

পটোত্তলনের আর বিলম্ব নাই। পুরুষ ও মহিলাগণ উৎগ্রীব ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন। উজ্জ্বল দীপালোকে নাট্যশালা আলোকিত। পুষ্পসারের তীব্র মদির গন্ধে বায়ু ভারাক্রান্ত।

যুবরাজ হেমন্তকুমার বাগদত্তা পত্নী পুষ্পিকার সহিত দর্শকের আসনে বসিবামাত্র পটোত্তলন হইল। গল্পের মৃদু গুঞ্জনধ্বনী মুহূর্ত্ত মধ্যে থামিয়া গেল।

প্রথমেই পঞ্চনদের রাজা যুবা ভাস্করদেব মন্ত্রীর সহিত রুগ্নারাণীর স্বাস্থ্যের জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে তাহার আলোচনা করিতেছেন, মন্ত্রী বহুক্ষণ যুবকের প্রেমোচ্ছ্বাস শুনিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন ভিষক বলিয়াছেন কেবলমাত্র এক উপায়ে রাণীর নষ্টস্বাস্থ্য ফিরিতে পারে, তাহা স্নিগ্ধ শ্যামল কাশ্মীরে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা, কিন্তু তাহা তো অসম্ভব কারণ কাশ্মীরের সহিত পুরুষানুক্রমে পঞ্চনদের শত্রুতা চলিতেছে। সুতরাং যুদ্ধে কাশ্মীর জয় করিয়া তবে তথায় রাজ্ঞীকে লইয়া যাইতে হয়। কিন্তু রমণীর জন্য সমরানল প্রজ্জলিত করা সমীচিন নহে। ভাস্করদেব বলিলেন "রাজ্ঞীই যদি না বাঁচিলেন তবে রাজ্যে আমার প্রয়োজন কি?" ইহা লইয়া মন্ত্রীর সহিত কিছুক্ষণ কথা চলিবার পর পটক্ষেপ হইল।

সহাস্য দৃষ্টিতে হেমন্তের প্রতি চাহিয়া পুষ্পিকে বলিল "সকলে যাহা করিয়া থাকে ভাস্করদেবও তাহাই করিলেন, কিন্তু পরে কি হইল? এই মনভাব ভাস্করদেবের কতদিন ছিল? রাণীর নিশ্চয় মৃত্যু হইয়াছিল এবং ভাস্করদেব পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছিলেন?"

অতি মৃদুস্বরে রাজকুমার উত্তর করিলেন "কেন পুষ্পিকা, ভাস্করদেবের ব্যবহারে তুমি কি কিছু মিথ্যা বা ছলনার পরিচয় পাইয়াছ?"

পুষ্পিকা বলিল "পুরুষ যখন প্রেমিক বলিয়া আপনাকে জাহির করিতে থাকে, তখন কাহার সাধ্য তাহাদিগকে কপট বা মিথ্যাবাদী বলিয়া বুঝে!—যাক, দেখি এবার ভাস্করদেব কি করেন।"

দ্বিতীয় দৃশ্য অভিনয় হইয়া গেল। পুষ্পিকা বলিল "মৃতার জন্য ভাস্করদেবের এতখানি বৈরাগ্য আমার বড়ই অস্বাভাবিক বোধ হইতেছে। ভাস্করদেব ছদ্মবেশে অবধূতের নিকট তো চলিলেন, অবধূতের কি একটি কন্যা নাই!"

হেমন্ত হাসিয়া বলিলেন "পুষ্পিকা, সকল বস্তুকেই যে সন্দেহ দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত, তাহার নিকট সত্যও মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। প্রেম যখন তুমি বিশ্বাস করই না, তখন তোমার নিকট ইহা ছলনা বলিয়াই তো বোধ হইবে।"

পুষ্পিকা বলিল "এখন এ বিষয় আলোচনার সময় নহে। কে কি ভূমিকা লইয়াছে? আমি কাহাকেও চিনিতেছি না। রাণী চূতা সাজিয়াছে কে? মূর্চ্ছনা কি?"

হেমন্ত বলিলেন "হাঁ, রাজকুমারী দীপ্তি কে সাজিয়াছে চিনিতে পারিতেছ?"

পুষ্পিকা কিছুক্ষণ অভিনয়কারিণীর প্রতি চাহিয়া বলিল "বোধ হইতেছে সেবা. হাঁ সেবাই, তাহার হাবভাবে একটু বিশেষত্ব আছে, রাজকন্যার অভিনয় সেবাকেই সাজে। ভাস্করদেব কে সাজিয়াছে?"

হেমন্ত বলিলেন "চিনিতেছ না? বিজয় সেন।"

চমকিত হইয়া পুষ্পিকা বলিল "বিজয় সেন? নূতন সেনাপতি বিজয় সেন?"

হেমন্ত বলিলেন "হুঁ সেনাপতি বিজয় সেনই প্রেমিক ভাস্করদেব হইয়াছে। আমিও ভূমিকা লইয়াছি আমি পারস্য রাজকুমার ইমদাদল খাঁ।"

পুষ্পিকার হাসপ্রফুল্ল মুখ নিমেষের মধ্যেই ম্লান ও গম্ভীর হইল। ব্যথিত কণ্ঠে পুষ্পিকা বলিল "এক মাসও হয় নাই বিজয় সেনের স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে; পত্নীর মৃত্যু তাহাকে কিছুমাত্র ব্যথা দিতে পারে নাই, বিজয় সেন আজ অভিনয়ে যোগ দিয়া প্রেমিকের ভূমিকা অভিনয় করিতেছে! রাজকুমার, ইহা অপেক্ষা পুরুষের হৃদয়হীনতার কি পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে!"

হেমন্ত উত্তর দিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নীরবে রহিলেন। পুষ্পিকার হস্তে মুক্তাঝালর স্খলিত একখানি স্বর্ণনির্ম্মিত ব্যজনী ছিল, তাহা ইতস্ততঃ আন্দোলন করিতে করিতে বলিল "কি গরম! উঃ আমার মাথা ব্যথা করিতেছে, আর থাকিতে পারিতেছি না।"

পুষ্পিকা উঠিবার উপক্রম করিতেই হেমন্ত সাগ্রহে তাহার হাতখানি ধরিয়া দুঃখিতভাবে বলিল "পুষ্পিকা, তুমি দেখিবে বলিয়াই এ আয়োজন, আমার অভিনয় না দেখিয়াই তুমি চলিয়া যাইবে?"

ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে একবার হেমন্তের প্রতি চাহিয়া পুষ্পিকা অভিনয়ের প্রতি চক্ষু নিবিষ্ট করিল কিন্তু তাহার গম্ভীর মুখে পূর্ব্বের প্রফুল্লতা আর দেখা গেল না।

(২)

রাজমন্ত্রীর প্রাসাদোপম অট্টালিকার বহির্দ্বার অতিক্রম করিয়াই হেমন্ত দেখিলেন পুষ্পোদ্যানে মর্ম্মর প্রস্তরাসনে পুষ্পিকা বসিয়া আছে। নিকটে আসিলে হাসির আলোকে তাহার অভ্যর্থনা করিলেও, তাহার অন্তরালে যে অন্ধকার প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা বুঝিতে হেমন্তের বিলম্ব হইল না।

পুষ্পিকার পার্শ্বে বসিয়া হেমন্ত বলিলেন "আমি জানিতাম যে পুষ্পিকা আজ আমার প্রতীক্ষাতেই উদ্যানে বসিয়া আছে।"

পুষ্পিকা বলিল "হাঁ রাজকুমার আজ তোমার প্রতীক্ষাতেই আমি এখানে বসিয়া আছি। আজ একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব। হেমন্ত যাহার পরিণতিতে বিবাহ এবং যাহার উপর মানব সমাজ প্রতিষ্ঠিত সেই প্রেম সত্য কি মিথ্যা তাহা কি তুমি বলিতে পার?"

হেমন্ত বলিলেন "তাহাই যদি সত্য না হইবে তবে তুমি কেন আমার প্রতীক্ষায় ছিলে এবং আমিই বা কেন এখানে ছুটিয়া আসিয়াছি?"

হাসিয়া পুষ্পিয়া বলিল "যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া না যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কি আমরা তাহা মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারি ?"

হেমন্ত বলিলেন "কিন্তু স্বপ্ন তো আমাদের তৈয়ারী নহে, যিনি জাগাইতেছেন, স্বপ্নও তো তিনি দিতেছেন।"

পুষ্পিকা বলিল "তাহা বোধ হইলেও ইহা সত্য নহে। স্বপ্ন আমরাই সৃষ্টি করি।"

হেমন্ত বলিলেন "তাহা হইলেও স্বপ্ন নিষ্প্রয়োজন নহে। প্রেমও সেইরূপ আমরাই প্রস্তুত করি সত্য, কিন্তু সেজন্য প্রেম মিথ্যা বা নিরর্থক নহে।"

পুষ্পিকা বলিল "এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমার বোধহয় কাব্যের শোভা বর্দ্ধনের জন্য কবিগণ প্রেমের সত্ত্বা কল্পনা করিয়াছেন, বাস্তব জগতে প্রেম নাই।"

হেমন্ত চমৎকৃত হইয়া বলিলেন "এ অদ্ভুত সত্য তুমি কোথা হইতে আবিষ্কার করিলে ?"

পুষ্পিকা বলিল "আবিষ্কার নহে হেমন্ত, আমি জানিতে চাহিতেছি, জগৎকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, প্রেম সত্য কি মিথ্যা, ইহা আছে কি নাই। ইহার উত্তর না পাইলে কোন বন্ধনে আমি আবদ্ধ হইব না।"

হেমন্ত বলিলেন "এ সকল কথা শুনিলে লোকে তোমাকে পাগল বলিবে। তুমি আমার ভালবাসার প্রমাণ চাও, ভাল, আমি তোমার নিকট প্রমাণ করিব যে, আমি তোমাকে ভালবাসি, প্রেম মিথ্যা নহে। আমি চারি বৎসর তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়াছি, আর কতদিন অপেক্ষা করিব পুষ্পিকা !"

পুষ্পিকা বলিল "অপেক্ষা অনাবশ্যক। ভারতের সকল রাজকুমারীই তোমাকে বিবাহ মাল্য দিলে ধন্য হইবেন। আমার যাহা বলিবার ছিল তাহা বলিয়াছি।"

হেমন্ত বলিলেন "পুষ্পিকা আমার ভালবাসা এত লঘু নহে যে, অনায়াসে তাহা পথভ্রষ্ট হইবে। তুমি নিষ্ঠুররূপে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ, কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আমি তোমাকেই ভালবাসিব।"

কয়েক মুহূর্ত্ত স্থিরভাবে হেমন্তের প্রতি চাহিয়া পুষ্পিকা বলিল "ইহাই কি প্রেম! এ কি প্রেম! এ কি সত্য !"

পুষ্পিকার একখানি হস্ত স্বহস্তে তুলিয়া লইয়া হেমন্ত বলিলেন "সত্য।—পুষ্পিকা—"

হাত টানিয়া লইয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া পুষ্পিকা বলিল "হাঁ জগৎ সর্ব্বদাই এ কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে। সেইজন্য পত্নীর মৃত্যুর পর বিবাহ করিতে পুরুষের অধিক বিলম্ব হয় না, সেইজন্য মৃত পত্নীর স্মৃতি ভুলিবার জন্য এত আয়োজন হইয়া থাকে! যাহাকে একদিন আমরা হৃদয়বান বলিয়া জানিতাম সেই বিজয় সেন কুমারী মূর্চ্ছনার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেছে! পত্নীপ্রেমের কি জলন্ত দৃষ্টান্ত !"

হেমন্ত ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া পরে বলিল "পুষ্পিকা, তবে সত্য তুমি আমাকে ত্যাগ করিবে ? তোমার আত্ম-হৃদয় কি তুমি বুঝিতেছ না, যাহা অস্বীকার করিতেছ, তাহাতে তুমি কি আবদ্ধ হও নাই ?"

বিষাদপূর্ণ হাসি হাসিয়া পুষ্পিকা বলিল "হেমন্ত পূর্ব্বে যাহা তুমি বলিলে সকলেই কি প্রেমাস্পদকে তাহাই বলে না! কিন্তু ইহাদের কথা ও কার্য্য তো একরূপ হয় না। সেইজন্য আমি বলিতেছি যে হয় তো জ্ঞাতসারে তোমরা মিথ্যা বল, নতুবা প্রেম সম্বন্ধে তোমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই।"

হেমন্ত বলিলেন "এই তুচ্ছ বিষয় লইয়া সত্যই যে তুমি এত ভাবিতেছ আজ তাহা বুঝিলাম। এত দিন মনে করিয়াছিলাম তুমি কৌতুক করিতেছ। যাহা হউক আমি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইলাম, বল কি করিতে হইবে ?"

পুষ্পিকা বলিল "জানি না কি করিতে হইবে। কোন দিন এ সমস্যার মীমাংসা হইবে কি না তাহাও জানি না। জগৎ নিয়ত যাহা দেখাইতেছে তাহাতে প্রেমের তো কোন প্রমানই পাওয়া যায় না, যাহার চক্ষের সম্মুখে প্রিয়জন যন্ত্রণার সহিত নিতান্ত অনিচ্ছায় ইহলোক ত্যাগ করিয়া যায়, সে কিরূপে সেই শোচনীয় দৃশ্য ভুলিয়া পুনরায় সংসারের মধ্যে আপনাকে নিয়োজিত করে, তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। প্রিয়জনের মৃত্যু-ম্লানমুখচ্ছবি কি সর্ব্বদা তাহার মনশ্চক্ষে উদিত হইয়া সকল আমোদপ্রমোদ হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করে না! কিন্তু তাহা তো করে না, তবে প্রেমের মূল্য কি? প্রেমের মর্য্যাদা কোথায়!"

হেমন্ত বলিলেন "তুমি প্রেমকে যেভাবে দেখিতে চাহিতেছ দুর্ব্বল মানবজীবনে তাহা অসম্ভব। এই প্রেমের জন্য যে আত্মত্যাগ পরার্থপরতার প্রয়োজন সকল মানুষের সে শক্তি নাই।"

পুষ্পিকা বলিল "তবে কি ভগবান মানুষের মনে প্রেম দিয়াছেন কেবল উপহাস করিবার জন্য? ইহা দুদিনের জিনিষ, জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার সমাপ্তি হইয়া যায়! ইহাই প্রেম! কোথায় গিয়া তবে নারীর প্রেম পূর্ণ-পরিণতি লাভ করে? তোমাদের নিকট তো ইহার প্রতিদান পাওয়া যায় না। প্রেমের জন্য ত্যাগের ক্ষমতা নাই, সংযমের সাধ্য নাই, এই প্রেমেরই তোমরা এত গর্ব্ব করিয়া থাক!"

হেমন্ত বলিলেন "সে প্রেম উচ্চ স্তরের। সাধনায় সিদ্ধ না হইলে মানুষ ইহা লাভ করিতে পারে না।"

পুষ্পিকা বলিল "কিন্তু প্রেমকে এভাবে কামনায় পরিণত করিবার জন্য ভগবান মনুষ্যহৃদয়ে প্রেম দেন নাই। যখন সাধনায় সিদ্ধ হইয়া প্রেমের অধিকারী হইবে তখন আমার নিকট আসিও। আমি প্রেম চাই, তাহার মরীচিকা চাহি না।"

পুষ্পিকা আসন ত্যাগ করিয়া উদ্যান হইতে চলিয়া গেল। আজ হেমন্ত তাহাকে বাধা দিলেন না।

(৩)

মূর্চ্ছনার চিত্রগৃহ বহু চিত্রে পরিশোভিত। কোনটি সমাপ্ত, কোনটি অর্দ্ধসমাপ্ত কোনটি বা আরম্ভমাত্র হইয়াছে, চিত্রগুলি সকলই মূর্চ্ছনার অঙ্কিত। মহা সম্ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠীকন্যা মূর্চ্ছনার নাম চিত্রলেখিকারূপে মালবে সুপরিচিত।

সিক্ত তুলিকা হস্তে মূর্চ্ছনা চিত্রাঙ্কনে রত, তাহার তুলিধৃত হস্ত কখনও দ্রুত চালিত হইতেছে, কখনও বা সে কয়েক পদ পশ্চাতে সরিয়া একদৃষ্টে চিত্র দেখিতেছে, আবার তখনই ফিরিয়া গিয়া রেখার দ্বারা অপূর্ব্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে।

সহসা পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া মূর্চ্ছনার চক্ষু চাপিয়া ধরিল। মূর্চ্ছনা হাসিয়া বলিল "এমন কোমল স্পর্শ কেবল এক বসন্তেই সম্ভবে। অসময়ে পুষ্পবিকাশের কারণ কি?"

পুষ্পিকা মুগ্ধভাবে বলিল "এ বিদ্যা আমি কিছুতেই শিখিতে পারিলাম না। সেদিন 'সার্থক প্রেম' নামে একখানা ছবি আঁকিয়াছিলাম, রাজকুমার দেখিয়া বলিলেন "রমণীটির কি ক্ষুধা পাইয়াছে?"

মূর্চ্ছনা হাসিতে হাসিতে বলিল "রাজকুমারের চিন্তাতেই তুমি সব মাটী করিয়াছ। ঐ রোগে পড়িলে সব কাজই নষ্ট হয়।"

পুষ্পিকা বলিল "আমি কিছু দিন তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমাকে একখানা ছবি আঁকিয়া দিতে হইবে।"

মৃদু হাসিয়া মূর্চ্ছনা বলিল "ঠিক এই কথা বলিয়া আর এক জন আমার শিষ্যত্ব লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন।"

পুষ্পিকা বলিল "তবু তো তোমার বিশ্বাস আমি তোমার বেণী প্রশংসা করি। সে শিষ্যটি কে?"

সলজ্জ হাসিতে মুখ রঞ্জিত করিয়া মূর্চ্ছনা বলিল "সে বিজয় সেন।"

চমকিত হইয়া পুষ্পিকা অন্য দিকে চাহিল, তাহার আহত স্থানে আবার আঘাত পড়িল।

পুষ্পিকার প্রতি মননিবেশের সময় তখন মূর্চ্ছনার ছিল না, সুখ-স্মিত-মুখে মূর্চ্ছনা বলিল "বিজয় সেনকে আমি পূর্ব্বে ভাল জানিতাম না। সে দিন অভিনয়ে তাহার সহিত আমার সবিশেষ পরিচয় হয়। যেমন অভিনয়ে তেমনি কথাবার্ত্তায় তিনি অতি চমৎকার!"

পুষ্পিকা ক্ষণমধ্যেই আত্মসম্বরণ করিয়াছিল, হাসিয়া বলিল "তিনি কি কেবল চিত্রাঙ্কনেই শিষ্যত্ব লইয়াছেন?"

মূর্চ্ছনা প্রফুল্ল মুখে বলিল "আপাততঃ তাহাই বটে; কিন্তু শীঘ্রই যে অন্য বিষয়ে শিষ্যত্ব লইবেন তাহাতে কোন সংশয় নাই।"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া পুষ্পিকা বলিল "মূর্চ্ছনা আমরা বরাবরই খোলাখুলিভাবে আলাপ করিয়া আসিয়াছি, কয়েকটী কথা জানিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে, রাগ করিবে না তো?"

মূর্চ্ছনা বিস্মিত হইয়া বলিল "আমি যে রাগ করিব তাহা তুমি ভাবিতে পারিলে পুষ্পিকা? তুমি জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে তো আমি সব বলিলাম।"

পুষ্পিকা বলিল "আঃ প্রথমেই তোমাকে যে রাগাইয়া দিলাম! সে যাক্, বিজয়কে তুমি ভালবাসিয়াছ কিন্তু বিজয় যে তোমাকে ভালবাসিবে তাহা তুমি কি বিশ্বাস কর?"

বিস্মিত হইয়া মূর্চ্ছনা বলিল "সে কি কেন ভালবাসিবে না? তাহার সম্বন্ধে তুমি কিছু শুনিয়াছ?"

পুষ্পিকা বলিল "তাহা নহে, আমার বিশ্বাস দ্বিপত্নীকেরা দ্বিতীয় পত্নীকে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিতে পারে না, তাহাদের হৃদয়ে পূর্ব্ব-পত্নী নিয়তই জাগিয়া থাকে।"

আশ্বস্ত হইয়া মূর্চ্ছনা বলিল "ওঃ এই! তা পূর্ব্বপত্নীর স্মৃতি নিশ্চয় হৃদয়ে আছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস ভাল-বাসার দ্বারা অতি অল্প দিনেই আমি বিস্মৃতির অন্ধকারে আমি সে স্মৃতি ডুবাইয়া দিতে পারিব।"

পুষ্পিকা জিজ্ঞাসা করিল "তাহা কি পারিবে?"

মূর্চ্ছনা বলিল "নিশ্চয়ই। জীবিত বর্ত্তমানের নিকট অতীতের স্মৃতি কতক্ষণ টিকিতে পারে? দ্বিপত্নীকরা দ্বিতীয় পত্নীর অধিক অনুগত হয়, তাহা কি তুমি জান না?"

পুষ্পিকা আবার বিষন্ন হইল। হায় মৃত পত্নীগণ ইহাই তোমাদের প্রেমের স্বার্থকতা! এইরূপেই তোমরা বিশ্বাসপূর্ণ প্রেমের প্রতিদান পাইতেছ!

মূর্চ্ছনা এতক্ষণে পুষ্পিকার বিষন্নতা লক্ষ্য করিল। কিন্তু কারণ বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইল, পরে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "আমিও একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব তুমি তো রাগ করিবেনা?"

ম্লানমুখে হাসি আনিয়া পুষ্পিকা কেবলমাত্র বলিল "না।"

মূর্চ্ছনা বলিল "পুষ্প, আমাকে লুকাইও না, তুমি কি বিজয়কে ভালবাসিয়াছ? বিজয়ের সহিত তোমার বহুদিনের পরিচয়"—.

পুষ্পিকা বলিল "কি বলিতেছ! আমি যে যুবরাজ হেমন্তকুমারের বাগ্দত্তা তাহা কি ভুলিয়া গেলে?

মূর্চ্ছনা বলিল "ভুলিনাই বলিয়াই আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমার নূতন জীবনের সম্ভাবনায় তোমাকে তো প্রফুল্ল দেখিলাম না, তুমি এত বিষণ্ণ হইলে কেন? বল পুষ্পিকা, আমার নিকট লুকাইবার কি আছে?"

পুষ্পিকা ক্ষণকাল ভাবিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল "কিছুই নহে,—ব্যস্ত হইও না মূর্চ্ছনা। আমি ভাবিতেছিলাম হেমন্তকুমারকে আমি কত ভালবাসি, কিন্তু আমার মৃত্যু হইলে সে কত সহজে আমাকে ভুলিয়া আর একজনকে ভালবাসিবে।"

মূর্চ্ছনা হাসিয়া বলিল "না না, হেমন্ত তেমন নহে।"

পুষ্পিকা বলিল "বিজয়ই কি পূর্ব্বে এরূপ ছিল? আজ বিজয় তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসা জানাইতেছে কিন্তু যদি এখন তোমার মৃত্যু হয় তবে কি ঠিক এই ভাবেই সে আর একজনকে ভালবাসা জানাইবে না? তোমার মন কি ইহা সমর্থন করে মূর্চ্ছনা?"

মূর্চ্ছনার হাস্য প্রফুল্ল মুখ ম্লান হইয়া গেল।

দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে পুষ্পিকা আবার বলিল "তবে কেন তাহার মৃত পত্নীকে ভুলাইতে পারিবে বলিয়া তুমি এত আনন্দিত হইতেছ? বিজয়ের মৃত পত্নীর স্থানে আপনাকে রাখিয়া দেখিলে কি আনন্দিত হইতে পারিবে? আত্মহৃদয় দ্বারা অপরের বিচার করিলে সত্য কি, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।"

মূর্চ্ছনা সমভাবে চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া তাহার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া পুষ্পিকা বলিল "আমার কথায় কি রাগ করিলে? আমি কি অন্যায় বলিয়াছি!"

মূর্চ্ছনা ধীরে ধীরে বলিল "না, তোমার কথা সত্য। কিন্তু জগৎ যে ভাবে চলিতেছে, কাহার সাধ্য তাহার ব্যতিক্রম করে? সুখ বল, শোক বল কিছুই স্থায়ী নহে, সময়ে সকলই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইহাতে দুঃখের কিছু নাই।"

পুষ্পিকা বলিল "নিশ্চয় আছে। মনে কর আজ যদি বিজয়ের মৃত্যু হয়, তবে কি আবার তুমি বিবাহ করিতে পারিবে?"

মূর্চ্ছনা গম্ভীর স্বরে বলিল "প্রথম দৃষ্টিতে তাহা অসম্ভব বোধ হয়, কারণ তাহার ভালবাসায় আমার হৃদয়পূর্ণ, তাহা বিস্মৃত হইবার নহে। কিন্তু শোকের তীব্রতা যখন কমিয়া যাইবে, তখন ইহাও সম্ভব হইবে।"

পুষ্পিকা বলিল "তাহা হইলে আমি বলিব বিজয়ের প্রতি তোমার এ ভালবাসা উচ্চস্তরের প্রেম নহে। তাহা প্রবৃত্তি পরায়নের আসক্তি। জগতে যদি প্রেম থাকে তবে কর্পূরের ন্যায় তাহা ক্ষণস্থায়ী নহে, নারী ও পুরুষের হৃদয় হইতে যে প্রেম উত্থিত হয় তাহা ধ্রুব চিরস্থায়ী ও পবিত্র, নতুবা তাহা প্রেম নহে অতি অপবিত্র।"

বিস্মিত মূর্চ্ছনা হাসিয়া বলিল "আশ্চর্য্য! কবিদের মাথায় যে কতরূপ কল্পনা খেলিয়া থাকে তাহা ধারনা করা কি আমাদের সাধ্য! কিন্তু কবি মহোদয় জিজ্ঞাসা করি, প্রেম যদি নাই থাকে তবে তাহা লইয়া তুমি এত মাথা ঘামাইতেছ কেন? তাহা নাই বলিয়া তোমার এত দুঃখ পাওয়ারই বা প্রয়োজন কি? প্রেম না থাকে যুবরাজকে ভুলিয়া যাও, এস, আজই তোমাকে শিষ্যত্বে বরণ করিতেছি, তুলি ধর।"

পুষ্পিকা এ পরিহাসের কোন উত্তর দিল না। মূর্চ্ছনা ঈষৎ হাসিয়া তুলিটি রঙ্গে সিক্ত করিয়া চিত্রের প্রতি হস্ত প্রসারণ করিল। এমন সময় দাসী আসিয়া বলিল "সেনাপতি বিজয়সেন আসিয়াছেন, তাঁহাকে কি এখানে লইয়া আসিব?"

পুষ্পিকার সহিত মূর্চ্ছনার বিদ্যুদ্দৃষ্টি বিনিময় হইল। মূর্চ্ছনা বলিল "হাঁ এখানেই তাঁহাকে লইয়া এস।— পুষ্পিকা, তোমার এই সব অদ্ভুত কথা কি বিজয়ের সম্মুখে"—

পুষ্পিকা বলিল "না। অনেকক্ষণ আসিয়াছি, আমি এখন বাড়ী ফিরিব।"

(৪)

বিজয়সেন চিত্রগৃহে প্রবেশ করিলে, হস্তধৃত তুলি রাখিয়া, স্মিত, সলজ্জ মুখে মূর্চ্ছনা তাহার প্রতি অগ্রসর হইল। মূর্চ্ছনার চিত্রগৃহে আসিয়া প্রথমে সকলেই এক দফা তাহার চিত্রের প্রশংসা করিয়া পরে অন্য কথা বলিত। বিজয়ও সেই প্রচলিত রীতির অনুসরণে বিরত হইল না। বলিল "কি সুন্দর! চিত্রে ভাবের অভিব্যক্তি ফুটাইতে আপনি যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন, অন্যের চিত্রে তাহা দুর্লভ। চিত্র লেখায় আপনি সিদ্ধ হইয়াছেন।"

আনন্দে মূর্চ্ছনার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল "সত্যই আমি এত প্রশংসার যোগ্য কি না তাহাতে সন্দেহ আছে, আপনাদের এই অতিশয়োক্তিতে যাহাতে আমি অহঙ্কৃত না হইয়া উঠি এজন্য আমাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইতেছে। পরে তো আপনারা উহার দায়ীত্ব লইবেন না।"

বিজয় বলিল "আমরা কি মিথ্যা প্রশংসায় আপনাকে ভুলাইতেছি মনে করেন? দায়ীত্ব যদি লইতে বলেন তাহাতে ভয়ের কিছু নাই।"

বিজয়ের কথাগুলি মূর্চ্ছনার কর্ণে বীণাধ্বনি অপেক্ষাও সুশ্রাব্য বোধ হইল। মূর্চ্ছনা হাসিয়া বলিল "কবিত্ব আপনার মধ্যেও বেশ আছে, কিন্তু এই জিনিষটি হইতে আমি একেবারে বঞ্চিত।"

বিজয় বলিল "আপনার কবিত্ব মূর্ত্তি ধরিয়া চিত্রে ফুটিয়া উঠিতেছে। আমাকে একখানা ছবি আঁকিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন?"

মূর্চ্ছনা প্রফুল্লমুখে বলিল "কিরূপ ছবি আপনার পছন্দ? কত দিনের মধ্যে চান?"

বিজয় বলিল "পনের দিনের মধ্যেই আমার প্রয়োজন। এজন্য বোধ হয় আপনাকে বিশেষ শ্রম করিতে হইবে।"

মূর্চ্ছনা বলিল "সেদিন যে বলিয়াছিলেন একমাস সময় দিবেন?"

বিজয় বলিল "তত দিন অপেক্ষার আর সময় নাই। মগধেশ্বর অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধে মালবের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন, এজন্য যুবরাজের সহিত আমি শীঘ্রই কলিঙ্গ গমন করিব। তৎপূর্ব্বে ছবিটি আমার প্রয়োজন।"

মূর্চ্ছনা বিমর্ষভাবে বাতায়নের বাহিরে চাহিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

কিছুক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া বিজয় বলিল "পনের দিন সময় একটু ত্বরা সত্য, কিন্তু আপনার যেরূপ প্রতিভা তাহাতে আপনি স্বচ্ছন্দে তাহা পারিবেন।"

মূর্চ্ছনা ধীরে ধীরে বিজয়ের প্রতি চাহিয়া আবার মুখ নত করিল।

কুণ্ঠিত স্বরে বিজয় বলিল "আচ্ছা তবে আবার, আপনাকে বিরক্ত করিলাম, এজন্য ক্ষমা করিবেন।"

মূর্চ্ছনা মৃদুস্বরে বলিল "কলিঙ্গ যুদ্ধে সত্যই কি আপনি যাইবেন ?"

বিজয় বলিল "হাঁ, আমি মালবের সেনাপতি, মগধেশ্বর অশোক মালবকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া আমাদের গৌরবান্বিত করিয়াছেন।"

মূর্চ্ছনা বলিয়া উঠিল "না আপনি যাইতে পারিবেন না. সেনাপতি পদ আপনি ত্যাগ করুন।"

বিস্মিত হইয়া বিজয় বলিল "কেন ?"

মূর্চ্ছনা বলিল "সেই বিপদের নিকট, মৃত্যুর নিকট যাইতেছেন. আপনার আত্মীয়গণ ইহাতে কি সম্মত হইয়াছেন ?"

বিজয় ম্লান হাসিয়া বলিল "জগতে আমার এমন কেহ নাই যে আমার মৃত্যুতে একবিন্দু অশ্রুবর্ষণ করে। আমি বন্ধন মুক্ত।"

মূর্চ্ছনা বুঝিল "তাহার ভালবাসা ভিক্ষার জন্যই বিজয়ের এই ভূমিকা", সে অস্ফুটস্বরে বলিল "আপনার অমূল্য জীবন কখনই এভাবে নষ্ট করিতে পারিবেন না।"

বিজয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মূর্চ্ছনার নতমুখে দৃষ্টি স্থাপন করিল, একটি সন্দেহের ক্ষীণছায়া তাহার মনে পতিত হইল, কিন্তু তাহা যে অসম্ভব !

কিছুক্ষণ পরে বিজয় বলিল "আমি এই যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়াই নূতন সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছি। আমার প্রার্থিত যুদ্ধ হইতে কেন আমি ফিরিয়া আসিব ?"

"না, না, আমি কিছুতেই সেখানে আপনাকে যাইতে দিব না।" মূর্চ্ছনার কপোল বহিয়া অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িতেই সে মুখ ফিরাইয়া লইল।

সংশয়ের যাহা কিছু ছিল, সব মিটিয়া গেল, অপ্রত্যাশিত ঘটনায় স্তম্ভিত বিজয় নিস্পন্দভাবে আসনের উপর বসিয়া রহিল।

বহুক্ষণ কেহই কথা কহিল না। অবশেষে অশ্রু মুছিয়া কম্পিতস্বরে মূর্চ্ছনা বলিল "কিরূপ ছবি আঁকিতে হইবে বলুন, আমি পনের দিনের মধ্যেই আঁকিয়া দিব।"

বিজয়ের অন্তরে আঘাত লাগিল। মূর্চ্ছনার এই রোদন, এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে চিত্রাঙ্কনের প্রতিশ্রুতি ইহা কেবল তাহার প্রতি অনুরাগ বশতঃ, কিন্তু প্রতিদান করিবার সাধ্য যে বিজয়ের নাই।

বিজয়কে নীরব দেখিয়া উত্তরের প্রত্যাশায় মূর্চ্ছনা তাহার প্রতি চাহিতে, চকিত হইয়া বিজয় বলিল "আমার স্ত্রীর নাম ছিল শিখা, কঠিন পীড়ার প্রবল ঝঞ্ঝায় সে শিখা নিভিয়া গিয়াছে, শিখার বিলোপে দীপটি ব্যর্থ হইয়া রহিয়াছে, এই ভাবে একখানি ছবি আমি চাই। আমার কিছু ধন সম্পত্তি আছে, আমার স্ত্রীর আত্মার মঙ্গল কামনা করিয়া দীন দরিদ্রের জন্য তাহা উৎসর্গ করিয়া যাইব ; এই চিত্র তাঁহার স্মৃতিমন্দিরে স্থাপিত হইবে।"

মূর্চ্ছনার অশ্রু শুকাইয়া গেল। বিমর্ষ মুখে ঈর্ষার কুটিল চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

বিজয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহা দেখিল, বলিল "তবে ক্ষমা করিবেন, অনর্থক আপনার সময় নষ্ট করিলাম।"

বিজয় চলিয়া গেল। মূর্চ্ছনা বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া রহিল, তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে বিজয় তাহার নিকট ভালবাসা ভিক্ষা করিতে আসে নাই।

(৫)

রাজমন্ত্রীর বৃহৎ ভোজন-কক্ষ ফুল, লতা ও পাতায় বিচিত্ররূপে সজ্জিত। চন্দন ও ধূপের মৃদু সুগন্ধে গৃহপূর্ণ।

সেনাপতি বিজয়সেন সেই কক্ষের একখানা আসনে একাকী বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে পুষ্পিকা গৃহে প্রবেশ করিয়া বিজয়ের সম্মুখীন হইয়া বলিল "আপনি একা আসিয়াছেন, রাজকুমার কখন আসিবেন?"

বিজয় ও তৎপত্নী শিখার সহিত পুষ্পিকার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, কিন্তু শিখার মৃত্যুর পর হইতেই পুষ্পিকা বিজয়ের সহিত বন্ধুত্বের পরিবর্তে কেবল বাহ্যিক ভদ্র ব্যবহারই করিত। বিজয় তাহাতে অত্যন্ত দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছিল; আজ বহুদিন পরে সহসা পুষ্পিকার নিমন্ত্রণ পাইয়া সে অধিকতর বিস্মিত হইয়াছে।

পুষ্পিকার প্রশ্নের উত্তরে বিজয় বলিল "রাজকুমার আসিবেন না, তিনি এই পত্রখানি দিয়াছেন।"

পুষ্পিকা ঈষৎ সচেষ্ট হাসিয়া পত্র লইয়া বলিল "বাবা এখনই আসিবেন, তাহার পূর্বে আমি আপনাকে একটা কথা বলিতে চাই, যদি আপনি অসন্তুষ্ট না হন --"

বিজয় স্বাভাবিক শান্তস্বরে বলিল "শ্রেষ্ঠিকুমারি, শিখার সহিত আপনার বন্ধুত্ব ছিল বলিয়া বলিতেছি যে তাহার মৃত্যুর পর হইতেই বিরক্তি বা অসন্তোষকে আমি চির বিদায় দিয়াছি।"

পুষ্পিকা বলিল "তাহা জানি। আপনাকেও আমি জানি। সেই জন্যই আমি.........সেনাপতি মহাশয়, আপনার মহত্ত্বে অবিশ্বাস করিয়া আমি অনুতপ্ত হইয়াছি। আপনার ক্ষমা চাওয়া বাহুল্য, কারণ আমি জানি আপনি উদার। কিন্তু তথাপি আমার অপরাধ স্বীকার করাই উচিত।"

বিজয় বিস্মিত হইয়া বলিল "অপরাধ? আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না।"

পুষ্পিকা বলিল "মূর্চ্ছনার নিকট সকল কথাই আমি শুনিয়াছি। কিন্তু আমি ভাল বুঝিলাম না। আপনার জীবন যেরূপ শোকাকুল ও নিরানন্দ হইয়াছে তাহাতে মূর্চ্ছনাকে বিবাহ করিলে সুখী হইতেন।"

বিজয় ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "শ্রেষ্ঠিকুমারি, অন্যে আমাকে বিবাহের কথা বলিতে পারে, কিন্তু আপনি বলিবেন না। আমি আবার বিবাহ করিলে শিখা কি মনে করিবে? ইহার মধ্যেই কি শিখাকে আপনি ভুলিয়া গেলেন!"

পুষ্পিকা বলিল "শিখা কি মনে করিবে এ কথার অর্থ কি?"

বিজয় বলিল "মানুষের মৃত্যু হইলে যাহারা মনে করে যে সে নাই তাহারাই একের ভালবাসা অপরকে দিতে পারে। কিন্তু এ কথা সত্য নহে।"

পুষ্পিকা উৎসুকভাবে বলিল "সত্য কি?"

বিজয় বলিল "আপনি আমার ও শিখার বন্ধু কিন্তু আপনি মূর্চ্ছনারও বন্ধু। মূর্চ্ছনাকে অসুখী দেখিয়া কি আপনি আমাকে বিবাহে ইচ্ছুক করিবার জন্য—?"

বাধা দিয়া পুষ্পিকা বলিল "কিসের বলে মূর্চ্ছনার ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করিলেন, কি আশায় আপনি সংসার সুখ পরিত্যাগ করিলেন তাহাই জানিতে আমার আগ্রহ হইতেছে। আমার মৃত বন্ধু শিখার স্বামী আপনি, শিখাকে এখনও যে আপনি মনে রাখিয়াছেন এজন্য আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি।"

বিজয় বলিল "তবে বলিতে আমার আপত্তি নাই। আমার স্ত্রী আছে বলিয়াই আমি জানি, সে চলিয়া গিয়াছে আমি তাহাকে হারাইয়াছি সত্য কিন্তু চিরদিনের জন্য হারাই নাই। সে চিরন্তরে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। আমি জানি যে শিখা পরলোকে আমার অপেক্ষায় রহিয়াছে।"

মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিস্তব্ধভাবে পুষ্পিকা বিজয়ের কথা শুনিতেছিল. একবার তাহার প্রতি চাহিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বিজয় বলিল "জীবনের কার্য্য শেষ হইলে যেদিন আমি সেখানে যাইতে পারিব সেদিন যাহাতে আমি লক্ষ শূন্য না হইয়া পড়ি, সেই চেষ্টা করিতেছি। আমার স্ত্রীর সাগ্রহ প্রতীক্ষার মধ্যে আমি যেন অমলিনভাবে উপস্থিত হইতে পারি।"

বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুষ্পিকা বলিল "যেদিন শিখার মৃত্যু হইয়াছিল, সেদিন আমি কাঁদিয়াছিলাম সে অশ্রু আজ মুছিতেছি। শিখা মৃত্যুর দ্বারা অমৃত লাভ করিয়াছে, তাহার মৃত্যুতে কাঁদিবার কিছুই নাই। আপনার অন্তরে সে চিরজীবিত রহিয়াছে।"

বিজয় কিছুক্ষণ পরে বলিল "শ্রেষ্ঠিকুমারি, যেদিন মূর্চ্ছনাকে আমি প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম, সেদিন আমার মনে হইতেছিল যে সে আমাকে ভালবাসা দিয়াছিল. কিন্তু আমি দিলাম বিরাগ ইহা কি ঠিক হইল, কিন্তু আজ আপনার শান্তমুখের ধীর কথায় বুঝিতেছি যে এই মহা প্রলোভন জয় করিয়া আমি ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারিয়াছি।"

পুষ্পিকার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। আবেগপূর্ণ স্বরে কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বৃদ্ধ রাজমন্ত্রীকে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, পিতার নিকট অশ্রু লুকাইবার জন্য দ্রুতপদে চলিয়া গেল। তাহার মুগ্ধমন বলিতে লাগিল "এই প্রেম! তবে সত্যই জগতে প্রেম আছে! প্রেম কি সুন্দর! কি শক্তিময়!"

(৬)

রাজপ্রাসাদের এক কক্ষে যুবরাজ হেমন্তকুমার, সেনাপতি, বিজয়সেন ও মগধ ও কলিঙ্গের দুইজন দূত উপবিষ্ট। দূতদ্বয় উত্তরের প্রতীক্ষায় উৎসুকভাবে রাজকুমারের প্রতি চাহিয়া আছেন, রাজকুমার কিছু চিন্তাবিষ্ট

কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া যুবরাজ মগধের দূতকে বলিলেন "মগধেশ্বর অশোক মালবকে যুদ্ধে সঙ্গী চাহিয়াছেন, ইহা সৌভাগ্যের কথা। মগধ, মালবের প্রাচীন মিত্র, মগধের মিত্রতা অক্ষুন্ন রাখাই বাঞ্ছনীয়। আপনি আর একদিন অপেক্ষা করুন, আমি কাল আপনাকে উত্তর দিব।"

মগধের দূত কক্ষত্যাগ করিলে কলিঙ্গের দূত বলিলেন "আমি যুবরাজের নিকট বিবাহ প্রস্তাব আনিয়াছি।"

হেমন্তকুমার বিস্মিত হইয়া বলিলেন "বিবাহ প্রস্তাব!"

দূত সবিনয়ে বলিলেন "হাঁ যুবরাজ। কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত কুমারী হেমমালাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন। বিবাহের যৌতুক স্বরূপ তিনি কলিঙ্গের সিংহাসন দান করিবেন।"

হেমন্ত ধীরভাবে বলিলেন "কলিঙ্গের যে সিংহাসন মগধের ভয়ে টলিতেছে?"

ব্যঙ্গ বুঝিয়া দূত গম্ভীরস্বরে বলিলেন "কলিঙ্গরাজ আপনার সাহায্যপ্রার্থী। মালব ও কলিঙ্গ একত্র হইলে অশোককে প্রতিরোধ করা অসম্ভব হইবেনা। ভগবান বুদ্ধের পুণ্য দন্তমন্দির অধিকার করিবার জনাই অশোকের কলিঙ্গ আক্রমণ; রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া আপনি দন্তমন্দিরের রক্ষক হউন, অধার্ম্মিক লুব্ধ অশোক যেন প্রভুর অমর্য্যাদা না করিতে পারেন। ভগবান ভক্তির পূজাই লইয়া থাকেন, শক্তির নহে।"

হেমন্ত বলিলেন "কলিঙ্গের পক্ষাবলম্বন করা আমার অসাধ্য। কারণ মগধ আমাদের প্রাচীন মিত্র, আর ইতিপূর্ব্বেই আমি মগধকে সাহায্য করিতে একরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছি।"

দূত বলিলেন "যুবরাজ, ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ ব্রহ্মদত্তের অন্তর্বেদনা অনুভব করুন। ভগবানের মন্দিরটি অধিকারে রাখিয়া পূজা করিবার জন্যই তাঁহার যুদ্ধ আয়োজন, তিনি মালবের নিকট ভিক্ষার্থী। রাজকন্যা হেমমালাও পিতার ন্যায় ভক্তিমতী, কেবল বুদ্ধের পূজাতেই তিনি জীবন যাপন করেন, যুবরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়া তিনি এই রাখী পাঠাইয়াছেন।"

হেমন্ত বিজয়ের প্রতি চাহিলেন। বিজয় ঈষৎ উৎসুকভাবে উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছে। হেমন্ত কিছুক্ষণ চিন্তার পর দূতকে বলিলেন "আপনি অপেক্ষা করুন, কাল উত্তর দিব।"

দূত প্রস্থান করিল। বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া হেমন্ত বলিলেন "বিজয়, আমি সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিলাম, যুদ্ধের জন্য যত শীঘ্র পার প্রস্তুত হও। আমাদের গন্তব্যস্থান কলিঙ্গ, মগধ নহে।"

বিস্মিত বিজয় বলিল "কলিঙ্গের কাতরতায় কি তুমি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবে? আর মহারাজ অশোক যে কিরূপ প্রতাপান্বিত তাহাও কি বিস্মৃত হইলে?"

হেমন্ত বলিলেন "কিছুই বিস্মৃত হই নাই। মগধের মিত্রতা বন্ধন ছিন্ন করিতেই হইবে। বিস্ময়ের কিছু নাই বিজয়, বৈচিত্র্যপূর্ণ মানবজীবনে কত পরিবর্ত্তন হয় তাহা কি কেহ বলিতে পারে?—আমি কলিঙ্গকুমারী হেমমালাকে বিবাহ করিব।"

ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া বিজয় বলিল "রাজকুমার, একথা যদি বিদ্রূপ না হয় তবে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠিকুমারীর প্রত্যাখ্যানই কি ইহার কারণ?"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া হেমন্ত বলিল "বিজয়, আজ চারি বৎসর পুষ্পিকাকে ভালবাসা জানাইয়া প্রত্যাখ্যান ভিন্ন কিছু পাই নাই, চিরকাল তাহার প্রত্যাখ্যান পাইলেই কি আমার জীবন সার্থক হইবে? সুদীর্ঘ জীবন আমার সম্মুখে রহিয়াছে এজীবন যাপন করিবার জন্য তো অবলম্বন চাই।"

বিজয় বলিল "রমণীর প্রেম ভিন্ন কি জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়? ভগবান বুদ্ধের জীবন কি ব্যর্থ হইয়াছিল?" হেমন্ত বলিল "বুদ্ধদেব সর্ব্বত্যাগী সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। কিন্তু আমি কিছুই ত্যাগ করি নাই, সংসারে আমি সুখী হইতে চাই। আমি ভালবাসা চাই এবং ভালবাসিতে চাই।"

বিজয় বলিল "আমি তো সর্ব্বত্যাগী নহি। আমার পত্নী চলিয়া গিয়াছে তাহার নিকট গেলে আমি সুখী হইব সত্য কিন্তু সেজন্য আমার জীবন তো দুর্ব্বহ হয় নাই। সংসারের সকল সুখদুঃখ আমি পূর্ব্বের মতই পূর্ণভাবে গ্রহণ করি। পত্নীর অভাবে আমার জীবন অবলম্বনহীন হয় নাই।"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া হেমন্ত বলিলেন "বিজয় ক্ষমা করিও, আমি দুর্ব্বল। তুমি জান তোমার পত্নী প্রেমময়ী তাহার স্মৃতিতে তোমার হৃদয়পূর্ণ। কিন্তু—"

বিজয় বলিল "তোমার বাগ্দত্তা পত্নীও প্রেমহীনা নহেন, পুষ্পিকা আমার বন্ধু তাহাকে আমি জানি, চারি বৎসর দেখিতেছি তুমিও তাহাকে বেশ জান। তুমিও দুর্ব্বল নহ, সুস্থ ও শক্তিমান যুবকের আত্মদমন কি এতই কঠিন? যে বলিষ্ঠ পুরুষের অসাধ্য কাজ জগতে নাই সেই পুরুষ হইয়া আপনাকে দুর্ব্বল বলিতে তোমার লজ্জা

হইল না? তোমার বুদ্ধি, তোমার বিবেক সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার সমর্থন করে একথা কি তুমি বলিতে পারিবে? জ্ঞান, বিবেচনা, প্রেম, সকলকে পরাস্ত করিয়া কামনা বিজয় পতাকা উড়াইবে, উহা এতই শ্রেষ্ঠ। শক্তিমান পুরুষ হইয়াও তুমি দুর্ব্বল, তবে সবলতা চাহিব কি বালিকার নিকট? রমনীর নিকট? সকল জানিয়া বুঝিয়াও যখন তুমি আত্মপ্রতারণা করিতেছ তখন অপরের তাহাতে বলিবার কি আছে?"

ক্রমশঃ—

শ্রীউষাপ্রভা সেন।

স্বাস্থ্যের কথা।

—:*:—

যক্ষ্মারোগীর প্রতি। বঙ্গের স্বাস্থ্য কমিশনারের বিজ্ঞাপন।

তোমার যক্ষ্মারোগ হইয়াছে বলিয়া ভয়ে বিহ্বল হইওনা। তোমার যে যক্ষ্মারোগ হইয়াছে ইহা যে তুমি জানিতে পারিয়াছ তোমার এই বোধই তোমার আরোগ্যলাভের প্রধান হেতু হইবে।

এই রোগ প্রথমাবস্থায় ধরা পড়িলেই ইহা নিবারিত হইতে পারে।

এক সময়ে লোকে মনে করিত যক্ষ্মা যার হয় তার আর রক্ষা নাই, এখন ঐ ধারণা ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহা দেখা গিয়াছে যে প্রথমাবস্থায় যে সকল রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে তাহাদের অনেকেই আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

তোমার যদি কাসি হইয়া থাকে, উহার কারণ অনুসন্ধান কর। পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহার করিও না। উহা ব্যবহার করিয়া রোগী একটু উপকার বোধ করিতে পারে, বস্তুতঃ উহাতে কোন উপকার হয় না, রোগ ক্রমশঃ বাড়িতেই থাকে।

রোগ নির্ণয়ে যাহার সুখ্যাতি আছে এমন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশ লইয়া সত্বর তাঁহার চিকিৎসাধীন হইলে রোগমুক্তির সম্ভাবনা হয়। প্রারম্ভে রোগ নির্ণয় করা যে-সে চিকিৎসকের কর্ম্ম নহে।

যক্ষ্মারোগী সতর্ক না হইলে তাহার রোগ অন্যে সংক্রামিত হইতে পারে। তাহার মলমূত্র থুথু প্রভৃতি শোধন করিয়া নষ্ট করিতে হয়।

প্রধানতঃ থুথু হইতে এইরোগ ছড়াইয়া পড়ে। থুথু গিলিও না, বা শুকাইয়া যাইতে দিও না, যেখান দিয়া লোক যাতায়াত করে এমন পথে থুথু ফেলিও না, ঘরের দেওয়াল, মেজে, কিংবা অশোধিত পাত্রে থুথু ফেলিতে নাই।

যক্ষ্মারোগীর আরোগ্যলাভের জন্য চাই—

বিশুদ্ধ বায়ু

সূর্য্য কিরণ

ও পুষ্টিকর খাদ্য

দিনে রাত্রে শীতে গ্রীষ্মে সর্ব্বদা রোগীর বিশুদ্ধ বায়ু অত্যাবশ্যক। সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের বিনা উপদেশে যক্ষ্মারোগী ব্যায়াম বা শারীরিক শ্রমসাধ্য কোন কার্য্য করিবে না। যে রোগীর ওজন কমিতেছে বা যে জ্বর জ্বর বোধ করে, যাহার থুথুর সহিত রক্ত পড়ে কিংবা নাড়ী দ্রুত চলে তাহার কোনরূপ কার্য্য করা উচিত নয়।

যক্ষ্মা সম্বন্ধে জনসাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

যক্ষ্মারোগ এক প্রকার জীবাণু হইতে জন্মে। যক্ষ্মারোগ এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সঞ্চারিত হয়, কিন্তু নিবার্য্য।

অধিকাংশ স্থলে এই রোগ রোগীর ফুস্‌ফুস যন্ত্র আক্রমণ করিয়া থাকে। এই রোগ অনেক রোগীর পরিপাক যন্ত্রও আক্রমণ করে।

যক্ষ্মারোগীর দেহ হইতে রোগ-বীজাণু থুথু, কাসি, কফ, মল, মূত্র ও পুঁজ প্রভৃতির সহ নির্গত হইয়া থাকে। যক্ষ্মারোগীর থুথু শুকাইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া বায়ু দূষিত করে। সেই বায়ু শ্বাসের সহিত যে গ্রহণ করিবে তাহারই এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। যক্ষ্মারোগী যখন কাসিতে থাকে তখন তাহার নিকটে দুই হাতের মধ্যে থাকিও না, কারণ কাসির সময়ে তাহার মুখ হইতে সূক্ষ্মাকারে থুথু নির্গত হয়, ঐ থুথুর সহিত রোগ-বীজাণু থাকিতে পারে। যখন যক্ষ্মারোগী জোরে কথা কহে তখনও ঐরূপে থুথু বাহির হইয়া থাকে। যক্ষ্মারোগীর সাধারণ শ্বাসের সহিত রোগ-বীজাণু নির্গত হয় না।

যক্ষ্মারোগীর মলমূত্র থুথু প্রভৃতি শোধন না করিয়া যদি মলপাত্রে পায়খানায়, নদীতে কিংবা ভূগর্ভে নিক্ষেপ বা প্রোথিত করা হয় তাহা হইলে উহা হইতে বিপদ ঘটিতে পারে। উহা পানীয় জলের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে। সাধারণতঃ দূষিত দুগ্ধ পানে যক্ষ্মারোগ হয়। যে গরুর যক্ষ্মা রোগ আছে উহার দুগ্ধ পান কিংবা বায়ু হইতে যক্ষ্মারোগীর থুথু চূর্ণ যে দুগ্ধে পড়ে উহা পান করা বিপজ্জনক। এইরূপ সন্দিগ্ধ দুগ্ধ না ফুটাইয়া কখনও পান করিও না।

যক্ষ্মারোগব্যাপ্তি নিবারণের প্রধান উপায় এই যে, যক্ষ্মারোগীর মল মূত্র, থুথু প্রভৃতি পরিত্যক্ত হইবামাত্র নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়। অগ্নি অথবা সংশোধক ঔষধ দ্বারা ঐ সকল নাশ করিবে।

এই নিমিত্ত কার্ব্বলিক আসিড মিশ্রিত জল অর্থাৎ /৫ সের জলে ১৭ তোলা কার্ব্বলিক আসিড মিশাইয়া সেই জল ব্যবহার করিতে হয়।

সুস্থ অসুস্থ কোন ব্যক্তির রাজপথে থুথু ফেলিতে নাই। যে স্থলে সঞ্চিত হইয়া দূরীকৃত এবং বিনষ্ট হইতে পারিবে না এমন স্থলে থুথু ফেলিও না।

যক্ষ্মারোগীর থুথু বহন করিয়া মাছি আসিয়া তোমার হাতে, মুখে, পোষাকে, খাদ্যদ্রব্যে, শিশুদের দুগ্ধ পাত্রে পড়িয়া থাকে। এই উপায়ে রোগবীজাণু উদর ও ফুস্‌ফুস্ মধ্যে প্রবেশ করে।

আত্মরক্ষা, পরিবার, বন্ধুবর্গ এবং জনসাধারণের নিরাপদের নিমিত্ত যক্ষ্মারোগীর যেখানে সেখানে থুথু ফেলা কর্ত্তব্য নহে।

যক্ষ্মারোগীরা যাহাতে তাহাদের মল মূত্র থুথু প্রভৃতি শোধন পূর্ব্বক বিনষ্ট করে তজ্জন্য সুস্থ ব্যক্তিদিগের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

দৃষ্টান্ত প্রদর্শন জন্য সুস্থ ব্যক্তিকেও যেখানে সেখানে থুথু ফেলা হইতে বিরত থাকিতে হইবে। সুস্থ ও বলিষ্ঠ ব্যক্তি আপনার অজ্ঞাতসারে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইতে পারে। এইরূপ ব্যক্তি যেখানে সেখানে থুথু ফেলিলে উহা তাহার নিজের এবং লোক সাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক।

যক্ষ্মারোগীর সহিত এক শয্যায় বা এক গৃহে শয়ন করিও না। যে ঘরে রোগী ছিল, ঐ ঘরে শয়ন করিতে হইলে ঘর শোধন করিয়া লইও।

যক্ষ্মারোগীর সংশ্রবে সুস্থ অসুস্থ সকল ব্যক্তিরই এই রোগ হইতে পারে। তবে যাহারা কৃশ ও রুগ্ন, যাহাদের সর্দ্দি কাশি, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া অথবা দৌর্ব্বল্য আছে তাহারা এই রোগে সহজেই আক্রান্ত হইতে পারে। সুস্থ ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিরা এই রোগে তেমন সহজে আক্রান্ত হয় না। যদি তোমার দীর্ঘকাল স্থায়ী কাসি রোগ থাকে তাহা হইলে কোন সুপরিজ্ঞাত সুবিজ্ঞ চিকিৎসককে দিয়া তুমি পরীক্ষিত হইও।

তুমি যদি সতর্ক হও তাহা হইলে যক্ষ্মারোগ তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। রোগাক্রান্ত হইয়া চিকিৎসিত হওয়ার অপেক্ষা সতর্কতা গ্রহণ অল্প ব্যয়সাধ্য।

যক্ষ্মারোগী যদি সময় মত সুচিকিৎসক কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হয় তাহা হইলে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে।

পুরাতন যক্ষ্মারোগ দুরারোগ্য এবং উহা অন্যের পক্ষে বিপজ্জনক।

পুরাতন যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা স্বাস্থ্যনিবাসে হওয়া কর্ত্তব্য।

এইরূপ রোগীর আরোগ্যের সম্ভাবনা থাকিলে এক মাত্র স্বাস্থ্যনিবাসেই আরোগ্য হইয়া থাকে।

এইরূপ পুরাতন যক্ষ্মারোগীর স্বাস্থ্যনিবাসে বাস জনসাধারণের পক্ষেও নিরাপদ ব্যাপার।

যে স্থলে যক্ষ্মারোগীর জন্য স্বাস্থ্যনিবাস আছে সেই অঞ্চলে যক্ষ্মারোগে অন্যত্র অপেক্ষা অল্প সংখ্যক লোকের মৃত্যু হয়।

বঙ্গদেশে যত লোক মরে উহাদের দশমাংশ যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

প্রত্যেক ১০টি শিশুর ১টি যক্ষ্মারোগে মরিয়া থাকে।

বাস এবং বিদ্যালয় গৃহ বিশুদ্ধ বায়ু পূর্ণ হওয়া আবশ্যক।

যক্ষ্মারোগীদের হিতার্থে দেশের প্রত্যেক অঞ্চলে চিকিৎসালয় থাকা কর্ত্তব্য। রোগের ব্যাপ্তি নিবারণ এবং আরোগ্য লাভের জন্য কি কি নিয়ম মানিতে হয় রোগীরা যেন চিকিৎসকদের নিকট হইতে সেই সকল উপদেশ প্রাপ্ত হয়।

যক্ষ্মারোগীকে পতিত অস্পৃশ্য মনে করিও না।

তুমি যক্ষ্মারোগ ব্যাপ্তির বিরোধী হইবে, কিন্তু কদাচ রোগীকে ঘৃণা করিও না।

যক্ষ্মারোগী যদি সতর্ক হয় তাহা হইলে তাহাকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা যাইতে পারে।

অসতর্ক যক্ষ্মারোগী সমাজের ভীষণ আতঙ্কের স্থল।

সঞ্জীবনী।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।'

৪র্থ বর্ষ। চৈত্র, ১৩২৬ সাল। ৫ম সংখ্যা।

দুঃখ বরণ।

———:*:———

নাহিক ক্ষতি! যতই মোরে দুঃখ তুমি দাও
দুঃখ যেন বহিতে পারি বুকে,
যেমন ক'রে বহিছে চখা ওই যে নদীতীরে
হারায়ে তার আপন প্রিয়াটিকে!

নাই বা হ'লো তৃপ্তি-ভরা শান্তি-নিকেতন
ব্যথায় ভরা গোপন হৃদিখানি,
নাই বা দিলে অধরপুটে পেলব তুলি দিয়া
বিশ্বজয়ী সুধার রেখা টানি!

এই যে তব নিষ্করুণ নিঠুরতর বাণী
নয়ন মোর ভরিয়া দেছে জলে,
এ যেন ঝরি' স্বরগ হ'তে মন্দাকিনীধারা
ধন্য মোরে করিছে পলে পলে।

যদিও সুখ শান্তি আজি হারায়ে চিরতরে
মৃত্যুসম পড়িয়া পথে রব,
তবুও আমি হে দুর্ল্লভ তোমার সুখ লাগি'
দুঃখ নিজ বক্ষে তুলে' লব।

শ্রীরেণুকা দাসী।

পরীক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৭)

কলিঙ্গপতির সমুদ্রতীরস্থ গ্রীষ্ম প্রাসাদটি আহতের শুশ্রূষাগারে পরিণত হইয়াছে। মগধ, মালব, কলিঙ্গ প্রভৃতি সকল দেশের কুমারীগণ সানন্দে সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যহই শুশ্রূষাগারে বহু আহত আসিতেছে।

সুবৃহৎ কক্ষমধ্যস্থ ক্ষুদ্র খট্টায় শায়িত একটি আহত সৈনিকের নিকট দাঁড়াইয়া, একজন সেবিকা অতি সন্তর্পণে তাহার মস্তকবেষ্টিত বস্ত্রখণ্ড খুলিয়া দিতেছে। যুবকটি রণক্ষেত্রে অচৈতন্য হইয়াছিল, আজ পর্য্যন্ত জ্ঞান সঞ্চার হয় নাই।

নিপুণ হস্তে ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া ঔষধ লেপন করিয়া, পুনরায় নূতন বস্ত্রখণ্ডে মস্তক বেষ্টিত করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী প্রবীণ চিকিৎসককে সেবিকা মৃদুস্বরে বলিল "আজও তো ইঁহার জ্ঞান সঞ্চার হইল না। আপনি তো বলিয়াছেন আজই ইঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে।"

চিকিৎসক বলিলেন "আজ এক প্রহরের মধ্যেই যুবক জ্ঞান লাভ করিবে বোধ হইতেছে। এখন কোন বিকৃতাবস্থা নাই, রাত্রে নিদ্রা হইয়াছিল কি?"

সেবিকা বলিল "হাঁ ছয় দিন পরে কেবল কাল রাত্রেই প্রলাপশূন্য নিদ্রা হইয়াছিল।"

চিকিৎসক বলিলেন "আর আশঙ্কার কারণ নাই, চিকিৎসা অপেক্ষা সেবাই ইহার কারণ। কুমারি, সেবাকার্য্যে আপনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।" আহত সম্বন্ধে কয়েকটি উপদেশ দিয়া চিকিৎসক অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

সেবিকা ফিরিয়া আহতের প্রতি চাহিল, তাহার নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে বহিতেছে, ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে। অতি যত্নে ললাট মুছাইয়া সেবিকা স্থির দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। আর কেহ নিকটে থাকিলে দেখিত, সেবিকার দৃষ্টিতে কেবল সেবা বা করুণা প্রকাশিত হইতেছে না।

কিছুক্ষণ পরে আহত ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "হেমন্ত, হেমন্ত, তুমি কোথায়?"

সাত দিন পরে আহতের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনিয়া সেবিকার পুঞ্জীভূত অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইবার উপক্রম করিল, কিন্তু প্রাণপণে অশ্রু সম্বরণ করিয়া ধীরভাবে একটি ঔষধ লইয়া আহতের মুখে ঢালিয়া দিল।

আহত বিস্মিত কণ্ঠে বলিল "তুমি কে? আমার কি হইয়াছে?"

সেবিকা উত্তর করিল "আমি সেবিকা। যুদ্ধে আপনি আহত হইয়াছেন, বেশী কথা কহিতে চিকিৎসক নিষেধ করিয়াছেন আপনি ঘুমান।"

কয়েক মুহূর্ত্ত মুদিত চক্ষে কি ভাবিয়া যুবক জিজ্ঞাসা করিল "কোন্ পক্ষের জয় হইয়াছে? এ শুশ্রূষাগার কাহার? যুবরাজ হেমন্তকুমারের কি হইয়াছে?"

সেবিকা বলিল "যুদ্ধ চলিতেছে, কোন পক্ষেরই জয় হয় নাই। রাজকুমার জীবিত আছেন।"

চঞ্চল নেত্রে চারিদিক চাহিয়া যুবক বলিল "আমি কত দিন এভাবে রহিয়াছি? আর কত দিন থাকিব? কুমারি, আমাকে শীঘ্র আরোগ্য করিয়া দিন্—আমি আবার যুদ্ধে যাই, এভাবে শুইয়া থাকা বড় কষ্টকর।"

সেবিকা বলিল "হাঁ, চিন্তা কি, আপনি শীঘ্রই সারিয়া উঠিবেন। এখন ঘুমান্।"

যুবক পুনরায় চক্ষু মুদিল। তাহার মস্তকে বিশৃঙ্খলভাবে শত চিন্তা আসিতে লাগিল। সেবিকার কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু সে কে, কিছুতেই তাহাকে স্মরণ করিতে পারিতেছে না।

বহুক্ষণ পরে সৈনিক আবার চাহিল। সেবিকা বাতায়নে হস্তে এক দৃষ্টে তাহারই প্রতি চাহিয়াছিল। বিস্মিত কণ্ঠে যুবক বলিল "তুমি! মূর্চ্ছনা!" যুবক বিজয়।

বহু চেষ্টায় যাহা রোধ করিয়াছিল, সেই অশ্রুরাশি মুক্তাধারার ন্যায় মূর্চ্ছনার কপোল বহিয়া পড়িতে লাগিল। মুছিয়া মুছিয়া মূর্চ্ছনা তাহা ফুরাইতে পারিল না।

দুর্ব্বল মস্তিষ্ক বিজয় আবার চক্ষু মুদিত করিল। কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া মূর্চ্ছনা দেখিল সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

(৮)

কলিঙ্গের রাজধানী সমুদ্র তীরবর্ত্তী দন্তপুর বা পুরীর দন্তমন্দির ভাস্কর শিল্পীর অপূর্ব্ব নৈপুণ্য এবং প্রাচীন সভ্যতার চিহ্নস্বরূপ আজিও উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে।—কিন্তু এখন তাহা দন্তমন্দিররূপে জগতে পরিচিত নহে, ভগবান বুদ্ধের দন্তমন্দির এখন জগন্নাথের মন্দির নামে অভিহিত হইতেছে।

মন্দিরের ভিতর স্বর্ণশতদলের উপর বুদ্ধের একটি দন্ত রহিয়াছে, সম্মুখে রাজকন্যা হেমমালা পূজারিণীবেশে উপবিষ্ট। রাজকন্যার নেত্রদ্বয় দুঃখপূর্ণ ও ম্লান। কিছুক্ষণ পরে পূজা শেষ করিয়া ফিরিতেই হেমমালা দেখিলেন যুদ্ধসাজে সজ্জিত হেমন্তকুমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন।

হেমমালা ফিরিতেই বলিলেন "হেমমালা, আমি বিদায় লইতে আসিয়াছি, বোধ হয় ইহাই তোমার সহিত শেষ সাক্ষাৎ।"

স্থির স্বরে হেমমালা বলিলেন "তাহা অসম্ভব নহে।"

হেমন্ত গম্ভীর স্বরে বলিলেন "হেমমালা! হৃদয় কি তোমার একেবারে নাই? তোমার জন্য আমি প্রাচীন মিত্র রাজ্যকে ত্যাগ করিয়াছি, অকৃত্রিম বন্ধু বিজয়ের অন্তর হইতে অপসারিত হইয়াছি, পরাজয় স্থির জানিয়াও মানবের সকল শক্তি তোমার জন্য নিয়োজিত করিয়াছি, আজ প্রাণত্যাগ করিতে যাইতেছি, কিন্তু তোমার হৃদয় আমি কিছুতেই পাইলাম না।"

হেমমালা অবিচলিত ভাবে বলিলেন "আমার জন্য ? রাজকুমার, তুমি কি করুণা পরবশ হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে এসকল আমার জন্য করিয়াছ ?"

হেমন্ত বলিলেন "না হেমমালা, প্রতিদানে আমি তোমার ভালবাসা চাহিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম তোমার ভালবাসার অমৃতে আমার ব্যর্থজীবন সার্থক হইবে।"

হেমমালা বলিলেন "তাহা দেওয়া আমার অসাধ্য। ভগবান বুদ্ধই আমার হৃদয়ের সকল স্থান অধিকার করিয়া আছেন. এস্থানে অপরের স্থান নাই। তোমার সাহায্যপ্রার্থী হইয়া যাহা দিতে আমি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, তাহা দিয়াছি।"

হতাশভাবে হেমন্ত বলিলেন "ওঃ তোমার জন্য আমি সর্ব্বত্যাগ করিলাম, প্রতিদানে তুমি একবিন্দু ভালবাসা আমাকে দিতে পারিলে না !"

হেমমালা বলিলেন "রাজকুমার, তুমি অনর্থক আমাকে তিরস্কার করিতেছ। তুমি সকল ত্যাগ করিয়াছ সত্য, কিন্তু আমার জন্য কর নাই। তুমি আপনার জন্যই এসকল করিয়াছ আপনি সুখী হইবে বলিয়া করিয়াছ, আমাকে সুখী করিবার জন্য কর নাই। এ আশা তোমার পূর্ণ হইল না এজন্য আমি দায়ী নহি। কারণ তোমাকে সুখী করিবার জন্য আমি বিবাহ করি নাই, আমার স্বার্থ ভিন্ন ছিল। সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্বার্থে আমরা পরস্পরকে অবলম্বন করিয়াছিলাম।"

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া হেমন্ত বলিলেন "তুমি সত্য বলিয়াছ হেমমালা, আমি আত্মপরায়ণ হইয়াই তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম। আমি আত্মসুখের জন্যই সকল ত্যাগ করিয়াছিলাম। প্রেমের দুঃখকে আমি স্বীকার করিতে পারি নাই. সেজন্য সুখও আমি পাইলাম না। বুঝিতেছি. এত স্বার্থপরতায় প্রেমের বিকাশ হয়না। যে প্রেম দুঃখ, স্মৃতি ও সম্মানের দ্বারা দৃঢ় হয় নাই, যে প্রেম একনিষ্ঠতার পবিত্রতায় সুপ্রতিষ্ঠিত নহে, সে প্রেম প্রেম নহে। এতদিন বুঝিতেছি যে পুষ্পিকার কথা সত্য, ত্যাগ ও আত্মদানের ক্ষমতা যাহার নাই সে প্রেমের অধিকারী নহে। সেজন্যই আমি ব্যর্থ হইলাম।"

হেমন্তকুমারের গম্ভীর কণ্ঠের তীব্র নৈরাশ্যপূর্ণ কথাগুলি মন্দিরের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল কিন্তু হেমমালা অটলভাবে রহিলেন, তাঁহার বদনের একটি রেখাও কম্পিত হইল না।

স্থির দৃষ্টিতে হেমমালার প্রতি চাহিয়া হেমন্ত বলিলেন "তোমার নিকট আমি কৃতজ্ঞ যে এ ভ্রম তুমি ভাঙ্গিয়া দিলে। কিন্তু তুমিও ব্যর্থ হইলে হেমমালা, মানব-প্রেমই হউক বা ভগবৎ-প্রেমই হউক প্রেমাস্পদের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতার প্রয়োজন কিন্তু পূর্ণবিশ্বাসে তুমিও প্রেমপাত্রে নির্ভর করিতে পার নাই, আমার মত তুমিও অপরের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলে। আমরা উভয়েই ভ্রম করিয়াছি এজন্য উভয়েই ব্যর্থ হইলাম।"

হেমমালার অটল অকম্পিত মুখভাব এইবার ঈষৎ কম্পিত হইল, কিন্তু তাঁহার কথায় অপেক্ষা না করিয়া হেমন্তকুমার পশ্চাৎ ফিরিয়া মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।"

(৯)

সূর্য্য অস্ত গমনোন্মুখ। অপেক্ষাকৃত সুস্থ আহতগণ সমুদ্রতীরে বেড়াইতেছে, কিন্তু এখানেও সেবিকাগণ তাহাদের সঙ্গত্যাগ করে নাই।

শুভ্রপ্রাসাদের যে চূড়ায় একদিন কলিঙ্গের রাজপতাকা উড়িতেছিল, আজ সেস্থানে মগধের রাজপতাকা উড়িয়া মহারাজ অশোকের জয় ঘোষণা করিতেছে। রাজা অশোক পুরী অবরোধ করিয়াছেন।

বিজয় সেন তখনও সবল কিছু হয় নাই, কিছুক্ষণ বেড়াইয়া ক্লান্তভাবে সে সমুদ্রতীরে বালুকার উপর বসিল।

মূর্চ্ছনা বলিল "চলুন আপনাকে লইয়া যাই।"

বিজয় বলিল "অনেক দিন পর আজ বাহিরে আসিয়াছি, আর একটু থাকিতে দাও মূর্চ্ছনা, সাগরের বিরাট সৌন্দর্য্য আরও কিছুক্ষণ দেখি।"

মূর্চ্ছনা বলিল "আপনার সমুদ্রবাস ফুরাইল। মগধেশ্বর সকল বন্দীকে মগধে যাইতে আদেশ দিয়াছেন।"

বিজয় বলিল "আর তোমরা—সেবিকারা ?"

মূর্চ্ছনা বলিল "আমরাও যাইব, এতদিন বেশ ছিলাম, আবার সেই বৈচিত্রহীন জীবন যাপন করিতে হইবে ভাবিয়া আমি ভীত হইতেছি।"

বহুক্ষণ কেহই কথা কহিল না। দেখিতে দেখিতে আকাশে নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিল। সাগরের নীলজল কালো দেখাইতে লাগিল, চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জল দ্বিগুণ পুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

মূর্চ্ছনা মুগ্ধভাবে বলিল "সাগরের দৃশ্য কি সুন্দর !"

বিজয় বলিল "কেবল সাগরের নহে জগতের সকলই সুন্দর। মূর্চ্ছনা, আমি এতদিন যাহা বলিব মনে করিয়াছি, আজ তাহা বলিব। একদিন আমি তোমাকে একখানা ছবি আঁকিয়া দিতে বলিয়াছিলাম —"

মূর্চ্ছনা বলিল "সেখানা আমি আঁকিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। দেশে গিয়া তাহা পাইবেন। তাহারই একখানা ক্ষুদ্র প্রতিলিপি আমার সঙ্গে আছে, আপনার মনোমত হইয়াছে কিনা দেখুন।"

বিস্মিত বিজয় চিত্র দেখিয়া চমৎকৃত হইল, কি গভীর ভাবপূর্ণ মনোজ্ঞ চিত্র। ইহাতে যে কেবল চিত্রবিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে তাহা নহে, চিত্রকরের হৃদয়ও ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

বহুক্ষণ একদৃষ্টে দেখিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বিজয় ছবিখানা পার্শ্বে রাখিয়া ছিল। তাহার চক্ষুদৃষ্টি যেন জগতের বাহিরে, অন্য কোন লোকে। সে যেন সে লোকে কি দেখিতেছে, এবং তাহাতেই তন্ময় হইয়া গিয়াছে।

মূর্চ্ছনা পরিপূর্ণরূপে বিজয়ের তপঃমূর্ত্তি দেখিল। বিজয়ের অন্তর বাহির শিখাময়, তাহা পরিপূর্ণ, তাহাতে এমন একবিন্দু স্থান নাই, যাহাতে মূর্চ্ছনার একটি অতি ক্ষীণ ছায়ার স্থান হয় !

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিজয়কে নিস্তব্ধ দেখিয়া মূর্চ্ছনা তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। সদ্য ধ্যানভঙ্গের ন্যায় চকিত হইয়া বিজয় বলিল "মূর্চ্ছনা, তোমাকে আমার একটি কথা বলিবার আছে।"

মূর্চ্ছনা স্থির ভাবে বলিল "আমি জানি আপনি কি বলিবেন। আপনি বলিবেন আমার ভালবাসার প্রতিদান করা আপনার অসাধ্য।"

বিজয় বলিল "হাঁ, মূর্চ্ছনা অপাত্রে দান করিয়া নষ্ট করিবার জন্য ভগবান মানব হৃদয়ে প্রেম দেন নাই। অযোগ্যকে প্রদান করিলে প্রেমের অমর্য্যাদা হয়। তুমি কেন আপনাকে এভাবে দুঃখ দিতেছ ? তোমার পবিত্র হৃদয়ের প্রেম লাভ করিয়া যে ভাগ্যবান ধন্য হইবে, তাহাকেই ভালবাসা তোমার কর্ত্তব্য।"

মূর্চ্ছনা মৃদুস্বরে বলিল "আপনার কি কোন কর্ত্তব্য নাই ?"

বিজয় বলিল "নিশ্চয় আছে, তাহাই আমি পালন করিতেছি, এখন আমার আরও একটি কর্ত্তব্য হইয়াছে, তোমাকে ভ্রম দেখাইয়া দেওয়া।"

মূর্চ্ছনা বলিল "আপনি কি ভ্রম করিতেছেন না?" যে নাই, যাহা নাই তাহার জন্য এরূপ বাতুলতা করা কি ভ্রম নহে?"

বিজয় বলিল "কি বলিতেছ মূর্চ্ছনা! কি নাই? এখানে না থাকিলেও অন্যস্থানে আমার প্রার্থিত আছে, তাহা জানিয়াই আমি ইহা করিতেছি। আর ইহা জানিয়াও আমাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করা তোমার উচিত নহে।"

মূর্চ্ছনা দৃঢ়স্বরে বলিল "সেন মহাশয়, আত্মকর্ত্তব্য আমারও আছে, আমি যাঁহাকে ভালবাসি ইহজীবনে না পাইলেও পরজীবনে পাইবার আশা রাখি। ইহা জানিয়া আমাকে বিচলিত করার চেষ্টা করা আপনারও অধর্ম্ম। আপনি যখন পরলোকে গিয়া আপনার প্রার্থিত বস্তু পাইবেন, তখন আমি তাহা পাইব না কেন?"

বিজয় নির্ব্বাক হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে মূর্চ্ছনা বলিল "আপনার বোধ হয় আর কিছু বলিবার নাই, কিন্তু আমার আর একটি কথা বলিবার আছে। সত্যই আমি আপনাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, এজন্য আপনার ক্ষমা চাহিতেছি।"

প্রলোভন এবার ভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। কোন কথা না বলিয়া বিজয় মূর্চ্ছনার প্রতি চাহিল তপস্বীর সিংহাসন কি টলিতেছে!

সে দৃষ্টিতে মূর্চ্ছনা কি দেখিল, সে ধীরে ধীরে বিজয়ের হস্তে আপনার হস্ত রাখিল।

চমকিত হইয়া বিজয় উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "মূর্চ্ছনা, দুঃখও তাঁহারই দান। তিনি তোমাকে শান্তি দিন।"

মূর্চ্ছনা মৃদুস্বরে বলিল "হাঁ। কিন্তু সেন মহাশয়, আমার জন্য করুণা প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন, আমি দুঃখিনী নহি।—ব্যস্ত হইবেন না আমার হাত ধরুন, হিম পড়িতেছে, আপনাকে গৃহে লইয়া যাই।"

(১০)

অস্তগামী সূর্য্যের রক্তাভায় যুদ্ধক্ষেত্র রঞ্জিত। অসংখ্য হতাহতে যুদ্ধক্ষেত্র ভরিয়া গিয়াছে। স্তূপাকার মৃতদেহ হইতে বাছিয়া সেবিকাগণ আহত অন্বেষণ করিতেছে।

কতকগুলি আহতকে বাহকের খাটিয়ায় তুলিয়া দিয়া একজন সেবিকা ঈষৎ শ্লথ ভাবে অন্যদিকে অগ্রসর হইল। কিছুদূর গিয়া দেখিল একজন আহত উবুর হইয়া পড়িয়া যন্ত্রনায় অস্ফুট শব্দ করিতেছে। তাহার পরিচ্ছদ রক্তে একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে।

তাহাকে সোজা করিয়াই সেবিকা চমকিয়া বলিয়া উঠিল "হেমন্ত, তুমি! আজ এইভাবে তোমাকে দেখিতে হইল!"

হেমন্তের চক্ষু হইতে তখন জগতের আলো নিভিয়া আসিতেছিল, কর্ণ হইতে পার্থিব শব্দ বিলীন হইতেছিল, কিন্তু পুষ্পিকার কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র তাঁহার প্রাণে যেন অমৃত সিঞ্চিত হইল। অতি কষ্টে অস্ফুট স্বরে

হেমন্ত বলিলেন "কে পুষ্পিকা ? আঃ পুষ্পিকা তুমি ! এ হতভাগ্যের প্রার্থনা তবে ঈশ্বর শুনিয়াছেন, এখন আমি সুখে মরিতে পারিব।"

আত্মসম্বরণ করিয়া পুষ্পিকা বলিল "না, না আমি তোমাকে মরিতে দিব না, কথা কহিও না আহত স্থান বাঁধিয়া দিতেছি।"

অধিকতর ক্ষীণ স্বরে হেমন্ত বলিলেন "বাধা দিও না পুষ্পিকা, আজ আমাকে বলিতে দাও। সকল কথা বলিবার সময় হইবে না, কেবল ইহাই বলিতেছি যে জীবন দিয়া আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি।"

পুষ্পিকা বলিল "স্থির হও হেমন্ত, সকল কথা পরে আমাকে বুঝাইয়া বলিও। বাহকদিগকে—"

হেমন্ত বলিলেন "অপেক্ষা কর। পুষ্পিকা, সকল কথা বুঝাইয়া বলিব সেদিন, যেদিন আমার নিকট তুমি আসিবে। আসিবে কি পুষ্পিকা, আমার অপেক্ষার মধ্যে তুমি কি আসিবে? আমি তো প্রেমের মর্য্যাদা রাখি নাই, তোমাকে আহ্বানের অধিকার যে আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি! কোন মুখে আমি তোমাকে আমার কাছে ডাকিতেছি! পুষ্পিকা, প্রেমের পরীক্ষায় আমি পরাজিত হইলাম, কিন্তু পুষ্পিকা, মানুষের পরীক্ষা, মানুষের প্রমাণই সব সময় সত্য হয়? আজ মৃত্যুর পূর্বক্ষণে যখন ভগবান আমাকে তোমার নিকট আনিয়াছেন, তখন ইহাতেই কি প্রেম সত্য এবং ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া প্রমাণিত হইল না?"

বেদনার জর্জ্জরিত পুষ্পিকা স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। হেমন্তকে সে কি বলিবে!

বহুক্ষণ পরে হেমন্তের প্রতি দৃষ্টি পড়িতে পুষ্পিকা দেখিল, তাহার জীবন-দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে, কিন্তু তখনও নিষ্প্রভ চক্ষুতে প্রাণপণে দৃষ্টি সঞ্চার করিয়া সাগ্রহ দৃষ্টিতে পুষ্পিকার প্রতি চাহিয়া সে যেন একটি কথা শুনিবার অপেক্ষা করিতেছে।

হেমন্তের মুখপ্রতি নত হইয়া অশ্রু ব্যাকুল কণ্ঠে পুষ্পিকা বলিল "হাঁ হেমন্ত আর অস্বীকার করিব না, প্রেম সত্য এবং চির পবিত্র। শোন হেমন্ত, আর অস্বীকার করিব না আমি তোমাকে ভালবাসি এবং তোমার ভালবাসায় আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি।"

রণক্ষেত্র হইতে সূর্য্যের ম্লানজ্যোতিঃ চলিয়া গেল, কিন্তু মরণাহত হেমন্তের মুখে শান্তির স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল।

শ্রীমতী উষাপ্রভা সেন।

কাঁটা গাছ।

—*—

কখন কাহার ফুটবে পায়ে
এ এক দারুণ ল্যাটা,
ফলের সাথে নেইক যে খোঁজ
গামর কেবল কাঁটা।

বাগানে এই দারুণ গাছে
সখ করে কি আন্‌তে আছে?
ঠগীর দলে বাস করিয়ে
নষ্ট করা গাঁ-টা।

শয়ন ঘরে সুদূর থেকে
ভীমরুলে কে আন্‌লে ডেকে?
সদ্য দোহা দুধের পাশে
বনের তেঁতুল খাটা।

বিহগগণের কুলায় কাছে
'চাঁদমারি' কি কর্‌তে আছে?
মন্দিরেরি মণ্ডপেতে
ইঁট পোড়ানো ভাটা।

পঙ্গপালে আদর করে
বস্‌তে ডাকা ক্ষেতের 'পরে?
চোরের বাসা রত্নাগারে
ধন্য বুকের পাটা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ত্রিপুরায় বীরচন্দ্র মাণিক্যের ছায়া চিত্রের একখানা চিত্র।

জেইল প্রথা।

—:*:—

৫২ বৎসরের বৃদ্ধ মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য, আর তখন ছিল আমার বয়স ২২ বৎসর। বয়সে তারতম্য অনেক। সবে মাত্র পাঠ্যজীবন শেষ করিয়া আমি কলিকাতা হইতে তাঁহা ই আদেশে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। এই নূতন জীবনে নূতন রাজসেবার অধিকার পাইয়া তাঁহার A. D. C. রূপে নিযুক্ত হইলাম। কিন্তু কাজ পাইলাম যাহা জীবনে প্রত্যাশা করি নাই, অভিজ্ঞতা একবারেই ছিল না। বৃদ্ধের সেবা যুবকের (বিশেষতঃ কলিকাতার বৈচিত্র্যময় জীবনের মধ্যে পড়িয়া ধরা সরা জ্ঞান করিয়াছিলাম) পক্ষে কতদূর কষ্টকর ছিল তাহা ভুক্তভোগী মাত্র জানিতে পারে। এ নূতন জীবনে কষ্টও যেমন ছিল তাহার তুলনায় রস ছিল পূর্ণ মাত্রায়। বীরচন্দ্র মাণিক্যের দরবারে সে রসের রসিক হইয়া পড়িতে বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিলাম। বীরচন্দ্র মাণিক্য মানুষ ছিলেন এবং আমার পক্ষে দেবতা ছিলেন। তিনি বজ্রের ন্যায় কঠোর ছিলেন এবং কুসুমের ন্যায় কোমল ছিলেন। ৮ বৎসর এই ভাবে কাটাইতে পারিয়াছিলাম এইক্ষণে ঐ সব ঘটনা মনে পড়িলে সেই ৮০ বৎসরের বৃদ্ধের ন্যায় হইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় তাহা হইতে পারে নাই। তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। আমার জীবন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। যাক্ সেই সব ও বিচিত্র কাহিনী। এই বিচিত্র জীবনের একদিনের ঘটনা বলিতেছি। বীরচন্দ্র মাণিক্যের সহিত তদানীন্তন পলিটীক্যাল এজেণ্টগণের দ্বন্দ্ব সমাস ছিল; টের পাইতাম বীরচন্দ্র মনুষ্যত্ব লোপ করিয়া Administrator machine প্রাচীন রাজ্যে ঢুকাইতে রাজি নহে। মেশিনের 'রাজত্বিতে' যে রাজত্ব চলে সে রাজত্বির সহিত তাঁহার দ্বন্দ্ব সমাস ঘটিবেই তাহাতে বিচিত্র কি? এই দ্বন্দ্ব সমাস তাঁহার জীবন ভরা ছিল; জেইল প্রথা লইয়া তিনি সদা সর্ব্বদা দ্বন্দ্ব করিতেন। নবপ্রবর্ত্তিত মেশিন রাজ্যের জেইল তিনি পছন্দ করিতেন না। মেশিন রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ার পলিটীকাল এজেণ্ট সর্ব্বদা তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন,—সভ্য জগতের জেলের নিয়ম কেন তিনি গ্রহণ করিবেন না? তখন তিনি মানুষের মত জবাব দিতেন। কিন্তু মেশিন বুঝিত না, পলিটীক্যাল এজেণ্ট ভদ্র ভাবে ভদ্র ভাষায় তাঁহাকে, নিন্দা করিত এবং মাঝে মাঝে রুষ্ট পর্য্যন্ত হইত। এ জন্য ইতিমধ্যে মেশিন রাজ্যের দেশীয় ইঞ্জিনিয়ার—এসিস্‌ট্যাণ্ট আসিয়া তাঁহাকে দেশীয় ভাষায় বুঝাইতে কিন্তু বীরচন্দ্র এই দেশীয় ভাষায় ছেলে ভুলানী ছঁড়ায় তিনি কিছুতেই ভুলিতেন না। বরঞ্চ সুবুদ্ধি উড়াই হেসে এভাবে চলিতেন। উমাকান্ত বাবু তখন দেশীয় ইঞ্জিনিয়াররূপে Assistant Political Agent পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছায় আমাদের রাজ্যের জেলে 'ঘানিগাছ' বসে। একদিন ম্যাজিষ্ট্রেট (স্বর্গীয় রাধামোহন ঠাকুর) ঘানিগাছের প্রথম তৈল যাহা পাওয়া গিয়াছিল ঐ তৈল তিন বোতল (Quart) "শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাৎ দাখিলের জন্য" একখানা পত্র আমার নিকট পাঠাইয়া দেন। আমি যথা সময়ে এই তিন বোতল সহ পত্রখানা দাখিল করিলাম। মনে করিলাম বীরচন্দ্র মাণিক্য খাঁটি সরিষার তৈল অত্যন্ত পছন্দ করিতেন এবং ঘৃত ফেলিয়া খাঁটি তৈলে তাঁহার আহারীয় জিনিষ সর্ব্বদা প্রস্তুত হইত। তৈল পেষার জন্য Pressing machine ছিল;— আমি মনে করিলাম মহারাজের স্বভাবসুলভ হাস্য বদন বক্‌সিস পাইব। কিন্তু বিপরীত কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

পত্রখানা পড়িয়া তিনি চটিয়া গেলেন এবং আমাকে হুকুম করিলেন "রাধামোহন মানুষ দ্বারা বলদের কাজ লইল আর তুই উহা আনিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করিলি ? এখনই এই তৈল ৩ বোতল চতুর্দ্দশ দেবতার পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দে আর রাধামোহনকে এখনই তলব দিয়া হাজির কর।" আমি অবাক্ কিন্তু নাচার। ৩ বোতল তৈল চতুর্দ্দশ দেবতার পুষ্করিণীতে চতুর্দ্দশ দেবতার উদ্দেশ্যে ফেলিয়া দিলাম এবং চতুর্দ্দশ দেবতার বাড়ীতে যাইয়া রাজপ্রকোপ শান্তির জন্য প্রার্থনা করিলাম। যখন ফিরিয়া "সাক্ষাৎ" উপস্থিত হইলাম তখন বীরচন্দ্রের প্রকোপ কতকটা শান্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম। বীরচন্দ্র মাণিক্য আমাকে বাৎসল্য ভাবে দেখিতেন এবং আদর করিতেন। তখন তিনি চিত্রকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এই পাপ তৈল ফেলিয়া দিয়া স্নান করিয়া আস্‌ছিস্ ত ?" বুঝিলাম ইহা বাৎসল্য রসের রস, কষ নাই। আমাকে তখন তিনি সম্মুখে বসাইয়া এই জেলের ঘটনা উল্লেখ করিয়া যাহা আমাকে বুঝাইবার জন্য বলিয়াছিলেন তখন আমি মন্ত্র-মুগ্ধবৎ শুনিয়া গেলাম, যাহা বুঝিয়াছিলাম তাহা এই পরিণত বয়সে অন্তরে অন্তরে আছে।

অন্যকে বুঝান আমার শক্তির বাহির। সম্প্রতি রাজকর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত জীবনে যখন যাহা পাই তাহা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া থাকি এবং মাঝে মাঝে সুখ পাইয়া থাকি Indian Review নামক পত্রিকায় June এর সংখ্যায় Prison Reform নামে একটা প্রবন্ধ পাঠ করিতেছিলাম। মনে হইল আমি যেন বীরচন্দ্রের দরবারে আছি এবং তাঁহারই মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছিলাম ইহা যেন তাহারই পুনরাবৃত্তি বা প্রতিধ্বনি এই প্রবন্ধে ৪২০ পত্রে লিখা আছে; একজন আমেরিকার সুসভ্যরাজ্যের Jail System নূতন এবং পুরাতন বিচার করিয়া লিখিয়াছেন :

In punishment the man is the object of revenge, often vindictiveness—and he is also contemplated with a large amount of fear. The old theory that the punishment must fit the crime, regardless of the individual, belongs to past ages and should be put with other useless lumber. Solitary confinement, strait jacket the dungeon and the lash intensify evil and make men bitter and revengeful. A writer in the May number of the Theosophist deplores all these and exhorts us to improve the prison system both from a moral and economic point of view.

বীরচন্দ্র মাণিক্য আমাকে বলিয়াছিলেন "জেইলে কয়েদী রাখা, এখনকার নির্ম্মল জেইল নিয়মানুসারে না চলিয়া দেশকালপাত্র ভেদে চলা উচিত। বৈষ্ণব নরোত্তম ঠাকুর আপশোষ্ করিতেন "বহিলাম মানুষ জন্ম, করিলাম পশুর কর্ম্ম" আর মানুষ পশুর কর্ম্ম করিতে যাইয়া পদে পদে অপরাধী হইয়া পড়ে। সেও কর্ম্মদোষে। জেইলে পড়িয়া তাহাকে পশু জীবন পাইতে হয়। আমরা কেন তাঁহাকে পশু হইতে অধম তৈয়ারী করি। ইহাতে আমাদেরই পাশবিকতা প্রকাশ পাইবে মাত্র। দোষের প্রতি একটু অন্ধ হওয়া এবং গুণের প্রতি সহানুভূতি করাই মানুষের কর্ম্ম। আমরা কেন রাজা হইয়া কর্ম্মদোষের ভাগী হই। একথা কখনও ইংরেজ Political Agentকে বুঝাইতে পারা গেল না।" কিন্তু আজ সভ্যাভিমানী এমেরিকার সাগর পার হইতে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই বৃদ্ধ বীরচন্দ্রের কথাই বলিতেছে। The old prison

system was based on the theory that punishment must fit the crime, without regard to the individual who commits the crime, the so-called criminal. Solitary confinement in iron cells, inferior and insufficient food, the lock-step, the shaven head, the strait jacket, the lash and the dungeon, have been devised to repress the evil in the man. The reverse has been effected. The good in the man has been crushed, the evil intensified by the resentment at the injustice of society. Prisoners, guards, warders, society, none have escaped the degrading influence."

বীরচন্দ্রের Sentiment পাকা ছিল। এই পাকা ব্যক্তির নিকটে গিল্টিকরা জিনিষ বিকাইত না। কাজেই তাঁহার সব কাজের মধ্যেই আধুনিক শিক্ষাভিমানী আমরা দোষ ধরিতাম এবং প্রত্যেক বিষয়ই সন্দেহ নয়নে দেখিতাম। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রের দিনে রাধামোহন ঠাকুর "By Command এ" হাজির হইলেন; ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে এবং বিরক্তি ভরে। নূতনহাবেলী হইতে আগরতলা ৫ মাইল ব্যবধান কিন্তু আতপ-তাপে বিনা যানবাহনে পদব্রজে হাজির হওয়া কি সহজ কথা! অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় রাধামোহন ঠাকুর 'সাক্ষাৎ' হাজির হইলেন বটে কিন্তু সাক্ষাৎ পাইলেন না। কাজেই A. D. C. র শরণাপন্ন হইতে হইল। আমি তাঁহার আত্মীয়, আগরতলায় আসিয়া তিনি সর্ব্বদা আমার বাড়ীতে বাস করেন। তখন আমি আহার প্রস্তুতের অপেক্ষায় ছিলাম। অতিথি পাইয়া আহারের একটু খাদ্যসামগ্রী বাড়াইবার ইচ্ছা হইল। রাধামোহন ঠাকুর চড়া সুরে আমাকে কড়া কথা বলিতে লাগিলেন। তখন প্রাতে কাছারী বসিত। রাজার হুকুম তাই অভুক্ত অবস্থায় বিনা যানবাহনে চলিয়া আসিতে হইল। ঠাকুর লোক বিশেষ আধুনিক ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার মেজাজ যে কড়া হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি তাঁহার স্নেহেরপাত্র কাজেই কড়া কথা বলা নিরাপদ মনে করেন। দাদা ভাই আহারে বসিলাম! তখন আমার নাকিসুরে কথা বলিবার অধিকার জন্মিল। অদ্যকার প্রাতে "তৈল লইয়া যে কাণ্ড হইয়াছে কেবল আমাকে A. D. C রূপে ঘানিগাছে ঘুড়িয়া দিয়া মহারাজ যেকাণ্ড করিয়াছেন আমি 'কলুর চোকঢাকা বলদের মত" হইয়াছি' : ঘটনা বর্ণনা যত চড়া হইতে লাগিল বেচারি রাধামোহন ঠাকুরের অবস্থা ততদূর ম্রিয়মান হইতে লাগিল। তাঁহার প্রায় মূর্চ্ছা হয়। তিনি মুখের গ্রাস ফেলিয়া আচমন করিয়া বিছানায় পড়িলেন এবং অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা চাহিলেন, আমি নূতন দরবারী; ঘরের নূতন বউয়ের মত অস্ফুট ভাষায় আলাপ করি। A. D. C রূপে কিছু বলিতে অক্ষম, তবে শিশুকাল হইতে রাজপরিবারে বর্দ্ধিত হইয়াছি, শিক্ষাদীক্ষা পাইয়াছি। দাদা মহাশয়কে বলিলাম "আপনি চিন্তিত হইবেন না। ঘরে বসিয়া দুই একটা কবিতা লেখুন। নিজে কবি বীরচন্দ্র সুন্দর বিষয় কবিতা পাইলে রাজা ভুলিতে পারেন। আমাদের নগণ্য অপরাধ ভুলিবেন না? কিন্তু দাদা আপনি মানুষ ঘানিতে আর তৈল পিষিবেন না।" রাধামোহন ঠাকুর বলিলেন "ভাই আর আমি এজন্মে তৈলের ব্যবসা করিব না। এ তৈল বিষ্ণুতৈলের কাজ করাইয়াছে।" রাধামোহন ঠাকুর ১৭ দিন অপেক্ষা করিলেন, সাক্ষাৎ পান না। আমি মাঝে মাঝে এত্‌লা দিতাম। বীরচন্দ্র মাণিক্য তখন সকালে বিকালে কবিতা কাটাইয়া দিতেন। উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলে আমি রাধামোহন ঠাকুর (দাদা) কে বলিতাম—

"এখন তখন করি দিবস গোয়াইনু,
দিবস দিবস করি মাস;

মাস মাস করি বরিখ গোয়াইনু,
না মিটিল জীবনক আশ ;"

কিন্তু আপনার আশা অবশ্য মিটিবে। রাধামোহন ঠাকুর রাজদর্শন পান না। আর রোজ সেরেস্তাদার কাগজ পাঠায় নথিও পাঠায়। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে পাঠায় ভয়ানক তাগিদ—মাম্‌লাবাজ পক্ষাপক্ষ হইতে এবং গোপনে গৃহিণী হইতে। রাধামোহন ঠাকুর বিপদের মাঝ গঙ্গায় পড়িয়া তাঁহার কবিতাও গিয়াছে কবিত্বও গিয়াছে। আমি বৈষ্ণব কবিতার নন্দনকাননের নবপ্রবেশী তোতাপাখী। হয় কথায়, নয় কথায় এবং কথায় কথায় কবিতা কব্‌লাইতে থাকি। কিন্তু রাধামোহন ঠাকুর তাহাতে বিরক্ত হন ; তীর্থের কাকের মত আমার বৈঠকখানায় অপেক্ষা করেন। কিন্তু আমি কোনদিনও খালাসের সুখবর আনিতে পারিলাম না। একদিন বীরচন্দ্র মাণিক্য বলিলেন "রাধামোহন ঠাকুরকে ছাড়িয়া দে। তাঁহার শাস্তি হইয়াছে। আর ১৭ দিনের মাহিনা নিজ তহবিল হইতে দিয়াছে। তোরা ত আলঙ্গের সরদার ছিলি ; এশ্রেণীর কয়েদী রাখা তোদের অভ্যাস। First class misdemeanour তোদের ইংরেজিতে বলে। কিন্তু ভারতবর্ষ-জেইল-বিধানে ইহা নাই, বিলাতে আছে। আমার রাজ্য এপ্রথায় কয়েদী অনেক হইয়াছে ও হয়ত আরও হইবে। রাধামোহন ঠাকুরকে আমি খালাসের হুকুম শুনাইলাম। তিনি পুলকিত হইয়া বলিলেন "ভাই রক্ষা পাইয়াছি। জেইল হইতে খালাস পাইলাম। নাক কাণ মলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি এমন কার্য্য আর করিব না। আমি বলিয়াছিলাম "আমার" আলঙ্গ সেলামি দিতে হইবে।" তিনি কর তুলিয়া আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি এ আশীর্ব্বাদ তাঁহার জীবনময় পাইয়াছিলাম। এখনও পাইতেছি।

পূর্ব্বে "আলঙ্গ" নামে এক প্রকার জেইল ছিল। সে আলঙ্গের আমরা ৪ পুরুষ সর্দ্দার ছিলাম। তাহাতে নানা শ্রেণীর লোক পড়িত কিন্তু দেশকালপাত্র ভেদে তাহাদের বসবাসের বন্দোবস্ত ছিল, পৃথক্ পৃথক্ রকমে। রাজ সম্পর্কান্বিত ব্যক্তিবর্গ, ঠাকুর পরিবার, ও অপর ভদ্রলোকের প্রচুর ও নানা উপাদেয় আহারবিহারের বন্দোবস্ত ছিল। আমরা শিশুকালে মিষ্টান্ন প্রয়াসী বালকবৃন্দ বলিতাম—

"জামাই এলে খাই ভাল" কারণ এইরূপ কারাবাসকে লোকে "শ্বশুর বাড়ী" আখ্যা দিয়াছিল। সেই দিনের কথা (১৮৯৫খৃঃ) Late Mr. Mc Minn আমাদের জেইল পরিদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন "The prisoners seem to be in a Familyway." বীরচন্দ্র মাণিক্যের জেইল ছিল তাঁহারই way অনুসারে।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

প্রেম-সম্ভব।

—:*:—

কৈশোর-স্বপ্নের ছিল নানা ভঙ্গী
কার মত হবে মোর জীবনের সঙ্গী ;
রূপে সে যে মনোজিনি মানসী
স্থিরমণি-শিখা সম রূপসী
সেই আর আমি দোঁহে নিরেলা
র'ব চির একেলা
অমর জীবন হবে, র'বে এই চিত্ত,
দিন যাবে হাসি খেলা সঙ্গীতে নিত্য !

স্বপ্ন সে ছেয়ে দিল মত্ততা তীব্র
মনোমথি মন্মথ দিল দেখা শীঘ্র।
কল্পনা আল্‌পনে বসিয়া
নিজ মনোমাধুরীতে রসিয়া
দু'জনের পাণি পাণি বাঁধিল
কাহারে না সাধিল !
একি দেখি ? মানসী যে মনসিজ বাঁধনে
মানবীর রূপে ধরা পড়ে' গেছে আগুনে !

সলজ্জ সচকিত চাহনি সে চক্ষে
চটুল চতুর চারু হানি শর বক্ষে
নিশিদিন নিষাদের ব্যবসা—
মিলনেও মধুময় বচসা !
পলকের আড়ালের বেদনা
জাগাইত চেতনা—
যেন মোরা দুই জনে একটিতে বদ্ধ—
উন্মাদ উন্মনা মধু-মদ-মত্ত !

নিষেধ সম্ভ্রম বাধা ছিল অতি তিক্ত—
তবু তার ফাঁকে দেখে, কথা ক'য়ে চিত্ত

উঠিত ভরিয়া নব-পুলকে
জীয়ন-কাঠির মহা কুহকে !
নিজ ধন চুরি করি হরষে—
দিন যেত সরসে !
অবাধ মিলন রাতে কোথা সে আনন্দ ?
চাপা হাসি চুপি কথা—সারা নিশি দ্বন্দ্ব।

কি করেছি ? কে দেখেছে ? যদি দেখে—শঙ্কা !
ম্রিয়মান্ ভেবে নিজ নিলাজের ডঙ্কা !
অন্যায় মানিলেও হ'ত না,
না মানিলে অভিমান কত না !
আমি সুখী তারে জয়ী করিয়া
পরাজয় বরিয়া ;
বিনা দোষে দোষী সেজে অসীম আনন্দ—
কথা কওয়া তারি নাম যৌবন-দ্বন্দ্ব !

গুরুজন লাজ ভয়ে হয়নি যা' বন্ধ
ভাবিনিও এতদিন ভাল কি তা' মন্দ !
আজ সবে থেমে গেল সহসা—
ভরা মধুমাসে ঘন বরষা !
ছাড়াছাড়ি হইয়াও দু'জনে
হ'ল বাঁধা দ্বিগুণে !
যে প্রিয়াও মোর মাঝে সহিত না মালিকা,
আজ সেথা দেখা দিল মহাক্রম কলিকা !

প্রিয়া সে জননী হ'য়ে হল শ্রেয় পূজ্য
লাবণ্য দীপ্তিতে অভিনব সূর্য্য !
মনোভব পরাভব মানিয়া
পদে তার তূণ ধনু রাখিয়া
গেল তার ছাড়া বেশ লইয়া
কৃতার্থ হইয়া !

সম্ভ্রমে সম্মুখ ছাড়ি দিল গুণ্ঠা
লক্ষ্মী সে লাজ ত্যজি দিল লাজে কুণ্ঠা।

কৈশোর-কল্পনা যৌবন-স্বপ্ন
নিতল অতীত তলে হয়ে গেল মগ্ন!
আজি আর নাহি মন পিয়াসী
তুচ্ছ সে দেহ আঁখি বিলাসী,
নাহি সে মিলন কিবা বিরহ
দুই আজ সুসহ।
কানায় কানায় প্রাণ কিসে পরিপূর্ণ
মনে হয় মরণেও হবে না তা' শূন্য।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রিয়তমা।

—:*:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য শেষ হইলে জুলিয়েন শুনিল, প্রাতরাশের আয়োজন হপমার্শেলের প্রকোষ্ঠ অংশেই হয়, তাহাকে এখনি সেখানে যাইতে হইবে। তাহার মনে একটু ভয় হইলেও বিনা বাক্যব্যয়ে লিয়েন সেই দিকে চলিল।

দ্বারের দিকে পশ্চাৎ করিয়া সেই চক্রযুক্ত আসনে হপমার্শেল বসিয়াছিলেন। তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া ক্রোলন্ কি বলিতেছিলেন। জুলিয়েনের প্রবেশ কাহারও লক্ষ্যে আসিল না। অত্যন্ত বিরক্তির সহিত মার্শেল বলিলেন, "কেন তাহার অসুখ আবার বাড়িল কেন? কোন কারণ ছিল কি?"

ক্রোলন্ বলিল "হাঁ তাও ছিল, কাল বৈকালে ডাচেস্ অফ্ মণ্টিথ তার সখীর সঙ্গে হাসিতে হাসিতে গল্প করিতে করিতে ঐ বাগানের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, সেই ঘোড়ার পায়ের শব্দ ও ডাচেসের স্বর তাহার কানে যায়; জানেন ত আপনি সে স্বর শুনিলেই লিলি কত কষ্ট পায়।"

"চুলায় যাক্ লিলি, উচ্ছন্নে যাক্ ডচেস্! কাল সমস্ত রাত্রি আমার ঘুম হয় নাই। মরেও না ও-পাপীষ্ঠা! তাহকে দূর করিয়া দিতে হয়—

মৃদুস্বরে লন্ বলিল, "তার আর বিলম্বও নাই, প্রভু আপনি তাহার অনেক অত্যাচার সহিয়াছেন, আর দু'চার দিন—"

"দু'চার দিনেই যে মরিবে তা কে বলিতে পারে ?"

ফ্রোলন্, এ-কথার উত্তর না দিয়া বলিল "একটি কথা,—ইণ্ডিয়ান হাউসের মেডিরা ফুরাইয়া গিয়াছে, আপনি যদি ভাণ্ডারীকে অনুমতি করেন—"

রুষ্ট স্বরে তপমার্শেল বলিলেন "ফুরিয়ে গেছে ? লন্ তুমি বল কি ? অত মেডিরা এরি মধ্যে ফুরাইল ?"

সবিনয়ে ফ্রোলন্ বলিল "রাত্রিতে চীৎকার করিলে ঐটা খাওয়াই, তাতে সে ঘুমাইয়া পড়ে।"

"অন্য মদ দিতে পার, মরফিয়া দিতে পার।"

"ডাক্তারে কিন্তু ঐটিই ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

"করেছেন ত করেছেন, আমি আর অত দামী মদ দিতে পারিব না। উহাদের দুজনার জন্য আমার অনেক টাকা নষ্ট হইয়াছে, আর আমি পারিব না। আর তুমি ফ্রোলন্, কেবলি ঐ ডাইনির কথাই বলিতে চাও, জান না কি তাহার নাম পর্য্যন্ত আমার শুনিতে ভাল লাগে না!"

"কি করিব প্রভু, নিরুপায় হইলেই আপনায় জানাইতে আসি, তাহার মৃত্যু হইলে আমিও নিশ্চিন্ত হই—" হঠাৎ লন্ জুলিয়েনকে দেখিতে পাইয়া সসম্ভ্রমে বলিল "এই যে মাননীয়া ব্যারনেস্ আসিয়াছেন।"

"তাই নাকি ? তা ওখানে কেন ; এদিকে এস ! অমন লুকাইয়া বসিয়া লোকের ঘরের কথা শুনিতে নাই, সম্মুখে এস।"

নত আরক্ত মুখে লিয়েন বলিল "আপনাদের কথা শুনিতে আসি নাই আমি।"

"হাঁ হাঁ বুঝিয়াছি তাও, যাক্ আমার চায়ের পেয়লাটি ভরিয়া দিবে কি তুমি ?—ধন্যবাদ !—তারপর রাওয়েল এখনও বেড়াইয়া ফিরে নাই, তুমি জলযোগে বসিতে পার।" শ্বশুরের অনুরোধে লিয়েনও বসিল।

ফ্রোলন্ বলিল "ব্যারনেসের হাত দুটি বড় সুন্দর !"

হপমার্শেল বলিলেন "কিন্তু সুন্দর হাতে ও দাগ কিসের ? আঙুলগুলি যে একেবারে ক্ষতবিক্ষত ! ও কি সূচের দাগ নাকি ?"

লিয়েন বলিল "হাঁ সেলাইয়ের সূচই ফুটিয়াছে।"

"কি ভয়ানক ! এ তো সাধারণ শিল্পের সূচ ফোটা নয়, রীতিমত দর্জ্জীগিরির ব্যাপার দেখিতেছি। রুডিস-ডর্ফে কি আজকাল পোষাক বিক্রয় হয় না কি ?"

লিয়েন নিরুত্তরে থাকিল দেখিয়া বৃদ্ধ উৎসাহিতভাবে বলিলেন "কে কে এ দর্জ্জীখানায় কাষ করেন শুনি ? কাউণ্টেস ট্রেচেনবার্গও এ ব্যবসায়ে যোগ দেন ত ?"

বৃদ্ধের শ্লেষতীব্র স্বর ক্রমশঃ জুলিয়েনের অসহ্য হইতেছিল, অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"ট্রেচেনবার্গরা যে এখন কতখানি দুরবস্থায় পড়িয়াছে তাহা তো আপনারা জানেন ; পরিশ্রম করিয়া সংসার নির্ব্বাহ তাহাদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নয়।"

"তাই না কি ? এত নীচ কাজও কর তোমরা ?"

"হাঁ, প্রয়োজন হলে সব কাজই করি বৈকি !"

"ধন্যবাদ, আর বলিতে হইবে না ! আমি জানিতাম না যে আমার উচ্চহৃদয়া ধর্ম্মপ্রাণা ভ্যালেরীর আসনে রাওয়েল এমন নীচস্বভাবের স্ত্রীলোককে মানিয়া বসাইয়াছে !—ছি ছি আমি এত জানিতাম না।"

"কিন্তু—যদি আমরা পরিশ্রম না করিয়া অন্তের নিকট হাত পাতিতাম, তাহা হইলেই আপনেরা প্রশংসা করিতেন ?"

"কিসে কি করিতাম তা জানি না, কিন্তু তাই বলিয়া তোমার মত ছোট লোকের মেয়েকে ঘরে আনিয়া নিজেদেরও মাথা হেঁট করিতাম না!"

লিয়েনের মুখ কালো হইয়া উঠিল, ধীরভাবে বলিল "আমরা হতভাগ্য নীচ হইতে পারি, কিন্তু তাহাতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের কোন অপরাধ হইতে পারে না!"

"আরে রাখ তোমার পূর্ব্বপুরুষ! লক্ষ্মীছাড়া ট্রেচেনবার্গদের কথা না জানে কে? রাওয়েল একেবারে গর্দ্দভ নেহাৎ লজ্জাহীন, তাই ঐ লালচুলো ইতর বংশের মেয়েকে বিবাহ করিয়া বসিল! এখন লোকের কাছে মুখ দেখাইব কি করিয়া তাই ভাবনা হইয়াছে আমার।"

জুলিয়েন আর কথা কহিল না, কিন্তু তাহার বুকের রক্তে যেন ঝড়ের বেগ লাগিতেছিল, ক্রমাগত বংশের নিন্দা পূর্ব্বপুরুষগণের গ্লানি সেই অভিমানিনী নারীর সর্ব্বাঙ্গের শিরায় শিরায় আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল। সে আহার শেষ করিয়া উঠিতে উদ্যত, হপমার্শেল তখন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন "তোমার ও আঙ্গুলের চিহ্নগুলা যেন শীঘ্র শীঘ্র মিলায় বুঝিলে লেডি! মনে রাখিও তুমি এখন মাইনো বংশের বধূ, তোমার ও ট্রেচেনবার্গী ছোটলোকামী এখানে সাজিবে না।"

লিয়েন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, হপমার্শেলের কথায় তাহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, এবার আর সে সংযম রাখিতে পারিল না, স্বভাবসিদ্ধ ধীর অথচ স্পষ্টকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "জানি মহাশয় জানি, মাইনোগণ যে কত সম্মানিত ও উচ্চপদস্থ, তাহা আমি ভুলি নাই; কিন্তু আপনি বোধহয় ভুলিয়াছেন যে কাউন্ট ট্রেচেবার্গ যখন 'ক্রুশে' যান—তখন একজন মাইনো তাঁর স্কোয়ার ছিলেন; ইতিহাসে তাঁহাদের দুই জনেরই বিস্তারিত উল্লেখ আছে। সে মাইনো যে বিশ্বাসী ও সাহসী ছিলেন, তাহা লইয়া যথেষ্ট প্রশংসা আছে তাঁহার।"

"বটে—বটে! জর্ম্মাণ ইতিহাস তোমার কণ্ঠস্থ দেখিতেছি! খুব লেখপড়া শিখিয়াছ ত, পণ্ডিতা বধূ ঘরে আসিয়া এতদিনে মাইনোদের বংশের পঙ্কোদ্ধার করিবেন দেখিতেছি।"

কথাগুলা উচ্চারণ করিয়া লিয়েন লজ্জায় অনুতপ্ত ছিল, কিন্তু বৃদ্ধের শ্লেষ বাক্যে বিদ্ধ হইয়া ক্ষমার নামও উচ্চারণ করিতে পারিলেন না।

সে দাঁড়াইয়াই ছিল, হপমার্শেলের মুখেও হিংস্র হাস্যের বক্ররেখা ফুটিয়া আছে, এ অপ্রীতিকর ঘটনার কোথায় অবসান হইত তাহা অনুমান করা যায় না; কিন্তু হঠাৎ পার্শ্বের ঘরে লিয়োর উচ্চ চীৎকার উঠিয়া তখনকার মত সে প্রসঙ্গটি শেষ করিয়া দিল।

"কি হইল—কি হইল" বলিয়া হপমার্শেল ব্যস্ততা প্রকাশ করায়, ফ্রোলন তাড়াতাড়ি পর্দ্দা সরাইতে দেখা গেল, ঘরের মেঝেয় চিৎ হইয়া পড়িয়া লিয়ো হাতপা ছুড়িয়া কাঁদিতেছে ও তাহার রক্ষয়িত্রী তুলিতে চেষ্টা করায় তাহাকে চড় কীল মারিতেছে!

"কি হইয়াছে ফ্রো যেসন্, লিয়ো ওরূপ কাঁদিতেছে কেন, কি হইল উহার ?"

হপমার্শেলের প্রশ্নে মেসন্ বলিল "দেখুন না, ঐ বদমায়েস ছোকরটার জ্বালায় আমি অস্থির হইয়াছি। লিয়ো কয়েকখানা ছবি চাহিতেছিল, তাহা সে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে ; এমনি পাজি, ছিঁড়িল তবু দিল না। তাই লিয়ো কাঁদিতেছে।"

ফ্রোলন্ ব্যস্ত হইয়া বলিল "কি আশ্চর্য্য ! সে কি ছবি ফ্রো মেসন্ ?"

নাক বাঁকাইয়া মেসন্ বলিল "কি জানি কি ছবি,—ছাইভস্ম আমি দেখিও নাই যখন টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল—"

এই সময় লিয়ো লাফাইয়া আসিয়া বলিল "তা বৈ কি, গেব্রিয়েলই টুকরা করিল বুঝি ?—না দাদামশায়, গেব্রিয়েল ছিঁড়ে নাই,—সেই ত আমায় আঁকিয়া দিয়াছিল, ছিঁড়িয়াছে এই—এই" বলিতে বলিতে সে মেসনের গায়ে এক ধাকা দিল।—

হপমার্শেল বলিলেন "গেব্রিয়েল আঁকিয়াছিল ? সেই ছবির জন্য কান্না লিয়ো ? এস, আমি তোমায় ভাল ছবি দিব।"

"না আমার ভাল ছবি চাই না ! ও আমায় হাত হইতে কাড়িয়া লইল কেন—আমি সেই ছবিই চাই।

"কি ছবি সেটা—" দাদামহাশয়ের কথায় লিয়ো বলিল, "সুন্দর ছবি, দেখিবেন ? গেব্রিয়েল, সেটা কৈ ?" গেব্রিয়েল ছবিখানা পাশের ঘর হইতে কুড়াইয়া আনিয়া লিয়োর হাতে দিল।—

হপমার্শেল ছবিখানার প্রতি চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "একি, এ যে আমার কাগজ ! অমন সুন্দর দামী কাগজখানা ঐ হিজিবিজি দাগ কাটিয়া নষ্ট করা হইয়াছে ? গেব্রিয়েল, তোমার সাহসও খুব বাড়িয়াছে দেখিতেছি, আমার ডেস্কেও হাত চালাও তুমি ?"

ফ্রোলন্ এতক্ষণ কাগজখানার দিকেই চাহিয়াছিল, এবার বৃদ্ধের দিকে অগ্রসর হইয়া সবিনয়ে বলিল, "ও-কাগজ আমিই উহাকে দিয়াছি প্রভু ; খ্রীষ্ট জন্মদিনে গ্রেবিয়েলকে আর ফরেষ্টার জনের ছেলেকে আমি অমনি দুখানি কাগজ উপহার দিই।"

"বটে ? সৌখীন জিনিষের সম্বন্ধে তোমার ত দিব্য রুচি আছে ফ্রোলন ? কিন্তু দুদিন পরেই যাহার সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে সেটা সুনিশ্চিত আছে, তাহাকে ভাল কাগজ দেওয়া বা ছবি আঁকায় সাহায্য করা,—এগুলি পাপ কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখি।—তোমার কতকগুলা টাকা বেশী হইয়াছে বোধ হয়, আমায় দিও—ব্যাঙ্কে রাখিয়া দিব !"

বৃদ্ধ যখন কথা বলিতেছিলেন, ততক্ষণ লিয়েন গেব্রিয়েলের আঁকা ছেঁড়া ছবিখানি দেখিতেছিল ; হিজিবিজি মোটেই নয়, পরিচ্ছন্ন রেখায় অঙ্কিত একটি সুন্দর সিংহের প্রতিকৃতি। বালকের হাতের এমন নিপুণতা দেখিয়া সে মুগ্ধ হইল।

লিয়ো তখন গেব্রিয়েলের কাছে গিয়া বলিতেছিল, "ওটা আবার আঁটা দিয়া সাটিয়া নিব, কেমন গেব্রিয়েল ?"

ফ্রো মেসন্ উগ্রস্বরে বলিল, "আবার উহার কাছে গিয়াছ লিয়ো ? এস আমরা এ ঘর হইতে যাই, পড়িতে হইবে তা মনে আছে ?"

লিয়ো উত্তর দিল, "আমি পড়িব না,—তুমি যাও !" "বটে, দুষ্ট ছেলে ?" বলিয়া মেসন্ তাহাকে ধরিতে আসিল এবং লিয়োও আপনার অভ্যাস মত চীৎকার সুরু করিল। তখন বৃদ্ধের দিকে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষয়িত্রী

বলিল, "তাল এ কি মহাশয়? লিয়ো দিন দিন এত দুষ্ট হইতেছে কেন বলুন দেখি? আগে ত সে এমন ছিল না।"—

বৃদ্ধ অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "হুঁ,"—মেসন্ বলিতে লাগিল, "ঐ হতভাগা চাকরটাকে আপনারা দূর করিয়া দিন, উহার শিক্ষার লিয়ো এমন বিগ্ড়াইয়াছে।"

এবার জুলিয়েন কথা কহিল;—বলিল, "শিক্ষার দোষ নিশ্চয়ই, কিন্তু সে দোষ গেব্রিয়েলের নয়,—তোমার।"

"কি—কি বলিলেন?"

"ভাবিয়া দ্যাখ কি বলিলাম। এইখানে বসিয়া আমি যতটুকু দেখিলাম, তার একটিও সুশিক্ষা নয়, তাহাতে লিয়োর উপকার ত নয়ই বরং যথেষ্ট অপকার হইবে।"

ভ্রো মেসন্ প্রথমটা স্তব্ধ হইয়া গেল, এ বাড়ীতে আসা অবধি শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে কেহ তাহাকে কোন কথা বলেন নাই, সে যেমন খুসি অথবা কর্ত্তাদের খেয়াল অনুযায়ী ভাবেই চলিয়াছে, আজ সহসা এই তরুণীর মুখের গম্ভীর ভর্ৎসনায় তাহার চমক লাগিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ স্মরণ হইল, কর্ত্রীর নামে এইযে নবাগতা নারী, এ সংসারে তাহার সম্মান বড় উচ্চে নয়, গৃহস্বামিনীর আসন ত সে পায় নাই ই—অধিকন্তু বৃদ্ধের কাছে সে তাহার মত গবর্ণেসের অপেক্ষাও তাচ্ছিল্যের পাত্র! এই একটি রাত্রির ঘটনা দেখিয়াই শোন্ ভরার্থের দাসদাসীরা বুঝিয়া লইয়াছে যে এই নবীনা ব্যারনেস্ নাম ধারণ করিলেও ব্যারণের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক অতি সামান্য এবং মান্য প্রতিপত্তি সেই অনুপাতেই পাইবে।

মেসন প্রথমটা স্তব্ধ হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহার প্রভুর দিকে চাহিয়া বুঝিল জুলিয়েনের কথায় তিনিও রুষ্ট হইয়াছেন, তখন সে আর লিয়েনের কথায় গ্রাহ্য না করিয়া বিশেষ একটি বিদ্রূপ ভঙ্গিতেই বলিয়া উঠিল, "লিয়োর কিসে ভাল হয় বা মন্দ হয় সে বিষয়ে আপনার অপেক্ষাও যাঁহারা ভাল বোঝেন, আমি তাঁহাদের আদেশ অনুসারেই বালকের শাসন বা শিক্ষা দিয়া থাকি, তাঁহারা ব্যতীত আমি আর কাহারও মতানুসারে চলিতে চাহিনা; প্রয়োজন হয় যদি—সেইখান হইতেই আমার আদেশ আসিবে। আমি শুধু সেই নির্দ্দেশেরই বাধ্য।"

পায়ের জুতা যষ্টিতে ঠুকিয়া হপ্‌মার্শেল বলিলেন, "নিশ্চয়!—প্রিয় লেডি, এ বিষয়ে কথা বলাই তোমার অন্যায়, তুমি এখনও বিবাহের বধূ—মাতৃত্ব বা কর্তৃত্ব দুই তোমার মানায় না; বিশেষ লিয়ের সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অধিকার তোমার নাই বোধ হয়,—কেমন? ভাবিয়া দ্যাখ তুমিও!—

গবর্ণেস হাসিতে ছিল। লিয়েন চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিল, সত্যই তাহার বলিবার কোন কথাই ত নাই এখানে—তবু বলিয়া ফেলে কেন? নিজের অসংযত রসনার উপর তাহার ক্রোধ হইতেছিল। সে উঠিয়া যাইতে উদ্যত—হঠাৎ বাহিরে উচ্চ কোলাহলে সকলের দৃষ্টিই জানালার প্রতি আকৃষ্ট হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শব্দ শুনিয়া বোধ হইল কতকগুলি শিশুকণ্ঠ একসঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে ও তাহার সহিত পুরুষ কণ্ঠে প্রবল ভর্ৎসনার স্বর মিশিয়া এক বিচিত্র কোলাহল চলিতেছে। শব্দটি প্রাঙ্গণে।

হপ্‌মার্শেল বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "ও আবার কি আরম্ভ হইল?"—

ভৃত্য উত্তর দিল, "কতকগুলা চাষার ছেলেমেয়ে বাগানের ফুলগাছ ছিঁড়িয়া ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইতেছিল, মালী তাহাদের ধরিয়া আনিতেছে, তাই তাহারা চীৎকার করিতেছে।"

"অ্যাঁ—আমার সেই গাছ ভাঙ্গিয়াছে?" বলিয়া বালকদের উদ্দেশে কটু বাক্য বর্ষণ করিতে করিতে বৃদ্ধ চেয়ার ছাড়িয়া স্বয়ং কোনমতে জানালার পাশে আসিলেন, উত্তেজনায় চলিয়া গেলেন বটে কিন্তু কয়েক পদ গিয়াই এমন কোঁকাইয়া উঠিলেন যে ভৃত্য ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল।

সকলেই জানালা দিয়া দেখিতেছে, জুলিয়েনও একটা জানালায় দাঁড়াইয়া দেখিল অপরাধী বালকবালিকাদের মধ্যে তাহার স্বামীও দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার অশ্বারোহণের বেশ, হাতে সুদীর্ঘ চাবুক। তিনি তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে সেই কশা উত্তোলন করিলেন।

"উঃ উঃ!" অতি অস্ফুট স্বরে লিয়েনের মুখ দিয়া কাতরধ্বনি বাহির হইয়া গেল, তাহার চক্ষু দুটি মুদিয়া আসিতেছিল। কিন্তু আর কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই, উৎসাহিতভাবে ছপ্‌মার্শেল বলিতে ছিলেন, "আঃ রাওয়েল যদি শাসন করিতে শেখে তাহা হইলে আর আমার ভাবনা কি?" পরে তৎক্ষণাৎ চেঁচাইয়া উঠিলেন, "ওকি—ওকি! একবার চাবুক তুলিয়া দেখাইয়া—ছাড়িয়া দিল যে, মারিল কোথায়? অপদার্থ—একেবারে অপদার্থ! ওদের মায়া-কান্না দেখিয়াই ভুলিয়া গেল! ছি ছি—এমনি করিয়া সে এত বড় সম্পত্তি রক্ষা করিবে? সব উড়াইয়া দিবে—সব উচ্ছন্নে যাইবে।"

তিনি বকিয়াই চলিলেন, কিন্তু লিয়েনর মুখের সমস্ত আঁধার পলকে মিলাইয়া মেঘান্তে সূর্যোদয়ের মধুর আলোয় ভরিয়া উঠিল।

পরক্ষণে হাসিতে হাসিতে রাওয়েল সেই ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, "কাকা, জুলিয়েন আমার ফিরিতে বিলম্ব হইল।" বলিয়াই তিনি আহার্য্য আনিতে আদেশ দিলেন। তখন বৃদ্ধ বলিলেন, "ভাল রাওয়েল, ঐ বদ্‌মাইস ছেলেগুলাকে তুমি ছাড়িয়া দিলে কেন?"

"হাঁ, ভয়ানক দুষ্ট ছেলে উহারা? কিন্তু কাকা, পাজিগুলা এবার এমন ভয় পাইয়া গিয়াছে যে জন্মে আর এদিকে আসিতে সাহস করিবে না।"

"ভয় পাইয়াছে? কিসে ভয় পাইল শুনি? চাবুকের একটু ছোঁয়াও ত লাগে নি কাহাকে?"

"চাবুক? উঃ কাকা, ও চাবুক লাগিলে কি বাচ্ছা কটা বাঁচিত? ঘোড়ার চাবুক,—তার শব্দ শুনিয়াই ত তারা কাঁদিয়া অস্থির লাগিলে মরিয়া যাইত যে।—"

"মরিলে ত ঠিক হইত, উহাদের মারিয়া ফেলাই উচিত?"

"তুচ্ছ গাছের ডালের জন্য কাকা?—" বলিতে বলিতে রাওয়েল হাসিতে আরম্ভ করিলে বৃদ্ধ বলিলেন, "তোমার হাসি আমায় ভাল লাগে না রাওয়েল; আজ তারা অমনি বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পাইল, দেখিও দুদিন বাদে আবার গাছ ভাঙ্গিবে।"

"কখনো ভাঙ্গিবে না, আপনি সেজন্য নিশ্চিন্ত থাকুন।"

ভগ্নতরুলতার জন্য বৃদ্ধের অশেষ ক্ষোভ ও রাওয়েলের প্রবোধের সঙ্গে প্রাতর্ভোজন সমাপ্ত হইলে জুলিয়েন স্বামীর নিকটে আসিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে আমার ক'য়েকটি কথা আছে, এখন তোমার শুনিবার সময় হইবে কি?"

সহাস্য আস্যে রাওয়েল বলিলেন, "নিশ্চয় হইবে, চল।"

বৃদ্ধের মুখ মুহূর্ত্তে বিকট হইয়া উঠিল, গমনোন্মুখ ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন "রাওয়েল, তোমার স্ত্রীর সহিত সাবধানে ও সসম্মানে কথা বলিয়ো; কারণ উনি একজন পণ্ডিতা মহিলা; আরও উনি জানেন যে মাইনোরা একদিন মহামান্য ট্রেচেনবার্গেদের ভৃত্য ছিল।"

রাওয়েলের হাস্য বদন গম্ভীর হইয়া পলকে একবার ভ্রূকুঞ্চিত হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ একটু শুষ্ক হাসির সহিত মুখ ফিরাইয়া বাহির হইয়া গেলেন, জুলিয়েন তাঁহার সঙ্গে ছিল।

বৃদ্ধ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখের সে তড়িচ্চঞ্চল রোষচিহ্ন দেখিয়াছিলেন, হিংসার পরিতৃপ্ত আনন্দে তাঁহার অন্তরে তখন যথেষ্ট স্ফূর্ত্তি সঞ্চার হইয়াছে?

সেখান হইতে বাহির হইয়া রাওয়েল আপনার উপবেশন কক্ষে আসিলেন, সুচিত্রিত গৃহখানিতে সজ্জার যথেষ্ট পরিপাটা দেখা যায়, আরামেরও বিশেষ আয়োজন রহিয়াছে। জুলিয়েনকে বসিতে বলিয়া ব্যারণ পাশের ঘরে গিয়াছিলেন; ততক্ষণ সে ঘরটি দেখিতে লাগিল। সম্মুখেই এক দীর্ঘ তৈলচিত্র, পরম লাবণ্যময়ী নবীনার হাস্যময় সুন্দর আকৃতি তাহাতে অঙ্কিত, মুখের ভাব ও বেশবিন্যাস দেখিয়া তাঁহার সরল স্বভাব ও সেই সঙ্গে বিলাসপ্রিয়তার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। আশেপাশে আরও কএকটি সুন্দরীর ফটোগ্রাফ্ মূল্যবান ফ্রেমে বাঁধান,—প্রাচীরে লম্বিত।

সেদিক হইতে মুখ ফিরাইতেই লিয়েন দেখিল, লিখিবার টেবিলের উপর সোনার ফ্রেমে আর একটি সুন্দরী যুবতীর প্রতিমূর্ত্তি সযত্নে রাখা হইয়াছে। দেখিবামাত্র সে চিনিল, এ সেই গত সন্ধ্যায় অশ্বারোহিণী যে দুটি স্ত্রীলোক তাহাদের গাড়ীর পাশ দিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল, এ তাহাদের মধ্যে একজন। চিত্রিত মূর্ত্তিরও অশ্বারোহণ বেশ। ইঁহাকে দেখিয়া কল্যকার তাঁহার সেই প্রজ্বলিত চক্ষু দুটিও লিয়েনের স্মরণ হইল। কে ইনি?—

ভাবিতে ভাবিতেই তাহার দৃষ্টিতে পড়িল, কোন একটি ক্ষুদ্র টেবিলে গ্লাস্-কেসের মধ্যে এক জোড়া জুতা। রমণীর পরিধেয় নীল গর্ণেটের সুন্দর পাদুকা দুটি ভক্তের আরাধ্য বস্তুর ন্যায় সাদরে সজ্জিত রহিয়াছে।

রাওয়েল গৃহে আসিয়া লিয়েনের দৃষ্টিলক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "চিনিতে পার নাই না? এই ছবিখানি ভ্যালেরির। আর ঐ যে ফটোগ্রাফগুলি দেখিতেছ, ঐ মুখ কয়খানি আমার ভাল লাগে, এক সময় উহারা আমায় মুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু ঐ যে জুতা দুখানি দেখিতেছ লিয়েন, কি বলিব তোমায়—একদিন এমন ছিল ঐ জুতায় চা খাইতে পাইলেও আমি কৃতার্থ হইতাম।" বলিয়াই তিনি উৎসারিত কলহাস্যে ঘর ভরিয়া তুলিলেন।

লিয়েন বিস্মিত লজ্জিত হইয়া ভাবিতেছিল, এই সব প্রণয় প্রসঙ্গ, লজ্জাজনক পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্ত্রীর নিকট বলা যায় কি? তাহার স্বামীর মন উদার ও সরল এটুকু সে বুঝিয়া ছিল কিন্তু এ কি অদ্ভুত সরলতা?

হাসি থামিলে রাওয়েল বলিলেন, "কিন্তু জুলিয়েন, আমি দেখিলাম তুমি একদিনেই কাকাকে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছ, এতটা কেন হইল বল দেখি?"

ম্লানভাবে জুলিয়ান বলিল, "আমার অদৃষ্ট!—কি বলিব বল, আমি কি চাই যে তাঁকে একটুও কষ্ট দিই বা বিরক্ত করি? না না রাওএল—আমি তা একেবারেই ভালবাসি না। তিনি যে গুরুজন বৃদ্ধ পীড়িত ও শোকার্ত্ত, এ কথা কি ভুলিবার? তবে—"

"অসহ্য বোধ কর, কেমন ?"

"শুধু অসহ্য নয়, সে সকল কথার প্রতিবাদ না করাও আমি অন্যায় মনে করি। আমার পিতৃবংশ দরিদ্র হইলেও তাহারা মানুষ, এটা স্বীকার কর ত ? তোমরা তাহাদের ঘৃণা করিতে পার, কিন্তু অপমান করিয়ো না,— তাহাতে হয় তো সে অপমানের প্রত্যুত্তর আসিয়া তোমাদিগকেও আঘাত দিতে পারে ? জান ত আত্মরক্ষার চেষ্টা মানুষ কেন জীব মাত্রেইরই ধর্ম ।"

রাওয়েল কৌতুকদৃষ্টিতে চাহিয়া জুলিয়েনের কথাগুলি শুনিতেছিলেন, বালিকাকৃতি তরুণীর মুখের সেই শান্ত সৌম ভাব ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ স্বরের কথা কয়টি তাঁহাকে ভালই লাগিতেছিল, যদিও তাহাতে প্রকারান্তরে তাঁহাকেও আক্রমণ ও সাবধান করা হইল।

জুলিয়েন নীরব হইলে তিনি বলিলেন,—"জানি জানি জুলিয়েন তুমি যে কেন অত উত্তেজিত হইয়াছ তাহা আমি বুঝিয়াছি। তবে হয় কি, আমার ঐ বাক্‌বিতণ্ডা ঝগড়া বন্ধ ভাল লাগেনা, তাই চুপ্ করিয়া থাকি আর সকলকেই শান্তভাবে থাকিতে অনুরোধ করি । যাক্, তুমি যে আমায় কি বলিবে বলিলে, কথাটি কি বল ত ?"

"কথাটা লিয়োর সম্বন্ধে। কিন্তু তোমার ছেলের উপর আমার কথা বলা উচিত কি না সেইটুকু আমায় জানাইয়া দিতে হইবে তোমার।"

আনন্দ হাস্যে রাওয়েলের মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ত্বরিত স্বরে বলিতে লাগিলেন "নিশ্চয় উচিৎ,—নিশ্চয়! লিয়েন, তাহাকে যে আমি তোমারই হাতে দিতে চাই, যদি তোমার কোন বিরক্তিকর না হয়, লিয়ো বড় চঞ্চল যদি তুমি তাহাকে—"

বাধা দিয়া লিয়েন বলিল, "হাঁ আমি তাহাকে চাই ? কিন্তু তাহার পূর্ব্বে একটি কথা,—তাহারা শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষাপ্রণালী ভাল নয়, তাহার নিকট থাকিলে লিয়োর সুবিধা হইবে না।"

রাওয়েল বলিলেন, "তাহাও জানি, কাকার অন্যায় প্রশ্রয়ে সে আরও খারাপ হইতেছে। কিন্তু কি করিব বল, তাহাকে বিদায় দিলে নূতন লোকই বা সহজে কোথায় পাই,—নানা কারণেই বাধ্য হইয়া তাহাকে রাখিতে হইয়াছে।"

"কিন্তু সে যদি আমার কাছে থাকে, তবে ত আর গবর্ণেসের প্রয়োজন থাকিবে না ?"

"তোমার কাছে ? তুমি কি সর্ব্বদা ঐ দুষ্ট ছেলেকে দেখিতে পারিবে লিয়েন ? তা ছাড়া উহার পড়ার জন্যও লোক দেখিতে হইতে।"

"ক্লো যেমন্ যাহা যাহা করে, আমি স্বচ্ছন্দে তাহা পারিব ; এখানে ত আমার কোন কাজ নাই, আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও আমার অসাধ্য হইবে না বোধহয়।"

হাসিতে হাসিতে রাওয়েল বলিলেন, "পাগল, সেই কথা কি ভাবিতেছি আমি ? বুঝিয়া দ্যাখ জুলিয়েন, একটা দুরন্ত শিশুর সমস্ত ভার লওয়া,—ইহার মত কঠিন কাজ বোধহয় আর কিছুই নাই। দুই দিনে তুমি হাঁফাইয়া উঠিবে,—পারিবে না, কখনো পারিবে না, আমি বলিয়া রাখিতেছি।"

হাসিয়া লিয়েন বলিল, "না পারি ত অন্য লোক দেখিব ! এখন কথা হইতেছে তোমার কাকা আমার কাছে লিয়োকে ছাড়িয়া দিবেন কি ?"

"হাঁ, সে একটু কঠিন কথা বটে ?" স্বামীর কথায় লিয়েন বলিল, "ছেলের বড় ক্ষতি হইতেছে, তুমি যদি চেষ্টা করিয়া এটুকু কর তবে ভাল হয় কিন্তু।"

"চেষ্টা করিব বৈ কি, লিয়োর জন্য আমি সবই করিতে পারি। কিন্তু লিয়েন্ তুমি ভাবিয়া দ্যাখ, তোমার কষ্ট হইবে।"

মৃদু স্বরে জুলিয়েন বলিল, "কষ্ট হবে? না ভাল লাগিবে আমার; বুঝিতে পারিতেছেন না? এখানে আমার যে ভাবে থাকিতে হইবে তাহাতে এমনি কিন্তু আশ্রয় চাই আমার!"

"তাই হইবে, তাই হইবে লিয়েন, লিয়োকে, তোমার কাছে রাখিয়া আমি নিশ্চিন্ত ভ্রমণে বাহির হইতে পারিব।" পরে একটু ইতস্ততঃ ভাবে হাসিয়া রাওয়েল বলিলেন, "আর—জুলিয়েন, আমার মনে হইতেছে ক্রমশঃই আমরা দুজনে দুজনকে চিনিতে পারিতেছি,—না?

স্ত্রীর কাছে উত্তর না পাইয়া ব্যারণ পুনরায় বলিলেন, "আমায় তোমার বন্ধু মনে করিয়ো তুমি, আমিও তোমায় তাই ভাবিব। শুধু শান্তি লিয়েন? আমার বাড়ীটা যদি শান্ত নিরুপদ্রব হইত, তাহা হইলে বোধহয় আমি এমন করিয়া ঘুরিয়া মরিতাম না। তুমি, নির্ব্বোধ নও, পার যদি সব দিকে ধৈর্য্য রাখিয়া চলিয়ো। আমি বিদেশে থাকিয়াও যেন ঘরের সুখাস্থ্যর সংবাদ পাই। ও কি জুলিয়েন, তোমার মুখ অমন দেখাইল কেন? কোন কষ্ট হইল কি?"

লিয়েনের বিবর্ণ মুখের উপর লজ্জার গাঢ় রক্তিমা ফুটিল, সে ব্যগ্রভাবে বলিল, "না না কিছু না, কৈ কি হইয়াছে?"

মৃদু হাসিয়া রাওয়েল্ "একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব কি তোমায়?—বল দেখি, এ বিবাহে কি তুমি অন্য কিছু আশা করিয়াছিলে?"

দুর্ভাগিনী এ কথার কি উত্তর দিবে? স্বামীর মুখে এই প্রথম প্রণয় প্রসঙ্গ, কিন্তু ঐ প্রশ্ন ছলে যাহা উচ্চারিত হইল তাহার মধ্যে ভালবাসার কোন সম্বন্ধ ত নাই ই, অধিকন্তু ব্যথিত হৃদয়া তরুণীর সদ্য বেদনার উপর লজ্জার ধিক্কার দিয়া সর্ব্বাঙ্গ অচল করিয়া তুলিল। তাহার রুদ্ধ কণ্ঠ হইতে শুধু একটি শব্দ বাহির হইল—"না।"

ব্যারণ বিস্মিতভাবে তাহার প্রতিই চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু জুলিয়েনের শেষ কথাটার ভাব ঠিক্ বুঝিতে পারিলেন না কিম্বা ইচ্ছা করিয়াই বুঝিতে চেষ্টা করিলেন না। স্থানটি কিয়ৎকাল নীরব হইয়া থাকিল। অবশেষে লিয়েন যখন যাইবার জন্য আসন ত্যাগ করিল, তখন রাওয়েল্ বলিয়া উঠিলেন, "আর কিছু বলিবার আছে কি লিয়েন?"

"না;—হাঁ একটি কথা আছে; আমার ঘরে ড্রয়ারের ভিতর অনেকগুলা গিনি দেখিলাম, যদি আপনার কাজের তরে—"

এবার বহুক্ষণ পরে ব্যারণ তাঁহার কৌতুক হাসির উৎস ছুটাইয়া দ্রুতস্বরে উত্তর দিলেন,—"আরে না না,—আমার নয়, ও তোমারি খরচের টাকা জুলিয়েন, তোমার নিজের ইচ্ছামত যা হয় করিয়ো।"

"কিন্তু আমার ত কোন প্রয়োজন নাই টাকার! যখন কাজ পড়িবে—তোমার নিকট চাহিয়া লইব।" স্ত্রীর কথায় ব্যারণ আরও হাসিতে লাগিলেন।" "—টাকার প্রয়োজন নাই? লিয়েন্, এ যে বালকের কথা, নির্ব্বোধের কথা! জান না,—এখন দরকার নাই বলিতেছ বটে—কিন্তু আর কিছু দিন পরে টাকা বাড়াইবার

জন্য আমায় বলিতে আসিবে। ভ্যালেরি এক এক দিন আমায় ত্যক্ত করিয়া তুলিত। তুমিও ক্রমে অমনি করিবে—করিবে !”—

জুলিয়েন একথার কোন উত্তর দিল না, তাহার নম্র আনত মুখখানিতে আঘাত বেদনার ছায়া ঘনাইয়াছিল। রাওয়েল তাহা লক্ষ্য করিলেন না।

যাইবার সময় লিয়েন বলিয়া গেল, “তুমি যাহা যাহা বলিলে, আমি তেমনি ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিব।” হাসিয়া ব্যারণ বলিলেন, “তাহা হইলেই আমি সুখী হইব।” এইরূপে সেই দম্পতির আলাপ শেষ হইল।

জুলিয়েন চলিয়া গেলে ব্যারণ তাঁহার কাকার ঘরে ফিরিয়া গেলেন। ইহার পরই নিম্নতলের ভৃত্যেরা তাঁহাদের যুগল প্রভুর বচসা শুনিতে পাইল। মাঝে মাঝে প্রায়ই এমন ঘটিত; হপ্‌মার্শেল তাঁহার সর্ব্বদা ব্যবহৃত বেতের ছড়ি বার বার আছড়াইতেছেন ও ব্যারণ মাইনো পায়ের জুতা ঠুকিয়া উত্তর দিতেছেন, শুনিয়া তাঁহারা অদ্যকার বিবাদের গুরুত্ব অনুমান করিতেছিল।

ইহার পরই দেখা গেল লিয়োর শয্যাদি তাহার বিমাতার কক্ষের পার্শ্বের ঘরটিতে স্থানান্তরিত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রাওয়েলের বিবাহের পর ছয়মাস কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজকাল করিয়া তাঁহার প্রবাস যাত্রা এখনও ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু পত্নীর সহিত ব্যবহারে তাঁহার আর কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না, তাঁহাদের এই ভাব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, প্রথম প্রথম ঘরে এবং বাহিরে, ধনী নির্ধন নর নারী নির্ব্বিশেষে সকলেই সে কথার আলোচনা—সমালোচনা করিয়াছে। কেহ বা নূতন ব্যারনেসের অবস্থা শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছে, আবার কেহ—মাইনোর তুল্য পুরুষের সে লাংচুল রমণীকে ভালবাসা অসম্ভব, বলিয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছে। কিন্তু ইহা পূর্ব্বের কথা, সম্প্রতি আর তাঁহাদের সম্বন্ধে নূতন কিছু শোনা যায় না।

সেদিন প্রাতরাশের পর,—জুলিয়েন জানালার পাশে বসিয়া কি একটা সেলাই করিতেছিল। লিয়ো তাহার ঘাড়ে পড়িয়া একটি প্রশ্নেরই নানাবিধ গল্পের রচনা করিয়া তাহার প্রত্যেকটির উত্তরের জন্য তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। অবশেষে লিয়েন তাহাকে একটি রেশমের ফুল তৈয়ারি করিয়া হাতে দেওয়ায় সে তাহার নিকট মাটিতে বসিয়া খেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ওদিকে পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে তখন তর্ক আরম্ভ হইয়াছিল। হপ্‌মার্শেল বলিতেছিলেন, রাওয়েল যখন দুই তিন বার ইউরোপ ঘুরিয়া আসিয়াছেন তখন পুনরায় এ ভ্রমণের আবশ্যকতা কি? রাওয়েল বুঝাইতেছিলেন, এবার তিনি ইউরোপ দেখিতে নয়, ভারত ও পূর্ব্বাঞ্চল ভ্রমণে বাহির হইবেন। কিন্তু হপ্‌মার্শেলের তাহাতেও ঘোর আপত্তি, ক্রুদ্ধভাবে তিনি বলিলেন “না এসব অকারণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানের কোন মানেই আমার মাথায় আসে না; তোমার এই সারাজীবন ধরিয়া বাহিরে বাহিরে থাকা দেখিয়া মনে হয় যেন তোমার শরীরে জিপ্‌সীর রক্ত আছে!”

এ কথায় রাওয়েলের বড় হাসি পাইল; পিতৃব্যের রুষ্ট কথার উত্তরে পরিহাসের স্বরেই তিনি বলিলেন, “ঠিক বলিয়াছেন, কাকা? এক আপনি ভিন্ন আমাদের বংশের সকলেই প্রায় জিপ্‌সীর জীবনই যাপন করিয়া গিয়াছেন, নয় কি? আমার বাবা কদিন ঘরে থাকিতেন? আর গিস্‌বার্ট, কাকা—”

"চুপ কর রাওয়েল ! তোমার সে গিলবার্ট কাকার নাম আমার সম্মুখে করিয়ো না বলিতেছি। সে আমাদের বংশের কলঙ্ক। তার জীবনের লজ্জায় আমারও সারাজীবন লজ্জায় কাটিতেছে।"

"আঃ কাকা, মানুষের ভুলের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই ? শেষ কালে ত তিনি তাঁর সব পাপ সব ত্রুটির শোধ দিয়া গিয়াছেন। তা ছাড়া তাঁর মন যে, কত উচ্চ কত উদার ছিল, সত্যের উপর কতখানি আস্থা—"

"এই যেমন তোমার! তোমার চেহারাখানিও যেমন তাহারই নকল—বুদ্ধিটিও ঠিক তাই। এখন বাকি শুধু কলঙ্কটুকু, দেখিও এখানে যেন সাবধানেই থাকিও, তোমার দ্বারা যে কিছুই আশ্চর্য্য নয় তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি।—"

আবার রাওয়েলের মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল, ধীরভাবে তিনি বলিলেন,—"আমার যাহা ইচ্ছা বলুন, কিন্তু মৃত পরিজনের উদ্দেশ্যে আর আলোচনা করার ফল কি ?"

তীব্র স্বরে হপ্‌মার্শেল বলিলেন, "যার পাপপুণ্য জ্ঞান নাই, মানসম্ভ্রম বোধ নাই, সে মৃত হোক জীবিত হোক্—তাহাকে আমি আমার পরিজন বলিয়া স্বীকার করিতে ঘৃণা বোধ করি!" বলিয়াই পদাঘাতের ভঙ্গিতে পদতলের উক্ত চরণাধারটি ঠেলিয়া দিলেন।

রাওয়েলের তখন বিরক্তির মাত্রা রোষে পরিণত হইয়াছে; দন্তনিষ্পীড়িত সক্রোধ স্বরে তিনি উত্তর দিলেন, "কিন্তু আপনার ঐ ঘৃণায় তাহাদের এতটুকুও ক্ষতি হইবে না, আপনার ভক্তি বা সম্মানেও কাহারো প্রয়োজন নাই জানিবেন!"

"জানি তাহা আমি বহুদিনই বুঝিয়াছি!— নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই আমি তোমার সঙ্গে থাকি,—কথা বলিতে হয় তাই বলি। কিন্তু আর না—উইলি!—আমার চেয়ার ও-ঘরে লইয়া চল।"

ভৃত্য তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিলে রাওয়েলের দৃষ্টি জুলিয়েনের উপর পড়িল। নিজেদের তর্কে তাহার উপস্থিতি তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন তাহাকে দেখিয়া তাঁহার সে ক্রোধের উত্তেজনা অনেকটা কমিয়া গেল। সংযতভাবে তাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কাকা সামান্য কথাতেই রাগ করেন, দেখিলে—রাগ করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়াই গেলেন।"

বিবাহের পরদিনেই সেই কথাবার্ত্তার পর আজ এই প্রথম তাঁহারা একাকী একত্র হইয়াছেন। জিয়েন কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে মখমলের উপর ফুল তুলিয়া যাইতেছিল, স্বামীকে নিকটে দেখিয়াও সে ভাবের ব্যত্যয় হইল না। রাওয়েল তাহার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আবার বলিলেন, "কাকার আর কোন বিশেষ দোষ নাই, জান লিয়েন তিনি লোক মন্দ নন্ কিন্তু বড় রাগী!"

সেলাই হইতে মুখ না তুলিয়াই জুলিয়েন বলিল, "কিন্তু তুমি কি রকম লোক বল দেখি? মুখে যাহা বল, কাজে ঠিক্ তাহার উল্টাই কর দেখিতেছি যে!"

রাওয়েল হাসিয়া বলিলেন "সত্য না কি ? রকমটা কি স্পষ্ট করিয়া বল না শুনি ?"

অতি সন্তর্পণে গ্রন্থি দিয়া লিয়েন এবার মুখ তুলিল; মৃদু হাসিয়া বলিল "এই যে তুমি বার বার বল যে ঝগড়া-বিবাদ ভালবাস না, সংসার যাহাতে শান্তিময় হয় তাই চাও,—কাকার মনে কষ্ট দেওয়া অনুচিত মনে কর; অথচ নিজেই সে সকলের বিপরীত কাণ্ড ঘটাইয়া বস! কাকাকে অকারণে বিরক্ত কর তুমিই। কেন এ বিবাদটা বাঁধাইলে আজ ?"

"বিবাদ কি আমি করিলাম জুলিয়েন ? ছোট কাকার নাম উনি একেবারে সহ্য করিতে পারেন না, কেন ? এত কেন ? আমার ভাল লাগে না তাহা।"

জুলিয়েন এ কথার উত্তর না দিয়া সেলাই করিতে লাগিল ; রাওয়েল বলিলেন "আমি আমার ছোট কাকাকে বড় ভালবাসিতাম জুলিয়েন, যদিও তিনি—"

ব্যারণ একটু থামিলেন, তখন বলিল "আমি তাঁহাকে জানি না, তাঁহার নামও শুনি নাই কখনো।"

"এ বাড়ীতে তাঁহার নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ যে, জানিব কেমন করিয়া ? তবে সত্য কথায় গিস্‌বার্ট কাকা যে নির্দ্দোষী ছিলেন তাহা নহে ; আমাদের সমাজ ও ধর্ম্ম দুয়েরই উপর তাহার আস্থা ছিল না, তা ছাড়া আরও একটি দারুণ কলঙ্কে তাঁর সমস্ত সাধন সমস্ত সৎ কাজ মলিন হইয়া আছে, কাকা সে ঘটনাটা বড় ঘৃণার চক্ষে দেখেন, বুঝিলে ?—ও কি তুমি আমার কথা শুনিতেছ না জুলিয়েন ?"

মৃদু হাসিয়া সেলাইটি রাখিয়া জুলিয়েন বলিল "এসব তোমার পারিবারিক কথা, আমার শোনা যদি অন্যায় মনে না কর, তবে শুনিব না কেন ?"

"অন্যায় ! অন্যায় কিসে ? এসব কথা না জানে কে যে তুমি শুনিলে অন্যায় হইবে ? আচ্ছা জুলিয়েন, তুমি আমাদের বাড়ীর সম্মুখের ঐ ইণ্ডিয়ান হাউস দেখিয়াছ ত ?"

"দেখিয়াছি, ও দিকটা আমায় ভাল লাগে।"

যে দেখে তাহারই ভাল লাগে। গিস্‌বার্ট কাকা যে কত যত্নে কত অর্থব্যয় করিয়া উহা তৈয়ার করান তাহা বলিবার নয়।—ভারতবর্ষ হইতে মিস্ত্রী আনিয়া ঐ বাড়ী ও মন্দির তৈয়ার করান হয়, ঐ সব গাছ পাখী জীব জন্তু সমস্তই ভারতের।"

জুলিয়েন আবার ছড়ির মুখে রেশম পরাইতে ব্যস্ত ছিল, রাওয়েল বলিলেন "ওখানে একটি স্ত্রীলোক থাকে তাহার বিষয়ও কিছু শোন নাই কারু কাছে ?"

জুলিয়েন তখন আবার সেলাই আরম্ভ করিয়াছে। স্ত্রীর কাছে কোন উত্তর না পাইয়াও রাওয়েল বলিতে লাগিলেন, "তাকেও আমার গিস্‌বার্ট কাকাই ভারতবর্ষ হতে আনেন, সে বেনারসের বাইজি অর্থাৎ সাধারণ নর্ত্তকী। আমার কাকা ভারতে গিয়া অনেক উপার্জ্জন করেন, কত যে মণি মুক্তা লইয়া আসেন তাহা আর বলিব, কিন্তু সে সকলে তাঁহার আসক্তি ছিল না, সমস্ত ধনরত্ন—এমন কি পৃথিবীর সব কিছুরই অপেক্ষা তাঁহার প্রিয় ছিল ঐ রোটাস্ লিলি ! তাহার হিন্দু নাম ছিল পাদ্মনী, কাকা তাহাকে লিলি বা রোটাস্ লিলি বলিয়া ডাকিতেন।"

ব্যারণ গল্প বলিয়া যাইতেছেন কিন্তু তাহাতে শ্রোত্রীর প্রশ্ন বা ঔৎসুক্যের অভাবে ঈষৎ বিচলিত হইয়া তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওটা কি হইতেছে ?—বাঃ সুন্দর ফুলটি ত ? দেখি।"

জুলিয়েন মৃদু হাসিয়া বলিল, "কিছু না।"

রাওয়েল বলিলেন, "না সুন্দর হইয়াছে। হাঁ, গল্পটা যখন আরম্ভ করিয়াছি, তখন শেষ করিয়া দিই,—তুমি শোন। লিলি হিন্দু, তার জন্য তিনি এখানে তার দেবতা শিবের মন্দির পর্য্যন্ত করিয়া দেন, তুমি তাহা দেখিয়াছ ?"

জুলিয়েন বলিল, "না দেখি নাই ত।"

"সে কি, সে মন্দির যে এই জানালা দিয়াও দেখা যায় !"—রাওয়েল তখন স্ত্রীর মাথাটি দুই হাতে ধরিয়া [illegible] বলিলেন, "ঐ দ্যাখ, ঐ যে সোণার চূড়া দেখা যায় !—মন্দিরটা গাছে ঢাকা পড়িয়াছে।"

"দেখিয়াছি—ছাড়!" বলিয়া লিয়েন মাথা টানিয়া লইয়া একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইল। বিস্মিত হইয়া রাওয়েল বলিলেন "কি?"

"কিছু না, তবে একটি কথা মনে রাখিয়ো যে আমরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, আর সে বন্ধুত্বের মান্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।"

"ওঃ" বলিয়া র্যায়ল একটু হাসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রফুল্ল মূর্ত্তি যেন অপ্রতিভ হইয়া উঠিল। তিনি নীরবে চেয়ারে গিয়া বসিয়া পড়িলেন।

এবার লিয়েন তাহার সূচিকার্য্যের সমস্ত উপকরণ গুছাইয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তাহার পর একটা চেয়ার লইয়া স্বামীর নিকটে বসিয়া বলিল, "বল, এবার তোমার গল্প বল।"

হাসিয়া রাওয়েল বলিলেন, "গল্প শুনিতে তো তোমার ইচ্ছা দেখিতেছি না লিয়েন্!"

"না শুনিব বল, এবার আমার সত্যই কৌতুহল হইয়াছে। আচ্ছা রাওয়েল, তুমি কখনো সেই স্ত্রীলোকটাকে দেখিয়াছ কি?"

"না, দেখি নাই। কাকা তাহাকে হিন্দুদের ধরণে পর্দ্দার মধ্যেই রাখিতেন। শুনিতাম সে নাকি আশ্চর্য্য সুন্দরী, এমন রূপ নাকি সচরাচর দেখা যায় না। আর গিলবার্ট কাকা যে তাহাকে কি ভালইবাসিতেন লিয়েন, সে যে তাঁহার কি ছিল—আমার বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর মাত্র, তাহাকে যতটুকু বুঝিতাম—কাকা যেন তাহার জন্য পাগল হইয়া গিয়াছিলেন! এমন ভালবাসা যে মানুষে মানুষকে দিতে পারে তাহা আমি দেখি নাই। আর সেই অসভ্য দেশের কুচরিত্রা স্ত্রীলোক! জান লিয়েন, যে যাই বলুক পৃথিবীতে পাপ পুণ্য জিনিষটা যে সত্য, কাকারও সেই পদ্মিনীর পরিণাম দেখিয়াই আমার এ বিশ্বাস হইয়াছে।"

লিয়েন এবার পূর্ণ ঔৎসুক্যে স্বামীর কথা শুনিতেছিল। এই প্রসঙ্গটায় যে তাহার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে রাওয়েলও তাহা বুঝিতেছিলেন। একটু তৃপ্তির হাসির সহিত সনিশ্বাসে তিনি বলিলেন,—"কিন্তু ঐ দোষটি ছাড়া কাকার আমার যে কত গুণ ছিল লিয়েন, তাহাও তো বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। হপ্‌মার্শেল এখন তাঁহার নামে জ্বলিয়া উঠেন কিন্তু তাঁহার চরিত্রে তিনিও তাহার বাধ্য ছিলেন। আর আমায় যে তিনি কি ভালই বাসিতেন, যখন এখানে আসিতাম—"

"এখানে আসিতে কি আবার? কোথায় থাকিতে তুমি?"

"ওঃ তুমি যে কিছুই জাননা আমাদের! আচ্ছা শোন আমি আরও একটু খুলিয়া বলি তবে। তোমার এখন কোন কাজ নাই ত?"

"না, তবে লিয়ো কোথায় একবার তাহা খোঁজ লইতে হইবে।"

"ঐ যে লিয়ো বাহিরে খেলা করিতেছে, কথা শোনা যায় না?"

"হাঁ, বোধ হয় গেব্রিয়েলও আছে। তারপর?"—

ক্রমশঃ

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

বসন্তসম্ভোগ।

——ঃ*ঃ——

(ইংরাজী হইতে).

পাটল হৃদয়া রক্তি সখীগণ
আসে ঐ রাঙা পতাকা তুলি.
জাগায়ে হরষে অরুণ বরষে
স্ফুটনোদগ্রীবা কলিকাগুলি।
পাপীয়া বসিয়া তরুর শাখায়
কোকিলের সনে কণ্ঠ মিলায়
মধু মাধবের সব সুর গায়
সরস কূজনে হৃদয় খুলি
মলয় অনিল গন্ধ বিলায়
সুনীল গগনে আপনা ভুলি।

চিক্কন চারু দেবদারু তরু
সুনিবিড় ছায় ফেলেছে যথা
রচেছে চাঁদোয়া মুকুল আকুল
যথা সহকার মাধবীলতা,
কবিতা রাণীর শ্রীচরণ তলে
বসিব পুলিনে তথায় বিরলে
ভাবিব 'সকলে জন কোলাহলে
হেন দিনে কেন বরিছে ব্যথা'
স্মরিব গর্ব্বী বামনের আর
কাঙাল চিত্ত ধণীর কথা।

এখনো রুদ্ধ নগর বিবরে
চিন্তার দাস রয়েছ কা'রা,
কূজনে গুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে
হেথা যে ছুটেছে রসের ধারা।

তরুণ মধুপ সাথে লয়ে বধূ
একটী কুসুমে পিয়িতেছে মধু
মধুমক্ষিকা রচিছে চক্র
ফুলে ফুলে ঘুরে বিরামহারা
হিরণ বরণে　　　　মানস হরণে
উড়ে প্রজাপতি পাগলপারা।
ঋষিরা বলেন　　　　"মানব জীবন
এমনি চলিবে দুদিন তরে
এত কোলাহল　　　　এত আয়োজন
সব শেষ হবে দুদিন পরে।

জ্ঞানসম্পদ কর্ম্মজীবন
মান রাজপদ প্রেম যৌবন
ভাগ্য দেবীর নানা বরণের
ভূষণে ভূষিবে গর্ব্ব ভরে।
জরার পীড়ায়　　　　জর্জ্জর সবি
চরমে ধূলায় বরণ করে'।"
তাই যদি হয়　　　　উদ্বেগ জ্বালা
সারাটি জীবন কে বলো সবে ?
ওগো নীতিবিদ,　　　　তোমার মতন
বিষ ব্যথা ভার কে বলো ব'বে ?

সঙ্গীতে রসে গন্ধ বরণে
ফুলপল্লবে মলয় পবনে
মধু মদিরায় চক্র রচিয়া
মধুমাস বৃথা আশায় র'বে
তোমার মতন　　　　পেচক বদনে
আঁধার করিব মধূৎসবে ?

শ্রীকালিদাস রায়।

ভারত-যুদ্ধ কোন তিথিতে হইয়াছিল।

ভারতের রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ যুধিষ্ঠিরের স্থিতিকাল সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে; বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিকগণ এসম্বন্ধে নিজ নিজ স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহা লইয়া বিস্তর বাদানুবাদ হওয়া সত্ত্বেও কেহই স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত যুধিষ্ঠিরের স্থিতিকালের কোন সম্বন্ধ নাই; ভারতযুদ্ধের তিথিনির্ণয় অর্থাৎ কোন্ তিথিতে ভারতযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা স্থির করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে দুই বার যুদ্ধ হয়; একবার বিরাট নগরে; অন্য বার কুরুক্ষেত্রে। যেদিন বিরাট-নগরে কুরুসেনাপতি সুশর্ম্মার সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, সেই দিনই পাণ্ডবগণের ত্রয়োদশ বর্ষের অন্তিম দিন ছিল। * আর যেদিন দুর্য্যোধনের সহিত সমগ্র কৌরবসেনা বিরাট নগরে অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হন, সেই দিন পাণ্ডবগণের বনবাস ও অজ্ঞাতবাস শেষের পর প্রথম দিন; অর্থাৎ যেদিন ভীমের নিকট সুশর্ম্মা পরাস্ত হন, তাহার পরদিন সমগ্র কৌরব সেনানীর সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে পাণ্ডবগণ এক দিনেই বিজয় লাভ করেন।

সুশর্ম্মা কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথিতে † এবং দুর্য্যোধন অষ্টমী তিথিতে ‡ হস্তিনা হইতে বিরাটরাজের সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করেন; খুব সম্ভব পথে ছয় সাত দিন অতীত হইবার পর, ইঁহারা বিরাটনগরে উপস্থিত হন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিরাট নগর হইতে প্রস্থান করিয়া, দ্রুতগামী রথারোহণে তৎপর দিনই হস্তিনায় পৌঁছিয়াছিলেন। দ্রুতগামী রথারোহণে শ্রীকৃষ্ণ যেপথ দুইদিনে অতিক্রম করিয়াছিলেন, অস্ত্রশস্ত্রসহ ধীরগামী সৈন্যগণ সেই পথ বোধহয় ছয় সাত দিনে অতিক্রম করিয়াছিলেন। অতএব অনুমান হয় যে, পাণ্ডব এবং কৌরবগণের এই যুদ্ধ কোন মাসের চতুর্দ্দশী বা অমাবস্যা হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। মহাভারতে মাসের নাম পাওয়া যায় না। বিরাট নগরে পৌঁছিবার পরই কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ অর্জ্জুনকে তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন। কৌরবগণ পরস্পর বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে লাগিলেন যে—এখনও পাণ্ডবগণের বনবাসের সময় সম্পূর্ণ হয় নাই এবং অর্জ্জুন তৎপূর্ব্বেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের পুনরায় বার বৎসর বনবাসে থাকিতে হইবে; ইহা লইয়া কৌরবগণের মধ্যে বিস্তর বাদবিবাদ হয়। অবশেষে দুর্য্যোধন পিতামহ ভীষ্মকে এই কথা জিজ্ঞাসা করেন; মহামতি ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে বলেন,—"রাজন্! সূক্ষ্ম গণনায় পাঁচ বৎসরে দুই মাস অধিক হয়; অতএব এই হিসাবে পাণ্ডবগণের বনবাস শেষ হইয়া, পাঁচ মাস তের দিন অধিক হইয়া গিয়াছে।" § ভীষ্ম পিতামহের নির্দ্দেশানুসারে পূর্ব্বোক্ত তের বৎসর সংক্রান্তি ও মল মাস অনুযায়ী ছিল, তাই তের বৎসর অতীত হইয়া, পাঁচ মাস তের দিন অধিক হইয়াছিল।

---

* মহাভারত বিরাট পর্ব্ব, ১৬ অধ্যায় ৩১ শ্লোক।

† মহাভারত বিরাট পর্ব্ব, ৩১ অধ্যায় ২৮ শ্লোক।

‡ মহাভারত বিরাট পর্ব্ব, ৩০ অধ্যায় ২৯ শ্লোক।

§ মহাভারত বিরাট পর্ব্ব, ৫২ অধ্যায় ১ ৪ শ্লোক।

এই ত গেল বিরাটনগর ঘটিত যুদ্ধের বিবরণ। এখন দেখিতে হইবে যে, ভারত-যুদ্ধ কোন্ মাসে, কোন্ পক্ষে, এবং কোন্ তিথিতে আরম্ভ হইয়াছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দূত হইয়া বিরাট নগর হইতে কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের দিন হস্তিনাপুরে প্রস্থান করেন।* হস্তিনা হইতে ফিরিবার পথে কৃষ্ণ, বীরবর কর্ণকে বলিয়াছিলেন, "কর্ণ! আজ হইতে সাত দিন পরে অমাবস্যা, ইন্দ্র ঐ তিথির দেবতা; অতএব উক্ত দিনেই যুদ্ধ আরম্ভ করিও।" † ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথানুযায়ী জানিতে পারা যায় যে, কার্ত্তিক মাসের মহাঅমাবস্যার (কালী পূজার) দিন হইতে ভারতযুদ্ধ আরম্ভ হয়; কিন্তু ইহা ঠিক্ নহে। যুদ্ধ শেষ হইবার পঞ্চাশ দিন পরে মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্বিতীয়বার পিতামহ ভীষ্মকে দেখিতে যান; ওই দিন ভারতের আদর্শ বীরপুরুষ পিতামহ ভীষ্ম প্রাণত্যাগ করেন। ভারতযুদ্ধ কেবলমাত্র আঠার দিন পর্য্যন্ত হইয়াছিল; এই যুদ্ধের আঠার দিন এবং পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাশ দিন, সর্ব্বসমেত ৬৮ দিন হইল। অতএব মহাত্মা ভীষ্ম যুদ্ধারম্ভের দিন হইতে ৬৮ দিনে পরলোকে প্রস্থান করেন। ভীষ্মাষ্টমী মাঘ মাসের অষ্টমীর দিন হয় এবং ভীষ্মের তর্পণও ঐ তিথিতেই করা হয়। মার্গশীর্ষের প্রথম দিন হইতে গণনা করিলে, মাঘ মাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী পর্য্যন্ত ৬৮ দিন হয়। অতএব জানা গেল যে মার্গশীর্ষের প্রথম দিন হইতে (যদি তিথি কম বেশী না হয়) ভারতযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল এবং পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় তৃতীয়ার দিন শেষ হইয়াছিল। ইহার আর একটি প্রমাণ আছে;—যখন মহারাজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধান্তে পঞ্চাশ দিনের পর দ্বিতীয়বার ভীষ্ম পিতামহের নিকট গেলেন, তখন পিতামহ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "যুধিষ্ঠির! বর্ত্তমান সময় মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষ, ইহার তিন ভাগ কাটিয়া গিয়াছে ‡ ইহা এই পক্ষের অন্তিম ভাগ। আজ ৫৮ রাত্রি হইল আমি এই শরের অগ্রভাগে শয়ন করিয়া আছি; এই সামান্য দিন কয়টি যেন শত বৎসরেরও অধিক বলিয়া মনে হইতেছে § পিতামহ ভীষ্মের এই উক্তি হইতে জানিতে পারা যায় যে যেদিন মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন এবং যেদিন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন সেই দিন মাঘের শুক্লাষ্টমী ছিল। দশ দিন ভীষণ সংগ্রাম করিয়া মহাত্মা ভীষ্ম শরশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব ৫৮ দিন ও যুদ্ধের ১০ দিন, সর্ব্বসমেত ৬৮ দিন হইল। গণনা করিলে মার্গশীর্ষ শুক্লপক্ষীয় প্রথম দিন হইতে মাঘের শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত ৬৮ দিন হয়। এই প্রমাণ হইতেও পূর্ব্বোক্ত মতই সিদ্ধ হয়; অর্থাৎ ভারতযুদ্ধ মার্গশীর্ষ শুক্লা প্রতিপদের দিন হইতেই আরম্ভ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথানুসারে কার্ত্তিক অমাবস্যা হইতে এই যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, ইহার কারণ বোধহয় এই যে, এত বড় যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন আট দিনের মধ্যে হইয়া উঠে নাই। সুতরাং ভারতযুদ্ধ যে মার্গশীর্ষ শুক্লা প্রতিপদের দিন হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ।

ভারতযুদ্ধের প্রধান ও প্রসিদ্ধ বীরগণের মৃত্যুতিথি লিপিবদ্ধ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। মার্গশীর্ষ শুক্লা দশমীর দিন পিতামহ ভীষ্ম শরশয্যা গ্রহণ করেন। মার্গশীর্ষ শুক্লা একাদশীর দিন রাজা ভগদত্ত, ত্রয়োদশীর দিন বীর বালক অভিমন্যু, (এই দিন অর্জ্জুন জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা করেন) এবং চতুর্দ্দশীর দিন ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ ও

* মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব, ৮২ অধ্যায়, ৬—১৩ শ্লোক।

† মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব, ১৪১ অধ্যায়, ১৮ শ্লোক।

‡ মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব, ১৬৭ অধ্যায়।

§ মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব, ১৬৭ অধ্যায় ২৮ শ্লোক।

ঘটোৎকচ হত হন। মার্গশীর্ষ পূর্ণিমার দিন মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য স্বর্গারোহণ করেন। পৌষ কৃষ্ণা তৃতীয়ার দিন শল্য, শাল্য, শকুনী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, রাজ্ঞী দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং দুর্য্যোধন মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মহাভারতের যুদ্ধ কোন্ তিথি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা দেখান হইয়াছে;—বারান্তরে যুধিষ্ঠিরের স্থিতিকাল নির্ণয় করিব।

শ্রীবিমলকান্তি-মুখোপাধ্যায়।

কমলবিলাসীর গান।

——:*:——

কমলে কমলে ভ্রমি গো পিয়াসী
কমলবিলাসী নাম,
কমল ভ্রমণ কমল শয়ন,
কমল স্বধাম।
দিবসরজনী ক'রে ফিরি মোরা
কমলের মধু পান,
আলস-জড়িত মৃদুল কণ্ঠে
গাহি গুঞ্জন গান।
ফাগুনী রাতের মাতাল বাতাস
মদিরার নেশা হানে,
মধু-রজনীর মৃদু জ্যোৎসনা
স্বপন জাগায় প্রাণে!
বাতাসে বাতাসে ভাসে ওগো কার
মঞ্জীর-কলরব,
লাল নীল পীত সবুজ পরীরা
করে ফিরে উৎসব!
কেহ হাসে, কেহ দেয় করতালি,
কেহ নাচে গায় কেহ;
জোছনায় ঢাকা অঙ্গ কাহারো
জরদায় ঢাকা দেহ!

কোন সুন্দরী চটুলনয়না
কেহ বা সুরভিকেশা
রজনীগন্ধা গেলাসে ভরিয়া
খেতেছে রঙীন নেশা !
কোন মায়াবিনী উড়িয়া বেড়ায়
সুখ-বিহ্বল মনে ;—
পাখা ভেঙে হায় দু'একটি ওগো
পড়ে না কমল বনে ?—

*	*	*

যৌবন-বনবিহারী আমরা
আমরা সুখের রাজা,
ভাবনাবিহীন মুক্তপরাণ
নূতন সবুজ তাজা !
যৌবনরসে উতল আকুল
সেবিয়া কমল-মধু
ভুবনে ভুবনে ফিরি গো আমরা
খুঁজিয়া জীবনবঁধু !
কোথা পরাণের উর্ব্বশী ওগো
কোথা অপ্সরী প্রিয়া !
বনমাঝে কিবা মনোমাঝে সখি
লুকাইলে ফাঁকি দিয়া ?
মায়ার দেশের রাজকন্যার
কোন্ দূরে হায় বাস !
তাহারি স্বপনে জীবন ভরিয়া
কাটাই বরষ মাস !
কোন্ মানসীর মধুর ধেয়ানে
কোথা ভেসে যাই ব'য়ে,
উড়ে মিশে যাই বাতাসর সাথে
অণু পরমাণু হ'য়ে,

আলসে বিলাসে লালসে আমরা
রঙীন জীবন যাপি,
মানসী বধূর সরস পরশে
দরশে হরষে কাঁপি !
মোদের মর্ম্ম বুঝিবে না ওগো
মোদের এমন গান
নাহি কর যদি কখনো পিয়াসী
কমলের মধু পান।

শ্রীকমলবিলাসী —

সাহিত্যের-বিচার।

সাহিত্য, রাজনীতি ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকল ক্ষেত্রেই মতের অমিল দেখা যায় এবং এই সূত্র ধরিয়াই দ্বন্দ্ব বিরোধ ঘনাইয়া উঠে। সম্প্রতি কিছুদিন হইল সাহিত্যের জগতে এমনই একটা বিসম্বাদ চলিতেছে। অবশ্য এজগৎ বাঙলা দেশের এবং সাহিত্য—বাঙলা সাহিত্য। পূজনীয় কবি রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে" নামক উপন্যাসখানা এ বিরোধের বস্তু সরবরাহ করিতেছে—ঘরে বাইরে আজ যেন একটা আস্ত Bone of contention.

মাসিক কাগজের মামুলি খোরাক অপর্য্যাপ্ত রূপে যোগাইয়া গোলমালটা এতদিন বাহিরেই গুলজার করিতেছিল কিন্তু আজ দেখিতেছি অসহনীয় কোলাহল এর ভিতর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ঘরেও একটু আঘাত দিয়াছে ব্যাপারটা সুতরাং ভয়াবহ। ধৃষ্টতা ও অক্ষম প্রয়াস হইলেও আমরা সেই কথাই আরো গুটিকয়েক বলিব।

তর্কটা চলিয়াছেই একটা ভুয়া উপলক্ষের উপর। সন্দীপ সীতার কথা যাহা বলিয়াছে তাহা সন্দীপের নিজের থিওরি। একটা মন্দ লোকের ব্যক্তিগত মত—তাও আবার গল্পের প্রপল্লব। পল্লবের উপর মূলের সমালোচনা চালাইয়া উহার বাস্তব সত্ত্বাকে নাকচ করিয়া দিবার,—সমাজ ও সংসারের সম্মুখে সেটাকে ঘৃণিত আদর্শ বলিয়া প্রমাণ করিতে যাইবার চেষ্টা ও ইচ্ছার মধ্যে আর যাহাই থাকুক—সাহিত্যের শুভাকাঙ্ক্ষীর সত্য—প্রতিষ্ঠার আন্তরিকতা যে নাই একথা নিশ্চয়! এ কেবলি যে কারণেই হউক একটা গৌরবকে হীন করিবার জন্য আপন আপন মতের অনুকূল কতকগুলা ফাঁকা যুক্তি খাড়া করা—নীতি, ধর্ম্ম, দেশের সংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতির অনর্থক দোহাই দেওয়া—নিতান্তই অসঙ্গত ও অশোভন। কিন্তু বাঙলার জল-হাওয়ায় নাকি সবই সয়। বাঙলা সাহিত্যের জগতে সমালোচকদের নিরঙ্কুশ গতি নিয়মিত করিবার তো কেউ বা কিছু নাই সুতরাং উচ্ছৃঙ্খল; ইহা চলিবেই পথে-বিপথে নিত্য ও নিয়ত।

আখ্যায়িকার রস ও বস্তু লইয়া যে একেবারেই আলোচনা হয় নাই এমন কথাও অবশ্য হলফ করিয়া বলা চলে না। মুর্শিদাবাদ জেলার উষর সৈকতে গ্রহের ফেরে (দেশের ও ভাষার) এ রস শুকাইয়া গিয়াছে। সেখানকার

রসিক বিচার করিয়া বস্তুকেও নিতান্ত তিক্ত বোধে ত্যাগ করিয়াছেন ; শুধু তাই নয়, ইহাকে সমাহিত করিবার অস্পষ্ট ইঙ্গিতও দিয়াছেন। "সমালোচকের" যে 'মাপকাটি" দিয়া তিনি এ রসের গভীরতা পরিমাণ করিয়াছেন, তার গোড়ার দিকে "ক্যাদম"খানেক নিশ্চয়ই সনাতন আদর্শের মাথার দিব্য দেওয়া মৌরসী রস মাপের "বাম মেলে না" যন্ত্রের 'পুটিং" আঁটিয়া অতি কষ্টে তৈয়ারী করা হইয়াছিল। তাহারই নজীর লইয়া তিনি বলিলেন,—চিরন্তনের যাহা কিছু আমাদের পুরাতন, নিতান্ত করিয়া প্রাচ্য বাঙলার প্রাণের জিনিষ সন্ন্যাসী ও ত্যাগীর ভূমির ভূমা জ্ঞানে গম্ভীর তাহাকে উপেক্ষা করিয়া একটা হেয়, হীন আদর্শ দাঁড় করানো হইয়াছে। সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জয়ধ্বজা তুলিয়া, সার্ব্বজনীন নৈতিক জীবনের শুভ্র অঙ্গে বিদেশী ধরণের সাড়ী চড়াইয়া রসটকে যে শুধু কলঙ্কিত করা হইয়াছে তাহা নয়, উহাকে বিকৃত করিয়া ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইখানেই বালাই গেল না। আরো অনেক রকমের নীতি ও রুচির নিক্তিতে ইহার ওজন হইল এবং প্রসঙ্গতঃ ছন্দোবিহীন পরে ছন্দোবদ্ধ বাক্যে ক্ষোভে বিক্ষোভে সে মাপের ফল কালো কলঙ্কের ট্রেড্‌মার্কা লইয়া ফুটিয়া উঠিল।

এই রকমে তর্কটা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়াই চলিয়াছিল, মীমাংসা কিছুই হইতেছিল না—আস্তিক ও নাস্তিক দুই বিরুদ্ধবাদীর ভগবান সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী মতের মত "ঘরে বাইরের" নীতি ও কলাবাদও উভয়দিক হইতে বিভিন্নভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে প্রাণপণ করিতেছিল। অবশেষে এক লিপি চাতুর্যে বিস্মিত কবি লেখনী ধরিয়া দ্বন্দ্ব নিবারণের জন্য নিজেই স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিলেন :—"আমাদের মতে সন্দীপ সীতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহা সন্দীপেরই যোগ্য অতএব সে কথা অন্যায়-কথা বলিয়াই তাহা সঙ্গত হইয়াছে এবং এই সঙ্গতি সাহিত্যে নিন্দার বিষয় নহে।"

পরম প্রণম্য কবি এখানে স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছেন যে—মন্দকে মন্দ এবং ভালকে ভাল করিয়া আঁকাই "আর্টের" "আর্ট"। "ঘরে বাইরে" পুস্তকেও সন্দীপের চরিত্র এই "আর্টে" ফুটাইবার জন্যই যতটুকু প্রয়োজন—তাহার মুখ দিয়া সীতা সম্বন্ধে তার বেশী কিছু বলান নাই। সেখানে সীতাকে হেয় করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়—সন্দীপকে সন্দীপ করিয়া গড়াই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। সমালোচকেরা বস্তুর মূলতত্ত্বটা বাদ দিয়া এক সীতা সম্বন্ধে উক্তিটাকেই দেখিলেন বড় করিয়া, ইহাকেই ধরিলেন শক্তরকম। তাঁহারা বলিলেন :—এই আর্ট নিন্দনীয় ; দেশপূজ্যা পরম পতিব্রতা নারীর নামে অযথা কথা যেমন তেমন করিয়া লেখা অতিশয় অন্যায়। উদাহরণ তুলিবার কি আর চরিত্র তাঁর মিলিল না ? অবশ্য সীতার উল্লেখ না করিলে ত ভালই হইত—শিল্পীকে এমন জবাবদিহীর জবাবন্দী করিতে হইত না। কিন্তু কথাটা বলিয়াই বা এমন কি অন্যায় তিনি করিয়াছেন ? কবি তো সীতাকে কলঙ্কিনী বলিতেছেন না—বা তেমন পাপ কথা তাঁর মনেও হইতেছে না—হইতে পারেও না কারণ সীতা যেমন আমার দেবী, আপনার দেবী তেমনি তাঁরও পরমা দেবী—সতীত্বের পরিপূর্ণ আদর্শ। তিনি, মহত্ত্ব ও সত্যকেও মন্দের হাতে পড়িয়া কতটা হীনভাবে হেঁট ও মিথ্যা হইয়া যাইতে হয় তাহারই প্রমাণ স্বরূপ ইহার সৃষ্টি করিলেন। মহর্ষিও তো এ দুর্নাম এড়াইয়া যাইতে পারেন নাই তাই তাঁর শূর্পণখা প্রভৃতি। তারপর অমন কোশল সাম্রাজ্যের জানপদগণ মনীষী ভরতের সুশাসনে শাসিত সাম্রাজ্যের সুসভ্য আর্য্য প্রজাবৃন্দ তাঁরাও সীতা চরিত্রের শ্লেষ সমালোচনা করিলেন—আর রামচন্দ্র নিতান্ত অবিচারকের ন্যায় অপরাধীকে জানিতেও না দিয়া তাঁর নির্ব্বাসন দণ্ডের বিধান দিলেন। পরে মহর্ষির ন্যায় ব্যক্তিও যখন সীতা চরিত্র নিষ্কলুষ বলিতেছেন—তখনো প্রজারা সকলে এ কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে না—সেই জন্যই সীতার পুনরায় অগ্নি-পরীক্ষার

প্রস্তাব! ইহার পরে কি বিস্ময় সূচক চিহ্ন বসাইবার কারণ নাই? এটা এমন বিস্ময়—এমন একটা মহাবিপ্লব যে ধরণী দ্বিধা হইলেন।

সমালোচকেরা ইহার সমর্থনের জন্য বলিবেন যে রামচন্দ্রের চরিত্রে প্রজারঞ্জন প্রবৃত্তি স্পষ্ট ফুটাইবার জন্য মহর্ষির এ বর্ণরাগ। স্বচ্ছ, স্বচ্ছন্দ এ রস প্রবাহের নীচে মণিমুক্তা, পদ্মরাগ প্রভৃতি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। তা সে যাই যেমন ঝক্‌ঝক্ করুক এটা ঠিক কথাই যে কাব্যের অবয়ব গড়িবার প্রয়োজনেই রামচন্দ্রের চরিত্রের একটা দিক অসম্ভব রকম ফুটাইয়া তুলিবার জন্য মহর্ষি এই সকলের সংঘটন করিয়াছেন।" "ঘরে বাইরের" ঔপন্যাসিকের সম্বন্ধে ত ঐ কথাই আমাদের বক্তব্য; সন্দীপ—প্রবৃত্তির মোহে আত্মহারা, একটী লোক—আপনার "লব্ধসামর্থং" লাভ করিবার অভিপ্রায়ে মানুষ হিসাবে তার বিবেকের বাণীটাকে ইচ্ছা করিয়া চাপিয়া ফেলিতে গিয়া নিজের যা ইচ্ছা তাই যুক্তি দাঁড় করাইয়া নিজেকেই পূর্ব্বপক্ষে পরাজিত করিতে চাহিতেছে। শিল্পীর এ কথা লেখাও নায়ক চরিত্রের একটা দিক ফুটাইয়া তুলিবার জন্য—সেটা অবশ্য মন্দ দিক। নীতি হিসাবে ইহার স্থান যেখানেই হউক সাহিত্য হিসাবে ইহার প্রতিষ্ঠান অনেক উর্দ্ধে।

এ সকল লইয়া কথা কাটাকাটি বৃথা। আমরা পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের মত প্রকাশের বিপক্ষেই দুই চার কথা বলিবার জন্য অতিশয় বিনীতভাবে ছোটর চেয়েও ছোট হইয়া ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইতেছি।

এই তর্ক দ্বন্দ্বের সম্বন্ধে তাঁর কোনো কথা না বলাই যেন ভাল ছিল। ইতিপূর্ব্বে এক সময়ে যখন সাহিত্যের বাজারে মহা দুর্নাম উঠিয়াছিল যে রবিবাবুর রমণী দেখিলেই—"মরমে গুমরি উঠিছে কামনা কত"——সে দিনও কবি সম্পূর্ণ মৌনীই ছিলেন, আন্দোলনের বিরুদ্ধে আপনার গৌরব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য একটীও কথা বলেন নাই॥ তিনি ত আপনার লেখা হইতে অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখান নাই:—

"বুক ভরা মধু পল্লীর বধূ জল ল'য়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ কার আনচান চোখে এসে জল ভরে।"

বরং এপিকটেটাসের মত চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদককে লিখিয়া জানাইলেন যে:—নিন্দার মধ্যে যদি সত্য থাকে লেখকের উপকার হইবে, আর যদি তাহা মিথ্যা হয় তবে তো তাহা লইয়া আলোচনা করাই নিষ্প্রয়োজন—কারণ সে কথা লেখককে বলা হইতেছে না। (লেখার ভাবটা এই রকম ছিল ঠিক শব্দগুলি আমার মনে নাই।)

এ নীরবতা তাঁহার মহা-গৌরবেরই স্বর্ণ-মন্দির গড়িয়া দিয়াছিল, নিন্দুকেরাও বিস্মিতভাবে বলিয়াছিলেন তাইত, আমরাও বলিয়াছিলাম তাইত, এ স্বচ্ছ নির্ম্মল স্ফটিক, গঞ্জনা লাঞ্ছনার ঝঞ্ঝাশিলা ইঁহার বক্ষে ক্ষতের সৃষ্টি করিতে পারে না।

রাজর্ষির পক্ষে ইহাই শোভন। সমালোচকের নিন্দা "বানজাক"কে আনন্দই দিয়াছিল। সক্রেটীস্ অ্যারিষ্টফিনিসের নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়া আপনার নিন্দা প্রাণ ভরিয়া শুনিয়া আসিতেন। সংস্কার প্রয়াসী এডিসন অনেক প্রতিবাদেরই প্রতিবাদ লিখিয়া সেগুলি ভস্মসাৎ করিয়াছেন, একটীও প্রকাশ করেন নাই। এ সবগুলি কথাই জানেন বলিয়া নিজেও এতদিন নীরবে সকল আঘাত সহ্য করিয়াছেন। প্রতিহত হইয়া আঘাতগুলাই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এবারও এমনই ভাবে নীরব থাকাই যেন সঙ্গত ছিল। কারণ সত্য নিত্যবস্তু।

তাহা এক সময় না এক সময় প্রকাশিত ও গৃহীত হইবেই। সত্যই "এ কাল ছাড়া কাল আছে" এ মানুষ ছাড়াও মানুষ আছে। তাহারই অপেক্ষায় থানিয়া থাকিলে সে কালও মানুষ বুঝি আরও শীঘ্র আত্মপ্রকাশ করিত। কবি বলিতেছেন:—ইহা "সাহিত্য সীমানার বাহিরের জিনিষ"—হাঁ, অতিশয় বাহিরের জিনিষ, একেবারে "পুর পারথার" ওপারে যে সীমান্ত রেখা অতিক্রম করিয়া ইহা রহিয়াছে। যে লেখার উত্তরে বিশ্বের কবির লেখা বাহির হইয়াছে তাহা যে লেখা বলিয়াই গণ্য হইবার যোগ্য নয়। একখানি তৃতীয় শ্রেণীরও নীচের মাসিক কাগজে লেখাটা ছাপা হইয়াছিল "ট্র্যাস" লেখকদের জন্ত কণ্ডুয়ন-সঞ্জাত রাশীকৃত "রাবিসে" ভরপুর বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গে তার বিশেষ কোনো সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় কোনো সাহিত্যিকই স্বীকার করিবেন না। খড়্কে ফড়িংএর উপদ্রবে অস্থির হইয়া ফড়িং মারিবার জন্য অগ্রসর হইয়া লাভ কি! ফলে দাঁড়াইবে এই লেখার উপরে হয় ত আরও অনেক লেখা বাহির হইবে—তার সকলগুলির উত্তর দেওয়া তো অসম্ভব। বিশ্বের মানব যেদিন প্রশ্ন করিয়া বসিবে যে এ সৃষ্টিই একটা অনাসৃষ্টি। কেবল ব্যভিচার, অনিয়ম—ব্রহ্মাকে যদি তার কৈফিয়ৎ আর জবাবদিহী লইয়া যেদিন দাঁড়াইতে হয়—তবে ত মুস্কিলেরই কথা।

আমরা তাই বলি "ঘরে বাইরে" লইয়া যাহা বলা ও লেখা আবশ্যক ও তার অনেক বেশী বলা ও লেখা হইয়া গেল। আর ইহা লইয়া আন্দোলন না করাই ভাল। বিশ্বকবির মতও ব্যক্ত হইয়াছে এইখানেই ইহার সমাপ্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি ইহার পরেও ছাপার হরফে গ্লানি বাহির হয় হউক তাহাকে উপেক্ষা করিয়াই চলিতে হইবে।

"ঘরে বাইরের" যাহা গ্রহণযোগ্য যে রূপ ও স্বরূপ যে সে ব্যক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে কালে তাহা গৃহীত হইবেই তা যিনিই যত বিরুদ্ধবাদ প্রচার করুন। বাঙলা-সাহিত্য আর গণ্ডীর বাঁধনে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে চায় না বিস্তৃত প্রসারের মধ্যে অবাধ মুক্তি পাইয়া ছড়াইয়া, ফলিয়া, গৃহ বাহির সকল স্থান হইতে বিত্তত্ব লাভ করিয়া রসে বস্তুতে পরিপুষ্ট যে সে হইবেই একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শের বাঁধি-মাত্রায় সে আর অসন্তুষ্ট থাকিতে পারে না।

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

স্বাস্থ্যের কথা।

—:*:—

(বঙ্গের স্বাস্থ্য কমিশনারের বিজ্ঞাপন অবলম্বনে)

বঙ্গের শিশুমৃত্যু।

১৯১৮ সালে বঙ্গদেশে এক বৎসরের নিম্ন বয়স্ক ৩,৩০,০০০এর অধিক শিশু প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অর্থাৎ বঙ্গদেশে গড়পড়তা প্রত্যহ ১০০০ শিশু মরে! এই ১০০০ শিশুর মধ্যে ৭৫০ জনের নিবার্য্য ব্যাধিতে মৃত্যু হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশের মধ্যে বীরভূম ও বর্দ্ধমান এই দুই জিলায় এক বৎসর বয়স্ক হাজার শিশুর মধ্যে তিন শতের উপর মরিয়া থাকে। নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে হাজার করা ২৭৫ হইতে ৩০০, বাঁকুড়া ও জলপাইগুড়ি জিলায় ২৫০ হইতে

২৭৫, মেদিনীপুর, খুলনা, বাখরগঞ্জ, দিনাজপুর, রাজসাহী, পাবনা, রংপুর ও দার্জ্জিলিং জিলায় ২২৫ হইতে ২৫০, মালদহ, ময়মনসিং, ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালি জিলায় ২০০ হইতে ২২৫, যশোহর, ২৪পরগণা, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, বগুড়া এই কয় জিলায় হাজারের মধ্যে প্রায় কিছু কম ২০০ জন শিশু মরিয়েছে।

এত শিশু এই দেশে নিবার্য্য ব্যাধিতে অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। ইহাদিগকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য কি প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত নয়?

আপনারা কি ইহা জ্ঞাত নহেন যে আমাদের মূর্খতার জন্য বঙ্গদেশে শত শত শিশু জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে?

হায়, বঙ্গজননী প্রত্যেক বৎসর নিবার্য্য ব্যাধিতে ১০ লক্ষের অধিক সন্তান হারাইতেছেন।

আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে ঐ ১০ লক্ষ মধ্যে ৫ লক্ষের বয়স ১০এর নীচে।

মনে রাখিবেন যে প্রত্যেক দিন এই দুর্ভাগা দেশের ৬ শতের অধিক শিশু নিবার্য্য ব্যাধিতে মরিতেছে!

আপনারা ইহা স্মরণ রাখিবেন যে যদি কলিকাতার শিশু-মৃত্যুর হার নিউজিলণ্ডের তুল্য হইত তাহা হইলে ১৯১৯ সালে কলিকাতা সহরে ৫৯২৮ জনের স্থলে ৮২০ জন মাত্র শিশু মরিত।

এই শিশুর মৃত্যুর মূলীভূত কারণ নিবারণ জন্য সকলের চেষ্টিত হওয়া উচিত।

বঙ্গদেশের শিশুমৃত্যু সংখ্যা অতিভীষণ অথচ তাহার প্রতীকারকল্পে লোকসাধারণের মধ্যে যেমন সাড়া পড়া উচিত ছিল তাহা হইতেছে না ইহা লক্ষ্য করিয়া স্বাস্থ্য কমিশনার ডাক্তার বেণ্টলি দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন:—শিশুমৃত্যু প্রসঙ্গ পাশ্চাত্য দেশে যেরূপভাবে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, ভারতবর্ষে তেমন করে নাই। ১৯১২ সালের হিসাব মতে বঙ্গের নানা জিলায় শতকরা ১৯১৬ হইতে ১১০৭ পর্য্যন্ত শিশু মারা যাইতেছে। যশোহরে শিশুমৃত্যু অপেক্ষাকৃত অল্প কিন্তু খুলনা ও বরিশালে ঐ মৃত্যু ভয়াবহ।

বিশেষ বিশেষ থানায় শিশুমৃত্যু কি ভীষণ নিম্নের তিনটি সংখ্যা উহা প্রকাশ করিবে!—

ঢাকার কেরাণীগঞ্জে	শতকরা	৬.'০
রাজসাহীর নাটোরে	,,	৬৪'৪
বর্দ্ধমানের গলসীতে	,,	৬৯'০

শিশু প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। যে স্থলে একশত শিশুর মধ্যে ৬০।৭০ জন শিশু মরে সেই স্থলে হতভাগা শিশুরা মরিবার জন্য যেন জন্মিয়া থাকে। শিশুদের শতকরা ২৭ হইতে ৩১ জন প্রসূত হইবার পরে ২৪ ঘণ্টা মধ্যেই ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া থাকে।

এইত শিশু মৃত্যুর ভীষণ সংখ্যা। ইহার প্রতীকার করিতে হইলে সর্ব্বত্র (১) শিশু মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করা দরকার (২) ইহার প্রতীকার জন্য লোক সাধারণের মনে আন্তরিক আগ্রহ জাগাইয়া তুলিতে হইবে। (৩) ইংলণ্ডে শিশুমঙ্গলের নিমিত্ত যেরূপ ব্যবস্থা আছে ভারতবর্ষে সকল স্থলে অবিলম্বে মিউনিসিপাল এলাকায় সেইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও কার্য্য আরম্ভ হওয়া উচিত।

বিদ্যালয় সমূহে ও ইহার প্রতীকারকল্পে স্বাস্থ্য নীতি শিক্ষাদান করা উচিত।

বালকদিগের স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে সুফল ফলিতে পারে! নোংরামি যাহাদের অস্থিমজ্জাগত চিরন্তন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে স্বাস্থ্যনীতি শুনাইলে উহা অরণ্যে রোদনবৎ ব্যর্থ হ

অসতর্ক অজ্ঞ মাতাপিতা ও সঙ্গীদের দৃষ্টান্ত হইতে শিশুরা যে সকল নোংরা অভ্যাস শিখিয়া থাকে বিদ্যালয়ে বিশেষ সতর্কভাবে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষাদান করিলে সেইগুলি কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইতে পারে।

বালকদিগকে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষাদানের জন্য কয় রকমের আয়োজন করা যায়:—

১। পুস্তক পড়ান।

২। তাহাদের সহিত আলোচনা ও তাহাদের নিকট বক্তৃতা করা।

৩। স্বাস্থ্যতত্ত্বমূলক নানাচিত্র, ছায়াবাজী, অভিনয় প্রদর্শন।

বালকগণ যে ঘরে শিক্ষকদের নিকট অধ্যয়ন করে সেই ঘরে প্রত্যেক বালকের শরীরের দৈর্ঘ্য ও ওজনের তালিকা টাঙ্গাইয়া রাখিলে বালকগণ স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে পারে।

বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীতে একজন স্বাস্থ্য-স্বেচ্ছাসেবক অল্প দিনের জন্য নির্ব্বাচিত হওয়া শ্রেয়। ধরুন, এক সপ্তাহের জন্য কোন বালক ক্লাসের স্বাস্থ্য-ভলাণ্টিয়ার নিযুক্ত হইবে। ঐ বালক ক্লাসের পরিচ্ছন্নতা, বালকগণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দাখিল করিবে উহা ক্লাসে টাঙ্গাইয়া রাখা হইবে।

স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবক ছাত্র তাহার রিপোর্টে কি কি বিষয় লিপিবদ্ধ করিবে?

তাহাকে লিখিতে হইবে সপ্তাহের কোন্ বারে বেলা এগারটার সময়ে—

১। ক্লাস ঘরের তাপ কত?

২। ক্লাসের বাহিরের তাপ কত?

৩। বৃষ্টি হইয়াছে কিনা?

৪। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন কিনা?

৫। আকাশের অবস্থা কি রূপ?

কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড জ্বর, হাম, পানিবসন্ত প্রভৃতি ব্যাধির জন্য কোন ছাত্র বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত আছে কি না? সেই ছাত্র বা ছাত্রদের নাম ঠিকানা পরিচয় ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। পর্য্যায়ক্রমে এ কার্য্য করিতে হইলে কর্ত্তব্য হিসাবে তাহারা এ কার্য্যে সাময়িক সাবধান হইবে নিশ্চয় ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হিসাবে একটা প্রতিদ্বন্দ্বীতার ভাব তাহাদের মধ্যে স্বতঃই জাগ্রত হইবে;—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য ইহাদিগকে বৎসর শেষে প্রতিদ্বন্দ্বীতার পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিলে আরও সুফল হইবার কথা।

দুগ্ধ সরবরাহের উন্নতি, শিশুরক্ষণের আর একটি প্রধান উপায়।

গো-দুগ্ধ মানুষের বিশেষতঃ শিশুদের প্রধান খাদ্য। গোয়ালাদিগকে সমবায় সূত্রে আবদ্ধ করিতে না পারিলে অপর কোন উপায়ে দুগ্ধ-সরবরাহের উন্নতি সাধিত হইতে পারিবেনা। দুগ্ধ-সরবরাহের উন্নতি করিতে হইলে গো পালনের ব্যয়, ঘাসের মূল্য প্রভৃতি আলোচনা করা দরকার। মোট কথা গোয়ালাদের মনে অসন্তোষের উদ্রেক না করিয়া এই বিষয়ে ক্রমশঃ উন্নতি বিধান করিতে হইবে।

দুগ্ধের উৎকর্ষতা সাধনের উপায় দুইটি।

(১). আদালতের সাহায্যে আইন প্রণয়ন করা।

(২) গোয়ালাদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষাদান করিয়া তাহাদের সহানুভূতি লাভ করা। তাহাদিগকে ইহা বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, দুগ্ধ খাঁটি হইলে ক্রেতাদের এবং তাহাদের উভয় পক্ষেরই লাভ।

গোয়ালাদের শিক্ষাদান।

গোয়ালারা নিরক্ষর, তাহাদিগকে গোপালন ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য মৌখিক উপদেশ এবং চিত্র প্রদর্শন এই দুই উপায় অবলম্বিত হইতে পারে।

উত্তম দুগ্ধ পাইতে হইলে কি কি করা চাই।

১। গোশালা যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে।

২। দুগ্ধ-দোহন সময়ে গরুকে কিছু খাইতে দিও না।

৩। দোহনের পূর্ব্বে গরুর অঙ্গের ধূলা ও ময়লা ঝাড়িয়া-পুছিয়া ফেলিও।

৪। দোহনের পূর্ব্বে গরুর পালান ভিজা পরিষ্কার কাপড় দিয়া মুছিয়া লইও।

৫। পরিষ্কার কাপড় পরিয়া পরিস্কৃত শুষ্ক হাতে গরুর দুগ্ধ দোহন করিও।

৬। দুগ্ধের বা দুগ্ধ পাত্রের মধ্যে আঙ্গুল ডুবাইও না।

৭। উত্তম সদ্যঃ ধৌত পরিস্কৃত পাত্রে দুগ্ধ দোহন করিও। এই নিমিত্ত ধাতুপাত্র ব্যবহার করা প্রশস্ত।

৮। দোহনের পূর্ব্বে দোহন পাত্র গরম জলে ধুইতে হয়।

৯। দোহন পাত্রের মুখে শাদা পরিস্কৃত বস্ত্র খণ্ড বাঁধিয়া রাখিও।

১০। টানা হেঁচড়া করিয়া দুগ্ধ দোহন করিও না। দোহন করা দুগ্ধ গোয়ালঘরে অনেকক্ষণ রাখিও না।

১১। সুস্থ বলিষ্ঠ গোরুরই দুগ্ধ দোহন করিবে।

১২। দুগ্ধ কিংবা দুগ্ধপাত্রে যেন মাছি বসিতে কিংবা কোন পশু পক্ষীতে মুখ দিতে না পারে।

১৩। গরুর শয়নের জন্য পরিস্কৃত শুষ্ক নূতন খড় দিবে।

১৪। গোয়ালঘর যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিও।

১৫। গোয়ালঘর হইতে প্রত্যহ গোবর সরাইতে হইবে।

১৬। যে ব্যক্তি অল্প দিন হইল অসুস্থ ছিল এমন ব্যক্তিকে দুগ্ধ কিংবা গরু ছুঁইতে দিও না।

দুগ্ধের শুদ্ধতা পরীক্ষা।

আকৃতি, রসায়ন, বীজাণু এবং স্বাস্থ্যনীতি এই চারি প্রকারের মান দ্বারা দুগ্ধের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা হয়। দৈহিক পরীক্ষায় দুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব, তাপ, স্বাদ, বর্ণ প্রভৃতি দেখা হইয়া থাকে। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা দুগ্ধের মাখন, কঠিন দ্রব্যের পরিমাণ প্রভৃতি দেখা হয়। উহার দ্বারা জল মিশান হইয়াছে কি না তাহা বুঝা যাইতে পারে।

দুগ্ধের বিশুদ্ধতা অসংশয়ে বুঝিতে হইলে উহার মধ্যে কতগুলি বীজাণু আছে তাহা পরীক্ষা করা দরকার।

ম্যালেরিয়া।

বঙ্গদেশে প্রত্যেক বৎসর ৪ লক্ষের অধিক লোকে ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রাণত্যাগ করে। কুইনাইনই ম্যালেরিয়া জ্বরের একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র, ম্যালেরিয়া দমনের এমন অব্যর্থ ঔষধ আর নাই, এই সহজ কথা আজিও লোকের মনে মুদ্রিত করিয়া দিতে কেহ সমর্থ হন নাই।

ম্যালেরিয়া জ্বরের মত ভয়ানক ব্যাধি কুইনাইন খাইলেই সারিবে কেহ বিশ্বাস করিতে চায় না। ব্যবস্থা অতি সহজ বলিয়াই বোধ হয় লোকের প্রত্যয় হয় না।

নামন নামক এক সিরিয়াবাসীর কুষ্ঠরোগ হয় তাহাকে বলা হইয়াছিল যে জর্ডন নদীতে ৭ বার স্নান করিলেই তাহার রোগ আরোগ্য হইবে, সে উহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। কুষ্ঠরোগ ঐরূপ অনায়াসে সারিতে পারে সে তাহা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে নাই।

সার রোণাল্ড রস ম্যালেরিয়া রোগ চিকিৎসার অন্যতম বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত, তিনি বলেন, কুইনাইনের আরক,ম্যালেরিয়ার একমাত্র ঔষধ। তিনি বলেন, ৮০ গ্রেণ কুইনাইন, আসিড সলফিউরিক ডিলে দ্রব করিয়া জল সহ ৮ মাত্রা ঔষধ তৈয়ার করিয়া রোগী প্রত্যহ জ্বরবিরামে সেবন করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর আরোগ্য হয়। পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলে প্রায় সর্ব্বত্রই ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হইতেছে। ১৮২০ সালে সিঙ্কোনা বৃক্ষের ত্বক হইতে প্রথমে কুইনাইন তৈয়ার হয়। তদবধি জ্বরের চিকিৎসায় কুইনাইনই সর্ব্বোত্তম ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

নানাপ্রকার কুইনাইনের মধ্যে সল্‌ফেট্‌ অব কুইনাইনের মূল্য অল্প। এই নিমিত্ত কুইনাইন সলফেটই ব্যবহৃত হয়। প্রত্যহ প্রাতে আহারের পূর্ব্বে একমাত্রা ঔষধ সেবা অথবা ৩০ গ্রেন হিসাবে সপ্তাহে দুই মাত্রা ঔষধ ব্যবহার করিলেও একই ফল পাওয়া যাইবে, যাহাদের উদরাময় বা অপর কোন প্রকার পেটের অসুখ আছে তাহাদের সল্‌ফেটের পরিবর্ত্তে ক্লোরাইড কুইনাইন সেবন করা বিধেয়।

ম্যালেরিয়া রোগের ব্যাপ্তি।

বর্দ্ধমান, হুগলি, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ এই চারি জিলায় শতকরা ৫০ এর অধিক; বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, যশোহর এই চারি জিলায় শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ব্যক্তি; মেদিনীপুর, পাবনা, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এই ৪ জিলায় শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ব্যক্তি; খুল্‌না, ২৪শ পরগণা, রাজসাহী, বগুড়া, রংপুর, হাওড়া দার্জিলিং এই কয় জিলায় শতকরা ২০ হইতে ৩০ ব্যক্তি; ঢাকা ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম এই কয় জিলায় শতকরা ১০ হইতে ২০ ব্যক্তি; ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি এই তিন জিলায় শতকরা প্রায় ১০ ব্যক্তি ম্যালেরিয়া রোগে ভুগিতেছে।

টাইফয়েড জ্বর।

টাইফয়েড একপ্রকার ছোঁয়াচে অবিরাম ক্লেশদায়ক জ্বর। টাইফোসাস নামক একপ্রকার বিশেষ বীজাণু হইতে এই রোগ জন্মে।

এই ব্যাধিতে যত লোক আক্রান্ত হয় উহাদের ১২ কি ১৫ জন মধ্যে ১ জনের মৃত্যু হয়।

এই রোগ-বীজাণু দেহে প্রবেশ করিয়া ৭ হইতে ১৪ দিন মধ্যে পূর্ণভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হয়।

টাইফোসাস নামক রোগ-বীজাণু এক ব্যক্তির দেহ হইতে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করিলে তাহার ঐরোগ উৎপন্ন হয়।

সাধারণতঃ টাইফয়েডে রোগীর মলমূত্র ও থুথুর সহিত রোগ-বীজাণু নির্গত হইয়া থাকে। এই সকলের উপরে যে মাছি বসিয়া থাকে সেই মাছি খাদ্যদ্রব্যের উপর পতিত হইলে ঐ খাদ্যদ্রব্য যে ভক্ষণ করিবে সে রোগ-বীজাণু উদরস্থ করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অথবা রোগীর প্রস্রাব যদি কোনরূপে জলাশয়ে পতিত হয় উহার দ্বারা পানীয় জল দূষিত হয় এবং জলসহ রোগ-বীজাণু অপরের উদরস্থ হইয়া তাহাকে রোগাক্রান্ত করিয়া থাকে।

টাইফয়েড জ্বর সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ব্যাধি।

মলমূত্র বা থুথু শুকাইয়া গেলেও টাইফয়েড রোগ বীজাণু বিনষ্ট হয় না। তখন উহা বায়ুর সহিত সূক্ষ্মাকারে ব্যাপ্ত হইতে পারে।

এই রোগের সংক্রামকতা নিবারণের উপায়,—পানীয় জল সিদ্ধ করিয়া পান করা। দ্বিতীয়তঃ খাদ্যদ্রব্যাদি এমনভাবে ঢাকিয়া রাখা উচিত যে উহার উপরে যেন কদাচ মাছি বসিতে না পারে।

যাঁহারা টাইফয়েড রোগীর সেবা করিবেন তাঁহাদের সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন থাকিতে হইবে। তাঁহারা সাবান, গরমজল এবং কার্ব্বলিক লোসন দ্বারা হাত না ধুইয়া বাহিরের কোন জিনিস স্পর্শ করিবেন না।

রোগী রোগ-ভোগ কালে যে সকল জিনিষ ব্যবহার করে, সেই সমস্ত পোড়াইয়া ফেলিতে হয়।

রোগমুক্তির পরে চিকিৎসকের ব্যবস্থা লইয়া রোগীর দেহ সাবান প্রভৃতি দ্বারা ধোয়াইয়া শোধন করিতে হয়।

যে ঘরে টাইফয়েড রোগীর মৃত্যু হয় সেই ঘর ঔষধ মিশ্রিত জল দ্বারা শোধন না করিয়া কাহারও তথায় প্রবেশ করা উচিত নহে।

বক্রকীট ব্যাধি।

বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ। কিন্তু এদেশের প্রায় ৪ কোটি লোক বক্রকীট ব্যাধিতে ভুগিতেছে। প্রত্যেক ৫ ব্যক্তির মধ্যে ৪ জনই এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। অথচ অধিকাংশ লোকই জানে না যে তাহারা ঐ রোগে ভুগিতেছে। তাহারা ইহাকে জড়িত জীর্ণ ব্যাধি বলিয়া ভ্রম করেন।

প্রশ্ন।—বক্রকীট কিরূপ?

উত্তর।—বক্রকীট শাদা ছোট পোকা, লম্বায় এক ইঞ্চিরও ছোট, ইহারা মানুষের উদরে অন্ত্রমধ্যে বাস করে।

প্রশ্ন।—ইহাদিগকে বক্রকীট বলে কেন?

উত্তর।—ইহাদের বড়শীর মত বাঁকা দাঁত আছে, উহার দ্বারা অন্ত্রের প্রাচীর কামড়াইয়া রোগীর রক্ত পান করে।

প্রশ্ন।—ইহারা কি রোগীর কোন অনিষ্ট করে?

উত্তর।—হাঁ, ইহাদের আক্রমণে রোগীর বক্রকীট ব্যাধি জন্মে, ইহারা রোগীর রক্ত শোষণ ও দূষিত করিয়া থাকে। যাহাদের এই রোগ হয় তাহারা উদরাময় রোগে ভুগিয়া থাকে, তাহাদের রক্ত তরল হয়, তাহারা দুর্ব্বল, জড়বুদ্ধি এবং কর্ম্মবিমুখ হইয়া পড়ে। শিশুরা এই রোগে আক্রান্ত হইলে তাহাদের দেহ বাড়ে না, বুদ্ধি জড়তাপ্রাপ্ত হয়, লেখাপড়ায় উন্নতিলাভ করিতে পারে না।

প্রশ্ন।—বঙ্গদেশে কত লোক এই রোগে ভুগিতেছে?

উত্তর।—এই রোগ বাঙ্গলাদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। এই ব্যাধি বহু লোকের দুঃখ, দৈন্য, দৌর্ব্বল্যের হেতু।

অনেক পরিবারে সকলে এই রোগে আক্রান্ত হয়, অনেক বিদ্যালয়ে সকল ছাত্রই এই রোগে ভুগিতেছে।

প্রশ্ন।—কেবল দরিদ্র ও অজ্ঞ ব্যক্তিরা এই রোগে ক্লেশ পায় ?

উত্তর।—না, শিক্ষিত ও ধনীরাও এই ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়। দরিদ্রের ৫জন মধ্যে ৪জনে এবং ভদ্রলোকদের ৫জন মধ্যে ৩জনে এই রোগে ক্লেশ পাইতেছে।

প্রশ্ন।—কিরূপে লোকের দেহে বক্রকীট প্রবেশ করে ?

উত্তর। যে স্থলে মল ত্যাগ করা হয়, সেই জমির উপর দিয়া খোলাপায় হাটিলে এই কীট দেহে প্রবেশ করে। কেহ কেহ কলুষিত খাদ্য ও পানীয়সহ এই কীট উদরস্থ করিয়া থাকে। প্রধানতঃ মলদূষিত ক্ষেত্র হইতেই এই কীট লোকের দেহে প্রবেশ করে। মলত্যাগের পরে জমি হইতে মলচিহ্ন লুপ্ত হইবার পরেও তথায় অসংখ্য বক্রকীট বিচরণ করিয়া থাকে। মল নাই দেখিয়া যাহারা এইরূপ জমির উপর দিয়া হাঁটিয়া থাকে কখন কখন তাহাদের পায় এক প্রকার চুলকানি হইয়া থাকে। এই চুলকানি আর কিছুই নহে, চর্ম্মের ছিদ্র পথে সূক্ষ্মাকারী বক্রকীটের প্রবেশ নিমিত্ত এই চুলকানি জন্মিয়া থাকে।

প্রশ্ন।—সূক্ষ্ম বক্রকীট কোথা হইতে মলের মধ্যে এবং পানীয় জলে গমন করে ?

উত্তর।—পূর্ণকার বক্রকীট মানবদেহে অন্ত্রমধ্যে বাস করে, উহারা তথায় ডিম্ব প্রসব করে কিন্তু অন্ত্রমধ্যে ডিম্ব হইতে কীটশাবক প্রসূত হইতে পারে না; ঐ ডিম্বগুলি মলের সহিত যখন সিক্ত ভূমিতে পতিত হয় তখন সেইগুলি হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীট উৎপন্ন হয়। প্রথম অবস্থায় ঐ কীটশাবকগুলি এমন সূক্ষ্ম থাকে যে সাধারণ দৃষ্টিতে সেইগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। উক্ত দূষিত ভূমিতে কোন ব্যক্তি বিচরণ করিলে কীট তাহার পা, হাত প্রভৃতির চর্ম্ম-ছিদ্র পথে দেহে প্রবেশ করে।

সেই সকল সূক্ষ্ম কীট নানা প্রকার শাকসব্জি ও ফলের উপর বিচরণ করে। ঐ সকল ফল যাহারা কাঁচা ভক্ষণ করে তাহারা উক্ত শাকসব্জি ও ফলের সহিত ঐ কীট গলাধঃকরণ করিয়া থাকে।

ঐ সকল কীট দূষিত ভূমির সমীপবর্ত্তী কূপ বা পুষ্করিণীর জলের সহিত মিশ্রিত হয় এবং ঐ জল যাহারা পান করে তাহাদের উদরে প্রবেশ করে।

প্রশ্ন।—বক্রকীট উদরে প্রবেশ করিয়া নূতন কীটের জন্মদান করে ? না, প্রত্যেকটি কীট বাহির হইতে দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে ? বক্রকীট সংখ্যা কি জমির উপর বাড়িতে থাকে ?

উত্তর।—না, মনুষ্যের উদর হইতে প্রসূত প্রত্যেক ডিম্ব হইতে কীট জন্মলাভ করে। যদি ঐ কীট কোনরূপে মানব দেহে প্রবেশ করিতে না পায় তাহা হইলে কালক্রমে মরিয়া যায়। এই কীট কয়েকমাস পর্য্যন্ত জমির উপর জীবিত থাকে, কিন্তু মানব দেহে প্রবেশ করিয়া এই কীট বহু বৎসর জীবিত থাকে।

প্রশ্ন।—লোকে কি করিয়া বুঝিবে যে তাহার বক্রকীট ব্যাধি জন্মিয়াছে ?

উত্তর।—যাহারা এই রোগ হয় তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ, রক্ত পাতলা, এবং উচ্চে আরোহণ কালে শ্বাস ক্লেশ হয়। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কার্য্য করিতে বা খেলিতে চায় না। লোকে তাহাকে অলস বলিয়া মনে করে। শিশুদের এই রোগ হইলে তাহারা বাড়ে না, তাহারা লেখাপড়া শিখিতে পারে না। পরিণত বয়স্কদের এই রোগ হইলে তাহারা কার্য্যে অসমর্থ হইয়া পরের গলগ্রহ হইয়া উঠে। মাথাধরা, অস্থিরতা, বুকজ্বালা, পেটে বেদনা, বদহজম, হৃদ্‌স্পন্দন প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ।

প্রশ্ন।—বক্র কীট ব্যাধি কিরূপে নির্ণীত হয় ?

উত্তর—মল পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসকগণ উহা স্থির করেন।

প্রশ্ন।—এই রোগ হইলে রোগী কি আরোগ্য লাভ করিতে পারে ?

উত্তর।—হাঁ, উপযুক্ত চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন হইলে তিনি উদর হইতে সকল কীট বাহির করিয়া দিয়া রোগীকে রোগমুক্ত করিয়া দিতে পারেন ?

প্রশ্ন।—বক্রকীট ব্যাধি কি নিবারিত হইতে পারে ?

উত্তর।—হাঁ, মল-দূষিত জমির উপর দিয়া জুতা পরিয়া চলিতে হয়। পায়খানা ব্যতীত যেখানে সেখানে কাহাকেও মল ত্যাগ করিতে দিতে নাই। যদি কেহ উহা করে তাহা হইলে উহার দ্বারা অপরের অনিষ্টের সম্ভাবনা হয়।

কলেরা।

বঙ্গের নগর ও পল্লী সমূহে প্রত্যেক বৎসর ৮০ হাজারের অধিক লোক বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। ১৯১৯ সালে এই রোগে ১২১, ২৬১ লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বিসূচিকা নিবার্য্য ব্যাধি।

মুর্শিদাবাদ, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জিলায় হাজার করা ২·৫ ব্যক্তির অধিক; ২৪ পরগণা, হাওড়া, বর্দ্ধমান, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর এই কয় জিলায় হাজার করা ২ হইতে ২·৫ ব্যক্তি; খুলনা, মেদিনীপুর, বীরভূম, ত্রিপুরা এই কয় জিলায় হাজার করা ১·৫ হইতে ২ ব্যক্তি; বাখরগঞ্জ, যশোহর, নদীয়া, হুগলি, ঢাকা, পাবনা, বগুড়া, মালদহ, রংপুর এই কয় জিলায় হাজার করা ১ হইতে ১·৫ ব্যক্তি; দিনাজপুর ও রাজসাহী জিলায় হাজার করা ·৫ হইতে ১ ব্যক্তি; দার্জ্জিলিং ও বাঁকুড়া জিলায় হাজার করা ·৫ ব্যক্তি কলেরায় প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যাধি পৃথিবীর সর্ব্বদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এই ব্যাধি ভারতবর্ষে যত লোকের প্রাণক্ষয় করিয়াছে ইয়ুরোপের মহাসমরেও তত লোকের প্রাণনাশ হয় নাই।

এই ভীষণ ব্যাধির হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার উপায় কি ? উপায় এই :--

১। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীর সংস্রব হইতে দূরে থাকা।

২। সকল বিষয়ে নিয়মনিষ্ঠ হইয়া শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ রাখিতে হইবে। পুষ্টিকর খাদ্য খাইবে, যাহাতে দেহ অবসন্ন হয় এমন কোন কার্য্য করিও না, ঠাণ্ডা লাগাইও না, মদ্যপান করিও না। এই সকল নিয়ম যাহারা মানিয়া চলিবে তাহারা ব্যাধি দ্বারা কোন কারণে আক্রান্ত হইলেও রোগ মারাত্মক হইতে পারিবে না।

৩। এই রোগে যে ব্যক্তি অতি সাধারণভাবেও আক্রান্ত হইয়াছে সেও অপরের আতঙ্কস্থল তাহাতে সন্দেহ নাই।

৪। ইনফ্লুয়েঞ্জা এখন এমন ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে যে ইহার ছোঁয়াছানা এড়ান একরূপ অসম্ভব হবে।—

(ক) যাহারা পুষ্টিকর খাদ্য আহার করে।

(খ) অবাধ বায়ু প্রবাহিত খোলা ঘরে বাস করে।

(গ) জনতা এড়াইয়া চলে, রুদ্ধ গৃহে বহুক্ষণ থাকে না।

(ঘ) যথোপযুক্ত পোষাক পরিধান করে।

(ঙ) পটাসিয়ম পার ম্যাঙ্গেনেটের আরক দিয়া নাক ও মুখ ধৌত করে।

(চ) কোন রোগীর সেবা করিতে হইলে যাহারা নাক মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া লয়, তাহাদের এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প।

৫। এই রোগের সংশ্রব এড়াইবার জন্য যে সে ঔষধ কিনিয়া অকারণে অর্থের অপব্যয় করিও না।

৬। যে স্থলে রুদ্ধ গৃহে বহু লোকের বৈঠক হয় সেই স্থলে যাইও না। রুদ্ধ গৃহেই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা সহজে সংক্রামিত হইয়া থাকে।

৭। যাহাদের অতি মৃদু ভাবেও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার স্বচনা হইয়াছে তাহাদের ১০ দিনের মধ্যে সভায় সম্মিলনে যাওয়া উচিত নয়।

৮। কার্য্যস্থলে বসিয়া যদি কোন ব্যক্তি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে তাহার তৎক্ষণাৎ—

(ক) বাড়ী যাইয়া শয্যায় শয়ন করা এবং তাহার গরম কাপড়ে সর্ব্ব দেহ আবৃত রাখা সঙ্গত।

(খ) তাহার তখনই চিকিৎসক ডাকিয়া ব্যবস্থা লওয়া কর্ত্তব্য।

(গ) ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগী সম্ভব হইলে একাকী একঘরে বাস করিবে। অন্যথা তাহার শয্যার চারিদিকে পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

(ঘ) এই রোগী যখন কাসিবে বা হাঁচি দিবে তখন রুমালে তাহার মুখ ঢাকিয়া লইবে। সেই রুমাল তখনই আবার গরম জলে সিদ্ধ করিয়া ধুইয়া দিতে হইবে। অন্যথা উহা পোড়াইয়া ফেলিবে।

(ঙ) পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের আরক দিয়া এই রোগীর নাক মুখ ধুইতে হইবে।

(চ) ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগীকে রোগমুক্ত হইয়াও বহুদিন সতর্ক থাকিতে হইবে।

(ছ) রোগমুক্তির পরে এই রোগী অগত্যা সপ্তাহকাল যেন কোন জনপূর্ণ স্থলে গমন করে না।

ছারপোকা।

কলিকাতা এবং মফঃস্বলে অনেকেই এই গরমের দিনে ছারপোকার কামড়ে রাত্রিকালে অনিদ্রায় নিশাযাপন করেন।

ছারপোকা একান্ত নিরীহ প্রাণী নহে। ইহা কেবল রক্ত শোষণ করে না। স্বাস্থ্য কমিশনার মহাশয়ের রচিত যে বিজ্ঞাপন পত্র সংপ্রতি স্বাস্থ্য প্রদর্শনীতে বিতরিত হইতেছে উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, যে ছারপোকা কালাজ্বর, বেরিবেরি এবং অপর বহু রোগের বীজ বহন করে। ছারপোকার দেহে যক্ষ্মা রোগের বীজাণুও পাওয়া গিয়াছে। ছারপোকা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়, তবে কোন কোন স্থলে ইহাদের বাহুল্য লক্ষিত হয়। যে ঘরে ছারপোকার উৎপাত হয় সেই ঘরের মেজের ও প্রাচীরের ফাঁকে, ফাটালে ছোট বড় গর্ত্তে ইহারা বাস করে। বিছানা পরিধেয় বস্ত্র, বসিবার আসন সকল স্থলেই ইহারা বিচরণ করে। যে গর্ত্ত, বা ফাটালে ইহারা বাস করে সেই স্থলে ইহারা ডিম্ব পাড়িয়া থাকে।

ছারপোকা দূর করিতে হইলে বিছানা গরমজলে সিদ্ধ করিতে হইবে। তক্তপোষের ফাঁকে, সন্ধিস্থলে কেরোসিন বা পেট্রোল ঢালিয়া দিতে হয়। ফাটাল বা গর্ত্তের মধ্যে কেরোসিন বা বাইক্লোরাইড অব মার্কুরির ছারপোকা হইলে ঘর বন্ধ করিয়া ৩ কি ৪ ঘণ্টা কাল গন্ধক পোড়াইলে ছার পোকা নষ্ট হইবে। ইহার মধ্যে এই

একটি আপত্তির বিষয় আছে যে জলীয় বাষ্প সহযোগে ঘরে সলফিরস আসিড উৎপন্ন হইলে উহাতে ধাতু পাত্র এবং বস্ত্রাদির অনিষ্ট হইতে পারে।

নিম্নলিখিত চারি উপায়ের যে কোন উপায়ে ঘরের এবং তক্তোপোষের ছারপোকা মারা যাইতে পারে।

(১) সমান পরিমাণে তারপিন ও কেরোসিন মিশাইয়া উহা তক্তোপোষে এবং ঘরে গর্ত্তে ফটালে মাখাইয়া দেও।

(২) করসিভ সব্লিমেট ২ আউন্স
মিউরিক আসিড ২ আউন্স
জল ৪ আউন্স

মিশাইয়া উহার সহিত তামাকের ডিক্‌কসন ১পাইন্ট মিশাইয়া উহা তুলির দ্বারা মাখাইয়া দিলে ছারপোকা মরিবে। এই আরক ভয়ানক বিষাক্ত। সতর্কভাবে ব্যবহার করিও।

(৩)	কর্পূর	২ আউন্স
	টার্পেণ্টাইন স্পিরিট	৪ আউন্স
	কারোসিভ সব্লিমেট	১ আউন্স
	এলকোহল (মদ্য)	১ পাইন্ট
(৪)	মারকুরি অয়েণ্টমেণ্ট	১ আউন্স
	সাবান গোলা	১ আউন্স
	তারপিন তৈল	১ পাইন্ট

(৫) বেন্‌জাইন ও পেট্রোল ব্যবহারেও ছারপোকা মরে।

মানুষের সহস্র শত্রু। জীবন প্রতি পদে বিপন্ন। সাবধান না হইলে কাহারও পরিত্রাণ নাই। বঙ্গের চিত্র সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ—অথচ আমরা সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চেষ্ট। আমাদের অবস্থা ব্যবস্থা, শিক্ষা দীক্ষা, দারিদ্রতা, সর্ব্বোপরি স্বাস্থ্যে ঔদাসীন্য পলে পলে আমাদিগকে মরণের দ্বারে লইয়া চলিয়াছে! তথাপি কি ঘুম ভাঙ্গিবে না। যে দেশে জন্ম হইতে মৃত্যু সংখ্যা অধিক,—জীবিতও আধিব্যাধিতে জরাগ্রস্থ—সে দেশের ভবিষ্যত কি ভয়াবহ—তাহা কল্পনা করা যায় না। ডাক্তার ভিজিট লইয়াই তুষ্ট কিন্তু কয় দিন এ মৃত্যুর ব্যবসা চলিবে—অর্থ যোগাইবার লোক শেষ হইয়া আসিল যে! কার জন্য অর্থ? ঘরেও যে টান পড়িতেছে! উকিল মোকদ্দমায় ব্যস্ত—ভূতে কি জমীজমা ভাগ করিবে! আচ্ছা কেন এ দেশের লোক জাগে না! এরা কি কেহ বুঝে না। বুঝে ভাবেনা! ভাবে সেই যুধিষ্ঠিরের উক্তি—আমি অমর! প্রাণ তাই কাঁদে না—স্বার্থপরতায় অন্যে মরুক চাল সস্তা হইবে আহার চলিবে অরণ্যে বসিয়া—এই স্বার্থপরতায় আত্মজ্ঞানহীন, আত্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টাতেই দেশটার সকল গুণই ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সবই অরণ্যরোদনে পরিণত হইতেছে! কেন? শিক্ষিত অভিমানী যাঁরা তাঁরাও কি জীবনের এই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্যকে উপেক্ষা করিবেন? কত কাল? শিয়রে শমন—সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে! একবার স্থির হইয়া ভাবুন ত দেশের বংশধরের—আপনার নিজের কি ঘোর বিপদ উপস্থিত,—জীবন মরণের কি বিষম সমস্যা!

শোক-সংবাদ !

আমাদের দুর্ভাগ্য ! সাহিত্যের একটি অকৃত্রিম বন্ধু,—একজন প্রকৃত সাহিত্যরথী—আমরা হারাইলাম ! কোচবিহার রাজ্যের সুযোগ্য দেওয়ান নরেন্দ্রনাথ সেন বার্-এট্-ল, সি, আই, ই, মহোদয় আর ইহজগতে নাই ; বিগত ৩১শে চৈত্র অপরাহ্নে পুরাতনের অবসানের সহিত তিনিও শান্তিময়ী মা'র অনন্ত শান্তির ক্রোড়ে কর্ম্মান্তে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন ! জীবন ছিল তাঁর—কর্ম্মের, বিশ্রাম কি তিনি জানিতেন না ; সন্তানের এত শ্রম !—অক্লান্তকর্ম্মা সন্তান নিজে ক্লান্তি অনুভব না করিলেও মা'র প্রাণে বুঝি আর সহ্য হইল না—তিনি তাঁকে কর্ম্মজগতের পরপারে সাফল্যের মুকুট শিরে পরাইয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। কত আশা আমরা করিয়াছিলাম—তাই তাঁর শান্তিতেও আমাদের মন প্রবোধ মানে না। তিনি বিগত ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে গুরুতর রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন ;—এত কর্ম্মের মধ্যেও তিনি সাহিত্যকে বিস্মরণ হইতে পারেন নাই—যখনই সুবিধা হইয়াছে তখনই সাহিত্য আলোচনায়, তুলনায়, সমালোচনায়, উপদেশে শ্রোতৃ-বর্গকে মুগ্ধ ও উপকৃত করিয়াছেন। কি গভীর পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর ! ইংরাজী, সংস্কৃত, বঙ্গভাষায় এমন কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছিল না—যাহা তাঁহার অপরিচিত ছিল।—কেবল নামমাত্র পরিচয় নয়, সেগুলিকে তিনি নিজের করিয়া লইয়াছিলেন। প্রতি কথায় যেগুলির উল্লেখ করিয়া কত প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন—সে যিনি শুনিয়াছেন তিনি ব্যতীত অন্যে বুঝিবেন না। কি গভীর গবেষণার সহিত তিনি সাহিত্যকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন ! তিনি নিজে বিশেষ কিছু লেখেন নাই,—লিখিবার মতিও ছিল না—অত বড় পণ্ডিত আজীবন ছাত্র ছিলেন ; তিনি বলিতেন, "লেখা কি সহজ—না পড়িয়া হয় ?—লিখিতে হইলে শিখিতে হইবে,—জগতের সহিত পরিচিত না হইলে জগৎকে দিবার মত কি দেওয়া যায় !" সকল কার্য্যকে পরিপূর্ণতা প্রদান করিবার চেষ্টাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য,—এই লক্ষ্য পূর্ণভাবে উদ্‌যাপন করিতে গিয়া তিনি নিজেই নিজকে পূর্ণতার দিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিলেন। ছাত্রত্ব হইতে তিনি শিক্ষকের পদে নিজকে কখনও প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না। সাফল্যও তাঁর এখানে—লোক-চক্ষে ত্রুটীও তাঁর এখানে ! তাঁহাকে আমরা বুঝি নাই—অত বড় আদর্শকে কল্পনায় আনিতে অসমর্থ হইয়া অনেকেই হতাশ হইয়াছেন, আমরা ফল চাই হাতে হাতে—অপেক্ষার অবসর আমাদের নাই—তিনি অর্দ্ধসমাপ্ত বস্তু দান করিবার পাত্র ছিলেন না, তাহাতে কেহ হতাশ হইলে তাহার জন্য দুঃখ বা গ্রাহ্য তিনি কমই করিতেন।

আগ্নেয়গিরি কখন নিষ্ক্রিয় থাকে না, আলোক কখন নিজকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না, তিনি নিজকে ছাত্রত্বে বরণ করিলেও শিক্ষার্থী তাঁহার পাণ্ডিত্যে, প্রতি উক্তিতে অশেষ লাভবান্ হইয়াছে। যিনিই তাঁর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহাকেই বলিতে হইয়াছিল ;—"হাঁ, আজ কিছু নূতন শিখিলাম।"

সুযোগ আসিয়াছিল ;—তাঁহার পাণ্ডিত্যের ফল ভোগ করিবার দিন। তাঁহার নিকট ছোট বড় ছিল না—সাহিত্য-পিপাসুকে তিনি স্নেহাগ্রহে কোল দিতেন ; সাহিত্য-প্রসঙ্গে তাঁহার বদনে-নয়নে আনন্দজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিত।—এই আনন্দে কত জন উপকৃত হইতে পারিতেন, কিন্তু মা আনন্দময়ীর ইচ্ছা,—তৃষিতের আকাঙ্ক্ষা

উপেক্ষা করিয়া সুসন্তানকে কেন যে তিনি অকালে লোকান্তরিত করিলেন—মাত্র ৬৬ বৎসর তাঁর বয়স হইয়াছিল—তিনিই জানেন !

মঙ্গলময়ী মা—তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক !

শোকার্ত্ত পরিজন, বন্ধুবর্গ—তাঁহার অভাব ভুলিতে সহজে পারিবেন না—তাঁহাদের শান্তি বিধান কর মা !

নগর সঙ্কীর্ত্তন।

—:০:—

দোঠুকী।
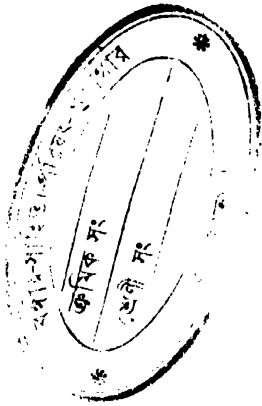
স্বার্থের প্রবল টান জাতি প্রেম অভিমান
ভেদবুদ্ধি বিষের জ্বালায়—
(ধরা জ্বলিয়া মরে—বিদ্বেষ জ্বালায় আজি)
(ঐ শোন শোন গো—দুঃখের রোদন রোল)
দয়া ভক্তি স্নেহ প্রীতি দলন দমনে নিতি
পথে ঘাটে ধূলিতে লুটায় ॥
(পথ চলিতে নারি—ধূলি অন্ধ আঁখি—আঁধারে
কাঁটার ভয়ে—লজ্জা অপমান ক্ষোভে)
(কোথা আছ—আছ হে—বিপদ ভয়হারী হরি—)
বিনাশিতে পাপভার দুষ্কৃতের অত্যাচার
ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন।
(যুগে যুগে কর লীলা—যুগ-অবতার-সনে)
(ছুটিছে সবে—তোমা হতে সুদূরে দূরে)
(তবু হল না, হল না গো—তোমার ইচ্ছার জয় ভবে)
ধরা হবে স্বর্গধাম তব নামে প্রাণারাম
অশান্তির হবে অবসান ॥
(সেদিন কবে বা হবে—আশাপথ চেয়ে আছি।)

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

---

* নবত্রিতম মাঘোৎসবে গীত।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।'

৪র্থ বর্ষ। | বৈশাখ, ১৩২৭ সাল। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

গ্রামের কোলে।

——:*:——

সহরসীমা ছাড়িয়ে এবার এসেছি এই গ্রামের কোলে
কচি ঘাসের গল্‌চে মোড়া শ্যামলতার পাথার-পুরী
খেতের পারে বালুর চরে ক্ষীণ নদীটির আঁচল দোলে
মন্দাকিনীর সুধার ধারা কেমন করে' করলে চুরি !
আকাশ যেন নির্ণিমেষে তাকিয়ে আছে ধরার পানে
তরুর শিরে শিরে আপন নিটোল চারু চিবুক রাখি
পাখী হেথায় কেমন যেন প্রাণের ভাষার সুরটি জানে
আম্র-মুকুল গন্ধ আকুল বনের কোলে উঠ্‌ছে ডাকি
চখাচখী ত্রস্তভীত হেলিয়ে দেখে মোহন গ্রীবা
স্রোতের 'পরে নিথর জলে ছায়াটি তার দুল্‌ছে কিবা !

ঝালর কাটা নারিকেলের পাতার হাওয়া লাগ্‌ছে মিঠে
হাওয়ার সাথে আস্‌ছে ভেসে নেবু ফুলের গন্ধধারা
কাঁটা গাছের ফুলগুলি সব বর্ণ লীলার মোহন ছিটে
কামিনী তার গন্ধে রসে রূপের ছবি কর্‌ছে সারা !

ঘুঘুর ডাকে উদাস করে বুকের মাঝে ব্যাকুল হিয়া
কোন্ অজানা প্রেমাস্পদের কোন্ অজানা প্রেমের লাগি,
বাতাস বহে বাঁশের পাতায় মর্ম্মরিয়া মর্ম্মরিয়া
নীড়ের কোলে পক্ষীশাবক ক্ষণে ক্ষণে উঠ্‌ছে জাগি
পল্লী বালক নগ্ন দেহে মাঠের পরে ছুটছে হেসে
সরলতার মধুরতার মন্দাকিনী আপনি মেশে !

ছোট ছোট পাতায় ছাওয়া কুটীরগুলি শান্তি আধার
কুমড়া শাখার নধর বাহু জড়িয়ে আছে চালের 'পরে
পল্লীবধূ খোঁজ রাখে না সহর-কেতা বাঁধন বাধার
বুকের পরে কাপড় বেঁধে যৌবনেরে আড়াল করে !
রৌদ্র হেথা স্বর্ণ উত্তাল, আঁধার হেথা নিবিড় কালো
প্রভাত হেথা স্নিগ্ধ মধুর, রাত্রি হেথা সুধায় ভরা
স্বপ্ন লোকের লুকিয়ে চাওয়া মায়ার স্ফটিক চাঁদের আলো
কবি জনের প্রাণ ভোলান মন মজান পাগলকরা !
নিন্দা কুযশ এত দিনের অবসাদের বসন ত্যজে
পবিত্রতার শান্তি জলে মলিন হিয়া নিলাম মেজে !

ভূমিকা।

-:*:-

যে কাব্যগ্রন্থখানির সম্পাদনভার গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া ভূমিকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইহার নাম "বেহারোদন্ত কাব্য" অর্থাৎ বেহারের ঐতিহাসিক বিবরণ সম্বন্ধীয় কাব্য। ইহা কোচবিহারের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের পত্নী মহারাণী বৃন্দেশ্বরীর রচিত ও ১২৬৬ সনে মুদ্রিত হয়। এই পুস্তক রংপুরের অন্তর্গত কাকিনায় মুদ্রিত হইয়াছিল, ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কোচবিহারে তখনও মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই পুস্তকখানির মুদ্রণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল না হইলেও ইহা যে বিশেষ যত্ন ও শ্রম সহকারে

মুদ্রিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই কারণ এইরূপ প্রাচীনগ্রন্থে মুদ্রণের ভ্রম থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সে হিসাবে ইহাতে ভ্রম অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। যথা:—

		পৃষ্ঠা।			পৃষ্ঠা।
ষেন (যেন)	...	২	ষাগ (যাগ)	...	৩২
ষেমন (যেমন)	...	৪	অধিকন্তু (অধিকন্তু)	...	৩৯
বয় (বয়ঃ)	...	৬	ষায় (যায়)	...	৪০
ষোড় (যোড়)	...	৬	করিয়া [করিয়া]	...	৩১
ঘোষনা (ঘোষণ)	...	৯	প্রজাগণ (প্রজাগণ)	...	৫৯
জ্যোতিষ (জ্যোতিষ)	...	১৪	নিরক্ষিতে (নিরীক্ষিতে)	...	৪০
নিষোজিয়া (নিয়োজিয়া)	...	১৪	পরীক্ষণ (নিরীক্ষণ)	...	৪১
ষারে (যারে)	...	১৭	মোদবায় (মোদবার)	...	৪৯
করেন (করেন)	...	১৯	ক্ষান্ত (ক্ষান্ত)	...	৫০
সম্রাট (সম্রাট)	...	১৯	ক্রূব (ক্রূর)		৫৪
ষান (যান)		২৪	বথা (বৃথা)		৫৫

উপরোক্ত ভ্রমগুলি হইতে পরিলক্ষিত হইতেছে যে য ও ষ এর ভ্রম অধিক। ইহা ভিন্ন প্রাচিন মুদ্রণ প্রণালীতে কতকগুলি অক্ষরবৈচিত্র দৃষ্ট হয় যথ ভ্রর স্থানে ভ্র, ক্রঃ স্থানে ক্র, 'র' র স্থানে পেটকাটা ব ব, এ সকলের উদাহরণও বহুল পরিমাণে আছে। যথা ভ্রমণ; ক্রমে, ক্রন্দন, ভ্রমণ, ক্রোশ ইত্যাদি। মহারাণী বৃন্দেশ্বরী যে সাহিত্যানুরাগিণী ছিলেন তাহা ইঁহার কাব্যে ইতিহাস লেখা হইতে উপলব্ধি হয়, পরন্তু এই কাব্যের একমাত্র উদ্দেশ্য কোচবিহার রাজ্যের ইতিহাস বর্ণনা, যদ্যপি তাঁহার নারীজনোচিত অজ্ঞতার জন্য বহুস্থানে যথাযথ সকল ঘটনা বর্ণিত হইতে পারে নাই তথাপি তিনি যে সাধ্যানুরূপে বর্ণনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার কাব্যপাঠে হৃদ্‌বোধ হয়। এই ইতিহাস লেখার ইচ্ছা ইঁহার মনে কেন বলবতী হইয়াছিল তাহা এত বৎসর পরে অনুমান করা দুষ্কর, তথাপি একটি কারণ আমাদের নিকট সত্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। এই কাব্যের সমসাময়িক অন্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল কিনা আমরা অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞাত হইয়াছি যে ইঁহারই সপত্নী মহারাণী কামেশ্বরীর (ভাঙ্গরাই) আদেশে গেবরাছড়া নিবাসী রিপুঞ্জয় বড়-কায়েত কর্তৃক রাজবংশাবলী নামক একখানি কোচবিহার রাজবংশের ইতিহাস গদ্যে এই সময়ে লিখিত হয়। এই পুস্তকখানি অসম্পূর্ণ থাকা নিবন্ধন ইহা লিখিত হইবার প্রকৃত কাল আমরা জানিতে পারি নাই। সপত্নীর অনুকরণ করিবার ইচ্ছা মহারাণী বৃন্দেশ্বরীর হৃদয়ে প্রবল হওয়া বিচিত্র নহে; এতদ্ভিন্ন দুর্গাদাস মজুমদার কর্তৃক লিখিত আর একখানি বংশাবলী পুস্তক বেহারোদন্ত কাব্য প্রকাশিত হইবার চারিবৎসর পর ১২৭০ সনে প্রকাশিত হয়।

এই পুস্তকখানি একমুখা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দলাই মহাশয়ের নিকট রক্ষিত ছিল; তঁহার জামাতা ডাক্তার আদিত্যচন্দ্র কাঞ্জি মহাশয় কোচবিহার সাহিত্যসভায় এই পুস্তকখানি প্রদান করিয়া উপকৃত করেন। সাধ্যমত অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞাত হইলাম এই পুস্তক কেবল এই এক খণ্ড মাত্র বিদ্যমান আছে। এই শ্রেণীর প্রাচীন পুস্তক যাহাতে একবারে বিলুপ্ত হইয়া না যায় তাহা প্রত্যেক সাহিত্যসেবীরই দ্রষ্টব্য। সৌভাগ্য-ক্রমে শ্রীশ্রীমহারাজ ভুপ বাহাদুরের অনুগ্রহে কোচবিহার নগরে যে সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা

এইরূপ পুরাতন গ্রন্থ ও পুঁথি রক্ষাকল্পে বিশেষ যত্নশীল। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থকর্ত্রী মহারাণী বৃন্দেশ্বরী আই দেবতী স্বয়ং রাজমহিষী ছিলেন, তিনি আমার পূজনীয় ভাসুর ঠাকুর শ্রীশ্রীমহারাজ স্যার জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, কে,সি,এস,আই, এবং আমার স্বামী মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ মহাশয়ের প্রপিতামহী ছিলেন। তাঁহার রচিত পুস্তক পুনর্মুদ্রণ ও সম্পাদন করিবার ভার রাজমহিষী অথবা রাজবংশীয়া মহিলার উপরই ন্যস্ত হওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ সাহিত্যসভার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও দ্বিতীয়তঃ আমার শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরাণী শ্রীশ্রীমহারাণী সুনীতি দেবী আইদেবতী সি, আই, আমার প্রতি এই গুরুভার স্নেহপরবশ হইয়া অর্পণ করায় আমাকে এ কার্য্য কর্ত্তব্যবোধে গ্রহণ করিতে হইল। অযোগ্যের উপর এ দায়িত্বভার পতিত হইল, তথাপি ইহা আমাদের পূর্ব্ববংশীয়া রাজমহিষীর সাহিত্যানুরাগে সযত্ন লিখিত হইয়াও আমাদের অযত্নে লোকচক্ষুর অন্তরালে বিলুপ্ত হইলে বড়ই পরিতাপের বিষয়, তাই ভক্তিভরে এ কার্য্যে ব্রতী হইলাম। শব্দের রূপ ও বর্ণবিন্যাস যথাযথ পূর্ব্বের মত রক্ষা করিয়া ইহা পুনর্মুদ্রিত করা হইল।

কলিকাতা, ঢাকা, রংপুর ও কোচবিহারের যে সকল সাহিত্যপরিষৎ ও সভা এইরূপ পুরাতন গ্রন্থ ও পুঁথি মুদ্রণে যত্নশীল হইয়াছেন ইদানিং তাঁহাদিগের মধ্যে মুদ্রণ প্রণালী সম্বন্ধে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। ইঁহাদিগের মধ্যে দুইরূপ মত দৃষ্ট হয়। এক পক্ষের মত এই সকল পুঁথিতে গ্রন্থকারের সংস্কৃত ধাতুজাত শব্দের ভ্রম ও নকলকারকের ভ্রম সকল সংশোধন করাই কর্ত্তব্য। অপর পক্ষের মত পুরাতন গ্রন্থে কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার আমাদের নাই; ইহার ভ্রমভ্রান্তি যথাযথ রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। কারণ কোন্‌টি নকলকারকের ভ্রম এবং কোন্‌টিই বা গ্রন্থকারকের ভ্রম তাহা প্রতিপন্ন করা দুষ্কর। যাহা হউক আমরা এই শেষোক্ত মতাবলম্বী, ইহা যদি আমরা যথাযথ রক্ষা করি তবে ভবিষ্যতে যে কেহ ইচ্ছা করিলে সংশোধন করিতে পারিবেন কিন্তু আমরা যদি ইহা একবার সংশোধন করি তবে ভবিষ্যতে আর ইচ্ছা করিলেও পূর্ব্বাবস্থায় আনয়ন করা সম্ভবপর হইবে না। ইহা ভিন্ন আমার মতে এইরূপ শব্দ পরিবর্ত্তন করিলে পুঁথির মৌলিকত্বে আঘাত করা হয়।

এই পুস্তকে একই শব্দের বর্ণবিন্যাসে বহু পার্থক্য দৃষ্ট হয় কিন্তু ইহাকে অজ্ঞতামূলক ভ্রম বলা যায় না। কারণ প্রাচীন পুঁথি ও পুস্তকে এই প্রকার নানারূপ বর্ণবিন্যাসের প্রচলন ছিল, ইহা ভ্রম বলিয়া বিবেচিত হইত না। সেই প্রাচীনকালের প্রভাব যে ইঁহার পুস্তকেও বিদ্যমান তাহাতে সন্দেহ নাই। যদ্যপি তিনি ৫৫ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন,—

"বহু শব্দ অসাধ্য যে শুদ্ধ করিবারে
কবিতে অকবি জ্ঞানে ক্ষমিবে আমারে"

তথাপি ইহা বিনয়সূচক বাক্য ভিন্ন আর কিছুই নহে কারণ সাধারণ চক্ষে যে ভ্রম প্রাচীন গ্রন্থমাত্রেই ক্ষমার্হ তাহা মহিলা রচিত প্রাচীন গ্রন্থে অবশ্যই ক্ষমার্হ। অকারস্থানে আকার প্রয়োগ যথা অমিয়া (অমিয়) ৩৫ পৃষ্ঠা সাষ্টাঙ্গ (ষষ্ঠাঙ্গ) ৪২ পৃষ্ঠা এইরূপ পার্থক্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল, দীর্ঘ ঈ স্থানে হ্রস্ব ই যথা,—

			পৃষ্ঠা।				পৃষ্ঠা।
বন্দি	(বন্দী)	...	২	মুখি	(মুখী)	...	২৬
গুণি	(গুণী)	...	২	সমিরণ	(সমীরণ)	...	৩০

	পৃষ্ঠা।
বংশাবলি (বংশাবলী) ...	৪
স্বামি (স্বামী) ...	৭
নিবাসি (নিবাসী) ...	১০
সন্ন্যাসি (সন্ন্যাসী) ...	১২
করিবর (করীবর) ...	১৩
ব্যাপি (ব্যাপী) ...	১৬
যোগধারি (যোগধারী) ...	১৭
ত্রিশূলি (ত্রিশূলী) ...	১৭
ফণি (ফণী) ...	১৭
বৈরি (বৈরী) ...	১৯
কাণ্ডারি (কাণ্ডারী) ...	২৪
সঙ্গি (সঙ্গী) ...	২৪
মন্ত্রি (মন্ত্রী) ...	৩৬
রাজ্যবাসি (রাজ্যবাসী) ...	৩৭
সুখি (সুখী) ...	৩৯
শিখি (শিখী) ...	৪১
বৃন্দেশ্বরি (বৃন্দেশ্বরী) ...	৪৪
মনোহারি (মনোহারী) ...	৪৪
ধটি (ধটী) ...	৪৫
হিরা (হীরা) ...	৪৫
টিকা (টীকা) ...	৪৬
কর্ম্মি (কর্ম্মী) ...	৪৬
বাঁশি (বাঁশী) ...	৪৬
খঞ্জরি (খঞ্জরী) ...	৪৭
দুঃখিজন (দুঃখীজন) ...	৪৭
সত্যবাদি (সত্যবাদী) ...	৪৮
জ্ঞানি (জ্ঞানী) ...	৫১
চেড়ি (চেড়ী) ...	৫১

হ্রস্ব ই স্থানে দীর্ঘ ঈ এর প্রয়োগ কেবল মাত্র এক স্থানে দৃষ্ট হয়,—

বীণা (বিনা) ...	৪৯

	পৃষ্ঠা।
হ্রস্ব উ স্থানে দীর্ঘ ঊ যথা :—	
নিশূম্ভ (নিশুম্ভ) ...	১৮
তাম্বূল (তাম্বুল) ...	২৩
মূনি (মুনি) ...	৩৬
কূসল (কুশল) ...	৪১
কারচূবি (কারচুপি) ...	৪৫
চূরি (চুরি) ...	৫৮
দীর্ঘ ঊ স্থানে হ্রস্ব উ যথা :—	
পুরাও (পূরাও) ...	২
পুর্ণিত (পূর্ণিত) ...	৮
ভুমি (ভূমি) ...	২৩
মুল (মূল) ...	৩৮
পুজন (পূজন) ...	৩৯
ভুষায় (ভূষায়) ...	৪৩
কালকুট (কালকূট) ...	৫১
একার স্থানে হ্রস্ব ইকার যথা :—	
অনিমিসে (অনিমেষে) ...	৪৯
কর স্থানে গ যথা :—	
ওদিগে (ওদিকে) ...	৩৬
ছ র স্থানে চ্ছ যথা :—	
চ্ছবি (ছবি) ...	১৮
চ্ছেদি (ছেদি) ...	৫২
একটি জর স্থানে দুইটি জ (জ্জ) যথা :—	
বজ্জ্র (বজ্র) ...	৮
জর স্থানে য যথা :—	
যুড়াইল (জুড়াইল) ...	৫২
যোড়া (জোড়া) ...	৪৬
জর স্থানে জ্ব যথা :—	
জ্বর জ্বর (জর জর) ...	৫৩
ত র স্থানে দ, যথা :—	
যাবদীয় (যাবতীয়) ...	৪১

		পৃষ্ঠা।
ধর স্থানে দ, যথা:—		
উপাদান (উপাধান)	...	৪৫
ন র স্থানে ণ, যথা:—		
দর্শণ (দর্শন)	...	৮
শূণ (শূন্য)	...	২১
স্থাপণ (স্থাপন)	...	২২
গর্জ্জণ (গর্জ্জন)	...	৪৭
ন্দ র স্থানে ন্ধ, যথা:—		
বন্ধি (বন্দী)	...	১
সিন্ধূর (সিন্দূর)	...	৪১
ন্ব র স্থানে ন্ন, যথা:—		
গুণান্নিত (গুণান্বিত)	...	৮
ন্ব র স্থানে ন্ব্য যথা:—		
অন্বেষণ (অন্ব্যেষণ)	...	৪৮
স্তর স্থানে ন্ত্র, যথা:—		
তন্ত্রবায় (তন্তুবায়)	...	৪০
ভ র স্থানে ব, যথা:—		
গাবী (গাভী)	..	৪২
ম্ম র স্থানে ন্ম, যথা:—		
সন্মান (সম্মান)	...	১১
য র স্থানে জ, যথা		
জার (যার)	...	১১
জান (যান)	...	২৩
জত (যত)	...	২৪
্যর স্থানে একার, যথা:—		
ব্যেতিরেকে (ব্যতিরেকে)	...	৩১
শুধু '্য'র স্থানে ্যা, যথা:—		
ব্যাগ্র (ব্যগ্র)	..	৪১
্যর স্থানে ্য ফলা ত্যাগ, যথা:—		
ভক্ষ (ভক্ষ্য)	...	৫০

		পৃষ্ঠা।
অকারণে য ফলা যোগ যথা:—		
কাংশ্য (কাংস)	...	১১
'র' র স্থানে ড়, যথা:—		
জড়ির (জরির)	...	৪৫
ভেড়ী (ভেরী)	...	৪৭
লর স্থানে র, যথা;—		
কাচরি (কাঁচলি)	...	৪১
শ র স্থানে স, যথা;—		
নিসান (নিশান)	...	৪৬
পসিব (পশিব)	...	৫৩
স্বশ্রু (শ্বশ্রু)	...	৫৫
শ র স্থানে খ, যথা;—		
খরীর (শরীর)	...	৩৯
ষ র স্থানে স, যথা;—		
সাটাঙ্গ (ষষ্ঠাঙ্গ)	...	৪২
ভাসা (ভাষা)	...	৪৯
স র স্থানে শ, যথা;—		
কাংশ (কাংস)	...	১১
বৈশ (বৈস)	...	২৭
শান্ত্বন (সান্ত্বন)	...	২০
শরাশন (শরাসন)	...	২৮
ধশয়ে (ধসয়ে)	...	৪৭
স র স্থানে ষ, যথা:—		
ভাষে (ভাসে)	...	১৫
সর স্থানে ছ, যথা;—		
ছোটা (সোঁটা)	...	৪৬
ড়র স্থানে র, যথা;—		
মরক (মড়ক)	...	৩৫
অকারণে "ঃ" যোগ, যথা;—		
চক্ষুঃ (চক্ষু)	...	৩৬

উদ্ধৃত শব্দগুলির মধ্যে এমন কয়েকটি শব্দ দৃষ্ট হয় যাহা স্থানে স্থানে আধুনিক বর্ণবিন্যাসের রীত্যনুসারেও লিখিত হইয়াছে, যথা;—

শুণাতে ন, দিগে ক, গাবীতে ভ এবং নিরীক্ষণে প্রকৃত বর্ণবিন্যাস! বাঙ্গালা ভাষার অভিধানের ভূমিকায় (১৯ পৃষ্ঠা) "প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালায় ক্রম-পরিণতির প্রাচীনাবস্থার সমীরণ লক্ষণ" বলিয়া এই পার্থক্যের উল্লেখ আছে। প্রাকৃতের বর্ণবিন্যাস বৈচিত্র উপযুক্তরূপে আয়ত্ত না করিয়া ভ্রম প্রদর্শন করিতে যাওয়া সমীচীন নহে। কারণ প্রাকৃতে ন র স্থানে ণ র প্রচলন ছিল, মহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনী প্রাকৃতেও তাহাই। আবার পৈশাচী প্রাকৃতে ণ র স্থলে ন হয়। পালীতে ন ও ণ দুই ব্যবহৃত হয়। পালীতে আদি ব ল হয়, মাগধীতে ইহার বিপরীত *।

এতদ্ভিন্নও এমন কয়েকটি শব্দ আধুনিক বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয় যাহাতে দীর্ঘ ঈ, ও হ্রস্ব ই দুইই প্রযোজ্য। প্রাচীন পুঁথিকারগণের মধ্যে এই প্রাচীন প্রথার প্রভাব পতিত হইয়া যে তাঁহাদের রচনার মধ্যে বর্ণবিন্যাসের বৈচিত্র উৎপন্ন করিবে তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। বর্ণবিন্যাসের বৈচিত্র প্রদর্শন করিবার জন্য যে সকল শব্দ উদ্ধৃত করিলাম প্রকৃতরূপে অনুসন্ধান করিলে হয় ত ইহার মধ্যে অধিকাংশ শব্দেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বর্ণবিন্যাসের কারণ আমরা অবগত হইতে পারি। সেজন্য এই সকল শব্দ ভ্রমরূপে উল্লিখিত হইতে পারে না।

প্রাচীন পুঁথিতে সচরাচর পয়ার ও ত্রিপদীর শেষ দুই ছত্রে কবির ভণিতা থাকিত তাহা হইতেই আমরা লেখকের নাম ধাম ও লেখার উদ্দেশ্য অথবা কাহার আদেশে লিখিত তাহা অবগত হই কিন্তু যে সকল কবিতায় তাহা নাই তাহাতে কেবলমাত্র প্রাদেশিক শব্দ প্রয়োগ বিচার করিয়া আমরা লেখকের জন্মস্থান নিরূপণ করিয়া থাকি। এরূপ বিচার কোন কোন স্থলে ভ্রমাত্মক হয় কারণ বাল্যকালের শিক্ষাপ্রভাব যে প্রাদেশিকতা পরিবর্তন করে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহারবাসী হইলেও পূর্ব্ববঙ্গীয় শিক্ষকের প্রভাবে ইঁহার রচনায় পূর্ব্ববঙ্গীয় প্রভাব যে কতদূর পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল,—

ব্রহ্মময়ী কালীরূপ ভাব সদা সুমনে
জপ নাম অবিশ্রাম সুখে বস্যা যোগাসনে
রসনা মজ্যাছে আমার কালীনামামৃত পানে
শ্রীহরেন্দ্রে কহে নাম লিখাইয়াছি শ্রীচরণে।

৬২ নং গীতাবলী।

কি গতি হইবে শিবে কে দিবে উপায়
রক্ষ দক্ষ যজ্ঞ বিন শিনী যমদায়
শ্রীহরেন্দ্রে কহে প্রাণ সপ্যাছি চরণে
যা কর করুণাময়ী জীবনে মরণে।

ক্রিয়াযোগ সার। ১ম অধ্যায়ের ভনিতা।

* ১৩১৬ সনের শ্রাবণ সংখ্যার পরিচারিকার খাঁ চৌধুরী আমানত উল্যা আহম্মদ কর্তৃক লিখিত কোচবিহারের প্রাচীন ভাষা দ্রষ্টব্য।

ইহা ভিন্ন ইঁহার সমসাময়িক অন্যান্য কবির রচনার মধ্যেও পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষার প্রভাব দৃষ্ট হয়,—

যে নৃপতি শেখরের নিজ দেশধাম
অতি ক্ষুদ্রমতি দ্বিজ রুদ্রদেব নাম
অরণ্যকাণ্ডের পদ স্বদেশ ভাষায়
সমাপ্তি করাছি নৃপসিংহের আজ্ঞায়
পুনর্ব্বার একদিন মধ্যাহ্ন সময়
আহ্নিকান্তে যজ্ঞদান করা মহাশয়।

আদি পর্ব্ব মহাভারত। দ্বিজ রুদ্রদেব কৃত।

সেইরূপ আবার মহারাণী বৃন্দেশ্বরীর পুস্তকে দক্ষিণ বঙ্গের প্রভাব দৃষ্ট হয়। তাঁহার পুত্রবধূর নিকট শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, বিবাহের পর তিনি তাঁহার পিতৃব্যের নিকট লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন কিন্তু তৎপূর্ব্বে কোন দক্ষিণ-বঙ্গীয় ব্যক্তি তাঁহার শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন কিনা তাহা জানিতে পারা যায় নাই। এইরূপ কয়েকটি দক্ষিণবঙ্গীয় ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদান করিতেছি যথা,—

	পৃষ্ঠা।		পৃষ্ঠা।
হতেছে	২	পেয়ে	৩১
চেয়ে	২	দিয়ে	৩১
পড়েছি	৩	গড়িয়ে	৩২
হ'ল	৬	বাঁচিলে	৩৩
হচ্ছে	৯	দেখে	৩৩
হলে	১০	নাহিক	৪৯
জানি নাকো	১২	হয়েছে	৫২
পেয়েছি	৩১	এল	২৪
গেছে	৫২		

ইহা ভিন্ন সর্ব্বনাম ও ক্রিয়ার প্রাচীন ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যথা,—

	পৃষ্ঠা।		পৃষ্ঠা
তেঁই	৭	করহ	৪২
তোঁহে	২১	তুমিহ	৪৩

আবার বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের কয়েকটি ক্রিয়াও আছে, যথা,—

	পৃষ্ঠা।			পৃষ্ঠা।
জুড়াকু	২৯	হৈয়ে	...	৩৭
কৈরে	৩৬	হৈল	...	৩৭
হইয়ে	৩৬	ধ্যায়ে (অর্থাৎ দেখে)	...	৪০
কৈতে	৩৬	কাহ্ন	...	৪৪

আবার এই পুস্তকে কোচবিহারের দেশীয় ক্রিয়া শব্দেরও অভাব নাই যথা,—

		পৃষ্ঠা।			পৃষ্ঠা।
রাখিলেক	...	৫	আনিলেক	...	১৯
কইলেক	...	৬	দেও	...	২০
রহিলেক	...	৬	বৈশ	...	২০
দিলেক	...	৯	করিলেক	...	২৯
ফেলায়	...	১১	কয়	...	৩০
না ছিল	...	১২	নেও নেও	...	৩১
			পরিলেক	...	৪১

কোচবিহারে ব্যবহৃত শব্দ যথা,—

		পৃষ্ঠা।			পৃষ্ঠা।
আদ্দাশ	...	১১	পহরা	...	৩৬
আখি	...	১২	পুথি	...	৩৬
করুণা করি	...	২০	আটি	...	৩৯
দিনান্তরে	...	৩৫	গোয়াল	...	৪০
তদন্তরে	...	৩১	কেনে	...	৫২

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে তিনি যে কোন উপায়ে হউক তাঁহার শিক্ষায় দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গীয় প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু স্বদেশীয় ভাষা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, স্থানে স্থানে দেশীয় ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকটি শব্দের অপপ্রয়োগও ইহাতে আছে, যথা,—

		পৃষ্ঠা।			পৃষ্ঠা।
রায়	...	৬	গুচ্ছগণ (গুচ্ছগুলি)	...	৪৪
কাটে (কাটিয়া)	...	৮	গ্রন্থিত (গ্রথিত)	...	৪৫
সকলেতে (সবে মিলে)	...	২৩	সদৃশ প্রায়	...	৪৫
ছলীত (মর্ম্মান্তক)	...	২৯	একচিত্ত মনে	...	৪৮
চিরদিন (বহুদিন)	...	৩৭	লেখণী (লিখিত বিষয়)	...	৫৪
উপমান (উপমা)	...	৩৭	ক্ষান্ত নাই আর (নিবৃত্ত নাই)	...	৫৫

এই শব্দগুলি যে তাঁহার ভাষার অজ্ঞতানিবন্ধন, এমন কথা বলা যায় না।

বহুস্থানে মিলের অনুরোধে ভাষার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়াই তিনি এইরূপ করিয়াছেন। তবে ইহা যে অনুমোদনযোগ্য নহে তাহা বলাই বাহুল্য। এই সকল শব্দের অপপ্রয়োগ সত্ত্বেও স্থানে স্থানে ছন্দপতন দোষ পরিলক্ষিত হয়। যথা,—

কপট করিয়া দেওয়ান গেল নিজালয়ে। ১৬ পৃষ্ঠা।

জ্ঞান শূন্য হয়ে রাণী করে বাহা বাছা ধ্যান

শীঘ্র আয় রে অন্ধের নয়ন। ৩১ পৃষ্ঠা।

থামানে করিতে হুকুম চথাদিং করার। ৩৬ পৃষ্ঠা। ইত্যাদি।

এ সকল দৃষ্টান্ত হইতে ধারণা জন্মে ইঁহার একেবারেই ছন্দ বোধ ছিল না কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, কারণ এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে যথা,—

পুনর্ব্বার ধৈর্য্যেন্দ্রনারাণ রাজা হন্। ৫ পৃষ্ঠা।

এ ক্ষেত্রে নারায়ণ লিখিলে ছন্দপতন হইত সেজন্য কেবলমাত্র নারাণ লিখিয়া ছন্দ রক্ষা করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন দু এক স্থানে সরল সহজ ভাষায় গভীর তত্ত্বকথা সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে, যথা.—

সংসারের ধর্ম্ম হয় জনম মরণ
জন্মিলেই মৃত্যু হয় না হয় বারণ
সেই মৃত্যু কেবল দেহের মাত্র হয়
জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধ জীবের কভু নয়। ২২ পৃষ্ঠা।

কবিদিগের কাব্যে যে সকল উপমার প্রভাব, ইঁহার কবিতা তাহা হইতে বঞ্চিত নহে পরন্তু দু একটি বিচিত্র উপমাও পরিলক্ষিত হয়, যথা.—

প্রজার পালন করেন অতি সাবধানে
যেন সাবধানে পাতা রাখয়ে নয়ন। ৪৮ পৃষ্ঠা।

দু'এক স্থানে ভাব প্রকাশের নূতনত্বও আছে যথা.—

এই বর চাই রহিবে সদাই
পেটে বাগীশ্বরী রূপে। ৩ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থ রচনা কালে ইংরাজী শব্দের ব্যবহার যে আরম্ভ হইয়াছিল তাহার পরিচয় গ্রন্থের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয় যথা,—ইষ্টিং বোট—২৬ পৃষ্ঠা।

বৃং হিয়ার ওয়ান বটন্ হুড্ ডিকন—১৯ পৃষ্ঠা।

ইঁহার কাব্য পাঠে এ কৌতূহল উদ্দীপ্ত হওয়া বিচিত্র নহে যে প্রাচীন কালে আমাদের হিন্দু নারী সমাজবিদ্যা শিক্ষা হইতে বঞ্চিতা হইয়া এবরূপ নিরক্ষর ছিল, যখন বিদ্যা শিক্ষা লোপ করিবার জন্য পাঠাভ্যাসে নানারূপ মিথ্যা ভয় প্রদর্শন করা হইত, সেই প্রাচীন কালে হিন্দু রাজবংশের অসূর্য্যম্পশ্যা পুরমহিলা হইয়া ইনি কেমন করিয়া কাব্য রচনায় সমর্থা হইলেন? কিন্তু সেই সময়ে যে কোচবিহারে বিশেষতঃ কোচবিহার রাজপরিবারে একটি সাহিত্যের হাওয়া উঠিয়াছিল তাহার পরিচয় আমরা পাই। এই হাওয়া রাজ-অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়া ইঁহাকে সাহিত্যের রসাস্বাদে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। ইঁহার শ্বশুর মহাশয় মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ তাৎকালিক সাহিত্যসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক ছিলেন। ইঁহার স্বরচিত বহু খণ্ড গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সভাপণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। মহারাণী বৃন্দেশ্বরীর স্বামী মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ বিরচিত সঙ্গীত পুস্তকও আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহারাণী বৃন্দেশ্বরীর মতে মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ কৃত স্তব ১৭ ও ১৮ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হয় কিন্তু ঐ দুইটি যথাক্রমে ভারতচন্দ্রের শিববন্দনা ও কৌষিকী বন্দনা। প্রাচীন বাঙ্গলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে এই প্রকার গ্রহণ প্রথার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে চ ের পরিচয় উপলক্ষে লিখিত আছে,—

শুনি চমকিত লোক শুনি চমকিত লোক
কহিছে ভারত তার গোটাকত শ্লোক

এই বলিয়া তিনি যে "চোরের শ্লোক পাঠ" লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা মূল সংস্কৃত গ্রন্থ চোরপঞ্চাশৎ হইতে গৃহীত। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল যে কবিকঙ্কণের ভাবসংগ্রহ তাহা বলাই বাহুল্য।

সে যাহা হউক মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের সভাপণ্ডিতগণ রচিত বহু গ্রন্থ কোচবিহার রাজকীয় পুস্তকাগারে ও তদন্যান্য অনেক ব্যক্তির নিকট রক্ষিত আছে। ইহার মধ্যে কয়েক খণ্ডের নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল।—

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী—মহীনাথ শর্ম্মা কৃত।
চণ্ডীকার ব্রতকথা—মাধবচন্দ্র দ্বিজ কৃত।
অশ্বমেধ পর্ব্ব—মহীনাথ শর্ম্মা কৃত।
শিবপুরাণ—দ্বিজ বৈদ্যনাথ কৃত।
আদি পর্ব্ব মহাভারত—দ্বিজ রুদ্রদেব কৃত।

এতদ্ব্যতীত কুমার ব্রজেন্দ্রন রায়ণের পত্নী ফুলতাপ্রিয়ার (পিশু আই) আজ্ঞায় দ্বিজ ধর্ম্মেশ্বর কর্ত্তৃক মার্কণ্ডেয় পুরাণ রচিত হইয়াছিল, এই সকল পুস্তক কোচবিহার রাজকীয় পুস্তকাগারে এপর্য্যন্ত রক্ষিত আছে। এই পুস্তকের কোন কোন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারের রচনা যথাযথ গৃহীত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে কয়েকটি ঐতিহাসিক ভ্রম দৃষ্ট হয় তাহা টীকায় যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পুস্তক কাকিনা শম্ভুচন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল; কাকিনা শম্ভুবংশচরিতে ৮৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশ যে উপরোক্ত মুদ্রাযন্ত্র ১২৬৬ সনে অগ্রহায়ণ মাসে স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু এই গ্রন্থ ১২৬৬ সনে ১৫ই ভাদ্র মুদ্রিত হয় সুতরাং শম্ভুবংশচরিতের উপরোক্ত মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনার সময় নির্দ্দেশ যে ভ্রমাত্মক তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থের প্রণয়ন ও মুদ্রণ সনের মধ্যে গুরুতর অনৈক্য রহিয়াছে, গ্রন্থকর্ত্রী এই গ্রন্থের ভণিতায় বলিতেছেন "অষ্টাদশ শতেকালী শাকে (১২৭১ বঙ্গাব্দ) পুঁথি সমাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু গ্রন্থের উপর পৃষ্ঠায় মুদ্রণ সন ১২৬৪ বঙ্গাব্দ দৃষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন এই পুস্তকে কয়েকটি নূতন ঐতিহাসিক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ বাতরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন।—

বাতে ক্লান্ত অধৈর্য্য নিতান্ত সর্ব্বক্ষণ। ১০ পৃষ্ঠা।

মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ রোগাক্রান্ত হইলে তাঁহারা সপরিবারে বেনারস যাত্রা করেন। তাঁহার দত্তকপুত্র মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া রাজ্য শাসনের বহুবিধ বিধিব্যবস্থা প্রচলন করিয়াছিলেন।—

রীতি নীতি স্থাপন করিলে বহুতর। ৫২ পৃঃ।

মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর বেনারস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে রাজকর্ম্মচারী কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী ও শিবপ্রসাদ বক্সী ও তারামোহন বক্সীর আচরণ ব্যক্ত হইয়াছে।—

কালী শিবপ্রসাদ দুজনে দ্বন্দ্ব করি
আপন নৌকায় চলে সব পরিহরি।

* * *

রাজারে রক্ষণ করে যারের নৌকার
শ্রীতারামোহন ছোট বক্সী নাম তার। ২৪ পৃঃ

রাজার মৃত্যুর পর দেশের যে কিরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাহা মহারাণী বৃন্দেশ্বরীর ভাষায় পরিস্ফুট হইয়াছে,—

দুষ্টবর্গ যারা কাল পেয়ে তারা
করে তাড়াতাড়ি তারা
ছিল যত ধন করিল হরণ
কি করি রমণী মোরা
সচিব যাঁহারা দ্বন্দ্বে মত্ত তাঁরা
রাজ্য দিকে নাহি চায়
প্রজার সর্ব্বস্ব হরে সব দস্যু
বিচার কে করে তায়। ২৬ ও ২৭ পৃষ্ঠা।

এই গ্রন্থে তাৎকালিক দেশের অবস্থাও আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি,—

দীর্ঘ পরবাসে রাজা করিল গমন
দুর্ভিক্ষ মরক রাজ্যে উপস্থিত হন
অন্নাভাবে সব প্রজা করে হাহাকার
দিনান্তরে কিছুমাত্র না মিলে আহার
জঠর জ্বালাতে মরে করিয়া হুতাশ
ছাড়য়ে বনিতা নিজ পতি গৃহ বাস
আর যত মন্ত্রী ছিল বেহার নিবাসে
চক্ষুঃ মুদে থাকে তারা নিজ কার্য্যবশে
সানুকূল হৈল কেবল দেয়ান মোক্তার
শুভদৃষ্টি করি প্রাণ বাঁচান প্রজার
তণ্ডুল আনিয়া রাখে পর্ণশালা কৈরে
হুশিয়ারে পহরা বসায় দ্বারে দ্বারে
নানা মতে রাজ্য নষ্ট হইল রাজার
কৈতে ক্ষান্ত হইলাম করিয়া বিস্তার। ৩৩ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থকর্ত্রী যে মানসিক অশান্তি ও দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন তাহা এই গ্রন্থে স্থানে স্থানে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে ;—

অবলা সরলা হই স্থিত অন্তঃপুরে
ধনলোভে রাজ্য নষ্ট করে দুষ্ট নরে
যশ গুণ ব্যক্ত হয় যত্র তত্র স্থলে
গুণ হরি অর্পে দোষ আমার কপালে। ৫৯ পৃষ্ঠা।

রাজ্য শাসন ব্যাপারে তাঁহাকে যে নানা প্রকার দুর্নামগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল তাহা নরেন্দ্রনারায়ণের কাঁদিবাটী পুনর্যাত্রাকালে মহারাণী বৃন্দেশ্বরীর মুখে ব্যক্ত হইয়াছে,—

এ ছার জীবন রেখে নাহি প্রয়োজন
বারম্বার কলঙ্কেতে হব না পতন। ৫৬ পৃষ্ঠা।

গেল দেশান্তরে রাজ্যে রেখে মোরে
সঁপে কলঙ্কের ডালি
যেরূপ লাঞ্ছনা লোকের গঞ্জনা
জানাইতে নারি তাপ
সেই দুঃখে মন করে জ্বালাতন
মনে হ'লে বাড়ে তাপ
ঘৃণা হয় চিতে না পারি কহিতে
মনোখেদ মনে রই

* * *

তোর সভাসদ করে নানা মত
প্রবঞ্চনা এ লেখনী। ৫৪ পৃষ্ঠা।

এত মানসিক দুঃখ ও অশান্তি সত্ত্বেও তিনি যে ধৈর্য্য হারান নাই তাঁহার গ্রন্থেই আমরা তাহার পরিচয় পাই,—

শিশুকালে রাজগৃহে এসেছ যেমন
অন্ন দিনে বহু কষ্ট পেয়েছ তেমন
দুঃখে তনু জর জর কহিতে না পারি
স্থির চিত্তে আছি মাত্র স্মরিয়া শ্রীহরি। ৫১ পৃষ্ঠা।

কোন বিষয়েতে বাঞ্ছা নাই চিতে
তুষ্টে রুষ্টে নাহি ভয়
সুখ দুঃখ মম হইয়াছে সম
চিন্তা মাত্র বিশ্বময়। ৫৪ পৃষ্ঠা।

মনের বিকার কভু নাই আর
বৃথা দিন চলি যায়
শ্রী বৃন্দেশ্বরীর যেন এ শরীর
লিপ্ত রয় রাঙ্গা পায়। ৫৫ পৃষ্ঠা।

মহারাণী বৃন্দেশ্বরীর আত্মপরিচয় গ্রন্থ হইতে আমরা যতটুকু অবগত হইয়াছি তাহা এইরূপ,—ইনি গোয়ালপাড়া অন্তর্গত পর্ব্বতজুয়ারের জমীদার কন্যা ছিলেন, ইঁহার পিতার নাম ৺রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও মাতার নাম প্রাণেশ্বরী চৌধুরাণী।

মহারাণী বৃন্দেশ্বরীর পুত্রবধূ শ্রীশ্রীঈশ্বরী ব্রজেশ্বরী মধ্যম আই ঈশ্বরী আই দেবতী বলেন,—"তাঁহার কোন সহোদর ভ্রাতা না থাকায় রাজেন্দ্রনারায়ণ, নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাণী বৃন্দেশ্বরীর দুই জন সহোদরা কনিষ্ঠা ভগ্নী ছিলেন, জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠাকে বিজনীর রাজা অমৃতনারায়ণ বিবাহ করিয়াছিলেন; বিবাহের পর ইঁহারা যথাক্রমে রাণী ইন্দ্রেশ্বরী ও রাণী ভুবনেশ্বরী নামে অভিহিতা হন। মহারাজ

শিবেন্দ্র নারায়ণ রাজা হওয়ার পর ঘটক প্রেরণ করিয়া বৃন্দেশ্বরীকে পত্নী মনোনীত করেন, তখন তাঁহার বয়স নয় দশ বৎসরের অধিক ছিল না। কোচবিহার রাজবংশের কুলপ্রথানুসারে তাঁহাকে বিবাহের নিমিত্ত কোচবিহারে আনয়ন করা হয়। ১২৪১ বঙ্গাব্দে জলপাইগুড়ির অন্তর্গত ময়নাগুড়ির রাজা বজ্রধর কার্জির কন্যা কামেশ্বরী দেবী ও বৃন্দেশ্বরী দেবীর সহিত এক দিনে একত্রে মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ হয়। এই কারণে ইঁহাদিগের মধ্যে কে বড় রাণী তাহা বলা কঠিন। তাই মহারাণী কামেশ্বরী দেবীকে ডাঙ্গর আই ও মহারাণী বৃন্দেশ্বরী দেবীকে বড় আই বলা হইত। কোচবিহারী ভাষায় ডাঙ্গর অর্থে বড় বুঝায়। বিবাহকালে মহারাণী বৃন্দেশ্বরীর বয়স অপেক্ষা মহারাণী কামেশ্বরীর বয়স অনেক বেশী ছিল। সে সময়ে মহারাজ শিবেন্দ্র-নারায়ণের বয়স ৪৪ বৎসর। সপত্নীদ্বয়ের মধ্যে বয়সের বহু পার্থক্য থাকায় কোন প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ সম্ভব হয় নাই। মহারাণী বৃন্দেশ্বরী মধ্যমাকৃতি ও শ্যামবর্ণা ছিলেন। শারীরিক সৌন্দর্য্যে তিনি মহারাণী কামেশ্বরীর তুল্যা ছিলেন না। মহারাণী বৃন্দেশ্বরী বিবাহের পূর্ব্বে পিত্রালয়ে কাহার নিকট শিক্ষালাভ করেন তাহা অজ্ঞাত, তবে বিবাহের পর স্বামীগৃহে তাঁহার পিতৃব্যের নিকট বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। সে সময়ে রাজ-অন্দরে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিতা ছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি ধর্ম্মগ্রন্থ ও পুরাতন পুঁথি পাঠে তাঁহার সাহিত্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যাইত। কোচবিহারের বর্ত্তমান জেঙ্কিন্স স্কুল পাঠশালার আকারে সর্ব্বপ্রথম মহারাণী কামেশ্বরী ও মহারাণী বৃন্দেশ্বরী কর্ত্তৃক ১২৬৩ বঙ্গাব্দে স্থাপিত হয়। মহারাণী বৃন্দেশ্বরী ১২৫৪ বঙ্গাব্দে প্রায় ১৭।১৮ বৎসর বয়সে বিধবা হন। তাঁহার আপন সন্তানাদি না হওয়ায় নরেন্দ্রনারায়ণকে পালকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। প্রায় ৪৫ বৎসর বয়সে ১২৮৩ সনে (৩৬৭ রাজশকা) তাঁহার মৃত্যু হয়।"

নব বর্ষ।

ভৈরবী—একতালা।

নূতন দিনে নূতন কথা,
  নূতন ব্যথা জানা'ব।
নূতন দিনে নূতন করে,
  মনকে তোমায় মানা'ব।
নূতন গানে নূতন তানে,
  নূতন প্রাণে দাঁড়াব।
নূতন করে নেব তোমায়,
  নূতন গীতি শুনাব।

এমনি করে নূতন করে
নেব তোমায় বারে বারে ;
পুরাতনের মাঝে কেবল
নূতনেরেই আনাব ॥

স্বরলিপি।

কথা ও সুর—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল, স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

২´ ৩ ০ ১
II II সদা -া দপা । মপা জ্ঞা -া । জ্ঞমা -া জ্ঞা । ঋা সা -া I
নূ॰ ॰ তন্ দি॰ নে ॰ নূ॰ ॰ তন্ ক থা ॰

২´ ৩ ০ ১
I ণ্া -া সমা । মা -া মজ্ঞা । মা -জ্ঞা পা । -মা পা -া I
নূ॰ ॰ তন্ ব্য ॰ থা॰ জা ॰ না ॰ ব ॰

২´ ৩ ০ ১
I পর্সা -া র্সা । ঋর্া ণা -া । র্সা -া দা । ণা পা -া I
নূ॰ ॰ তন্ দি নে ॰ নূ ॰ তন্ ক রে ॰

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা -া জ্ঞা । দা -া দপা । জ্ঞা -া ঋা । সা -া -া II
ম নু কে তো ॰ মায় মা ॰ না ব ॰ ॰

অন্তরা।

২´ ৩ ০ ১
II দা -া দা । দা ণা -া । দর্সা -া র্সা । র্সা র্সা -া I
নূ ॰ তন্ গা নে॰ ॰ নূ ॰ তন্ তা নে ॰

২´ ৩ ০ ১
I দা -া দা । ণা র্সর্জ্ঞা -া । র্জ্ঞা র্মা -া । র্জ্ঞা -ঋর্া -র্সা I
নূ ॰ তন্ প্রা ণে॰ ॰ দাঁ ড়া ॰ ব ॰ ॰

২ ৩ ০ ১
I র্সা -া র্সা । ঋর্া ণা -া । র্সা দা -া । ণা -া পা I
নূ ॰ তন্ ক রে ॰ নে ব ॰ তো ॰ মার

২´ ৩ ০ ১
I পা -া জ্ঞা । দা -া দাপ । জ্ঞা -া ঋা । -া সা -া II
নূ ॰ তন্ গী ॰ তি ত ॰ না ॰ ব ॰

সঞ্চারী।

২´ ৩ ০ ১

II ণ্‌া -া সা । সা সরা -া । জ্ঞা -া জ্ঞমা । মা মাপ -া I

এ ম্‌ নি ক রে ০ নূ ০ তন্‌ ক রে ০

২´ ৩ ০ ১

I জ্ঞা -া জ্ঞার । জ্ঞা জ্ঞার -া । মা জ্ঞা -া । ঋা সা -া I

জা ন্‌ ব ০ তো মা য় বা রে ০ বা রে ০

২´ ৩ ০ ১

I সাঁ সাঁ -া । ঋাঁ -া ণা । সাঁ দা -া । ণা -া পা I

পু রা ০ ত ০ নের না মে ০ কে ০ বল্‌

২´ ৩ ০ ১

I জ্ঞা -া জ্ঞা । জ্ঞদা -া দপা । জ্ঞা -া ঋা । ণা সা -া II II

নূ ০ ত নে ০ রেই আ ০ না ০ ব ০

চিররহস্য-সন্ধানে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুসজ্জিত নাট্যশালা; গৃহতল হইতে ছাউনি পর্য্যন্ত লোকে একেবারে লোকারণ্য; রঙ্গমঞ্চের সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনার্থ দর্শক-কক্ষের আলোকজ্যোতিঃ মৃদু করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং জনসঙ্ঘ আপনাপন রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা অভিনিবিষ্টচিত্তে কেহ বা অন্যমনস্কভাবে শুনিতেছে,—হ্যামলেটের সেই সুগ্রথিত প্রসিদ্ধ স্বগতোক্তি—"হয় কি না হয়"।

আজ সেক্সপীয়রের চিরনূতন নাটকপানির নূতনতর অভিনয় প্রচেষ্টার প্রথম রজনী; বিশেষতঃ, এ-নাটকের প্রধান ভূমিকায় যিনি আজ অবতীর্ণ, সুদক্ষ অভিনেতা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত।

এই নবীন হ্যাম্‌লেট অভিনয়-ভঙ্গী নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন অতি সুন্দর। স্বগতোক্তি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বপ্রথামত পাদচারণ না করিয়া ইনি উপবিষ্ট হইলেন এবং কয়েকমুহূর্ত্ত যেন আত্মগত চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গেলেন—পরে বিন্দুমাত্রও অবস্থা-পরিবর্ত্তন না করিয়া আরম্ভ করিলেন—"হয় কি না হয়, মরি কিম্বা বাঁচি, প্রশ্ন ইহাই এখন"।

ঐ ক্রমোচ্চারিত অমর পংক্তিগুলির সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য যতই স্পষ্ট ও ঘনীভূত হইতে লাগিল, তাঁহার কণ্ঠস্বরও যেন ততই গভীর ও তন্ময় হইয়া আসিল—

"মৃত্যু—না সে মহানিদ্রাগার ;—
নিদ্রা!—বুঝি দেখিতে স্বপন ; কে করে এ সমস্যা বিচার!
কে জানে রে কোন্ স্বপ্নছবি জুড়ে আছে মৃত্যু নিদ্রা-পট,
নীত হব কোন্ স্বপ্নদেশে ভাঙ্গিলে এ মর-দেহ-ঘট ? —
প্রশ্ন রয়ে যায় প্রশ্ন,—দীর্ঘশ্বাসে ছিন্ন চিন্তাহার !" ..

এইখানে ক্ষণকালের জন্য অভিনেতার কণ্ঠস্বর স্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল ; এবং সেই অত্যল্প অবসরটুকুর মধ্যে, বক্তা তাঁহার উক্তির সূত্র পুনরানুসরণ করিবার পূর্ব্বেই, নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে একটী নূতন লোক দর্শকমণ্ডলী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয় সারির একখানি শূন্য আসনে বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজোড়া কৌতূহলী দৃষ্টি তাঁহার উপর স্থাপিত হইল, কিন্তু দর্শক-কক্ষের প্রায়ান্ধকারে তাঁহার আকৃতি লক্ষিত হইতে না হইতেই হ্যামলেটের বিষণ্ণ-মধুর কণ্ঠস্বর আবার সকলকে আকৃষ্ট করিল—

"সাধ করে' কে সহিত আর
ক্লান্ত জীবনের এই পণ্ডশ্রম, ব্যর্থ হাহাকার,
অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন কোনো মহাভয়
ঘিরে যদি না থাকিত মৃত্যু-পরপার ?
সে অনাবিষ্কৃত দেশ, সে অজ্ঞাত দিক,
যেথা গেলে ফেরে না পথিক
বুদ্ধিকে স্তম্ভিত করে ; আর—
বরঞ্চ প্রস্তুত করে বহিতে এ জীবনের ভার
অজানা-কিছুর পানে, তবু—তবু দেয় না ছুটিতে !"...

দেখিতে দেখিতে ওফেলিয়ার সহিত সাক্ষাত-দৃশ্যে অভিনয় অগ্রসর হইয়া আসিল এবং সমগ্র অঙ্কটী এতই নৈপুণ্য ও ভাবাবেগের সহিত অভিনীত হইল যে চতুর্দ্দিক হইতে প্রশংসা-বর্ষণ চলিতে লাগিল ; ক্রমে ড্রপ পড়িল, আলোকমালা উজ্জ্বল হইল, ঐকতান বাজিয়া উঠিল, এবং যে নবাগত ভদ্রলোকটী ঐ চিরনবীন দার্শনিক স্বগতোক্তির মাঝখানে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার দিকে আবার কতকগুলি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইল।

লোকটী যে বাস্তবিকই দর্শন-যোগ্য তাহা আবিষ্কৃত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। সুরুচিসম্পন্ন নরনারীদের বিচিত্র আকারপ্রকার-দর্শনে অভ্যস্ত-চক্ষু আধুনিক লণ্ডন-সহর-বাসীদিগেরও কৌতূহল উত্তেজিত করিবার মত বিশিষ্টতা তাঁহার আকৃতিতে প্রচুর পরিমাণেই ছিল ; এত প্রচুর পরিমাণে যে তাঁহাকে দেখিবামাত্র মহিলা-পিঠ্ হইতে যে একটি আমেরিকান মহিলা কৌতূহল-দমন করিতে না পারিয়া একটু উচ্চস্বরেই তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া বসিয়াছিল তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই।

ভদ্রলোকটীর গাত্রচর্ম্ম তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভ,—আঁখিতারকা ঘনকৃষ্ণ, কিন্তু ভ্রূযুগলের ঘনকৃষ্ণ পক্ষ্মরাজির কোলে অনুস্রপ্রায়,—কৃষ্ণবর্ণ গুম্ফযুগলের নীচে ঈষৎ-বাঁকবক্র ওষ্ঠখানি অর্দ্ধলুকায়িত ;—কিন্তু মুখমণ্ডলের নানাস্থানে এই

সমস্ত কাঁচা ও কচি কৃষ্ণবর্ণ বিন্যাসসত্ত্বেও তাঁহার শিরোভাগের তরঙ্গায়িত কেশগুচ্ছ সম্পূর্ণ শুভ্রায়িত! বস্তুতঃ, তিনি বৃদ্ধ কি যুবক তাহা তাঁহার চেহারা দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না—কারণ, বয়োবৃদ্ধিজনিত কোনো দাগ বা কুঞ্চন সে মুখে না থাকিলেও এমন একটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাব ও গাম্ভীর্য্য তাহাতে ছিল যাহা কোনোক্রমেই যৌবনের সম্পদ হইতে পারে না। অথচ, বাহির হইতেও তাঁহাকে এতই দূরে অবস্থিত মনে হইতেছিল যে চতুর্দ্দিকের দর্শকবৃন্দ উত্তরোত্তর বিস্মিতই হইতে লাগিল—এমন কি বক্স হইতে মহিলারা অপেরা-গ্লাস সহযোগে এমনভাবে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল যে নিজে সে সম্বন্ধে সচেতন থাকিলে তিনি অস্বোয়াস্তি বোধ না করিয়া পারিতেন না। কিন্তু কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি হস্তস্থিত প্রোগ্রাম-পাঠেই নিযুক্ত ছিলেন,—দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন তাঁহার লোচনযুগল পক্ষ্মবহুল অক্ষিপল্লবের অন্তরালে অর্দ্ধনিমীলিত।

পূর্ব্বোক্ত আমেরিকান মহিলাটী পার্শ্বোপবিষ্টা জননীর বারংবার ভৎসনা-সত্ত্বেও এতই অভিনিবেশ সহকারে তাঁহার দিকে চাহিতেছিল যে থিয়েটার দেখার কথা বুঝিবা তাহার আর মনেই ছিল না; ঠিক এই সময়, জানিতে পারিয়াই হোক বা ঐ অবহিত পরীক্ষায় বিরক্ত হইয়াই হোক, ভদ্রলোকটী চোখ তুলিয়া পূর্ণদৃষ্টিতে মহিলাটীর দিকে চাহিলেন; আর তৎক্ষণাৎ সে বেচারীরও সর্ব্বাঙ্গ জড়সড় ও নয়নদ্বয় অবনত হইয়া পড়িল। মহিলাটী বোধ হয় তাহার চঞ্চল, নিশ্চিন্ত ও ক্ষুদ্র জীবনখানিতে সেরূপ অগ্নিবর্ষী, অত্যুজ্জ্বল ও কৃষ্ণতার-নয়ন-দীপ্তি আর কখনও দেখিতে পায় নাই। সে-দৃষ্টিতলে তাহার কেমনএকটা অস্বস্তি বোধ হইল, সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল—গাত্রাচ্ছাদনখানি ভাল করিয়া অঙ্গে জড়াইয়া সে জননীর দিকে আরও সরিয়া বসিল, এবং ঐ আগন্তুকের দিকে আর একবারও চাহিতে সাহস করিল না।

অনতিবিলম্বেই আগন্তুক তাহার মুখ হইতে আপন মর্ম্মভেদী দৃষ্টিটুকু সরাইয়া লইলেন—কেননা, ড্রপ উঠিয়া-গিয়াই ইতমধ্যে দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইয়াছিল।

এ-অঙ্কের অবসানে পুনরায় ড্রপ পড়িবামাত্র তৃতীয় সারি হইতে এক চঞ্চল-প্রকৃতি শীর্ণ-সুন্দর যুবক দ্বিতীয় সারির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আগন্তুকটীর গাত্রস্পর্শ করিয়া বলিয়া উঠিল—"একি ব্যাপার এল র‍্যামি, তুমি এখানে—থিয়েটারে? এসব তুচ্ছ ব্যাপারে তোমার আসক্তি আছে, তা' তো কৈ জানতুম না"।

"হ্যামলেট তোমার বিবেচনায় তুচ্ছ?" বলিতে বলিতে ভদ্রলোকটী কর-কম্পনের জন্য গাত্রোত্থান করিলেন।

বেশ বড়রকমের একটী হাই তুলিয়া যুবক বলিল—"না, তা' ঠিক নয়; তবে সত্যি কথা বলতে কি, ও-লোকটাকে আমার অনন্ত একঘেয়েই মনে হচ্ছে"।

"হচ্ছে নাকি?"—ঈষৎ হাসিয়া এল র‍্যামি নামে সম্ভাষিত ভদ্রলোকটী উত্তর করিলেন—"অবশ্য, ও-বয়সে তাই মনে হওয়াই স্বাভাবিক; সম্ভবতঃ কোনো হাস্যকৌতুককর অভিনয়ই তুমি অধিকতর পছন্দ করছে?"

"মনের কথা যদি খুলে বলতে হয়, তবে তা' অস্বীকার করবো না। এখন ভাবছি যে এখানে না এলেই ভাল করতুম। আজ রাত্রে 'এম্পায়ারে' যাওয়াই ঠিক করেছিলুম—সেখানে একটা চমৎকার প্রহসন ছিল—কিন্তু ক্লাবে কোনো বন্ধু এইখানকার টিকিট দিয়ে বললেন যে আজ 'প্রথম অভিনয় রজনী'—সেইজন্যেই—"

"সেইজন্যেই অদৃষ্টের ফেরে"—এল র‍্যামি সহসা থামিয়া গেলেন। পরে বলিলেন—"কোথায়, এতক্ষণ 'এম্পায়ার' থিয়েটারে বসে' অর্দ্ধউলঙ্গ সুন্দরীদের নাচগানের তারিফ করবে, তা' না হয়ে কিনা এখানে এসে ভেবেই পাচ্ছ না যে দুনিয়ার এত জিনিস থাকতে ঐ হ্যামলেট নামক গাধাটা কিজন্যে তার পিতার [illegible]

নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছে ! ঠিক্ কথা ! তবে কিনা, এখানেও তোমার আগমন যে নিতান্ত উদ্দেশ্যহীন হয়েছে, তা' নয়"—সহসা কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মৃদু করিয়া যেন চুপিচুপি কথা কওয়ারই ভঙ্গীতে তিনি বলিলেন—"চেয়ে দেখ !—ঐযে, ঐদিকে—ভাল করে' দেখে নাও—উনিই হচ্ছেন তোমার ভাবী পত্নী"—এইখানে পূর্ব্বকথিতা আমেরিকান কিশোরীটীর উদ্দেশ্যে ইঙ্গিত করিয়া তিনি বলিতে লাগলেন—"হাঁ, হাঁ, ঐ-নীলবসনা নিবিড়-কৃষ্ণ-কেশা সুন্দরীটী। চেনাশুনো নেই ওঁর সঙ্গে ? না, নিশ্চয়ই নেই—কি হবে। আজ রাত্রেই এখান থেকে যাবার আগে তোমাদের পরিচয় হয়ে যাবে। ওকি, চম্‌কে উঠো না,—এর মধ্যে আশ্চর্য্য কিছুই নাই ! অতি নিরীহ প্রাণী উনি, 'মিস্ চেষ্টার' মাত্র—আর উনি হচ্ছেন নিউ-ইয়র্কের নবীন ধনকুবের জ্যাবেজ চেষ্টারের একমাত্র দুহিতা। মাসখানেকের মধ্যেই তুমি বিবাহের প্রস্তাব করবে, উনিও তা' মঞ্জুর করবেন—বাস্ ! তা' এ-সম্বন্ধ তোমার পক্ষে বেশ ভালই হবে—দেনাপত্তর যা' কিছু তোমার আছে দুদিনেই শোধ হয়ে যাবে, এর চেয়ে আর সুবিধার কথা কি হ'তে পারে। মনে রেখো, আমিই সর্ব্বপ্রথম তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

যুবক শঙ্কিত-বিস্ময়ে এতক্ষণ বক্তার দিকে চাহিয়াছিল,—তাঁহার কথা শেষ হইতেই কতকটা বিহ্বলভাবে বলিল—"এল র‍্যামি ! এটা একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে—মধ্যে মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারা অবশ্য খুবই ভাল, কিন্তু তা' নিষ্ফল করাও চলে।"

"যেতে দাও ! ড্রপ উঠ্‌ছে,—অসহ্য একঘেয়ে হলেও হ্যামলেটের প্রতি মনোযোগ করতে আপাততঃ আমরা বাধ্য" বলিয়া এল র‍্যামি মুখ ফিরাইলেন ও পরক্ষণেই উপবিষ্ট হইলেন।

প্রত্যুত্তরে যুবকটীও একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া আপন আসনে বসিয়া পড়িল, কিন্তু তাহাকে কতকটা বিরক্ত ও বিহ্বল দেখাইল। যে-কিশোরীকে এইমাত্র তাহার ভাবী পত্নীরূপে এত অনায়াসে ও এত দৃঢ়তার সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল, এল র‍্যামির পশ্চাতে হইতে আপনাআপনিই তাহার দৃষ্টি যেন সেইদিকে ধাবিত হইতে লাগিল।

বিরক্তভাবে সে ভাবিতে লাগিল,—"ও-মেয়েকে আমি চিনিও নে, চিন্‌তে চাইও নে ; না, কখনই ওর পরিচয় নেবো না—কখ্‌খনো না। ইচ্ছাই তো সব—অন্ততঃ এল র‍্যামিও তো তাই বলে। নিজের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে এ-লোকটা ভারী আস্থাবান্,—সে আস্থা আমিই এবার ঘুচিয়ে দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দেবো যে তার উক্তি মিথ্যেও হয়।"

সেক্সপীয়রের বিয়োগান্ত নাটকখানির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার থাকিয়া কতক্ষণ যে সে উক্তরূপ সংকল্পে বিভোর ছিল, সে বিষয়ে তাহার নিজেরই হুঁস ছিল না—কিন্তু ওফেলিয়ার সমাধি-দৃশ্যের অবসানে তাক্ত-আসন এল র‍্যামিকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া, সেও তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল—"যাচ্ছ নাকি ?"

"হ্যাঁ,—এ-নাটকে হ্যামলেট বা অপর কারুর পরিণাম দেখাবার আগ্রহ আমার একটুও নেই। শেষকালের ঐ হঠাৎ-খুনোখুনি ব্যাপারটা আমার আদৌ ভাল লাগে না ; ও-ভাগটা কলাচাতুর্য্যহীন।"

"সেক্সপীয়র কলাচাতুর্য্যহীন ?" যুবক প্রশ্ন করিল।

"ক্ষতি কি, যদিই বা কোথাও কোথাও তা' হয় ? অসাধারণ মনীষা-সত্বেও তিনি মানুষই ছিলেন, দেবতা নয়—কিন্তু সে যা' হোক্ তুমিও যাচ্ছ নাকি ?"

"নিশ্চয় ; ভবিষ্যদ্বক্তা বলে' তোমার যে খ্যাতি আছে, সেটা আমি নষ্ট করতে চাই। অর্থাৎ অন্ততঃ আজকের রাত্রে, তোমার ঐ মিস্ চেষ্টারের সঙ্গে যাতে আমার কোনোমতেই পরিচয় না ঘটে, তার চেষ্টা আমাকে করতেই হইবে।"

যুবক হাসিল, কিন্তু এল র‍্যামি চুপ করিয়া রহিলেন।

অতঃপর উভয়েই দর্শকমঞ্চ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং টুপি ও ওভারকোট লইবার জন্য বহির্কক্ষে উপস্থিত হইলেন। এই পরিচ্ছদাগারের কর্ম্মচারীটী অভ্যস্ত তৃষ্ণা-নিবারণার্থ সম্ভবতঃ তখন কোনো নিকটবর্ত্তী পানশালায় গমন করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহাদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে হইল। যুবক ইত্যবসরে একটী সিগার ধরাইয়া সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যামলেট্‌কে কেমন বোধ হল, বেশ ভাল অভিনেতা কি ?"

"চমৎকার!" এল র‍্যামি উত্তরে জানাইলেন। "এ অভিনেতাটীর উদ্ভাবনী-শক্তিও যেমন, অভিনয়-দক্ষতাও তেম্‌নি। হ্যামলেট-চরিত্রের জটিলতা সম্বন্ধে ইনি যথেষ্টই সজ্ঞান; কিন্তু এঁর সহকারী-অভিনেতারা নিতান্ত কাঁচা—সেই জন্যেই হ্যামলেট স্বয়ং যেখানে অনুপস্থিত সেখানে অভিনয় 'জমাটি' হচ্ছিল না। কিন্তু অভিনয় যেমন করেই করা হোক না কেন, 'হ্যামলেট' চিরদিনই উপভোগ্য। আশ্চর্য্যরকম অসঙ্গতও বটে, তবে প্রাণস্পর্শী।

"অসঙ্গত ? কি রকম ?" কুণ্ডলাকৃতি ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে কর্ম্মচারীর প্রত্যাবর্ত্তন-বিলম্বে অধীর যুবক প্রশ্ন করিল।

"অনেক রকমে। সম্ভবতঃ সব চেয়ে বড় অসঙ্গতি ঐ স্বগতোক্তিটুকুর মধ্যেই পাওয়া যাবে।"

"তাই নাকি ?" যুবক কৌতূহলী হইয়া উঠিল। "আমার তো ধারণা ছিল যে ঐটেই সমস্ত নাটকের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ।"

"তাতে সন্দেহ নেই। আমি পংক্তিগুলির কথা বল্‌ছি নে, কেননা তা বাস্তবিকই চমৎকার; কিন্তু হ্যামলেটের চরিত্রের সঙ্গে ও-উক্তির যোগাযোগ কতটা সঙ্গত, তারই কথা বল্‌ছি। সে অনাবিষ্কৃত দেশ, সে অজ্ঞাত দিক—যেথা গেলে ফেরে না পথিক'—এ কথা সে কেমন করে' বল্‌তে পারে, যখন নাকি তার পিতারই প্রেতাত্মার ফিরে আসা-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সে পেয়েছে, অন্ততঃ তার বিশ্বাস যে পেয়েছে; এমন কি, ঐ প্রত্যাবর্ত্তনকে ভিত্তি করেই যখন সে তার উক্তিগুলিকে খাড়া করছে ? এটা অসঙ্গত বোধ হয় না কি ?"

"নিশ্চয়ই হয়,—কিন্তু আমি এটা ভেবেই দেখিনি"—বিস্মিত কৌতূহল যুবক বলিল—"শুধু আমিই বা কেন, আমার বিশ্বাস, এক তুমি ছাড়া আর কেউই এ কথা তলিয়ে দেখেনি। হাঁা, নিশ্চয়ই এটা অমার্জ্জনীয়—সে বলেছেই তো 'ফেরে না পথিক'—তা' ছাড়া পিতার প্রেতাত্মা দেখাবার পর বলেছে।"

"ঠিক্"—উৎসাহের সহিত এল র‍্যামি বলিতে লাগিলেন—"তার পর দেখ, মৃত্যুর পর সে একটা মহাভয়ের কথা বলেছে;—এমনভাবে,—যেন সেটা শুধু 'ভয়'ই; সত্য নয়। অপর পক্ষে পিতার প্রেতাত্মাকে যদি তার বিশ্বাস করতে হয় (বিশেষতঃ, যখন তার নিজেরই মতে সে আত্মা অতি ভদ্র) তা' হ'লে ও-বিষয়ে সংশয়ের তো অবকাশই থাকে না। সে প্রেতাত্মা কি বলেনি—

"........নিষিদ্ধ না হোত যদি
কারা-নিবাসের সেই রহস্য-প্রকাশ,

পারিতাম শুনাইতে এমন কাহিনী,
শ্রবণে পশিলে, পুত্র, কণামাত্র যার
পলকে শতধা দীর্ণ হোত আত্মা তোর ;
তপ্ত রক্ত হৃদ্‌পিণ্ডে হইত জমাট ;
আঁখি-তারা কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের প্রায়
খসিয়া ছুটিত বেগে মহাশূন্য-পথে ;
গ্রন্থিবদ্ধ গুচ্ছ গুচ্ছ ঐ কেশরাজি
একে একে খাড়া হয়ে উঠিত নিশ্চয়
দারুণ বিস্ময়ে আর ভয়ে কণ্টকিত......

ভীতি বিবর্ণ-মুখে বক্তার সান্নিধ্য হইতে কয়েক পদ পিছাইয়া গিয়া যুবক বলিল "দোহাই তোমার এল র‍্যামি অমন করে' আমার পানে চেও না !"

এল র‍্যামি মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"ভয় পেয়েছো নাকি ? যাক্, কিছু মনে ক'রো না—একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলুম। এখন আমার মোট কথা হচ্ছে এই যে এখানেও হ্যামলেট অসঙ্গতি-দুষ্ট, অর্থাৎ সেক্সপীয়র বেশ যুক্তির সঙ্গে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখেন নি।"

যুবক তখনও সশঙ্কিত বিস্ময়ে বক্তার দিকে চাহিয়াছিল ; প্রত্যুত্তরে সে বলিল—"তুমি তো একজন চমৎকার অভিনেতা হ'তে পার দেখ্‌ছি! এইমাত্র তুমি এমনভাবে কথাগুলো উচ্চারণ করলে, যেন তুমিই সেই প্রেতাত্মা !"

"অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য হয়েছিলুম। ফলকথা, হ্যামলেট আমার কাছে একখানা ভেবে পড়বার মতন বই বলেই মনে হয়। আমার মতন বয়সে তোমরাও হয়তো হবে।"

"তোমার মতন বয়েসে ? অবশ্য বয়েসটা জান্‌লে মন্দ হোত না—কিন্তু দুঃখের বিষয় কেউই তা' জানে না। কে বল্‌বে, তোমার বয়েস তিরিশ কি একশো ?"

"কি দুশো—না, তারও বেশী—তিনশো। কিন্তু যাক্—কালের ঢেউ গুণে লাভ নেই, যেহেতু আমাদের কর্ম্মচারী মশাই এতক্ষণে হেলেদুলে আস্‌ছেন দেখ্‌ছি"—বলিয়া এল র‍্যামি দ্বারের দিকে ফিরিলেন।

কর্ম্মচারীটীও এই সময় প্রবেশ করিয়া ও দুটী ভদ্রলোককে তাহারই প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান দেখিয়া, নিজের বাহাদুরী-সম্বন্ধে যথেষ্টই প্রীত হইল।

"নাও, চল এইবেলা কোট নিয়ে সরে পড়া যাক্ ; নইলে, চাই কি তোমার ভাগ্যে এই রাত্রেই চেষ্টার-দুহিতাটী পুরস্কার-স্বরূপ মিলে যেতে পারে। ভাগ্য জয় করতে পারায় আনন্দ আছে—অবশ্য যদি পারা যায়"—এল র‍্যামির উজ্জ্বল চোখ দুটী হাসিয়া উঠিল এবং কোট গায়ে দিতে দিতে যুবকটী সন্দিগ্ধ আশঙ্কায় তাঁহার দিকে চোখ তুলিল।

ঠিক এই সময় প্রফুল্লকণ্ঠে পশ্চাৎ হইতে উচ্চারিত হইল—"এই যে এখানে ভেগান—বাঃ, বেশ হয়েছে"—পরক্ষণেই সুন্দর-দর্শন একটী প্রৌঢ় ভদ্রলোক দুইজন মহিলা-সহ পরিচ্ছদাগারে প্রবেশ করিয়া বলিল—"ভেগান, ঠিক তোমাকে দেখ্‌তে পাওয়াই আমার দরকার ছিল। হ্যামলেটকে যুদ্ধের গোলোযোগের মধ্যে ফেলে রেখে

আমরা চলে আসছি, কেন না অন্যত্র এক বল-নাচে এখনি যেতে হবে—চল, তুমিও চল আমাদের সঙ্গে। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে আমার বন্ধু-দুটীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করে দিই—চেষ্টার-পত্নী, চেষ্টার-দুহিতা—স্যার ফ্রেডারিক ভেগান।"

মুহূর্ত্তকালের জন্য ভেগান বিস্ময়-স্তব্ধ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়বৎ দাঁড়াইয়া রহিল; পরক্ষণেই আত্মস্থ হইয়া পরিচিতা-যুগলকে প্রত্যভিবাদন জানাইল। যাঁহার নিকট সে অশেষ প্রকারে ঋণী, এবং কোনোরূপ অবাধ্যতায় যাঁহাকে অসন্তুষ্ট করা ভেগানের সাধ্যাতীত, তাহার সেই খুল্লতাত ভ্রাতা লর্ড মেনথর্পই যে এমন সহসা চেষ্টার-পরিবারের সহিত তাহার পরিচয় ঘটাইবেন তাহা সে ধারণাও করে নাই। যথাবিধি নমস্কার-বিনিময় শেষ হইবামাত্র সে বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে পূর্ব্ব সঙ্গী ভবিষ্যদ্বক্তাটীর অন্বেষণে পার্শ্বের দিকে চাহিল,—কিন্তু কোথায় সে এল র‍্যামি? আপন ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্য-সূচনা দেখিয়া বিদায়-সম্ভাষণ না জানাইয়াই তিনি সরিয়া পড়িয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুখানি হাস্য-বিচ্ছুরিত চক্ষু ভেগানের চোখের দিকে তুলিয়া, তাহার সাহায্যে গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে মিস্ চেষ্টার জিজ্ঞাসা করিল—"এইমাত্র চলে গেলেন, কে ও ভদ্রলোক? লোকটী যেমন অদ্ভুত-দর্শন, তেমনি ভয়ানক!"

বর্ণনা শুনিয়া ভেগান হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, লোকটীর চেহারায় যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে বটে,"—সহসা বাধা দিয়া লর্ড মেনথর্প বলিয়া উঠিলেন—"এল র‍্যামির কথা বল্‌ছো? এল র‍্যামিই দাঁড়িয়ে ছিল না? হ্যাঁ, সেই তো; তা' এমন হঠাৎ চলে গেল কেন? থাক্‌লে মন্দ হোত না—লোকটী ভারী উপভোগ্য।"

"কিন্তু কে উনি?"—মিস্ চেষ্টার জিজ্ঞাসা করিল। এখন সে নিজের ব্রাহাম-খানির মধ্যে মাতার পার্শ্বে সুখোপবিষ্টা,—সম্মুখে উপাধি-গৌরবে ভূষিত দুটী ভদ্রসন্তান,—অবস্থাটী ও-বয়সের উচ্চাভিলাষ ও কামনার দিক হইতে যথোপযুক্ত সন্দেহ নাই। "আপনারা দুজনেই দেখ্‌ছি সমান মজার মানুষ! লোকটী যে কে, তা' যদি কেউ খুলে বলবেন, 'উপভোগ্য' যে, তা' তো দেখতেই পাওয়া যায়। ও-রকম সাদা চুল, অথচ কালো চোখ যে উপভোগ্য না হয়ে যায় না, সে তো সবাই জানে!"

উত্তরে লর্ড মেনথর্প কৌতুকভরে বলিলেন—"তার কি মানে আছে; এক রকম জানোয়ার দেখ্‌তে পাওয়া যায় যাদের গায়ের লোম সাদা অথচ চোখের তারা ভয়ানক লাল; কিন্তু"—

মধুর হাসিয়া কুমারী বাধা দিল—"বিষয়ান্তরে গিয়ে আমার প্রশ্নটা চাপা দেবেন না, কেন না তা' হলে ও-লোকটীর সম্বন্ধে আমি অজ্ঞই থেকে যাবো,—কি নাম বল্‌লেন, এল র‍্যামি না? কি বিশ্রী নাম—আরবী বোধ হয়?"

হ্যাঁ, খাঁটী আরবী"—লর্ড মেনথর্প জানাইলেন,—কিন্তু প্রাচ্যপ্রদেশ থেকে লোকটী কবে যে এখানে এসেছিল আর কেনই বা এসেছিল, তা' আমার বিশ্বাস—কেউই বল্‌তে পারবে না। সমাজে দু'তিনবারের বেশী আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটেনি, কিন্তু তারই মধ্যে অনেক লোককে সে বিস্মিত ও কৌতূহলী করে তুলেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে আমার স্ত্রীই তাকে একজন অসাধারণ লোক মনে করেন। অনেকবার তাকে নানা উপলক্ষে নেমন্তন্ন করা হয়েছে, কিন্তু সে বড় একটা কোথাও আসে না।"

কুমারী জিজ্ঞাসা করিল—"কিন্তু কি করে ও? ছবি আঁকে, না বই লেখে?"

"আমি যতদূর জানি, ওর একটাও সে করে না। বস্তুতঃ ও যে কি নিয়ে আছে বা কেমন করে' চালায় তার কিছুই আমি জানিনে। আমি যতদূর জানি তাতে মনে হয় যে লোকটা ভেল্কিবাজ—একরকম সখের ঐন্দ্রজালিক আর কি!"

"বটে!"—স্থূলাঙ্গী চেষ্টার-পত্নী যথেষ্ট কৌতূহলী হইয়া গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বলিলেন—"বৈঠকে বৈঠকে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়ায় বুঝি?"

উত্তরে লর্ড মেলথর্প বলিলেন—"না, মা, সে সব কিছু নয়; আমি ঠিক বোঝাতে পারিনি দেখ্‌ছি। আমার বক্তব্য ছিল এই যে লোকের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা বলতে পারে"—

"ও, বুঝেছি—হাত দেখে তো"—উৎফুল্ল কণ্ঠে কুমারী চেষ্টার বলিয়া উঠিলেন—"করকোষ্ঠী-গণনায় বাস্তবিকই খুব চাতুর্য্য আছে; ও-উপায়ে আমিও কিছু কিছু বলতে পারি!"

"পারেন নাকি?" সস্নেহে হাসিতে হাসিতে মেলথর্প বলিলেন—কিন্তু এল র‍্যামি হাতটাত কিছু দেখে না, সে মানুষের আকার প্রকার ভাবভঙ্গী দেখেই বিচার করে। অবশ্য এটা তার ব্যবসা নয়, তবে যখন তখন সে এম্‌নি ক'রে ভাবী ঘটনার আভাস দিয়ে দেয়।"

"একথা খুবই ঠিক"—সহসা আপন অন্যমনস্ক ভাবটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া সম্মুখে উপবিষ্টা কিশোরীটীর উদ্দেশ্যে ভেগান বলিয়া উঠিল—"তার একএকটা ভবিষ্যদ্বাণী যেমন নিখুঁত তেমনি আশ্চর্য্য!"

ভেগানের সাগ্রহ ও সানুরাগ দৃষ্টি যেন লক্ষ্যই করে নাই এম্‌নিভাবে দস্তানার বোতাম আঁটিতে আঁটিতে কিশোরী বলিল—"তাই নাকি? সুন্দর তো?—একদিন জিজ্ঞাসা করিতে হবে যে আমার বরাতে কি লেখা আছে—একটা ভয়ানক কিছু যে আছে তাতে অবশ্য সন্দেহই নেই। উঃ, কি ভয়ানক তার চাউনি,—থিয়েটারে একবার আমার দিকে চেয়েছিল"—

বাধাদিয়া চেষ্টার পত্নী বলিলেন—"তুমিই তো আগে চেয়েছিলে বাছা?"

"তা' হোক মা, কিন্তু আমার চাউনিতে সে যে ভয় পাইনি সেটা নিশ্চয়। আর সে যখন আমার দিকে চাইলে, তখন আমার মনে হল যেন কেউ আমার পিটের শিরদাঁড়ার বরফের জল ঢেলে দিচ্ছে—এম্‌নি হাড়-হিম-করা চাউনি সে!...বোতামটা এঁটে দাও তো মা"—বলিয়া কিশোরী তাহার জননীর দিকে হাত বাড়াইয়া দিতেই ভেগান সসম্ভ্রমে কহিল—"যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমিই"—

"বেশ তো, আপনিই দিন না—অবশ্য যদি আপনার জানা থাকে যে ভাঙা বোতাম কি করে' আঁটতে হয়" ব'লয়া কিশোরী ভেগানের দিকেই হাত সরাইয়া আনিল। তাহার সহাস্য মুখখানিও সেই সঙ্গে ঈষৎ লজ্জারক্তিম হইয়া উঠিল।

"দেখি চেষ্টা করে"—যথোচিত নম্র বচনে ভেগান বলিল—"কৃতকার্য্য হলে আশা করি বল-নাচে আপনার সহযোগীতা"—

"আনন্দের সহিত!" বলিয়া কিশোরী আর একবার রাঙা হইয়া উঠিল।

তৃপ্ত কণ্ঠে লর্ড মেলথর্প বলিলেন—"তুমিও যাচ্ছ তা' হ'লে? বেশ কথা। কিন্তু আমি যখন যেতে বল্লুম, তখন 'হ্যাঁ' কি 'না' কিছুই বল্লে না তো"

"বলিনি নাকি? তা' হবে। সম্ভবতঃ এল র‍্যামির প্রভাব তখন আমায় আচ্ছন্ন রেখেছিল"—বলিয়া ভেগান বোতাম আঁটা শেষ করিল।

* * * * *

উক্তবৎ কথোপকথনের বিষয়ীভূত ভদ্রলোকটী ইতিমধ্যে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন; তাঁহার পদক্ষেপ দৃঢ়, ক্ষিপ্র, অথচ ব্যস্ততা-লেশ-পরিশূন্য। দ্বিপ্রহর বাসন্তী রজনী; সুখস্পর্শ সমীর প্রবাহিত; মেঘলেশহীন স্বচ্ছ নীলাকাশে নক্ষত্রমালার দীপ্তি-সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনে হইতেছে যে এস্থান যেন ঘনঘটাচ্ছন্ন বিপুলকায় লণ্ডন-সহর নয়, পরন্তু হাস্যময়ী তন্বী ফ্লোরেন্স-নগরী। এল র‍্যামি পুনঃ পুনঃ উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্নিগ্ধোজ্জ্বল ছায়াপথখানির দিকে চাহিতেছিলেন, কারণ এদেশে ঐ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থটীর দর্শন সৌভাগ্য কচিৎ ঘটে। নিজের কথা ভাবিতে ভাবিতেই তিনি চলিয়াছেন,—পথের দুধারে বহুসংখ্যক পথিক যাতায়াত করিলেও তাঁহার আত্মবিভোর ভাবটীর পক্ষে কোনোই বাধা ঘটিতেছে না, এমন ভাবে তিনি চলিয়াছেন যেন পৃথিবীতে শুধু তিনিই বর্ত্তমান, আর বাদ বাকী যা' কিছু, সমস্তই ছায়া।

"কি নির্ব্বোধ এই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষগুলো!" তিনি ভাবিতে ছিলেন—"কতই না সহজে তা'রা প্রতারিত হয়! আমার ভবিষ্যদ্বাণী শুনে ভেগান এমনি আশ্চর্য্য হয়ে গেল যেন ব্যাপারটা 'দুই-দুগুণে চারের' মতই সহজ নয়! গণিতের সংখ্যাগুলিরই মত লোকচরিত্র আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে—যথাকালে তাদের যোগফল একটা মিলিবেই।

ঐ ভেগানের বিবাহ ব্যাপারই ধরা যাক্। দু'দিন আগে মেলথর্পের মুখে শুনলুম যে চেষ্টার-দুহিতার সঙ্গে ভেগানের বিয়ে দিতে সে ইচ্ছুক; কিছুক্ষণ বাদে কুমারীটীও সেখানে শুভাগমন করায় চিনে নেওয়া গেল যে সে কি ধাতের মেয়ে। আজ রাত্রে থিয়েটারে তাকে আবার দেখলুম—তা' ছাড়া বিপরীত দিকের বক্সে লর্ড মেলথর্পেকেও দেখা গেল। তারপর, ভেগান নামক ঐ যুবকটী, যার প্রকৃতি আমার বিবেচনায় এতই নরম যে, যে-কোনো চিত্তশক্তি-সম্পন্ন লোক ইচ্ছামাত্রই তাকে যে-কোনো দিকে ফিরিয়ে নিতে পারে, তাকেও আমার পাশেই পাওয়া গেল। এরপর বাদবাকী যোগ-ফলটী গড়ে তোলা আমার পক্ষে যে খুবই সহজ হবে তাতে আর সন্দেহ কি? প্রথমতঃ পাওয়া যাচ্ছে মোষের মতন একগুঁয়ে মেলথর্পকে; দ্বিতীয়তঃ কোনোরকম জেদের বালাই-শূন্য ভেগানকে; তৃতীয়তঃ, উপাধি-গত-প্রাণা সুন্দরীটীকে।—এ অবস্থায় ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বিবাহ নিশ্চিত। সন্দেহ যা' কিছু ছিল সেটা আজ রাত্রেই ও-বিবাহের সূচনা-সম্বন্ধে; কিন্তু সকলেই যখন উপস্থিত, তখন উদ্বৃত্ত ভগ্নাংশ হিসাবে বাকীটুকুও ধরে নেওয়া গেল—চারিত্রিক অঙ্কে এরকম ভগ্নাংশ কিছু না কিছু থেকে যায়, তা' তাকে দৈবই বল আর অদৃষ্টই নাম দাও। সাহস ক'রে ওখানটাতেও এগিয়ে গেলুম, জিতও হলো। বস্তুতঃ, এ-সব তুচ্ছ বিষয়ে আমার হার হয় কচিৎ। এগুলোকেও যে লোকে ভবিষ্যদ্বাণী বলে মেনে নেয়, তার কারণ মূর্খেরা নিজে ভাবতে চায় না। হায়রে—শূন্যে নিক্ষিপ্ত হবার পর থেকে আমাদের এই পৃথিবীটা কি ভয়ানক অজ্ঞতা ও স্বেচ্ছাবৃত নির্ব্বুদ্ধিতাতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে! এ অজ্ঞতার সীমা নেই, সংখ্যা নেই!...কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? কোন্ উন্নতির আশায়? কি পরিণাম-লক্ষ্যে?"

হাইড-পার্কের সন্নিকটে আসায় কিছুক্ষণের জন্য থামিয়া তিনি পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিলেন,—দেখা গেল, রাত্রি প্রায় বারোটা হইয়াছে।' অকস্মাৎ পশ্চাত হইতে তাঁহার পৃষ্ঠে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগিল এবং কে-একটা লোক তাঁহার হস্ত হইতে ঘড়ীটী ছিনাইয়া লইবার সঙ্গেসঙ্গেই দারুণ চীৎকার-শব্দে অসাড় ও চলৎশক্তি-হীন হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এল র‍্যামি প্রশান্তভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল লোকটীকে দেখিলেন; পরে ধীর-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি জন্যে এমন কাজ করলে বন্ধু?"

লোকটা শূন্যদৃষ্টিতে প্রশ্নকর্ত্তার দিকে চাহিল, কিন্তু তাহার উত্তর দিবার শক্তি ছিল বলিয়া বোধ হইল না। প্রসারিত অসাড়-হস্তে মুষ্টি-বিধৃত ঘড়ীটী লইয়া সে নির্ব্বাক দাড়াইয়া রহিল।

"আমার ঐ যৎসামান্য সম্পত্তিটুকু আমাকেই দিয়ে ফেল"—মৃদুহাস্যসহ এই কথা বলিয়া এল র‍্যামি তাঁহার আততায়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং একে একে তাহার আঙ্গুলগুলি শিথিল করিয়া ঘড়ীটী পুনরায় বাহির করিয়া লইলেন। ছাড়িয়া দিবামাত্র চোরটীর হাতখানা অবশভাবে পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়িল, কিন্তু সে পূর্ব্ববৎ সেইখানেই খাড়া থাকিয়া কাঁপিতে লাগিল।

"এটা নিজের কাছে রাখা তোমার পক্ষে সুবিধাজনক হোত না বলেই ফিরিয়ে নিলুম—চোরাই মাল একটা বিরক্তিকর জিনিস বলেই আমার বিশ্বাস। একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ কর্চ্ছ—না? সংঘর্ষজনিত একটু কম্পন ছাড়া ও বিশেষ কিছু নয়—এখুনি সেরে যাবে। টরপেডোর কথা শুনেছো আশা করি; যদি শুনে থাক তবে জেনো যে আমাদের এই বৈজ্ঞানিক যুগে অনেক মানুষ-টরপেডোও পথে ঘাটে দেখা যায়, আর আমি হচ্ছি তাদেরই একজন। যাকে তাকে স্পর্শ করবার আগে একটু সাবধান হওয়া ভাল—বুঝলে? যাক্—এখনি সেরে যাবে, ভয় নেই!"

কথাগুলি বলিয়া এল র‍্যামি এমনভাবে লোকটার দিকে চাহিলেন, যেন সে একটা ব্যাং কি গবরেপোকার চেয়ে উন্নততর জীব নয়। সর্ব্বাঙ্গে একটা অনুনয়ের ভঙ্গী প্রকাশ করিয়া সে বেচারী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিয়া উঠিল—"পুলুশের হাতে মোরে ধরায়ে দিবুন না, দোহাই আপনাদের—মুই আজ তিনদিন খাতি পাইনি।"

"না, না—তুমি দিব্যি খেতে পেয়েছো; মিথ্যে কথা কেন বলছো বন্ধু। ও একটা মহা ভুল—চুরি করার চেয়ে কিছু কম নয়। অভ্যাস করলে ও-দুইই তোমার পক্ষে কষ্টের কারণ হবে, অথচ দুঃখ এড়িয়ে চলাই হচ্ছে আধুনিক জীবনের লক্ষ্য। এমন নাদুসনুদুস চেহারা কি উপোস করে' মেলে!" বলিয়া এল র‍্যামি লোকটার হাতের গুলো-দুটো একটু টিপিলেন; পরে আবার বলিতে লাগিলেন—"আজই তুমি এতটা মাংস হজম করেছো যা' সাতদিনেই আমি পেরে উঠিনে। তা,' চালাবে একরকম মন্দ নয়; তুমি বেশ একজন পাকা চোর,—একরকম উকিল আর কি! তফাৎ এই যে, দলিলপত্তর আর ফিতের সাহায্যে বেশ সভ্যধরণে বেঁচে থাকবার অধিকার ঘোষণা না করে', কতকটা অভদ্রভাবে ঘড়ী চুরি করবার চেষ্টায় তুমি তা' প্রমাণ করতে চাও। এ-আচরণ সরল সন্দেহ নেই, তবে সভ্য নয়—সুতরাং নীতিবিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় অচল। বিরক্ত হচ্ছ? আচ্ছা, তা' হলে আসি"—

এল র‍্যামি গন্তব্য অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, এবং লোকটা হতভম্বভাবে দাঁড়াইয়া, ও কতক ভয়ে কতক বা বিস্ময়ে এল র‍্যামির দিকে বারকয়েক চাহিয়া আপন মনে বিড় বিড় করিতে করিতে একদিকে ছুট দিল।

"মূর্খ—মূর্খ সব"—বিচ্ছিন্ন চিন্তাসূত্র পুনর্গ্রহণ করিয়া এল র‍্যামি ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন—"চোর চুরি করে, খুনী হত্যা করে, কুলীরা খেটে সারা হয়, আর নর-নারী পরস্পর আসক্ত হয়ে বেঁচে থাকে, পরে মরে যায়,—কিন্তু কি উদ্দেশ্যে ? কোন্ মহৎ পরিমাণ কামনায় ?...ধ্বংশ না জীবন ? স্বর্গ না নরক ? ঈশ্বর না শয়তান ?—কোন্‌টা ? যদি তা' জান্‌তে পারতুম তবেই আমি জ্ঞানী হতুম,—কিন্তু যতক্ষণ না জান্‌ছি ততক্ষণ আমিও তো নির্ব্বোধ—নির্ব্বোধের সেরা নির্ব্বোধ,—আর সেই অদৃষ্টেরই ক্রীতদাস, যার রহস্য আমি আবিষ্কার করতে চাই—জয় করতে চাই—ব্যর্থ করে দিতে চাই !"

সহসা থামিয়া আর একবার তিনি নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে চাহিলেন। কি যেন প্রতিজ্ঞা বা প্রার্থনার স্বগত চিন্তায় তাঁহার ওষ্ঠযুগল ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল,—পরে দ্রুততর পাদবিক্ষেপে চলিতে চলিতে তিনি অনতিবিলম্বেই গন্তব্যস্থলে উপনীত হইলেন।

সর্ব্বপ্রকার বাহ্যাড়ম্বরবর্জ্জিত ছোট এক চৌরাস্তার মোড়ে নির্জ্জন একখানি ছোট বাড়ী, সারিবদ্ধ আরও কয়েকখানি অনুরূপ সৌধের সান্নিধ্য হইতে একটু বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থিত ; বিশেষত্বের মধ্যে দেখা গেল যে এক গুরুভার ও প্রাচীন ধরণে নির্ম্মিত প্রকাণ্ড দরজা উক্ত সৌধের প্রবেশ পথ রুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। গা-চাবীটী ঘুরাইতেই সে-দ্বার সহজেই খুলিয়া গেল—এবং এল র‍্যামি প্রবিষ্ট হইবামাত্র কিছুমাত্র শব্দ না করিয়াই সেই সুবৃহৎ ওক্-কাষ্ঠ-কবাট আবার পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সঙ্কীর্ণ দালান-কক্ষের কোণ হইতে যে ক্ষীণালোক-রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছিল তাহাতে জামা-কাপড় রাখিবার আল্‌নাটী কোনমতে দেখিতে পাওয়া যায় ;—ভ্রমণ-পরিচ্ছদগুলি তাহাতে টাঙাইয়া রাখিবার পর সে-আলোকটুকুও নিভাইয়া দিয়া পার্শ্বদ্বার-পথে এল র‍্যামি আপন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত সুন্দর কক্ষখানি,—আকার দেখিয়া বোধ হইতেছিল যে মধ্যভাগের ঠেলা-দরজাটীর সাহায্যে এককালে এটী ভোজনাগার ও বৈঠকখানা এই দুয়েরই কাজ চালাইয়াছে ; কিন্তু এখন একখানি সুদৃশ্য রেশমী পর্দ্দা সে-দরজাটীর স্থান অধিকার করিয়া লম্বমান। পর্দ্দাখানির রেশমে যথেষ্ট বৈচিত্র্য ও মহামূল্যতার পরিচয় সুস্পষ্ট,—কারণ এল র‍্যামি বিদ্যুতালোক প্রজ্জ্বলিত করিবামাত্র, চূর্ণ-হীরকদীপ্তির মত, পর্দ্দাখানির সর্ব্বাঙ্গে একটা রজত-তরঙ্গ ঝল্‌মল্ করিতে লাগিল। বিদ্যুতালোকমালাতেও বিশেষত্ব ছিল প্রচুর—কক্ষ-মধ্যভাগের কারুকার্য্যখচিত এক রজত-শৃঙ্খলে উহা পদ্ম-পুষ্পাকারে বিলম্বিত, এবং একটী সরু তারের সাহায্যে টেবিলের উপরকার আর একটী আলোকাধারের সহিত সংযুক্ত। কক্ষটীতে অপর কোনো সুন্দর বা মূল্যবান আসবাব-পত্র ছিল না সত্য—তথাপি মোটের উপর উহা সুরুচি-সুন্দর ও ঐশ্বর্য্যময় বলিয়াই মনে হইতেছিল। অল্প কয়েকখানি সাধারণ-ধরণের চেয়ার,—তন্মধ্যে একখানিমাত্র আবলুস-কাঠের ও রেশমী গদি-পাতা ; সাদাসিদা একটী বড় টেবিল,—তদুপরি সোনালী জরির কাজ-করা ও ঝালর-লাগানো কালো ভেলভেটের এক আস্তরণ,—টেবিলের উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি জ্যামিতি বিষয়ক যন্ত্রপাতি,—একজোড়া বড় গ্লোব,—দেওয়াল-গাত্রে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত একটী শেল্ফ,—গ্রন্থরাজিতে পরিপূর্ণ একটা আলমারী,—একপ্রান্তে রক্ষিত আবলুস কাঠের একটী ছোট পিয়ানো,—তৎপার্শ্বেই অপর একটী ছোট টেবিলের উপর তালা-বদ্ধ এক ওক্-কাঠের সিন্দুক,—এবং সর্ব্বশেষ, ব্যাঘ্র-চর্ম্মাচ্ছাদনে অযত্নরক্ষিত একখানি ক্যাম্প-খাট গৃহখানির আসবাব-সজ্জা সম্পূর্ণ করিতেছিল।

পূর্ব্বোক্ত গদি-পাতা চেয়ারখানিতে উপবিষ্ট হইয়া এল র‍্যামি টেবিলের উপর রাশীকৃত চিঠিগুলোর দিকে একবার চাহিলেন। রাজপুত্র, রাজস্ব সচিব, রাজনৈতিক, সংবাদপত্র-সম্পাদক ও নানা জাতীয় শিল্পীর নিকট হইতে সেগুলি সমাগত। কোনো কোনো খামের উপরকার হস্তাক্ষর তিনি দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিলেন এবং খুলিবার চেষ্টামাত্র না করিয়াই ললাট-কুঞ্চন-সহ একপাশে ঠেলিয়া রাখিলেন।

"পচুক কিছুদিন," —আপন মনে এল র‍্যামি বলিতে লাগিলেন—"আশ্চর্য্য যে কতকগুলো সাধারণ চিত্ত আকৃষ্ট না করে' কোনো প্রতিভাবান লোকের থাকবারই জো নেই,—এ যেন একটা মধুচক্র আর জনসাধারণ মৌমাছির ঝাঁক! কে বিশ্বাস করতে পারতো যে আমার মতন ধনমানহীন একজন দরিদ্র, নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, রাজারাজড়ার সংস্পর্শে আসবে? কে জানতো যে শাসন বিভাগের আনকোরা অভিসন্ধিগুলোও সাধারণে বিজ্ঞাপিত হবার যোগ্য হ'য়ে ওঠ্‌বার অনেক আগেই আমার কাছে আসবে? কে ভেবেছিল যে বড় ঘরের কর্ত্তা-গিন্নীদের গোপনীয়তাও, তাঁদের পরস্পরের অজ্ঞাতসারে আমার কাছে আসা-যাওয়া করবে? অথচ এসব আমি চাইনি; আমাকে বিশ্বাস করবার জন্যে কাউকে সাধিনি; এমন কি, আমাকে খুঁজে বের করবার মতলবও কাউকে দিইনি।—হয়তো আমার প্রকৃতিতেই এমন কোনো উপাদান আছে যা' চুম্বকের মতন মানুষকে আকর্ষণ করে—ফলে, নিজেও শান্তিতে থাকতে পায় না। তবু, মাঝে মাঝে মনে হয় যে এটা বুঝিবা ভালই—বহির্বিক্ষেপও বুঝি বা আমার মনের পক্ষে দরকার—নইলে একমাত্র লক্ষ্যকেন্দ্র সেই মহাবহস্যের মধ্যেই নিমগ্ন থাকলে হয়তো বা একদিন সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু না—না—এতদূর এগিয়ে ব্যর্থকাম হওয়া অসম্ভব। প্রেমের বিরুদ্ধে রাগদ্বেষের বিরুদ্ধে—সর্ব্বপ্রকার পার্থিব হৃদয়াবেগের বিরুদ্ধে ইস্পাতকঠিন এই মন—এ-মনের পরাজয়! না, জিত্‌তেই হবে—জিত্‌বোই!"

সহসা বামকরতলে ললাট রক্ষা করিয়া যেন কোনো নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে তিনি আপন মননশক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।—দেখিতে দেখিতে তাঁহার নয়নদ্বয় বিস্ফারিত ও এমন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল যাহাতে মনে হয় যে তৎপশ্চাতে বুঝিবা অগ্নিশিখাই প্রদীপ্ত হইয়াছে। মিনিট দু'য়েক ঐভাবে অতিবাহিত হইতে না হইতেই পার্শ্বদ্বার খুলিয়া গেল এবং সাদা ঘাঘরা ও আংরাখায় প্রাচ্যধরণে সজ্জিত-দেহ এক পরম সুন্দর যুবক ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া, যেন বা কোনো আদেশেরই প্রতীক্ষায় দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইল।

"এই যে, ফেরাজ! আমার আহ্বান তা'হলে শুনতে পেয়েছো?" নম্রকণ্ঠে এল র‍্যামি প্রশ্ন করিলেন।

যেন কতদূর হইতে ভাসিয়া-আসা এক স্বপ্নময় সুমধুর কণ্ঠে উচ্চারিত হইল—"শুনলুম, আমার ভাই কথা কইছেন; নিস্তব্ধ এক মেঘের আড়াল থেকে তাঁর পরিচিত কণ্ঠস্বর গানের মতন আমার কানে বাজতে লাগ্‌লো।—সে-ডাক শুনতে পেয়েই চলে এলুম"।

একটী ধীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যুবক থামিল; তাহার নিশ্চল ও ঋজু অবয়বখানি দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন একটী অতি সুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি কোন রহস্যময় মন্ত্রশক্তিবলে এইমাত্র জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আকারপ্রকারে সে এল র‍্যামিরই সদৃশ,—তবে তাহার দেহের বর্ণ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল,—আকর্ণবিশ্রান্ত নয়ন দু'খানির চাহনিটুকু যথেষ্টই কোমল ও রমণীসুকুমার,—কেশগুলি ভ্রমরকৃষ্ণ ও ঘন-কুঞ্চনে ললাটে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, এবং সুগঠিত সবল দেহখানি যেন একাধারে সৌন্দর্য্য ও শক্তির লীলাভূমি। কিন্তু তাহার বর্ত্তমান ভঙ্গীটাকে

বেড়িয়া বেড়িয়া কেমন যেন একটা আচ্ছন্নভাব প্রকাশ পাইতেছিল,—তাহার দীর্ঘায়ত চক্ষুদুটী এল র‍্যামির প্রতি নিবদ্ধ-দৃষ্টি ছিল সত্য, কিন্তু সে-নয়ন যেন কোনো স্বপ্নচারীর! তা'ছাড়া কথা কহিবার সময় তাহার মুখে এমন একটু হাসি লাগিয়াছিল যাহাতে মনে হইতেছিল যে, সে যেন কোন্ সুদূরের এক সঙ্গীত-মাধুর্য্য উপভোগ করিতেছে।

মুহূর্ত্তকাল এল র‍্যামি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিয়া লইলেন,—পরে টেবিলের উপরকার রূপার ঘণ্টাটী কয়েকবার সজোরে টিপিয়া, ডাকিলেন—"ফেরাজ!"

ঘণ্টাধ্বনি ও আহ্বানের শব্দে যুবক নিদ্রোত্থিতবৎ চমকিয়া উঠিল, দুই হস্তে চক্ষু রগড়াইয়া লইল,—পরে একবার চারিদিকে চাহিয়া, ভ্রাতার অভিমুখে অগ্রসর হইল। একটা ব্যগ্র ও সাগ্রহ জীবন্তভাব তাহার সৌন্দর্য্যটীকে যেন এই সময় শতগুণ বাড়াইয়া দিল।

"এল র‍্যামি! এসেছো এতক্ষণে! বড্ড দেরী হয়েছে আজ! আমি অনেকক্ষণ তোমার প্রতীক্ষায় বসে' থেকে থেকে শেষকালে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম; এজন্যে অবশ্যই আমি লজ্জিত।—কিন্তু তুমি আমাকে তেম্নি করেই ডেকেছো বোধ হয়? আমিও হয়তো তোমায় নিরাশ করিনি? নিশ্চয়ই নয়,—মরে গেলেও যে আমি না এসে থাকতে পারতুম না!"

সহসা জানু পাতিয়া ফেরাজ উপবিষ্ট হইল, এবং এল র‍্যামির দক্ষিণ হস্তখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিল। পরে বলিল—"এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে? অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাকে না দেখে আমার এত নির্জ্জন মনে হচ্ছিল"—

সস্নেহে কনিষ্ঠের আকুঞ্চিত কেশগুচ্ছে অঙ্গুলি-চালনা করিতে করিতে এল র‍্যামি বলিলেন—"কেন ভাই, তুমি তো মনে করলেই বীণার সঙ্গে তোমার কণ্ঠ মিলিয়ে বাড়ীখানাকে সঙ্গীত-মুখর ক'রে তুল্‌তে পার্‌তে? আমি আজ একটু থিয়েটারে গিয়েছিলুম, 'হ্যাম্‌লেট' দেখ্‌তে।

"কেন গেলে?"—উত্তেজিতভাবে ফেরাজ বলিয়া উঠিল—"আমি তো মরে গেলেও ও-জিনিস দেখ্‌তে যেতুম না! ও-সব কাব্যের সৌন্দর্য্য মানুষের অভিনয়ে খাটোই হয়ে যায়। ও-বই পড়া চলে, চিন্তা করা চলে, অনুভব করা চলে,—আর যদি সত্যিসত্যিই দেখা যায় তবে তো খুবই ভাল হয়।"

"কবির যোগ্য কথা, ফেরাজ"—সকৌতুকে এল র‍্যামি বলিলেন—"আজও তোমার বালকত্ব ঘোচেনি অথচ যুবকের মতন করে' তুমি কথা কইছো! এখন, খাবারদাবার কিছু রেখেছো কি না বল দেখি?"

সলজ্জভাবে হাসিয়া ফেরাজ একেবারেই উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঘর হইতে বাহির হইয়া, কয়েক মিনিট বাদেই খাদ্যপূর্ণ একখানি রেকাবী আনিয়া যথোচিত শ্রদ্ধা ও নম্রতার সহিত, সুশিক্ষিত ভৃত্যবৎ, ভ্রাতার সম্মুখে রাখিল।

"তোমার খাওয়া হয়েছে?" পান-পাত্রে পানীয় ঢালিতে ঢালিতে এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"হাঁ; জ্যারোবাও আমার সঙ্গেই খেয়েছে। কিন্তু সে আজ ভারী গম্ভীর হয়েছিল, একটীও কথা কয় নি।"

হাসিয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"এটা তার পক্ষে অস্বাভা বক!"

ফেরাজ বলিতে লাগিল—"অনেক লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল; কার্ড রেখে গেছে তারা। কেউ কেউ আমার নাম জানতে চাচ্ছিল আর জিজ্ঞাসা কচ্ছিল আমি কে। বললুম যে আমি তোমার চাকর—কিন্তু তারা বিশ্বাসই করলে না। তাদের মধ্যে বড় লোকও ছিল অনেক,—খুব বড় বড় ঘোড়া আর ভাল ভাল গাড়ী চড়ে তা'রা এসেছিল। তা'দের নাম দেখেছো?"

"না"।

"কিছুই যেন তোমার গ্রাহ্যের মধ্যে আসে না"—প্রফুল্ল-কণ্ঠে ফেরাজ বলিল। এখন তাহার তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব একেবারেই কাটিয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাহার কথাবার্তায় বয়সোচিত বাল্য-চাপল্যই প্রকাশ পাইতেছিল—সে-বয়স কুড়ি হইয়াছে কি না সন্দেহ। "বড় বড় চিন্তা নিয়ে তুমি এম্নি বিভোর থাক যে ছোটখাটো জিনিষ তোমার নজরেই ধরে না। কিন্তু যে সব ডিউক আর্ল প্রভৃতিরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তাঁরা নিশ্চয়ই নিজেদের ছোট মনে করেন না,—করেন কি?"

"তবু তাদের মধ্যে অনেকেই 'ছোট'র থেকেও ছোট"—ঈষৎ অবজ্ঞাব্যঞ্জক-কণ্ঠে এল র‍্যামি বলিতে লাগিলেন "বড় বড় ঐতিহাসিক নামের আড়ালে আত্মগোপন করে' নিজেদের বংশগৌরব-স্মৃতিটাকে জঘন্য রুচি ও নীচ প্রবৃত্তির মাঝখান দিয়েই তারা আজ টেনে চলছে কিন্তু যেতে দাও তাদের কথা; জ্যারোবা তা'হলে আজ তোমার সঙ্গে কথা কয় নি?"

"না; শুধু তোমাকে জানাতে বল্‌লে যে সব ভাল আছে।—ঐ এক কথা সে রোজই বলে; কিন্তু আমি বুঝে উঠতে পারিনে যে কি সে 'সব', যার পক্ষে ভাল বা মন্দ থাকাটা দরকার? তুমি তো এ-হেঁয়ালির কখনো উত্তর দাও না!"

ফেরাজ হাসিল, কিন্তু তাহার সুন্দর চক্ষু দুটিতে বেশ একটু কৌতূহল স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বোধ হইল যেন সাহসে কুলাইলে সে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিত।

এল র‍্যামি তাহার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন—"নিজের কথা কও ফেরাজ; আজও তোমার স্বপ্নরাজ্য-পরিভ্রমণে গিয়াছিলে নাকি?"

উত্তরে ফেরাজ তৎক্ষণাৎ জানাইল—"তুমি যখন ডাক, তখন তো আমি সেইখানেই ছিলুম। আমার বাড়ী, চারি ধারে গাছপালা সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে শেষে ঝরণার ধারে গিয়ে সেই পাহাড়ে-নদীটির গান শুন্‌ছিলুম। এখন সেখানে ফসল কাটার সময়, তা' জানো? চাষীরা যে কতরকম গান গাইতে গাইতে মাঠ থেকে ফসল নিয়ে যাচ্ছে তা' আর কি বলবো।"

বিস্মিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফেরাজের প্রতি চাহিয়া যেন কতকটা ঈর্ষার সহিতই এল র‍্যামি বলিলেন—"কি দৃঢ় তোমার বিশ্বাস ফেরাজ! তুমি নিশ্চিত ধরে নিয়েছো যে সেটা তোমার বাড়ী—অথচ কল্পনায় ছাড়া তার অস্তিত্ব নেই, তাও আবার স্বপ্নপ্রসূত কল্পনা।"

"একটা তুচ্ছ স্বপ্ন-কল্পনা থেকে কি প্রেম জাগে, প্রতীক্ষা জাগে?"

ফেরাজ সবেগে বলিয়া উঠিল—"না এল র‍্যামি, তা' হতেই পা'রে না! তোমার মতে যা' আমি ঘুমের ঘোরে দেখতে পাই, সে জায়গা যে আমি চিনি—তা'র পাহাড়-পর্ব্বত আমার পরিচিত, অধিবাসীরা আমার আত্মীয়; সেখানে আজও আমি বিস্মৃত হইনি, তুমিও হও নি;—একদিন সেখানে আমরা বাস করেছি, আবার পরেও করবো। সে যে আমাদের দু'জনকারই বাড়ী—সেই অত্যুজ্জ্বল সুদূর নক্ষত্র-জগৎ, যেখানে মৃত্যু নেই শুধু নিদ্রা আছে—কি জন্যে সে সুখের রাজ্য থেকে আমরা নির্ব্বাসিত হলুম, এল র‍্যামি? তোমার জ্ঞানে এর কি কোনই জবাব নেই?"

"তোমার কথা বুঝে ওঠা আমার পক্ষে কঠিন",—উত্তরে কতকটা কর্কশকণ্ঠেই এল র‍্যামি বলিলেন—"আগেই বলেছি, তোমার ও-উক্তি কাব্যেই শোভা পায়। তোমার ধারণা যে কোনো বিভিন্ন গ্রহে জন্মগ্রহণ করে সেইখানেই তুমি বাস করতে,—পরে কোনো অজ্ঞেয় অভিশাপে নির্ব্বাসিত হ'য়ে এ পৃথিবীতে মানবদেহ লাভ করেছো' কেমন, এই তো তোমার ধারণা? আমার বিবেচনায় এ-ধারণা হচ্ছে তোমার দ্বিবিধ জীবন-যাপনের ফল; এর মূলে আমার ইচ্ছা বা শিক্ষা একটুও নেই। যা'র প্রমাণ পাওয়া যায়, আমি শুধু তাই বিশ্বাস করি—কিন্তু তুমি যা' বল তা' সকলরকম প্রমাণেরই অতীত।"

"হোক্; তবু"—নিবিষ্টভাবে ফেরাজ বলিল—"প্রমাণ দিতে না পারলেও আমার অনুভূতির মধ্যে কিছুমাত্র ভুল আছে বলে আমার মনে হয় না। আমার 'স্বপ্ন' এই জীবনের চেয়েও অনেক বেশী জীবন্ত,—তা' ছাড়া, যে আত্মীয়দের কথা বলছিলুম তাদের লক্ষ্মী-পার্ব্বণের গান আমি স্বকর্ণে শুনেছি।"

সহসা কোমল অথচ ক্ষিপ্র-চরণে পিয়ানোটীর দিকে অগ্রসর হইয়া ফেরাজ উহার ঢাকা খুলিয়া ফেলিল; পরক্ষণেই বাজাইতে সুরু করিয়া দিল। চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িয়া নীরব নিবিষ্ট চিত্তে এল র‍্যামি ভাবিতে লাগিলেন—এই অতি সাধারণ যন্ত্রটা হইতে ওরূপ মোহময় স্বর লহরীর উত্থান কি বাস্তবিকই সম্ভবপর? এমন কোন্ স্বরলিপি পৃথিবীতে আছে যাহা হইতে ঐ অপরূপ গীতি-তরঙ্গ নিঃসৃত হইতে পারে? বস্তুতঃ, সে-সুরে পার্থিব কিছুই ছিল না; মনে হইতেছিল যেন বাদকের লীলায়িত অঙ্গুলিতল হইতে পিছলাইয়া পিছলাইয়া সুরগুলি বায়ুমণ্ডলকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছে! শুনিতে শুনিতে আপন অজ্ঞাতসারে এল র‍্যামির ভিতর হইতে একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, এবং তাহা শুনিতে পাইবামাত্র মধুর হাস্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফেরাজ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—"সুরটা খুব পরিচিত মনে হচ্ছে না কি? চোখের ওপর সেই গোধুলি সময় আর সেই গৃহাভিমুখী লঘু-সুন্দর তনুভার-হীন নরনারীগুলি জেগে উঠ্ চে না কি? নিশ্চয়—নিশ্চয়ই তোমার মনে পড়্ ছে!"

এল র‍্যামির সর্ব্বাঙ্গে একটা তড়িৎ-শিহরণ প্রবাহিত হইয়া গেল; উভয় হস্তে নয়ন-মার্জ্জনা করিয়া তিনি যেন প্রবল চেষ্টায় আপনার আত্মবিস্মৃত ভাবটুকু ঝাড়িয়া ফেলিলেন; পরে, পিয়োনোর দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য কনিষ্ঠের হাত দু'খানি আপন বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

"ও হেঁয়ালী রেখে দাও ভাই"—মৃদু কম্পিত নম্রকণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন—"তোমার বিশ্বাস, তোমার মোহ, তোমারই জন্যে থাকুক। তোমার কাজ যদি স্বপ্ন দেখা হয়, তবে আমার কাজ হচ্ছে প্রমাণ করা; কঠোরতর আমার ভাগ্য। তোমার স্বপ্নে সত্য থাকতে পারে—আমার প্রমাণেও ভ্রান্তি থাক্তে পারে—ভগবানই তা' বল্ তে পারেন! আমাদের দু'জনেরই দেহে যদি একই শোণিত প্রবাহিত না থাকতো, কিম্বা তুমি যদি পার্থিব যা কিছুর চেয়ে আমার প্রিয়পাত্র না হতে, তা'হলে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকের মতন আমিও তোমার ঐ আধ্যাত্মিক তন্দ্রা ছুটিয়ে দিয়ে সাধারণেরই একজন করে' তুলতে চেষ্টা করতুম। কিন্তু না, তা' করবো না—তা' করবার হৃদয় আমার নেই—আর যদিও বা হৃদয় থাক্তো" মুহূর্ত্তকাল থামিয়া ধীরে ধীরে এল র‍্যামি বলিলেন—"আমার সে শক্তি নেই।" বিদায়!

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সহসা তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন—দ্বিতীয়বার পশ্চাত ফিরিয়াও আর চাহিলেন না।

ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে ফেরাজ জ্যেষ্ঠের গমনপথপানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—কি লাভ এত জ্ঞানী হওয়ার, যদি জ্ঞান সময়ে সময়ে মানুষকে এমন বিষণ্ণ করে?—বিশ্বাস বলিদানে তথ্যকে বরণ করে' কি হবে, যখন বিশ্বাস

এত আনন্দময়, আর তথ্য এমন নিরানন্দ ? সম্ভাব্য বিষয়ের স্বপ্ন-কল্পনা সুন্দর, না নিশ্চিত বিষয়ের প্রমাণ-প্রচেষ্টা সুন্দর ? তা' ছাড়া, প্রমাণযোগ্য বিষয় আছেই বা কতখানি ? বিশ্বাসের রাজ্য কি তার তুলনায় যথেষ্টই বড় নয় ?

প্রশ্নগুলিকে নানা ভাবে মনের মধ্যে দুলাইতে দুলাইতে ফেরাজের মনের শান্তি বিক্ষুব্ধ হইল—তাহার সঙ্গীতময় প্রাণ যেন বেসুর বাজিতে চাহিল। তৎক্ষণাৎ সমস্ত বিরক্তি কর চিন্তা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে পিয়ানোটী বন্ধ করিল এবং ঘরের চতুর্দ্দিক পরীক্ষা করিয়া যখন বুঝিল যে ভ্রাতার স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার জন্য সে রাত্রে আর তাহার পক্ষ হইতে কিছুই করিবার নাই, তখন ধীরে ধীরে আপন ব্যাহত তন্দ্রাটীরই সন্ধানে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। কে বলিবে, সে রাত্রে তাহার কল্পিত নক্ষত্র-জন্মভূমে সেই সকল সঙ্গীত-পরায়ণ আত্মীয়দের সাক্ষাৎ আবার সে পাইয়াছিল কি না!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে সোপান-সাহায্যে দ্বিতলে উঠিয়া, এল র‍্যামি কি যেন শুনিবার জন্য বারান্দায় দাঁড়াইয়া পড়িলেন। নিস্তব্ধ বাড়ীখানি,—'লক্ষ্মী-পার্ব্বণ' গীতির সুমধুর স্বরলহরী বহুক্ষণ থামিয়া গেলেও, স্থানান্তরিত পুষ্পের পরিমলটুকুরই মত সে সুরের রেশ তখনও যেন বায়ুহিল্লোলে খেলিয়া বেড়াইতেছিল। আপন মনখানির উপর তাহারই পরশ লইয়া এল র‍্যামি যেন সেই গভীর নৈশ-নিস্তব্ধতার বাণীই শুনিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার দৃষ্টি যদি কেহ লক্ষ্য করিত তবে দেখিতে পাইত যে তাহা সম্মুখের এক রুদ্ধ-দ্বারের প্রতি নিবদ্ধ—আর, সে দ্বারের কবাটদুখানি কব্জা খুলিয়া লইয়া কোনো প্রদর্শনীতে যদি প্রেরণ করে তবে তাহা নিখুঁত জালির কাজের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন-হিসাবে বুঝিবা প্রথম পুরস্কারই প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ, সে কবাটের কারুকার্য্য বড়ই সুন্দর দর্শন ; নানা জাতীয় পুষ্পের প্রাচুর্য্যে রমণীয় লতা-পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে আধ-মুকুলিত গোলাপগুলির,—বিচিত্রিত লতা-বিতানের উত্তরার্দ্ধে পুষ্পিত এক শাখার উপর চিন্তামগ্ন কামদেব,—তাঁহার রক্ত অধরপুট এক মল্লিকা-মুকুল-স্পর্শে ঈষৎ স্ফুরিত ;—আর পদতলে, অপর একটী প্রসারিত পাদপ-শাখায় উপবিষ্টা রতিদেবী আপন করপল্লব-শায়ী এক গত-প্রাণ প্রজাপতির শোকে রোরুদ্যমানা। এতই একাগ্র অভিনিবেশ সহকারে এল র‍্যামি ছবিখানির পানে চাহিয়াছিলেন যেন এইমাত্র তিনি উহা প্রথম দেখিতেছেন এবং মুগ্ধ হইয়া প্রশংসার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছেন না—কিন্তু, সত্য কথা এই যে সে ছবি তাঁহার চোখেও পড়ে নাই। শিল্প-সৌন্দর্য্যের সেই সকল চিত্রিত প্রকাশ ভেদ করিয়া তাঁহার চিন্তাস্রোত অন্য খাতেই প্রবাহিত হইতেছিল, এবং ফেরাজেরই মতন এক্ষেত্রেও জবাব মিলিতে বিলম্ব ঘটিতেছিল না।

চাবী ঘুরাইতেই রুদ্ধ কপাট খুলিয়া গেল, এবং এক শিথিল-দীর্ঘদেহা তাম্রবর্ণা বৃদ্ধার কুৎসিৎ অথচ চিত্তাকর্ষক মূর্ত্তি প্রবেশপথে পরিদৃষ্ট হইল।

"চলে এস এল র‍্যামি!" অতুচ্চ তিক্ত কণ্ঠে সে বলিল—"আজ দেরী হয়ে গেছে,—কিন্তু দেরী আর কোন্ কালে তোমার প্রচণ্ড ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হ'তে পেরেছে! তবু, আমার ভাগ্যে একটা রাত্তিরও যে শান্তিতে কাটাবার জো নেই, এতো জানা কথা!"

এল র‍্যামি একটু হাসিলেন, কিন্তু জবাব করিলেন না, কেন না জ্যারোবার কথার জবাব দেওয়া একেবারেই ব্যর্থ। সে সম্পূর্ণ বধির, সুতরাং যুক্তিতর্কের অযোগ্যা। অগ্রগামিনী হইয়া সে এল র‍্যামিকে পার্শ্বের একটী

ছোট ঘরে লইয়া আসিল—এঘরে একটা টেবিল ও একখানি চেয়ার ছাড়া অন্য কোনো আসবাব ছিল না; তবে, একদিকের সমগ্র দেওয়াল জুড়িয়া কনক-খচিত এক সুবৃহৎ ভেলভেটের পর্দা টাঙানো ছিল। টেবিলের উপর একখানা স্লেট ও পেন্সিল রক্ষিত ছিল; তাহা টানিয়া লইয়া এল র‍্যামি লিখিলেন—"আজ কোনো পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে?"

জ্যারোবা পড়িল ও উত্তরে জানাইল—"কিছুই না।"

"একটুও নড়েনি?"

"এক চুলও নয়।"

এল র‍্যামি থামিলেন; পরে লিখিলেন—"তোমার মেজাজ ভাল বোধ হচ্ছে না। আবার পরিহাস-চাপল্য দেখা দিয়েছে!"

জ্যারোবার চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিয়া উঠিল; ক্রোধভরে উভয় হস্ত উৎক্ষিপ্ত করিয়া কর্কশ-চীৎকারে সে বলিল—"পরিহাস-চাপল্য!—বেশ, তাই যদি হয়, তবু তাতে তোমার কি যায়-আসে এল র‍্যামি? তোমার কাছে আমি তো অতি তুচ্ছ—একটা ক্রীতদাসী মাত্র! একটা নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক, বয়সের গুরুভারে যে আজ মরণের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে, তার চিন্তা-চাপল্যে পণ্ডিত-প্রবর এল র‍্যামির ক্ষতিবৃদ্ধি কতটুকু? এই একটুক্‌রো ক্ষণভঙ্গুর রক্ত-মাংসের পিণ্ড কি ভাবে না ভাবে, তাতে তোমার মতন আত্মসমাহিত প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী একজন নরদেবতার দরকারই বা কি?" তিক্তহাস্যে জ্যারোবা বলিতে লাগিল—"অদৃশ্য নিয়তির শক্তিমান নিয়ন্তা তুমি, মানব-চিন্তাজগতের কর্ণধার তুমি,—জ্যারোবার পরিহাস-চাপল্যে কর্ণপাত করবার দরকার তোমার তো কিছুই নেই এল র‍্যামি? জ্যারোবার আজ আর যোঝবার বল নেই, আজ সে বৃদ্ধা, শক্তিহীনা, অবরুদ্ধ শোকাশ্রুভারে মর্ম্মপীড়িতা,—হয়তো সে এই নীচ পৃথিবীতেই একটু স্বচ্ছন্দ চলাফেরা করতে পেলেই নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করতো—হয়তো এখানকার সাধারণ আমোদপ্রমোদেই সুখী হতে পারতো,—কিন্তু তাও তার পক্ষে নিষিদ্ধ। তার ভাগ্য যে উন্নততর,—অতীতের স্মৃতিভস্মের মাঝখানে নিঃসঙ্গ বসে' দিনরাত চারিদিক শূন্যময় দেখা কি কম ভাগ্যের কথা!"

হতাশা-ব্যঞ্জক হস্তসঞ্চালন করিয়া সে নীরব হইল। সকৌতুক উপহাসের চাহনিতে মুহূর্ত্তকাল তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া এল র‍্যামি শ্লেটে লিখিলেন—"আমার বিশ্বাস ছিল যে তুমি তোমার গৃহীত-কার্য্যভার ভালবাসো।"

পাঠান্তে জ্যারোবা এমন সগর্ব্বে সোজা হইয়া উঠিল যেন সে এল র‍্যামিরই সমকক্ষ কেহ।

"পাষাণ মূর্ত্তিকে কেউ ভালবাসে?" সে জিজ্ঞাসা করিল। "ছবি নিয়ে কি ভুলে থাকা যায়? যা' জীবনের আভাষ মাত্র, কিন্তু জীবিত নয় তার ওপর শোকাশ্রু আর চুম্বন বর্ষণ করে' কি লাভ? যে হাতদুটী আমার আলিঙ্গনে আর সাড়া দেয় না তার স্পর্শসুখে কি মন ভোলে? ভালবাসা!—হ্যাঁ, ভালবাসা আছে আমার এই বুকের ভেতর,—কবরের মধ্যে অবরুদ্ধ অগ্নিশিখা যেমন থাকে, তেমনি আছে,—কিন্তু এ-কবরের চাবী তোমারই হাতে এল র‍্যামি, তাই আজ বাতাসের অভাবে সে-শিখা নিভে যেতে বসেছে!"

এল র‍্যামি ঘাড় নাড়িলেন ও পেন্সিলটা রাখিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যেদিকের দেওয়ালের সম্পূর্ণ পরিসর জুড়িয়া ভেলভেটের পর্দাখানি লম্বিত ছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইয়া জ্যারোবার প্রতি এক আদেশসূচক

ইঙ্গিত করিবামাত্র বৃদ্ধা যন্ত্রচালিতের ন্যায় ছোট একটী কপিকলের দড়ি আকর্ষণ করিল; আর সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্ণরেখাঙ্কিত সেই কোমল পর্দ্দাখানি নিঃশব্দে দ্বিধাভিন্ন হইয়া এমন এক বিলাস-প্রাচুর্য্যময় আশ্চর্য দর্শন অভ্যন্তর-দৃশ্য খুলিয়া ধরিল যাহা দেখিলে সহসা সত্য বলিয়া বুঝিবা বিশ্বাসও করা যায় না।

সম্পূর্ণ গোলাকার এক প্রকাণ্ড কক্ষ—আগাগোড়া বিচিত্র জড়োয়ার কারুকার্য্যে খচিত অসংখ্য রেশমের ঝালরে ঝকঝক্ করিতেছে। ধনুকাকারে বক্র ছাউনিখানির পরিধি হইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত সোণার-চুমকী-বসানো বহুসংখ্যক সরলরেখা ব্যাসার্দ্ধের মত বিস্তৃত রহিয়াছে—কেন্দ্রমধ্যভাগ হইতে এক সুবৃহৎ স্বর্ণনির্ম্মিত আলোকাধার কতকগুলি স্বর্ণসূত্রের সাহায্যে ঝুলিয়া পড়িয়া বর্ণবৈচিত্র্যময় এক স্ফটিকাবরণের ভিতর হইতে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে—আর, প্রসারিত কক্ষতল কৃষ্ণবর্ণ পুরু ভেলভেটের আস্তরণে আগাগোড়া মণ্ডিত থাকিয়া কার্পেটের উপরকার চাকচিক্য সুন্দর কারুচিত্রগুলিকে অতুজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে।

যা' কিছু সুন্দর ও দুষ্প্রাপ্য, মহার্ঘ ও মনোরম সমস্তই যেন এই কক্ষখানিতে পুঞ্জীভূত! বেদীর উপর দণ্ডায়মানা, দ্বিরদ-নির্ম্মিতা নিখুঁত পরীমূর্ত্তিটী হইতে আরম্ভ করিয়া, রাশি রাশি তাজা গোলাপে পরিপূর্ণ ভিনিসীয় স্ফটিকের পরম সুন্দর ফুলদানীটী পর্য্যন্ত সমস্তই চিত্তাকর্ষক, সমস্তই উপভোগ্য!

কিন্তু সমস্ত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য, রমণীয়তা ও কমনীয়তা, সুরুচি ও শিল্প-পারিপাট্যের পরিপূর্ণ পরিচয় যে কেন্দ্রটীতে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল সেটী এক নিদ্রিতা বালিকার শয়ন-ভঙ্গী-সৌকুমার্য্যে। বহুমূল্য একখানি পালঙ্কের উপর গাঢ়-নিদ্রামগ্না বালিকাটী,—অতুলনীয় তার লাবণ্য,—নিস্পন্দ, যেন একখানি মর্ম্মর-প্রতিমা,—আশ্চর্য্য, যেন কাব্য-জগতের চরম সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন!

সাদা রেশমের সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করিয়া বালিকাটীর সর্ব্বাঙ্গের অপরূপ লাবণ্য রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিতেছে,—পাতলা সিল্কের একখানি ওড়না অতি সন্তর্পণে তাহার রক্ত-চরণতল বেষ্টন করিয়া লম্বিত,—অতি কোমল এক তুষার-শুভ্র সাটিনের বালিশে তাহার মস্তকটী যেন খুবই যত্নের সহিত বিন্যস্ত হইয়াছে। তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভ ছোট ছোট বাহুদুটী বালিকার বুকের উপর এলাইয়া আছে, আর অপূর্ব্ব-দর্শন এক তারকাকৃতি হীরকখণ্ড ঐ বক্ষে নিবদ্ধ থাকিয়া আলোকরশ্মিপাতে চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রধনু-বর্ণ-প্রভা বিকীর্ণ করিতেছে। সে-বর্ণের স্পর্শে বালিকার অঙ্গুলিগুলি রক্তরাগরঞ্জিত,—আর আজানুলম্বিত দীর্ঘকেশজাল তরঙ্গে তরঙ্গে শয্যার উপর ছড়াইয়া পড়িয়া যেন তরল সোনার ঢেউ তুলিয়া দিয়াছে! তাকে সুন্দরী বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না—কেননা, 'সুন্দরী' এই বাক্যটী সাধারণতঃ যতখানি অর্থ বহন করে, এ-ক্ষেত্রে তাহা এতগুণ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে যে, অসম্ভব যদিও বা না হয়, তবু, সে সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা খুবই কঠিন হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ, গঠন ও বাহিরাবয়বের অপরিসীম লাবণ্য ছাড়াও এমন এক অলোক-সামান্য অন্তর্দীপ্তি তাহার সর্ব্বাঙ্গে ও বিশেষভাবে আননখানিকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিতেছিল যাহা অবর্ণনীয় এবং যাহাতে মনে হয় যে তার সুন্দর তনু-সুষমা বুঝিবা কোনো মহত্তর অন্তঃ-সৌন্দর্য্যের প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। ঐ নিমীলিত নয়নপল্লব যদি উন্মীলিত হয় তবে তার নয়ন দুটীর দীপ্তি যে কি বিস্ময়কর হইতে পারে,—ঐ অনিন্দ্য-সুন্দর দেহলতা যদি নড়িয়া উঠিয়া পৃথিবীতে দাঁড়ায় তাহা হইলে সে শোভা যে কি আশ্চর্য্য দেখায়,—বুঝিবা তাহা কল্পনাতেও আনা যায় না!—কিন্তু হায়,—ঐ নিঃশব্দ বিশ্রাম আর ক্ষীণতম শ্বাস-স্পন্দন লক্ষ্য করিলে এ কথা বুঝিতে বুঝিবা কাহারও বাকী থাকে না যে, ও-মূর্ত্তি কোনোকালেই আর জাগিবে

না,—কোনোদিনই এই পার্থিব প্রাণীরাজ্যে সাধারণের সহিত বেড়াইবে না—আজ যেমন দেখাইতেছে, শেষ পর্যাস্ত তেম্‌নিই থাকিয়া যাইবে; ঠিক এম্‌নই একটী মানবী-কুসুম, সংগৃহীত ও সঙ্গ-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় স্থানান্তরিত,—কাহার জন্য?.........ভগবানের প্রেম? না, মানবের সম্ভোগ?......প্রথম, দ্বিতীয়, না দুইই?.........

জ্যারোবার অগ্রে অগ্রে কক্ষে প্রবেশ করিয়া এল র‍্যামি কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে ঐ পালঙ্ক-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার চিত্তরাজ্যে যে চিন্তাই আলোড়িত হউক না কেন মুখভাবে কিছুই বুঝিবার উপায় ছিল না; কেননা, সে-মুখ সর্ব্বপ্রকার আবেগ-পরিশূন্য। জ্যারোবা তীক্ষ্ণ-কৌতূহলী দৃষ্টিতে এল র‍্যামিকে নিরীক্ষণ করিতেছিল—তাহার বলি-অঙ্কিত মুখমণ্ডলে প্রাণপণে-চাপিয়া-রাখা একটা আবেগ সুস্পষ্ট। নিদ্রিতা বালিকা সহসা নড়িয়া উঠিল এবং যেন বা ঘুমের ঘোরেই একটু হাসিল; সে-হাসিতে তাহার মুখখানি কেমন-যেন-একটু গৌরব-দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"তোমারই জন্যে আজও বেঁচে আছে এল র‍্যামি"—জ্যারোবা বলিতে লাগিল—"তোমারই জন্যে এর রূপ দিনে দিনে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। এ সূর্য্যকিরণ, আর তুমি কঠিন হলেও তুষার। সময়ে এ তুষার-কাঠিন্যও গল্‌তে বাধ্য,—এমন কি, তুমিও এই প্রাকৃতিক নিয়মকে ব্যর্থ কর্‌তে পারবে না এল র‍্যামি!"

এমন তীব্র দৃষ্টিতে এল র‍্যামি বৃদ্ধার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন যাহা ভীতিজনক,—সেই তীক্ষ্ণ চাহনির কাঠিন্যতলে বেচারী যেন ভয়ে জড়সড় হইয়া কক্ষের এক দূর প্রান্তে সরিয়া গেল, এবং অত্যন্ত অপরাধীর মত মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া তাহার পরিচিত চরকাটীর সাহায্যে অভ্যস্ত সুতা প্রস্তুত কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইল।

কি করুণ সে ছবি! একটা ঢিলে তুলোভরায় সর্ব্বাঙ্গ-আবৃতা শোকতাপ-ক্লিষ্টা বৃদ্ধা,—রুক্ষ ধূসর চুলগুলোর উপর আলো পড়িয়া সেগুলোকেও যেন তাহার হাতেরই পেঁজা-তুলোর মতন করিয়া তুলিয়াছে—দীনা, সর্ব্বহারার মতন মেঝে বসিয়া দুখানি শীর্ণ-কম্পিত-হস্তে সুতার গুটী পাকাইতেছে,—জগতে যেন সে নির্ব্বান্ধব! দেখিতে দেখিতে এল র‍্যামির চিত্ত করুণায় ভরিয়া উঠিল—আহা, দুঃখিনী বেচারী!

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিয়া এল র‍্যামি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন—তাঁহার আয়ত-দীপ্ত নয়নযুগল একটা দীর্ঘ-সাগ্রহ ও সকরুণ শ্রদ্ধা-দৃষ্টিতে আরও যেন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। জ্যারোবার হাতের কাজ খসিয়া পড়িল,—এল র‍্যামির চোখের দিকে চোখ তুলিবামাত্র তাহার ওষ্ঠদ্বয়ে একটু তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিল,—পরক্ষণেই তাহার ক্লেশ-তিক্ত মুখভাব যেন শান্তি ও নম্রতার সংমিশ্রণে কোমল হইয়া আসিল।

"স্বজন-ত্যক্তা জ্যারোবা!" ধীরে ধীরে উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া এল র‍্যামি বলিতে লাগিলেন—"স্বামী হারা, সঙ্গীহীনা বিধবা! পার্থিব শব্দ-সম্বন্ধে বধির-শ্রবণ হ'লেও, তোমার আত্মার কর্ণ আমার বাণী শ্রবণের জন্য প্রস্তুত হোক্—তোমার অতীত-জীবনের সমস্ত সঙ্গীত সে আজ শুন্‌তে পাক্।—ঐ, তোমার গত জীবন-কাল ফিরে এসে তোমার ক্লান্ত-মস্তিষ্কে হারানো ছবিগুলি আবার এঁকে দিচ্ছে! আবার তুমি তোমার ক্রীড়ারত শিশুসন্তানগুলির কলরব শুন্‌তে পাচ্ছ—ঐ না আরব মরুভূমি সূর্য্য-কিরণে তোমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে স্বর্ণ-সমুদ্রের মতন প্রসারিত হচ্ছে—দীর্ঘায়ত তালতরুশ্রেণী রৌদ্রতপ্ত আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে—স্বচ্ছশীতল ঝরণার ধারে তাঁবু খাটানো রয়েছে, আর তোমার জীবনের সঙ্গীটী ভ্রমণ-ক্লান্তদেহে ফিরে এসে তোমার বুকে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে। আবার তোমার যৌবন ফিরে এসেছে জ্যারোবা!—হাঁ, নিশ্চয়ই তুমি যুবতী, সুন্দরী, পতিসোহাগিনী,—সুখের স্বপ্নে আত্মহারা হয়ে নিদ্রা যাও!"

শেষ কথাগুলি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধার শিথিল হাতদুটী দুইহাতে ধরিয়া অল্পে অল্পে তিনি তাহাকে শোয়াইয়া দিলেন এবং মাথার নীচে একটী বালিশ দিয়া কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"আশ্চর্য্য!" নিশ্চিন্ত আরামে সুখ-শায়িতার নাসিকা-ধ্বনি আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন—"জীবনের একমাত্র নিশ্চিত আনন্দ তবে কি শুধু স্বপ্নেই? কবির কল্পনা,—চিত্রকরের স্বপ্ন,—শিশু-চিত্তের আকাশকুসুম,—সবই স্বপ্ন! আর সেই সব স্বপ্নচারীরাই সুখী। অদৃষ্টই বল, আর ঐশ্বর্য্যই বল, কিছুতেই তাদের মনের শান্তি বিক্ষুব্ধ করতে পারে না—রাজামহারাজাই হোক আর মহা মহা জাতিরাই হোক, সমস্তই তাদের চিন্তারাজ্যের খেলনা মাত্র! কি চমৎকার এই স্বপ্ন-মাহাত্ম্য!—এই রকম স্বপ্ন দেখা যদি আমার পক্ষেও সম্ভব হোত! -কিম্বা যদি প্রমাণ করতে পারতুম যে আমার স্বপ্ন প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নই নয়, পরন্তু বাস্তবেরই প্রতিবিম্ব! আবার সেই হ্যামলেটের কথাই আস্‌ছে—

মৃত্যু না সে মহানিদ্রাগার?
নিদ্রা! বুঝি দেখিতে স্বপন? কে করে এ সমস্যা বিচার!"

গাঢ়নিদ্রামগ্না জ্যারোবার দিকে আর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এল র‍্যামি আবার সেই পালঙ্কের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন—ক্ষণকাল অপলক নয়নে সেই শয়ানা সুন্দরীর পানে চাহিয়া রহিলেন—পরে, ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার সুকোমল বাম বাহুখানি মুষ্টিবদ্ধ করতঃ ধীরোচ্চারিত আদেশসূচক স্বরে আহ্বান করিলেন—"লিলিথ! লিলিথ! এসেছি আমি,—কথা কও!"

ক্রমশঃ—

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা।

—:*:—

(বোধি সত্ত্বাবদান কল্পলতা)

শ্রাবস্তী মহানগরীর প্রতি দুয়ারে দুয়ারে কাশ্যপ
সারাদিনমান ফিরিছেন ডাকি সহি নিদারুণ তৃষাতপ—
"অভিমানহীন কাহার হৃদয়, কে দিবে ভিক্ষা মোরে আজ?
মানে ভগবান শ্রেষ্ঠবস্তু যার যাহা আছে মহীমাঝ"
পড়িল নগরে কল-কোলাহল, জনপদ জুড়ি কালোছায়া
শ্রেষ্ঠবস্তু কার কি যে আছে, কার 'পরে তার কত মায়া;—
নিরূপিতে গিয়া দেখিল সবাই যার যাহা আছে তাই তার
শ্রেষ্ঠ—নহিলে চলে না মোটেই, বড় একান্ত আপনার!
কি দিয়া কি রাখে এই সমস্যা-সমাধানে রত গৃহীগণ
তণ্ডুল কণা হ'তে কোষার্থ সবেতেই সম প্রয়োজন।

নৃপ দিল এক শ্রেষ্ঠহস্তী রতন-মালায় বিভূষিয়া
প্রত্যাখ্যানি শ্রমণ সে দান চলি গেল মুখ ফিরাইয়া !
তীব্র পুঞ্জ অপমান সম দাঁড়ায়ে রহিল করি-বর
রবিকর রেখা ঠিকরি রতনে ছুঁড়ে বিদ্রূপ গাঢ়তর !

ভাবি মনে মনে—দেখি জগতের এ শোভা রাজ্য অভিনব
ভিক্ষুর মন মোহিবে, নিবে সে আমার এ সেরা বৈভব—
শ্রেষ্ঠী সার্থবাহেরা আনিল নানা দেশানীত সম্ভার
বসন ভূষণ পাত্র অজিন শিল্প চিত্র কারু আর !
বাঁকায়ে গ্রীবাটি বাম করে ঠেলি চলিল শ্রমণ গান গেয়ে
দেশদেশান্ত আনীত লজ্জা দেখিছে বণিক্ চেয়ে চেয়ে !

মড়কের মত প্রতি ঘরে ঘরে জাগিয়া উঠিল কল্লোল
কি চায় ভিক্ষু, কি যে দিতে হবে—পড়িল নগরে মহারোল !
থালে থালে ভরি সব সম্পদ নিঃশেষ করি কোষ তার
নিয়ে এল ধনী প্রচুর অর্থ মণি কাঞ্চনে ভারে ভার।
কত পুরুষের সঞ্চিত এ যে প্রাণাধিক প্রিয় এই ধন
বারেক ফিরেও চাহিল না, ও গো কেমন ভিখারী এই জন ?

শ্রান্ত তপন ডাকিছে তখন অস্তপারের পাটনীরে—
শেষ-খেয়াখানি রাঙিয়া তুলেছে তিমির তীরের তরণীরে !
ব্যর্থ শ্রমণ উপজিল আসি জনরোপান্ত বনমূলে
দূরে দূরে পিছে আসে নরনারী বিস্মিত সব কায ভুলে !

পথি পাশে এক নিম্ব বিটপী দেখিল শ্রমণ তারি তলে
শয়ান একটি কুষ্ঠিনী, শুধু গলিত মাংসে আঁখিজলে !
তীব্র কুষ্ঠে কি পূতিগন্ধ গরল-জারিত বহু দূর
মাঝে মাঝে আসি লোলুপ শৃগাল লেহিছে সে দেহ রোগাতুর।
নাহিক শক্তি নাড়িতে অঙ্গ কহিল শ্রমণে সকাতরে
"বাঁচায়ে রেখেছি এ-ক'টি অন্ন, নিয়ে যাবে কিগো দয়া করে ?"
কম্পিত করে দিল ভিক্ষুরে সে ক'টি অন্ন যথাবিধি—
উল্লাসে নাচি কহিল ভিক্ষু—"পেয়েছি এবার মহানিধি !"

তপন তখনি ডুবিল সাগরে লাল মেঘালীর পর-পারে
উদ্গত-জল-বিন্দু-নিচয় ফলিল গগনে তারাকারে !

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

হাঁইদর আলি খাঁ।*

——:*:——

অসীম বুদ্ধিমত্তা, বীর্য্যবত্তা, সাহসিকতা এবং ন্যায়পরতা না থাকিলে মানব কদাচ উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতে পারে না। ইহা আমাদের কথা নহে—শাস্ত্রের কথা। তবুও যে-সকল বীর পুরুষ অতি নিম্নতর আসন হইতে উচ্চতর আসনে আরোহণ করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে উপরোক্ত বীর একজন। পরমেশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ বা দয়া না থাকিলে, এরূপ উচ্চতর আসনপ্রাপ্তি কাহারও ভাগ্যে ঘটে কি না, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। যে মহাবীরের সংক্ষিপ্ত কাহিনী নিম্নে প্রকটিত হইতেছে, তিনি হীনবংশে জন্মগ্রহণ না করিলেও, সহায়সম্পত্তিতে বিশেষ উচ্চ ছিলেন না, এবং স্বীয় ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় তাঁহাকে 'সময়ের' সহিত যথেষ্ট সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।

হাইদর আলি ৩৪ বৎসরকাল সংসারের সহিত বিচ্ছিন্ন না থাকিলেও, একরূপ উদাসীনতায় জীবন-তরী ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। ১৭৫১ খৃঃ অব্দে যখন তাঁহার পিতার মৃত্যু ঘটে, তখন তাঁহার চক্ষুরুন্মিলন হইয়াছিল। ইহার কয়েক বর্ষ পরে রাজনীতিক্ষেত্রে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে হাইদরের যেরূপ কুশলতা এবং বীরত্বের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দক্ষিণ ভারতের প্রবল নরপতিগণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের মহারাষ্ট্রশক্তি ;—এমন কি, ইংরাজ ফরাসী এবং পোর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তাগণকেও চমৎকৃত, বিস্মিত হইতে হইয়াছিল। স্বর্ণ-প্রসবিনী ভারতমাতা যে বীরগণের জননী—ভারতের বায়ু ; ভারতের জল : ভারতের প্রত্যেক ধূলিকণা এবং ভারতমাতার দুগ্ধ যে বীরের দেহকে কোন দিন সুগঠিত করিত ;—একথা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর সুদূর-দিগ্‌দেশাগত বৈদেশিক বণিকগণও বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া গিয়াছেন।

বেঙ্গালোর প্রদেশের অন্তর্গত দেবনলি নামক ক্ষুদ্র দুর্গে ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে হাইদরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম নাজিম সাহেব। নাজিম সাহেব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিজাম-মুল-মুল্‌কের অধীনে দশ সহস্র সৈনিকের সেনাপতিত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক দেবনলি দুর্গ রক্ষা করিতেছিলেন। এই সময় হইতে দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের প্রবল আধিপত্য ও ক্ষমতার সঞ্চয় হইতে থাকে ; কিন্তু প্রবলপ্রতাপান্বিত ও কূটরাজনীতিজ্ঞ ঔরঙ্গজেবের ভয়ে তিনি মস্তক উত্তোলন করিতে অবসর পান নাই। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর নিজাম-মুল-মুল্‌কের ন্যায় অন্যান্য প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণও শনৈঃ শনৈঃ শির উত্তোলন করতঃ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।†

নাজিম সাহেব (হাইদরের পিতা) হীন বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি খোরাসানের কোন এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু, ঘটনাচক্রে তাঁহার অধস্তন পুরুষেরা,—যেখানকার মৃত্তিকায়

---

* ৭ই আশ্বিন বুধবার গৌহাটি সাহিত্য পরিষৎ শাখায় সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত।

† ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৭০৭ খৃঃ অব্দে ঘটে, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৮৯ বৎসর এবং রাজত্ব কালের পরিমাণ ৫০ বৎসর হইয়াছিল।

স্বর্ণ অঙ্কুরিত হয়, পানীয় অমৃত তুল্য এবং যেখানকার শ্রীসম্পদ অতুলনীয় বলিয়া দূর—অতি দূরদেশেও কথিত হইত ;—সেই ভারতভূমিতে ভাগ্যচক্রের লিখনে, ভাগ্যলক্ষ্মীকে বোধহয়, বন্ধন করিবার আশায় আগমন করিয়াছিলেন। আবার তাঁহারই বংশধরগণ এই ভারত-সমুদ্রে ডুব দিয়া বালুকামুষ্টি উত্তোলন করেন নাই—উত্তোলন করিয়াছিলেন মণি !

হাইদরের পূর্ব্বপুরুষ (হুসেন) আনুমানিক ১০৭৫—১০৭৭ হিজিরায় ভারতবর্ষে আগমন করেন, এবং আজমীরের প্রসিদ্ধ ফকির সাজামইমুদ্দীন চিস্তীর আশ্রয়ে নিজ বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার পুত্র মহম্মদ আজমীর হইতে দিল্লী এবং পরে দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন। মহম্মদের প্রপৌত্র ফতে মহম্মদের ঔরসে ১১২৯ হিজিরায় (১৭১৭ খৃঃ অব্দে) হাইদরের জন্ম হয়। "কারনামা হাইদ্রবী"* গ্রন্থ হইতে হাইদরের বংশ-পত্রিকা এইরূপ প্রস্তুত করা যাইতে পারে :—
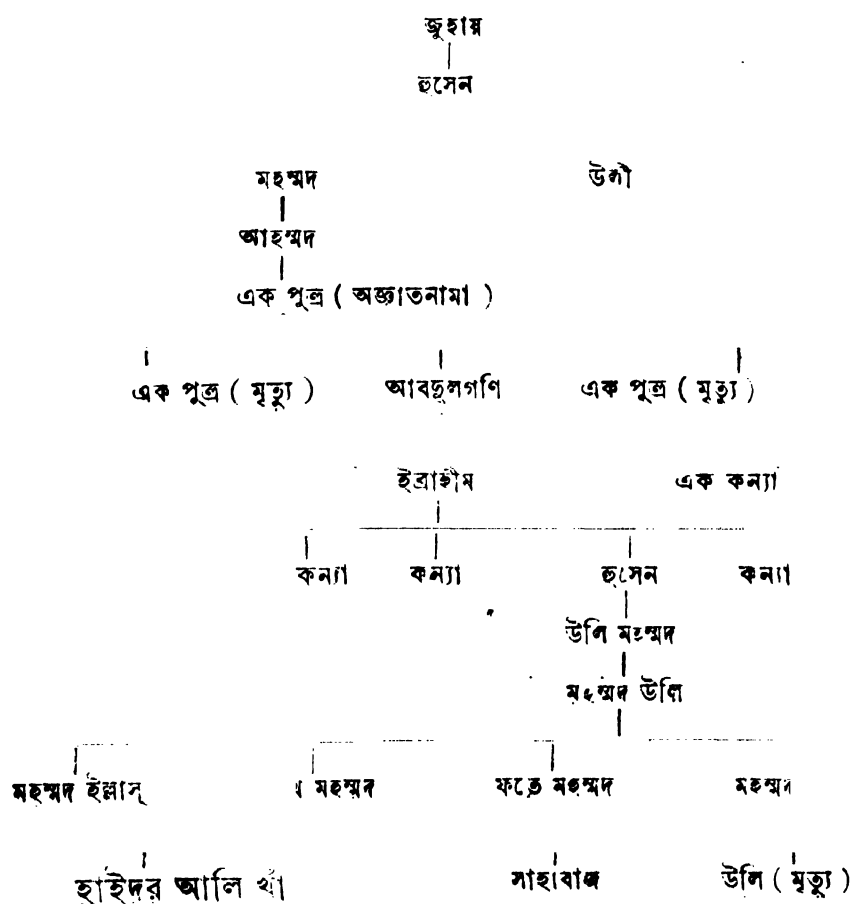
* "কারনামা হাইদ্রবী" পারস্য ভাষায় লিখিত। গ্রন্থকার অজ্ঞাতনামা

এই প্রবন্ধে হাইদর আলির ইতিহাস কথিত হইতেছে না। যাঁহারা তাহাই চান, তাঁহারা তাহা অন্যত্র দেখিবেন। এ-প্রবন্ধে আমরা দেখাইতেছি যে মানব সামান্য অবস্থা হইতে কতদূর উন্নতি করিয়া নিজকে কিরূপ আসনে বসাইতে সক্ষম হন। অধ্যবসায়, বাহুবল, শ্রম-সহিষ্ণুতা এবং ন্যায়পরতা দ্বারা চঞ্চলা কমলাকে স্বর্ণডোরে বন্ধন করিতে পারা যায় কিনা,—তাহা হাইদর আলি, পাঠানবংশের শের শা, পারসিক নাদির শা, আলিবর্দ্দী খাঁ, মুর্শিদকুলি খাঁ, রণজিৎ সিংহ এবং হিন্দু-কুল-চূড়ামণি শিবাজী প্রভৃতি জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন। যদিও হাইদর আলির শরীর কোন রাজবংশের শোণিতে গঠিত হয় নাই; তথাপি কালক্রমে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া, তিনি কিরূপ যোগ্যতার সহিত তাহা শাসন করিয়া গিয়াছেন তাহা সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাস পাঠ করিলে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। এবং ইহাও বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যতদিন বিখ্যাত মোগলবংশের অস্তিত্ব ছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে একজনও শাসন-সংরক্ষণে অথবা বীরত্বে হাইদরের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

কোন সমসাময়িক ইংরাজ লেখক হাইদরের রাজ্য শাসনপ্রণালী অবলোকন করিয়া লিখিয়াছেন :—

"Hyder Ali Khan was doubtless one of the greatest characters Asia has produced, and if his success cannot be compound with that of Taimrlane or Nadir Shah, it must be attributed more to the competitors with whom he had to contend, than to any want of ability on his part. Without the advantage of education, he acquired an extensive knowledge of the science of war and of politics; and by his superior talents, raised himself from a private station to the soverignty of a powerful kingdom.

He administered justice with impartiality, and gave great encouragement to agriculture and to commerce. He was indulgent to his subjects, but strict in the discipline of his army, severe in punishing offenders, and such to his enemies."

ইহা একজন খাঁটি ইংরাজের কথা, আমাদের নিজের কথা নহে। ইহা পড়িয়া হাইদরের বিচক্ষণতা এবং রাজকীয় সদ্‌গুণাবলীর একটা সত্যচিত্র কাহার না মানস-পটে উদিত হয়?

যাহাই হউক, প্রকৃত পক্ষে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে হাইদর আলি যোগ্যহস্তে শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া স্বাধীন রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। মহীশূর রাজ্য ঐ সময় হইতে তাঁহার করতলগত হয়। তাহার পর ক্রমান্বয় ১৭৬৩-৬৪ খৃঃ অব্দে বেদ্‌নোর; ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে শুন্‌দা; ১৭৬৫-৬৬ খৃঃ অব্দে মালবার; ১৭৬৮-৬৯ খৃঃ অব্দে বড় মহল; ১৭৭২-১৯ খৃঃ কর্ণাট, বালঘাট, বিজাপুরী এবং হাইদ্রাবাদী এবং ১৭৭২-১৭৭৭ খৃঃ অব্দে অন্যান্য ছোট ও বড় প্রদেশসমূহ তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহার বিজিত রাজ্যের পরিমাণ আশী হাজার বর্গমাইল, অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ এবং রাজস্ব প্রায় তিন কোটির উপর ছিল।

হাইদর আলি যে কাল সমর বাধাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার সমাপ্তি তিনি জীবদ্দশায় দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। বঙ্গ বেহার এবং উড়িষ্যার নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া দৌহিত্র সিরাজকে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, সিরাজ তখন চঞ্চলমতি বালক হইলেও, স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলে পর, তাঁহার উপদেশ যথাযথ পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে পলাশীর যুদ্ধ। যাঁহারা সিরাজকে অপরিণত বুদ্ধি, চঞ্চল, উচ্ছৃঙ্খল প্রভৃতি বিশেষণদ্বারায় তাঁহার চরিত্রকে কলুষিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,—তাঁহারা সত কে

যে কতদূরে পরিত্যাগ করিয়া লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিবার বিষয়। সিরাজ যে কারণে ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ বাধান ; হাইদর আলিও সেই সকল কারণে তাঁহাদের উপর একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সে পথের আশ্রয় লন। হাইদর জীবিত থাকিলে এই ভীষণ সমরের গতি কিরূপ দাঁড়াইত, তাহা এখন বলা কঠিন। যাহা হউক, এই সময়ে তাঁহার বয়সও অধিক হইয়াছিল, এবং যুদ্ধের জন্য ক্রমাগত পরিশ্রমে শরীর ক্রমশঃ অপটু হইয়া আসিতেছিল,—ততোধিক যন্ত্রণাদায়ক পৃষ্ঠের ক্ষত তাঁহাকে আরও পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। পীড়া বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করিলে তিনি যুদ্ধস্থলের শিবির পরিত্যাগ করিয়া আরকোটে চলিয়া আসিতে বাধ্য হন,—এবং এইখানেই ৮২ বৎসর বয়সে মহীশূর বীর হাইদর আলি খাঁর প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া কোন্ এক অজ্ঞাতরাজ্যে প্রস্থান করে। এদিকে তাঁহার এইরূপ আকস্মিক মৃত্যুতে যুদ্ধের অবস্থা যে অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

মৃত্যু যে আসন্ন তাহা নবাব দেহের অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন—তাই তিনি মরণের এক দিবস পূর্ব্বে তাঁহার রাজ্যের যাবতীয় কর্ম্মচারীগণকে এবং সৈন্যগণকে এক মাসের বেতন পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করিতে আজ্ঞা দিয়াছিয়াছিলেন। হাইদরের মৃত্যু ঘটলে কয়েক দিবস এ সমাচার বাহিরে প্রকাশ করা হয় নাই। নিশীথকালে তাঁহার দেহ কোলারের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে সমাহিত করিবার জন্য বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল। কিন্তু তাঁহার পুত্রগণের অভিপ্রায়ানুসারে নবাবের মৃতদেহ সেরিঙ্গাপত্তনে (শ্রীরঙ্গপত্তন রাজধানী) আনয়ন করা হয়, এবং 'লালবাগে' বিশেষ সমারোহের সহিত সমাধিস্থ করা হয়। হাইদরের সমাধি-ভবন একটি দেখিবার বস্তু, এবং আজিও উহা প্রবাসীর নয়নমন সার্থক করিয়া থাকে, এবং যতদিন উহার অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন তাঁহার নাম ও কার্য্যাবলীর কথা কেহ বিস্মৃত হইবে না।

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, হাইদর আলি একজন usurper ছিলেন ; একথা অসঙ্গত নহে। প্রাচীন কথাতেই ব্যক্ত যে—"যাহার লাঠি তাহার মাটী"। দুর্ব্বলের উপর পীড়ন স্বভাবসিদ্ধ—অপর কথায় "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"! বলপূর্ব্বক অন্যের রাজ্য অধিকার করিয়া ভোগ করা বীরের কার্য্য—অন্ততঃ এশিয়া খণ্ডে ইহা নূতন নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতে এরূপ লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। মোগল ও পাঠান যুগে usurpation একটা মজ্জাগত অভ্যাস ছিল। যাঁহাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা উচ্চাসন দিই—সেই সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবকে অবশ্য usurper বলিলে অন্যায় হয় না। তিনি কোন্ অধিকারে পিতা বর্ত্তমানে, ঘোরতর সমর বাধাইয়া দিয়া একে একে ভ্রাতাগণকে এবং আত্মীয় স্বজনগণকে বধ করিয়া,—পিতাকে বন্দী করিয়া 'তক্ত-তাউস'* অধিকার করিয়াছিলেন? এটা কি তাঁহার উচিত হইয়াছিল? রাজ্যশাসনে তিনি কি সাজাহানের অপেক্ষা প্রজারঞ্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন? কখনই না। আবার দেখি, কিছুকাল পরে এই ঔরঙ্গজেবকে প্রজাগণ প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছিল (অবশ্য হিন্দুগণ নহে) এবং সাজাহানকে ভুলিয়াছিল। জগতের ইহাই চিরন্তন রীতি। অন্যদিকে পাঠক দেখিবেন যে, বঙ্গ বেহার ও উড়িষ্যার নবাব আলিবর্দ্দীখাঁও এই দলের একজন। তিনি ত পাটনার শাসনকর্ত্তা ছিলেন—প্রভু সরফরাজ খাঁকে নিপাত করিয়া, তদানীন্তন দুর্ব্বল দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ শাকে উপযুক্ত উপঢৌকন দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সনন্দ লাভ

* "ময়ূর" সিংহাসনের অপর নাম।

করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে জাল, জুয়াচুরী, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সবই ছিল—তবুও প্রজাগণ তাঁহাকে অতি প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তাহার কারণ, তাঁহার নৈতিকচরিত্র এবং প্রজাপালনের গুণে। এরূপ দৃষ্টান্ত ভারতেতিহাসে নূতন নহে। সকল বিষয় ধীরমস্তিষ্কে আলোচনা করিলে নবাব হাইদর আলিকে ঠিক usurper বলতে পারা যায় না।

পিতার মৃত্যুর সময়ে টিপু সুলতান পানিয়ানি নামক স্থানে ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল ম্যাক্লীয়ডের (Col. macleod) সহিত ঘোরতর সমরে লিপ্ত ছিলেন। ১১ই ডিসেম্বর* রাত্রিকালে হাইদরের জীবনাবসানের বার্ত্তা তাঁহার কর্ণগোচর হয়। এই নিদারুণ সংবাদ তাঁহার কর্ণে পৌছিবামাত্র তিনি শিবির উত্তোলন করিয়া, ফরাসী সেনাপতি এম্ লালির (M. Lally) উপর সৈন্যগণের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়া, তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রগতিতে সেরিঙ্গাপত্তনে আগমন করেন। টিপু যথারীতি পিতার মৃতদেহের সৎকার করিয়া, আনুমানিক ২০শে ডিসেম্বর ১৭৮২ খৃঃ অব্দে বিনা আড়ম্বরে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। এ দিকে মহীশূরপতির মৃত্যু সংবাদ অল্প দিবসের মধ্যে চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সমাচারে তাঁহার শত্রুগণ যে অল্প-বিস্তর কিছু দিনের জন্য নিশ্চিন্ত না হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

নবাব হাইদর আলি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে হাইদর রাজবংশে জন্ম-গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তিনি দরিদ্র লোকেরও সন্তান ছিলেন না। স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া, বোধ-হয় এই কারণে, তিনি দরিদ্র লোকদিগের প্রতি অধিকতর দয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। দরিদ্রের উপর নির্য্যাতন, দরিদ্রের সর্ব্বস্ব অপহরণ প্রভৃতি নির্দ্দয় কার্য্যসকল কেহ করিলে, তাহার উপর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হইত ধনী ও দরিদ্রের বিচার প্রার্থনা তিনি সমভাবেই গ্রহণ করিতেন। বিচারাসনে বসিয়া হাইদর পক্ষপাতিত্বকে হৃদয়ে স্থান দিতেন না। কোন উচ্চতম রাজকর্ম্মচারীর বিপক্ষে কোন নিরাশ্রয়া বিধবার আবেদন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি সেই অপরাধী রাজপুরুষকে অতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি দরিদ্রকে অর্থদান করিতে কার্পণ্য করিতেন না; আমোদপ্রমোদ ও বিলাসীতাকে প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি মদ্যপান করিতেন না। ঈশ্বরের উপর তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল এবং ঈশ্বরোপাসক ব্যক্তিকে বিশেষ সম্মান ও ভক্তি করিতেন। কিন্তু যাহারা সাধুর বেশ ধরিয়া, কেবলমাত্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বেড়াইত, তাহাদিগকে তিনি ঘৃণা করিতেন। নবাব, দিবসে মাত্র দুইবার পানাহার করিতেন (প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় এবং রাত্রে ১২ ঘটিকার সময়)। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কার্য্যনিরূপণ তালিকানুযায়ী নিদ্রা, ভ্রমণ, বিশ্রাম, রাজকার্য্য, উপাসনা ব্যায়াম, বিচারকার্য্য প্রভৃতি সম্পন্ন করিতেন। হাইদর আলি রাত্রে ৪ ঘণ্টা এবং দিবসে ১॥০ ঘণ্টা নিদ্রাকেই পর্য্যাপ্ত মনে করিতেন। অন্যান্য ব্যায়ামের সহিত তিনি অশ্বারোহণ এবং শিকার নিত্যকার্য্যের ন্যায় সম্পন্ন করিতেন। হাইদর আলি লেখাপড়া জানিতেন।† কোরাণ তাঁহার মুখস্থ ছিল। তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। বহু কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইতেন। তিনি কোন কোন কবিকে হাজার টাকা পর্য্যন্ত বেতন দিতেন। তাঁহার রাজ্যের মধ্যে ডাকের বন্দোবস্ত, দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি ছিল। তাঁহার কঠোর শাসনে দস্যু তস্করের উপদ্রব অতি অল্পই ছিল; সুতরাং পথিকগণ নিরুদ্বেগে কি দিবসে, কি রজনী-কালে পথ পর্য্যটন করিতে পারিত। নবাব হাইদর আলির চরিত্র, বিচার পদ্ধতি,

* ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ। † কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হাইদর বর্ণজ্ঞান শূন্য ছিলেন

শিক্ষা, দয়া, দাক্ষিণ্য এবং অন্যান্য সদ্গুণ রাশি অবলোকন করিয়া, তাঁহাকে একজন বিচক্ষণ নরপতি বলিলে, বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া টিপু সুলতান আনন্দ প্রকাশ করেন নাই। মোগল বাদশাহদিগের পুত্রগণের ন্যায়, পিতৃ সিংহাসন কখন শূন্য হইবে এরূপ আশা অন্তরে পোষণ করিয়া, লুব্ধ দৃষ্টিতে টিপু সিংহাসনে বসিলেও, বিশেষ ভাবিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভাবনা—যে অনল হাইদর জলে স্থলে,—দেশীয় ও বিদেশীয়-দিগের সম্মুখে জ্বালিয়া ধরিয়াছিলেন, তিনি জীবিত থাকিলে, টিপু সুলতান তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ থাকিয়া, সে অনল নির্ব্বাপিত করিতেন। টিপু মহাবীর হইলেও, চতুর্দ্দিকে ইংরাজ, নিজাম, মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাট নৃপতির অবিরাম উল্লাসধ্বনিতে একটু বিচলিত যে না হইয়া পড়িয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সিংহাসনে উপবেশন করিয়া টিপু সুলতান কোষাগার উন্মুক্ত করিয়া হীরা জহরত, আশরফি এবং রৌপ্য মুদ্রা একত্রিত করিয়া, হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তাহার পরিমাণ একশত কুড়ি কোটি মুদ্রা। এই অগাধ মুদ্রা হস্তগত হওয়ায়, এই অবসরে রাজ্য আরও সুরক্ষিত করিবার নিমিত্ত তিনি সামরিক বিভাগের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে সুলতান যাবতীয় দুর্গ পরিদর্শন, সংস্কার এবং সামরিক উন্নতি যথেষ্ট করিয়াছিলেন। আমরা যথাসম্ভব তাহার একটা তালিকা নিম্নে প্রদান করিলাম :—

(১)	অশ্বারোহী সৈন্য	১৯ হাজার	(৭)	অশ্ব	১১ হাজার।
(২)	গোলন্দাজ সৈন্য	১০ হাজার	(৮)	বলদ	৪ লক্ষ।
(৩)	পদাতিক সৈন্য	১ লক্ষ ৩০ হাজার	(৯)	মহিষ	১ লক্ষ।
	(প্রথম শ্রেণীর)		(১০)	ভেড়া	৬ লক্ষ।
(৪)	পদাতিক সৈন্য	১ লক্ষ ৮০ হাজার।	(১১)	তরবারী	২ লক্ষ।
	(দ্বিতীয় শ্রেণীর)		(১২)	কামান	২২ হাজার।
(৫)	হস্তী	৭০০ শত।	(১৩)	মশালধারী	৫ হাজার।
(৬)	উট	৬ হাজার।		এবং ৬ লক্ষ সমরোপযোগী ভৃত্য।	

টিপু পিতার আমলের সৈন্য, কামান এবং অন্যান্য অস্ত্রাদির আমূল পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই সমরোপকরণ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে তিনি যুদ্ধ জয় করিবার জন্য কিরূপ আয়োজন করিয়াছিলেন। ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে সুলতান রাজ্যের সমুদয় জমি জরীপ করিবার আদেশ দেন এবং নূতন জমাবন্দী অনুসারে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। এই নূতন জমাবন্দী অনুসারে প্রত্যেক পাগোদার উপর ১ ফানাম বর্দ্ধিত হয়। এইরূপ রাজস্বের আকস্মিক বর্দ্ধন হওয়ায়, মোট রাজস্ব বর্দ্ধিত হইয়া প্রায় পাঁচ কোটির উপর হইয়াছিল। হাইদর আলির অধিকৃত ভূ-ভাগ ব্যতীত টিপু সুলতান বাহুবলে অনেক স্থান নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

প্রধানতঃ এই প্রবন্ধে হাইদর আলির্ণার রাজ্যের ইতিহাস এবং তাঁহার চরিত্রের আংশিক চিত্র প্রদর্শিত হইল,—টিপু সুলতানের ইতিহাস এ স্থলে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত। তবে মহীশূর রাজ্যের

রৌপ্য মুদ্রা (দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত।)

কথা বলিতে হইলে, কথাপ্রসঙ্গে টিপু সুলতানের কার্য্যাবলীর অল্প আভাষ প্রদান করা প্রয়োজন, তাহাই তাঁহার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা লিখিত হইল। যাঁহারা টিপু সুলতানের কথা বিশদরূপে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে "Catalogue and memoirs of Tipoo Sultan" পাঠ করিতে অনুরোধ করি।*

শ্রীনিরঞ্জন সান্যাল।

বসন্ত-বিদায়।

—:*:—

পলায়মান্ করুণ সুরে
　　বসন্ত কয়—"ধরণি,
এবার আমায় দাও গো বিদায়—
　　ওগো হৃদয়-হরণি!"
ভুঁই-চাঁপা যুই মল্লিগুলি
অমনি আকুল উঠ্‌ল দুলি,
পাঁপড়ি পরাগ দিল খুলি—
　　রুচি বিদায়-সরণি।
আকুল হল দখিন হাওয়ার
　　ব্যাকুল চাওয়ার তরণী।

বল্‌ছে বেলা—"বেশ তো ছিলাম
　　অন্ধকারের কক্ষে গো,
ফুটিয়ে কেন তুল্‌লে হেন
　　সোহাগ করে বক্ষে গো?
উজল বিপুল বিশ্বমাঝে
সঙ্কোচে যে মর্‌চি লাজে!
ক্ষুদ্রতা মোর বিষম বাজে
　　আলোক-হত চক্ষে গো!
আঁধার ভাল আলোর চেয়ে
　　ক্ষুদ্র আমার পক্ষে গো!"

* Catalogue and memoirs of Tippoo Sultan by Charles Stuard.
(Printed in Cambrsdge, 1809.)

আমের মুকুল কহে অকুলি
"কেমন করে বইব
তোমার দেওয়া ফলের এ ভার—
এ দুখ্ কারে কইব ?"
পাণ্ডুদেহে ব্যাথার ভরে
সবুজ পাতা সকাতরে
মূর্চ্ছি প'ল চরণ ধরে ;
"দাঁড়াও সাথী হইব।"
ছুটল পিছে কোকিল কহি'
"কারে নে' আর রইব ?"

"দণ্ড দুয়ের অতিথ্ আমার"—
ভুবন ভাবে অন্তরে—
"তোমার পরশ আমার মাঝে
কেবলি সে সন্তরে !
যৌবনেরই জোয়ার আনি
মুছিয়ে আমার সকল গ্লানি—
কাঙাল আমায় করে রাণী—
বাঁচিয়ে প্রাণ মন্তরে—
কেন আমার বক্ষে আবার
হান মরণ-মন্তরে !"

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

বঙ্গভাষা।

যে ভাষার জ্ঞান সদ্যোবিলাতপ্রত্যাগত বঙ্গবাসীর মনে জুগুপ্সার উদয় করে তাহার নাম বঙ্গভাষা। বঙ্গভাষা দুই প্রকার, চলিত ও সাধু। যে বঙ্গভাষার সাহায্যে আমরা মনের ভাব ব্যক্ত করি তাহার নাম চলিত ভাষা। যথা :—'একবার আমাদের শিক্ষার ভার বাস্তবিকই আমাদের নিজের হাতে নিয়েছিলেম। কিন্তু তা সত্য হয়ে উঠ্‌লো না—ওঠবার কথাও না। কারণ আমরা সেদিন যে বিদ্যার মন্দির খাড়া করে তুলেছিলেম তার আবাহন বীণাপাণির বীণার তানে হয় নি,—তার উদ্বোধন হয়েছিল রুদ্রের ডমরুর ডিমি ডিমি নাদে।"

যাহা চলিত ভাষা নহে তাহার নাম সাধু ভাষা। যথা:—"ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি মন্থন করিয়া অনর্গল ভূ'র ভূরি প্রমাণ প্রযুক্ত করিতে লাগিলেন, শব্দ-সাগর মন্থন করিয়া শত শত মহার্ঘ, শ্রবণ-মনোহর বাক্যপরম্পরা কুসুমমালাবৎ গ্রন্থন করিতে লাগিলেন, সাহিত্যভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া সারবতী রসপূর্ণা, সদলঙ্কার-বিশিষ্ট কবিতানিচয় বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বোপরি আপনার অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগের মোহময়ী প্রতিভান্বিতা, ছায়া বিস্তারিত করিলেন।"

এই দুইজাতীয় বঙ্গভাষার প্রত্যেকটী আবার দৃশ্য ও শ্রব্য ভেদে দুই প্রকার।

যখন পবন-পথে পরিচালিত হইয়া কর্ণপটহে আঘাত করেন তখন ইনি শ্রব্য, আর যখন মসীলিপ্ত হইয়া চক্ষুর পীড়া জন্মান তখন ইনি দৃশ্য। তন্মধ্যে শ্রব্যের দুইরূপ; বক্তৃতা ও গীত। গীতে স্বরবর্ণ ও বক্তৃতায় ব্যঞ্জনবর্ণ-সকল প্রাধান্য লাভ করে। গীত, যথা: —"আমি তো-ও-ও তো-ও-ও-ও মারে-এ চাহিনি-ই-ই-ই জীবনে তুমি অভাগা-আরে চে-এ-এ-এ-এ-এ-ছ-অ-অ।"

বক্তৃতা, যথা: —"সভাপতি মহাশয় ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমি বক্তা নহি, বক্তৃতা করা আমার কোন কালে অভ্যাস ছিল না। আমি অতি মন্দবুদ্ধি। অধিক আর কি বলিব,—আমি একটী গর্দ্দভ। জানি না আজ এই বিরাট ভার বহন করিয়া কিরূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব। এখন সে কথা চুলায় যাক্। আমি বলিতেছিলাম আজ আমার বড় আনন্দের দিন। এতগুলি সুসভ্য, সুশিক্ষিত, সুরুচি ব্যক্তিগণের সংসর্গে মনে আনন্দবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। কিন্তু সহসা এই আনন্দচন্দ্র পরিম্লান করিয়া চারিদিকে শোকের ঝড় বহিতেছে কেন? জান কি ভাই বাঙালী, কেন এরূপ হইল? হইল, তাহার কারণ আজ আমাদের বড় দুর্দ্দিন। আজ আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ হেড্‌ক্লার্ক শ্রীযুক্ত রতিকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন। রতিকান্ত বাবু পুণ্যশ্লোক। তাঁর—তিনি আমাদের—তিনি দেশের জন্য—সর্ব্বসাধারণের—তাঁর—তাঁর অনেক গুণ, সে কথা এখন বলিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। তাঁর স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে অক্ষয়রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা এই স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করিতে চাই। অতএব হে বন্ধুগণ, চাঁদা দাও।"

বক্তৃতা ও গীত উভয়ের উদ্দেশ্য ও ফল একরূপ। উদ্দেশ্য, উন্মাদন ও উৎসাদন। রামগোপাল, কেশবচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, শচীন্দ্র বোসই বল,—আর নরোত্তম, রামপ্রসাদ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্র, গিরীশচন্দ্র, রবীন্দ্রই বল, সকলের ঐ এক উদ্দেশ্য, সুপ্তকে ব্যস্ত করা।

ফল দ্বিবিধ; শ্রোতৃগত ও বক্তৃগত। শ্রোতৃগত ফল—কর্ণকীটসমুচ্ছেদ ও সুপ্তিসঞ্চার। কর্ণপটহে আঘাতের প্রাবল্য বা অল্পতার উপর এই দুই প্রকার ফল নির্ভর করে।

বক্তৃগত ফল,—কীর্ত্তি। বক্তৃতা করেন বা স্বরচিত সঙ্গীত আলাপ করেন অথচ কীর্ত্তিমান্ হন নাই এমন মানুষ ত দেখিলাম না। এ দুয়ের ভাষা যেমন হউক, রচনাভঙ্গী যেমনি হউক, বিষয় ছাই-ভস্ম যাহাই হউক, কীর্ত্তি অবশ্যম্ভাবী।

দৃশ্য বঙ্গভাষারও দুইরূপ, গদ্য ও পদ্য। দুই সমান্তরাল সরলরেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ পংক্তিমালার নাম গদ্য, যথা:—"কুড়ি, একুশ, বাইশ, তেইশ, চব্বিশ, পঁচিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, আটাশ, উনত্রিশ, ত্রিশ, একত্রিশ, বত্রিশ,

তেত্রিশ, চৌত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ, সাঁয়ত্রিশ, আটত্রিশ, উনচল্লিশ, চাল্লিশ, একচাল্লিশ, বিয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ, ছেচল্লিশ।" তদিতর পদ্য। যথা :—

"যেদিন ব্রহ্মা করিল সৃষ্টি, ছুটিল বারিধি! তোমার অম্বু,
কল্লোলে তোমার করিল ধ্বনিত, আপন বিষাণ শঙ্কর শম্ভু;
ঊর্ম্মি তোমার রচিল শয়ন, যাহাতে বিষ্ণু লভিল সুপ্তি,
মন্থনে তোমার উঠিল অমৃত, মৃত্যু হইতে করিতে মুক্তি।"

পদ্য দুই জাতীয়। মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর। যে পদ্যে দুই অনতিদূরবর্ত্তী চরণের শেষাক্ষর একধ্বন্যাত্মক—তাহা মিত্রাক্ষর। যথা :—

"দিন গেল মিছা কাজে, রাত্রি গেল নিন্দে
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে।"

যে পদ্য মিত্রাক্ষর নহে তাহাই অমিত্রাক্ষর। যথা :—

"একি একটা কথা হ'ল, ললনে!
শত্রু যদি
করে অপমান সমর ক্ষেত্রে দাড়ায়ে,
কাতরতা কেন তবে হবে বল দিখি মম মনে আজি তড়িবড়ি.
তারে করি অস্ত্রশস্ত্রাঘাতে
শতসহস্র খণ্ডে বিভক্ত
পাঠাইতে কৃতান্ত সদনে?"

(উপরোক্ত অংশটী কবিবর বনবিহারী মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের একখানি অপ্রকাশিত নাটক হইতে উদ্ধৃত।)

মিত্রাক্ষর পদ্য আদ্যন্ত মিত্রাক্ষর হইবে, এবং মিলগুলি সহজ ও সুখপাঠ্য হইবে। যথা :—

"লোকলজ্জা মান ভয়ে মাবাপ নিদয় হয়ে
আমার হৃদয়নিধি অন্যকারে সঁপিল।
অভাগার যত আশা জন্মশোধ ঘুচিল।
হারাইনু প্রমদায়, তৃষ্ণিত চাতক প্রায়
ধাইতে অমৃত আশে বুকে বজ্র বাজিল;—
সুধাপান অভিলাষ অভিলাষ (ই) থাকিল।
চিন্তা হলো প্রাণাধার প্রাণতুল্য প্রতিমার,
প্রতিবিম্ব চিত্তপটে চিরাঙ্কিত রহিল,
হায়, কি বিচ্ছেদবাণ হৃদয়েতে বিঁধি'ল।
হায়, সরমের কথা, আমার স্নেহের লতা
পতিভাবে অন্যজনে প্রাণনাথ বলিল,
মরমের ব্যথা মম মরমেই রহিল।"

কিছুদুর মিলাইয়া শেষে মিলাইতে না-পারা, বা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় "যা পদ্য যা মিলে যা" করিয়া মিলান বড় লজ্জার কথা। একটা উদাহরণ দিই :—

"সেদিন বরষা ঝর ঝর ঝরে,
কহিল কবির স্ত্রী,
রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড়,
রচিতেছ বসি পুঁথি বড় বড়,
মাথার উপরে বাড়ী পড় পড়
তার খোঁজ রাখ কি ?"

এখানে প্রথম দুই চরণের মিল গোঁজামিলন, মাঝের দুই চরণে মিল আছে, শেষের দুই চরণে আদৌ মিল নাই। এরূপ মিত্রাক্ষর অত কদর্য্য।

গদ্য লিখিবার উদ্দেশ্য :—

১। সাধুভাষার প্রচার। এ উদ্দেশ্য খুব সাধু, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কারণ গ্রন্থপাঠ করিবার সময় আমরা প্রথমতঃ দেখি তাহার ভাষা, দ্বিতীয়তঃ দেখি ভাষা, তৃতীয়তঃ দেখি ভাষা এবং শেষে দেখি তাহার ভাষা। ভাষাই সাহিত্যের প্রাণ, ভাষাই সাহিত্যের সর্ব্বস্ব, ভাষাই সাহিত্য। এই ভাষা যত সাধু হইবে সাহিত্যও তত সাধু হইবে এ-কথা কে অস্বীকার করিবেন ?

২। ভাষার পুষ্টি-সাধন। এই পুষ্টি-সাধনের উপায় পদের দৈর্ঘ্য ও গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি। পদের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি সংস্কৃত সমাসের সাহায্যেই হইয়া থাকে। (এস্থলে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে অন্যথা বঙ্গভাষা বড় শুদ্ধাচারিণী। তিনি দেববাণী ভিন্ন আর কিছু পরিপাক করিতে পারেন না। "ঘোড়ার আমার জুটিবে সোয়ার, ইয়ার পাইবে সাকী।" এস্থলে তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন।) গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির উপায় পর্য্যাপ্ত কালী, কলম ও কাগজ। এই জাতীয় গ্রন্থ সাধারণতঃ বি,এ, পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

৩। অর্থোপার্জ্জন। অর্থোপার্জ্জনের উপায় তুষ্টিসাধন। শিক্ষিতা মহিলা, বিদ্যালয়ের ছাত্র, সম্পন্ন জমিদার, প্রধান শিক্ষক প্রভৃতি তুষ্ট হইলে গ্রন্থকারের অর্থাগম হইয়া থাকে। পনের আনা লোমহর্ষণ উপন্যাস ও স্কুলপাঠ্য পুস্তকের শতকরা ৯৯.৯৭৩২খানি এই জাতীয়।

৪। অনিদ্রানিরাকরণ। গ্রন্থকে উপন্যাস নামে অভিহিত না করিলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। দু'এক স্থলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। যথা, গোরা। এখানি উপন্যাস নামে প্রচলিত হইলেও অনিদ্রারোগে সন্ন্যাসি-প্রদত্ত মাদুলির মত অব্যর্থ।

পদ্য লিখিবার উদ্দেশ্য :—

১। আত্মতুষ্টি। লেখা শেষ করিতে পারিলেই আত্মতুষ্টি হয়। পদ্য শেষ করিতে পারা বড় সুখসাধ্য নহে। পদ্যের মধ্যে ছন্দঃ বলিয়া একটা পদার্থ আছে। ইহা লেখকের পরম বৈরী। ছন্দঃ শব্দের অর্থ সমাক্ষরত্ব। অর্থাৎ পূর্ব্ব চরণে যদি চৌদ্দটী অক্ষর থাকে ত পরের চরণে গুণিয়া গুণিয়া ঠিক চৌদ্দটী অক্ষর বসাইতে হইবে।

কমবেশী হইলে চলিবে না। ইহার নাম ছন্দোরক্ষা করা। ইহা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। পদ্যব্যবসায়ী-মাত্রেই জানেন অক্ষরগুলাকে লইয়া অনেক সময়ে বড় বিব্রত হইতে হয়। করতলাগত সর্ষপতৈলের ন্যায় যতই তাহাদিগকে মুঠার মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা যায় ততই তাহারা আয়ত্তের বাহিরে গিয়া পড়ে। পয়ার,—ত্রিপদী ইত্যাদি বাঁধনের মধ্যে আটকাইয়া রাখা দুর্ঘট হইয়া পড়ে। ইহার দৃষ্টান্ত :—

"ত্যজ রণসাজ শীঘ্র দেখাই (ও) না আর
বিভীষিকা তরুণীর হৃদয় তাপিতে।"

অনেক নামজাদা কবির পদ্যে ছন্দোপতন দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইঁহারা দমিবার পাত্র নহেন। যেখানে ছন্দোরক্ষা করিতে না পারেন সেখানে মাত্রাছন্দঃ নাম দিয়া লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের চেষ্টা করেন। যথা :—

"জনগণপথ তব জয়রথ চক্রমুখর আজি
স্পন্দিতকরি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।"

এস্থলে পূর্ব্ব চরণে ১৯টী অক্ষর, আর দ্বিতীয় চরণে ১৭টী অক্ষর। কাজেই ইহা মাত্রাছন্দ! মত্তমহিষের ন্যায় দুর্নিবার এই ছন্দকে আয়ত্ত করিয়া পদ্য শেষ করিতে পারিলে আত্মতুষ্টি হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

২। ছাপার অক্ষরে সংমুদ্রণ। অনেক অমূল্য পদ্যে এতদতিরিক্ত আর কোনও উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয় না।

৩। ঘটনার বিজ্ঞাপন। একটী ঘটনা ঘটিয়াছে ইহা জানাইতে পারিলেই এই জাতীয় পদ্য সার্থক হয়। নসীরামের বিবাহ, হলধর চক্রবর্ত্তীর স্থানান্তর, তিনকড়ি মাইতির জন্ম প্রভৃতি যে কোনও ঘটনা উপলক্ষে এইরূপ পদ্য লিখিত হইয়া থাকে।

৪। যশোলাভ। যশোলাভের একটী উপায় মৃত্যু। সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে এ কথা সত্য। কবিগণ মৃত্যুর পরই যশের মুকুট পরিধান করিয়া থাকেন। জীবদ্দশায় ইঁহাদের অনেকের ভাগ্যেই শিরোভূষণ যদি কিছু জুটিয়া থাকে ত গাধার টুপি। কিন্তু শুদ্ধমাত্র মৃত্যুর সাহায্যে যশোলাভ সম্ভব হইলে 'মহিলা' রচয়িতাও যশস্বী হইতে পারিতেন। তাহা হয় নাই। আর একটী বিশেষ গুণের প্রয়োজন, রচনায় পয়ারবাহুল্য। ইহা না থাকিলে কোন কবিই অক্ষয় যশঃ অর্জ্জন করিতে পারিবেন না। 'স্বপ্নপ্রয়াণে' পয়ার নাই বলিলেই হয়, উপরন্তু তাহার রচয়িতা জীবিত এই কারণে তিনি একেবারে অখ্যাতনামা। (পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থ বলা প্রয়োজন যে "স্বপ্নপ্রয়াণ" বঙ্গভাষায় লিখিত একখানি পদ্য গ্রন্থ। 'Struggle for Existence' এবং 'Survival of the fittest' এই নিয়মের বশে এখানি কিছুকাল হইল লোপ পাইয়াছে এবং প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হইয়া উঠিতেছে।)

গদ্যে দোষ, চলিত ভাষার ব্যবহার। যথা :—'সেই সময়ে একদিন ক্ষুরের মত পূবের হাওয়া, শুভাগার নূতন বাগানে ফুলের বোঁটা ফেটে, গাছের পাতা ঝরিয়ে, তার সাধের মালঞ্চ শূন্যপ্রায় করে, শন্ শন্ শব্দে চলে গেল। পাখীর ঝাঁক হাওয়ার মুখে উড়ে গেল, প্রজাপতির ভাঙ্গা ডানা ফুলের পাপড়ির মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ল, এবং ছেলের পাল কোথায় অদৃশ্য হল।"

গদ্যে গুণ, পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও ভাবুকতা। অভিধানসুলভ শব্দ ও দীর্ঘ সমাসের সাহায্যে পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হয়। যথা :—"এই মাতৃভূমির বিমানচারী মার্ত্তণ্ডের কবোষ্ণ করস্পর্শ গর্ভভারজর্জ্জরিতা মাতার কুক্ষিস্থ শিশুর

শীত নিবারণ করে।.........দুঃসহ গ্রীষ্মতাপের দিনে এই পুণ্যভূমির বহুদূরদিগন্তাগত দক্ষিণমারুত মাতৃ-শরীরের মধ্য দিয়া ভ্রূণের দেহ শীতল করিয়া দেয়; শুক্লাযামিনীর পরিপূর্ণ চন্দ্রকরোজ্জ্বলা নদীনূপুরা শ্যামাঞ্চলা এই জন্মদাত্রীর অপূর্ব্বশ্রীসম্পদ্হৃতমানসা মাতার আনন্দপুলকের মধ্য দিয়া গর্ভস্থের অপরিণত দেহে অকালে পুলকোদ্গমের সহায়তা করে; শান্ত শরতের শ্যামায়মানা সন্ধ্যার সীমন্তে দিনান্তের অস্তমান সূর্য্যের সিন্দূরশোভা জননীর স্নেহনন্দিত মনের মধ্য দিয়া অজাতের অন্তরে আনন্দ আনিবার অকাতর আয়োজন করে; নিশীথিনীর নয়নাম্বুনিষেক নীহাররূপে মঞ্জরীর পুষ্পপরিণতি আনিয়া সমাসন্ন মাতৃগৌরবা জননীর আকুলিত ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া সে উচ্ছ্বসিত পরিমল ভ্রূণের তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া দেয়।"

কবিত্ব প্রকাশের উপায়, কথায় কথায় এক এক ঝলক যথাযথ বর্ণন। যথা:—"রমণী পড়িতে পড়িতে উঠিল, উঠিয়া আবার পড়িল, আবার উঠিল, আবার পড়িল, আবার উঠিল, আবার পড়িল, পড়িয়া পড়িয়া আবার উঠিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া উপরে চাহিল, চাহিয়া দেখিল আকাশে মেঘ হইয়াছে, চারিদিকে মেঘ, পাহাড়-প্রমাণ মেঘ, মেঘের উপর মেঘ, তাহার উপর মেঘ, আরও মেঘ, স্তরে স্তরে মেঘ, তাহার উপর মেঘ, তাহারও উপরে মেঘ,.........ইত্যাদি। এ বর্ণনাটী মদ্রচিত। পাঠক একটু আয়াস স্বীকার করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থানে স্থানে, এবং তৎপথানুবর্ত্তী ঔপন্যাসিকদিগের স্থানে-অস্থানে এরূপ কবিত্ব প্রচুর পরিমাণে পাইতে পারিবেন।

সহজকে দুর্ব্বোধ ও ব্যক্তকে অব্যক্ত করিবার চেষ্টা, এবং বিস্ময় চিহ্ন ও dash এর অজস্র প্রয়োগ ভাবুকতার পরিচায়ক। "আমার ক্ষুধা বোধ হইতেছে।" এই বাক্যে ভাবুকতা প্রকাশ করিতে হইলে নিম্নলিখিত দুই প্রকারে করা যাইতে পারে।

১ম। 'আমার মধ্যে একটা যেন অপূর্ব্ব, কি একটা যেন অব্যক্ত অভাব, একটা বিপুল শূন্যতা, একটা বিরাট হাহাকার, পরকে আত্মসাৎ করবার মত একটা উৎকট আগ্রহ, একটা আকুল আকাঙ্ক্ষা, একটা যেন— কি একটা যেন উপলব্ধি করিতেছি।"

২। আমার!—অতিশয় ক্ষুধা!—বোধ—হইতেছে! এই দুই প্রকার ভাবুকতার প্রথমটী স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্র-লালের নাটকের এবং দ্বিতীয়টী কতকগুলি কালেজ-পাঠ্য নবেলের পাতায় পাতায় Water hyacinth এর মত অজস্র ফুটিয়াছে।

পদ্যে দোষ, অপ্রাচীনত্ব। অপ্রাচীনত্ব চতুর্ব্বিধ।

১। বানানে অপ্রাচীনত্ব। যথা:—

'তোমার কটিতটের ধটি কে দিল রাঙিয়া?
কোমল গায়ে দিল পরায়ে
রঙীন আঙিয়া?
বিহান বেলা আঙিনা তলে
এসেছ তুমি কি খেলাছলে,
চরণ দুটী চলিতে ছুটি
পড়িছে ভাঙিয়া।"

'রাঙিয়া', 'ভাঙিয়া', প্রভৃতি বানান অপ্রাচীন, সুতরাং বর্জ্জনীয়। "বিহান বেলা আঙ্গিনা তলে" বলিলে পরিতৃপ্তি লাভ করিতাম। তাহা করা হয় নাই। অতএব চটিয়াছি।

২। ছন্দে অপ্রাচীনত্ব। যথা :—

"হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা,
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক্,
শুধু থাক্
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল!"

এ আবার কিরূপ পদ্য! ইহার কোন চরণ বা আধইঞ্চি, কোনটি বা দেড়গজ। পর পর জোড়াতাড়া দিয়া সাজান। ইহাকে চতুষ্পদী বলিব কি ষট্পদী বলিব ঠিক করা দুঃসাধ্য। এমন পদযোজনা হেমচন্দ্রেও দেখি নাই, নবীচন্দ্রেও দেখি নাই, ঈশ্বরচন্দ্রেও দেখি নাই ভারতচন্দ্রেও দেখি নাই। অতএব ইহা অপাঠ্য।

৩। ব্যবহৃত শব্দে অপ্রাচীনত্ব। যথা :—

"খোপের ভিতর পায়রা যেমন করতে থাকে বক্‌বকম্" পায়রার বক্‌বকম লইয়া আবার পদ্য! ভেকের মক্‌মক্ সহ্য করিতে পারি। উহা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। তাই বলিয়া বক্‌বকম্! নাঃ! ইহা বরদাস্ত করিতে পারিব না। —ইহা গ্রাম্যতা-দোষদুষ্ট।

৪। বর্ণনীয়ে অপ্রাচীনত্ব। শুনিতে পাই কোন এক তরুণ কবি "পেয়ারা ফুলের রেশমী মিঠাই" দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, এবং আকন্দ ফুল সম্বন্ধে দেড় পৃষ্ঠাব্যাপী এক পদ্য রচনা করিয়াছেন। ইঁহার সাহসিকতায় স্তম্ভিত হইলাম। ফুলের বিষয়েই যদি লিখিতে হয় ত যুথী, জাতি, মল্লিকা, মালতী, চামেলী, বেলা, চম্পা কি অপরাধ করিল? কে না জানে যে বর্ণনার ফুল ঐগুলি। এই সব সনাতন ফুল চুলায় গেল—এখন আকন্দ ফুল, যাহা পথেঘাটে, বনেবাদাড়ে ফুটিতেছে—তাই লইয়া পদ্য! হরি! হরি! আমার দৃঢ় বিশ্বাস কবি কখনও আকন্দ ফুল দেখেন নাই। দেখিলে এ কুকর্ম্ম করিতেন না।

পদ্যের একমেবাদ্বিতীয়ং গুণ, অনুপ্রাস। এই অনুপ্রাসের প্রভাবে মাঘ কালিদাসকে ছাপাইয়া উঠিলেন এবং জয়দেব কবি অমর হইলেন। ইদানীন্তন কালের অমরত্বের অধিকারিগণও অনুপ্রাস-প্রয়াসী। ইঁহাদের পলদ্ঘর্ম্ম প্রয়াসের উদাহরণ :—

"মিছে কেন ভাবি ভাবী ভবের ব্যাপারে।"—ঈশ্বরচন্দ্র
"যামিনী পোহায়ে যায় ভূষা পরি উষা ধায়।"—হেমচন্দ্র
"ইন্ধন বাহিনী ইন্দুমুখীর সঙ্গীত।"—নবীনচন্দ্র
"কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে।"—মধুসূদন

"কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে।"—দ্বিজেন্দ্রলাল
"যদিও বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিছে আকাশে।"—রবীন্দ্রনাথ

"শবরীর মেয়ে শ্যামা শর্ব্বরী চিত্তে জাগায় ত্রাস।"—সত্যেন্দ্রনাথ

"সরস করিয়া রসহীন রূঢ় রাঢ়ের মাটি
পণ্য আননি, পুণ্য এনেছ।"—কালিদাস

"গরজে পড়ি বরজে নামে পরজ সুরে গর্জ্জি বাজ,
দর্জ্জা আঁটে মর্জ্জী কড়া দর্জ্জী সেও বর্জ্জি লাজ—কবিবর বনবিহারী

অনুপ্রাসের জন্য একটু প্রয়াস করিতেই হয়। কারণ অনুপ্রাসের উৎস উঠানই পরম পুরুষার্থ। অনুপ্রাসের জন্য অর্থ কেন, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিসর্জ্জন দেওয়া যাইতে পারে। সর্ব্বাঙ্গে খোসপাচড়ার মত অনুপ্রাস ছড়ান না থাকিলে পদ্য কিরূপ অপাঠ্য হয় তাহার পাহাড়-প্রমাণ দৃষ্টান্ত স্বর্গীয় বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কবিতাবলী। সুখের বিষয় এরূপ নিকৃষ্ট পদ্য ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে; এবং যাঁহাদের কাঁচা হাতের লেখা ছিল :—

"বাঘের ক্ষুধা মিটাও ঠাকুর, প্রাণ রাখ প্রাণহানি ক'রে,
মনুষ্য মরে ক্ষুধায় জ্বরে, হাত গুটিয়ে রইলে সরে?"

"আছি দেশ ভরি তৃণ মঞ্জরী হরষের বুদ্বুদ্,
ফূরতির ফাউ, ফালতো আদায়
না-চাহিতে-পাওয়া সুদ।"

"সংবর এ মূর্ত্তি তব, একচক্র রথের ঠাকুর,
অগ্নিচক্ষু অশ্ব তব মূর্চ্ছি বুঝি পড়ে, আর তারে ছুটাবে কতদূর?
সপ্তসাগরের বারি সপ্ত অশ্বে তব করিছে শোষণ তৃষ্ণাভরে,
তবু নাহি তৃপ্তি মানে। পিয়ে নদ, নদী, সরোবরে
পঙ্কিল পল্বলে পিয়ে, গোষ্পদে ও কূপে
পুষ্পে রস তাও পিয়ে চুপে
তৃপ্তি নাহি পায়!

তাঁহাদেরই পাকাহাতের লেখা দাঁড়াইতেছে :—

"পদ্মের সদ্মে যে বজ্রীর ছদ্মে যে
সদ্যের মধ্যে যে মৌন্ মহান্।"

বেশ বুঝা যাইতেছে আমরা অতি দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে চলিয়াছি। এখানে একটী আশার কথা বলিয়া রাখি, উন্নতির সীমা **গোলকধাম বা গোল্লা।** (গোলকধাম খেলার ছক দ্রষ্টব্য।)

গদ্য ও পদ্যের একটী সাধারণ গুণ, অপঠিত-মনোহারিত্ব। বিলাতী কবি সেক্‌পীয়রে এই গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কালেজের অধ্যাপক হইতে ভবানন্দ বাবুর বাজারসরকার পর্য্যন্ত সকলেই বলিবে "আহা! সেক্‌পীয়রের মানবচরিত্রচিত্রণনৈপুণ্য কি চমৎকার!" সেক্‌পীয়রের কবিত্বে ইঁহারা সকলেই মুগ্ধ। কিন্তু এরূপ মুগ্ধ হইবার জন্য সেক্‌পীয়র পড়িবার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। মুগ্ধ হন নাই—কাউণ্ট্ টলষ্টয়। তাঁহার কাছে সেক্‌পীয়র হয় ত অপঠিত ছিল না। কে বলিতে পারে? যাহা হউক এ পরচর্চ্চায় আমাদের প্রয়োজন নাই। [illegible] আমাদের লেখকের মধ্যে অপঠিত-মনোহারিত্ব আছে। তন্মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

অক্ষয়কুমার দত্ত. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত. প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহাদের লেখনীর অধিকাংশ অপ্রত্যক্ষ থাকিয়াও আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। তাই বলিয়া সঞ্জীবচন্দ্র না পড়িলেও ভাল লাগে এমন কথা শুনি নাই। আর অপঠিত, রবীন্দ্র নাথের সৌন্দর্য্য দূরের কথা, উহা সহৃদয়গণের নাক্কার জনক।

দুইটী দোষ গদ্য ও পদ্য উভয়ত্র বৰ্জ্জনীয়।

১ম। দুর্ব্বোধ্যতা। দুর্ব্বোধ্যতা বলিলে ভাবের দুর্ব্বোধ্যতা বুঝিতে হইবে। অন্য প্রকারের দুর্ব্বোধ্যতা অভিধানাদির সাহায্যে দূরীভূত হয় বলিয়া দোষ নহে। যথা :—

"এপ্রপঞ্চে তবে কেন বঞ্চাইছ দাসে
কহ তা দাসেরে সর্ব্বভুক্ ?"
"এইরূপে বেঁধে বেড়ে দেন যদি নারায়ণ
—বোকারে বুঝাব কি বা বল ? —
রুক্মিণী অমৃতরাশি পড়িত কি পাতে তাঁর ?
সত্যভামা তপ্তহলাহল ?

গদ্যে দুর্ব্বোধ্যতা ;—

"ঐ যে গোড়ার সম্বিৎ। উহাই বিজ্ঞান-জগতের মূলস্থিত একপ্রকার নাভসিক তৈজস উপাদান ; আর উহারই ভিতরে (১) বিজ্ঞান জগতের জ্যোতিষ্কেন্দ্র, (২) সেই জ্যোতিষ্কেন্দ্রের রশ্মিস্ফুরণ, (৩) সেই জ্যোতিষ্কেন্দ্রের অবভাসা পরিধিমণ্ডল, সবই চাপাচুপি দেওয়া রহিয়াছে। জ্যোতিষ্কেন্দ্র কী ? না বুদ্ধিগত একাত্মিকা সম্বিৎ ; অর্থাৎ আত্মখোঁয়াসা বুদ্ধি। ঐ জ্যোতিষ্কেন্দ্রের রশ্মিস্ফুরণ কী ? না মনোগত সংকল্পনা বা সংযোজনা ; উহার অবভাসা পরিধিমণ্ডল কী ? না ইন্দ্রিয়গত বিষয়-বৈচিত্র।"

উপরোক্ত অংশ আমি মধুপোদ্দারকে শুনাইয়াছিলাম। সে ইহার একবর্ণও বুঝিতে পারিল না। যাহা লোকে বুঝিতেই পারে না এমন লেখা লিখিয়া পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করা এবং পাঠকের অমূল্য সময় নষ্ট করিবার আয়োজন করা অতি গর্হিত কার্য্য। একটা সান্ত্বনার বিষয় দেখিতেছি লেখকের ভাষা এত অসাধু যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার প্রবন্ধ স্পর্শ করিবেন না। ইহাঁর ভাষাই তাঁহাদিগের বৃথাকালক্ষয়রূপ অনর্থ হইতে রক্ষা করিবে। কিন্তু সকলের ভাষা ত অসাধু নহে। রচনা দুর্বোধ অথচ ভাষা সাধু এরূপ হইলে ত সর্ব্বনাশ। যথা :—"হে নবীন তুমি কোথা হইতে আগমন করিলে ?" এ স্থলে 'তুমি' কে ? ইহা কি পরমাত্মার উদ্দেশে বলা হইল ? তাহাই বা কিরূপে হয় ? পরমাত্মা ত নবীন নহেন, তিনি সনাতন। তবে কি "তুমি" জীবাত্মাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে ? জীবাত্মা ত অনাদি অনন্ত,—তাঁহাকে "কোথা হইতে আগমন করিলে ?" এ প্রশ্ন করা কিরূপে সঙ্গত হয় ? তবে কি 'তুমি' মন ? তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হয় ? প্রশ্ন করিতেছেন দেহী। দেহীর পক্ষে মন ত নবীন হইতে পারেন না, কারণ দেহ ও মনের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। যে দিন হইতে দেহ সেই দিন হইতে মন। তবে 'তুমি' কে ? এই সমস্যা লইয়া দীর্ঘকাল মাথাকোটাকুটি করিতে হয়। তাহাতেও হয় ত কোন ফল লাভ হয় না।

পদ্যে দুর্বোধ্যতা :—

"আমি উন্মনা হে
হে সুদূর, আমি উদাসী !
রৌদ্রমাখান অলস বেলায়,
তরুমর্ম্মরে ছায়ার খেলায়,
কি মূরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি !
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি বাজাও মোহন বাঁশরী,
কক্ষে আমার রুদ্ধদুয়ার, সেকথা যে যাই পাশরি।"

লোকে স্ত্রীপুত্রের জন্য, স্বজনবন্ধুর জন্য, বিরহিণী প্রণয়িনীর জন্য উন্মনা হয়, উদাসী হয় এই ত এতকাল জানা ছিল। এখানে দেখিতেছি এক ব্যক্তি সুদূরের জন্য উদাসী হইয়াছেন! আমরা সুদূরে থাকিলেই উন্মনা হই, ইনি ঘরে থাকিয়া সুদূরের জন্য উন্মনা। ইঁহার মানসিক অবস্থা আমাদের বোধশক্তির অতীত। আরও, তরুমর্ম্মরে, ছায়ার খেলায় সুদূরের 'মূরতি' কিরূপে ফুটিয়া উঠে—বলা শক্ত। তারপর, সুদূর আবার বাঁশী বাজাইবে কি? সুদূর কি একটা মানুষ? ও-ছাই কিছু বুঝিলাম না।

২য়। অশ্লীলতা। অশ্লীলতার কোন সংজ্ঞা হইতে পারে না। উহা সহৃদয়-হৃদয়-বেদ্য। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'চন্দ্রশেখর' অশ্লীল নহে, কিন্তু 'চোখের বালি' বা 'চরিত্রহীন' অতিশয় অশ্লীল। 'বিদ্যাসুন্দর' অশ্লীল নহে। হইলে তাহার মুদ্রণ, সংমুদ্রণ ও পুনর্মুদ্রণ এতদিনে বন্ধ হইয়া যাইত, এবং অভিনয়ের সাহায্যে ঘরে ঘরে তাহার রসস্বরূপের উপাসনা হইত না। কারণ আর যাহাই হউক অশ্লীলতা আমরা কিছুতেই মার্জ্জনা করিতে পারি না। 'মহাভারত' অশ্লীল, এমন কথা কখনও শুনি নাই। বরং ইহাই দেখিতে পাই যে নবেলনাটকাদির সংক্রামক বিষ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিধবা ও ব্রহ্মচারীর চিত্তকে মহাভারতের শৃঙ্গার রসে জর্জ্জরিত রাখার বিধি আছে। কিন্তু "চিত্রাঙ্গদা" ভয়ানক অশ্লীল। বিশেষতঃ তাহার মধ্যে—

"——নিগূঢ় সরম সঙ্কোচ
খসিয়া পড়িল শ্লথ বসনের মত
পদতলে।" এই অংশ একেবারে মারাত্মক।

বঙ্গভাষার স্বরূপ সবিশেষ বর্ণনা করিলাম। ইহার দোষগুণ সম্বন্ধে যে কয়টা মন্তব্য প্রকাশিত হইল তাহা আয়ত্ত করিতে পারিলেই যে-কোন ব্যক্তি গ্রন্থরচনায় সমর্থ হইবেন। তবে হে বঙ্গসন্তানগণ, আর বিলম্ব কেন? এইবার কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাও, সাজসরঞ্জাম লইয়া একবার লিখিতে আরম্ভ কর, একবার গদ্য ও পদ্যের কষাঘাতে বঙ্গমাতার পৃষ্ঠদেশ কিণাঙ্কিত করিয়া ছাড়িয়া দাও। কেবল পদ্যে নূতনতর কিছু করিতে যাইও না, এবং কোন ছিদ্র দিয়া পদ্যের মধ্যে চলিত ভাষা না প্রবেশ করিতে পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকিও। বাস্! তাই হইলেই রচনা নির্দ্দোষ হইল। ইহার উপর যদি অনুপ্রাসাদি গুণ দু'একটা জুটাইতে পার তবে ত সোণায় সোহাগা। লিখিবার বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইও না। কারণ শাস্ত্রে বিষয় বিষবৎ কীর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা

বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া কেবল লিখিয়া যাইব। আমাদের লেখার কোন অর্থ নাই থাকুক, তথাপি লিখিব, প্রাণপণে লিখিব, অবিশ্রাম লিখিব, অনর্গল লিখিব। আমাদের রচনার প্রবাহ কোন সীমার দ্বারা আবদ্ধ করিতে চাহি না, কোন মানদণ্ডের সাহায্যে পরিমাপ করিতে চাহি না। আমরা চাহি—দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া কেবল লিখিয়া যাইতে। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় আমরা বলিতে চাহি :—

"জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি'না অর্থ,
চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটী অমলকমল
চরণে স্থান।"

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

মিস্ত্রী।

—:*:—

(১)

রাস্তার ধারে রাশিকৃত ইঁট; চুন সুরকীর স্তূপ জমা করা। একটি নূতন বাড়ী তৈয়ারী হইতেছিল; একপাল কুলী ও কুলীরমণী সমস্বরে গান জুড়িয়া দিয়া ছাদ পিটিতেছিল। যে যায়গায় নূতন বাড়ীখানি তৈয়ার হইতেছিল ঠিক তার পাশে একটি তেতালা, হলদে রংয়ের পুরাণো বাড়ীর জানালায় দাঁড়াইয়া একটি মেয়ে বছর তিনেকের একটি ছেলের কান্না থামাইতেছিল; মেয়েটি ষোড়শী। খুব পরমা সুন্দরী না হইলেও যাকে বলে বেশ দেখ্‌তে. তাই। হাতে একগোছা সোনার চুড়ীর সঙ্গে সোনাবাঁধানো লোহা আর ফাঁপা চুলের মাঝে সরু সিঁথিতে টুক্‌টুকে সিন্দূরে তার এয়োতির সাক্ষী দিতেছিল।

তার পরনের একখানি ফিকে সবুজ রংয়ের চওড়া লাল পেড়ে সাড়ীর নীচে গোলাপী সেমিজের রং দেখা যাইতেছিল।

মেয়েটি জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দেখিল নূতন বাড়ীর ছাতের উপর হইতে একটা বিশ্রী ময়লা লুঙ্গি পরা একটি মিস্ত্রী নামিয়া আসিয়া দোতালার একটি অসম্পূর্ণ ঘরে এক-রাশ সুরকী-চালার কাছে পশ্চিম মুখ হইয়া দাঁড়াইল। তার গায়ে লুঙ্গির চেয়েও ময়লা মেরজাই আগাগোড়া চুন সিমেণ্ট মাখা, কাঁধের গামছা দিয়া সে হাতমুখ মুছিতে লাগিল।

পশ্চিমের সূর্য্য তখন প্রায় ডুবুডুবু। ঢেউ খেলানো মেঘ-সাগরের খানিকটা লাল আলোয় রাঙাইয়া দিয়া মেঘের আড়েই দিনান্তের শেষ-ছটা নিবিয়া আসিতেছিল। এই কদর্য্য নোংরা মিস্ত্রির চুন মাখা দাড়ির উপর, মুখের উপর, কার যেন অতি নিবিড় প্রেমালিঙ্গনের মত সে আলো আসিয়া পড়িল। লোকটা প্রথমতঃ দুই চক্ষু

বন্ধ করিয়া যুক্তকরে দাঁড়াইয়া পরে [illegible] বসিয়া তদ্‌গত চিত্তে ধ্যান করিতে লাগিল। সে বোধহয় ভাবিয়াছিল যে সে অন্ততঃ মানুষের [illegible] বসিয়াছে।

মেয়েটি একটুখানি দাঁড়াইয়া [illegible] পর ছুটিয়া গিয়া আর একটি ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইল, একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া টুক্ [illegible] পড়িল। ঘরের মধ্যে একজন কোঁকড়াচলে ঢেউ তোলা সিঁথিকাটা, সোনার চশমা চোখে, [illegible]-বোতাম দেওয়া হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলানো পাঞ্জাবী-পরা ইয়ংম্যান বসিয়া চিঠি লিখিতেছিল, চড়াঁটা বর [illegible] মুখ তুলিয়া চাহিল, শব্দটা যে তার কানে মধুর লাগিয়াছিল তাতে আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই, ক[illegible] বলিয়াছেন যে "প্রিয়ার হাতের সবই মিঠে," এমন কি "কানমুটি" পর্য্যন্ত, এই সুষমা মেয়েটিও উপস্থিত [illegible]এর প্রিয়া। সুষমা বলিল "ওগো একবার এদিকে এস, একটা মজা দেখে যাও!"

সরোজ চশমাবদ্ধ চোখ তুলিয়া বলিল "কি?" "ওঠো আগে,—দেখ্‌বে চল" বলিয়া সুষমা তার হাতের কলম কাড়িয়া লইল।

"কি দেখ্‌বো কি, তাই আগে বল না" "না সে বলা যায় না, শুধু দেখা যায়,—চলো"

সরোজ উঠিল, বলিল "আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছো, কিছু দেখবার মত যদি না দেখি তো আমিও দেখিয়ে দোব মজাটি" সুষমা হাসিয়া বলিল "কেমন কোরে!" "আচ্ছা, সে তখনই টের পাবে" বলিয়া তাহারা সেই খোলা জানলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এই ঘরটিতে সরোজের বড়দাদা থাকেন সুতরাং এখানে বেশীক্ষণ সপরিবারে অবস্থান করা সরোজ সুবিধা মনে করিল না;—সে বলিল "কোথায় কি?"

সুষমা জানালার পর্দ্দাটা একটু সরাইয়া দিয়া সেই তন্ময়মিস্ত্রিটিকে দেখাইয়া দিল। লোকটি তখন ও নিস্পন্দ হইয়া বসিয়াছিল। সুষমা বলিল "তুমি তো সবই হেসে উড়িয়ে দাও, বল দেখি ও কি ক'রছে?

সরোজ বলিল "তাইতো! বুঝলুম না." সুষমা বলিল "না; তা কেন, বলনা খেলা ক'ছে!"

"খেলা? তা হবে,—তাই হবে"—সুষমা বলিল "খেলা হ'লেও হ'তে পারে কিন্তু পুজো নয়,—এই তো বলচো?" সরোজ একটু মন দিয়াই লোকটিকে দেখিতেছিল, কিছু বলিল না।

সুষমা গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরের মেয়ে, তেত্রিশকোটী দেবতার কাছে, তুলসীতলায় বেলতলায় মাথা নোয়ান তার আজন্মের অভ্যাস,—এসব লইয়া সরোজ তাকে প্রায়ই ঠাট্টা করিত,—আর নিজেকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিতে সে খুব একটা গর্ব্ব অনুভব করিত। বেচারার চব্বিশ বয়সটা ভগবানের সৃষ্টি দানেই কাটিয়াছিল, তাই সে গলায় এমন জোর ছিল যে যাহাতে সে বলিতে পারিত "নাই তিনি"।

কথা শুনিয়া সুষমার কান্না পাইত, ভয় হইত, যে কোন্ ফাঁকে তাঁহারই দান এক রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া জানাইয়া দিবে:—

"আমি আছি, আমি আছি"। এই অস্তিত্ব জানার আগেই মানুষ নাস্তিক হইতে পারে,—পরে নয়।

(২)

একটু পরে মিস্ত্রী উঠিয়া ধুলামাখা গামছাখানা কাঁধে তুলিয়া লইয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল। সরোজ তখনও অন্যমনকে শুধু চাহিয়াছিল, সুষমার হাতের ধাক্কা খাইয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল "আঃ,—এই বুঝি খুব একটা

মজা দেখাতে এনেছিলে ?" সুষমা বলিল "কেন তুমি যে বড় পূজো মান না," "মানিই নে তো !" বলিয়া সরোজ ফিরিয়া গিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। মনটাকে খুব শক্ত করিলেও ধ্যানরত মিস্ত্রির অন্তালোকদীপ্ত মূর্ত্তিটার প্রভাব যেন সেখানে জাঁকিয়া বসিয়াছিল, কিছুতে যেন ভোলা যায় না।

সরোজের ভাইপোটি তার ঠাকুমার ডালা থেকে আমলীর জন্য কোটা কাঁচা আম লইয়া খাইবার জন্য একটু নির্জ্জন যায়গা খুঁজিতেছিল, বিধির বিপাকে সে কাকাবাবুর চশমায় ঠেকিয়া ধরা পড়িয়া গেল।

একে কাঁচা আম, তাতে সরোজ সম্প্রতি মেডিকেল কলেজের শেষ ডিগ্রি লাভ করিয়াছে, কাজেই অনেক কান্নাকাটিতেও সে খোকাকে আম ক'খানা খাইবার সুবিধা দিল না; লেখা চিঠিখানা খামে মুড়িয়া সে খোকাকে ভুলাইবার জন্য বলিল "চল্ তোকে বেড়িয়ে আনি,—জুতোটা প'রে নে" হাতের উল্টা পিঠে চোখ মুছিয়া চোখের জল মুখময় মাখিয়া কান্নার উপর হাসিয়া খোকা জুতার খোঁজ করিল।

খোকার হাত ধরিয়া বাইরে আসিয়া সরোজ দেখিল সেই মিস্ত্রী একটি ঘটি হাতে করিয়া বাড়ীর চাকর বিধুনের কাছে একটু জল চাহিতেছে বাবুকে দেখিয়া একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

খোকা কিন্তু কাকার হাত ছাড়িয়া পরম আনন্দে লাফাইয়া গিয়া মিস্ত্রির হাত ধরিল বলিল "মিস্ত্রি জি, একটা পাখী বানিয়ে দেবে, কাঁঠালের পাতা দিয়ে ?" মিস্ত্রী স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিল "বহুত আচ্ছা"—

খোকা ফিরিলে খোকার ঠাকুমা তার কাছ থেকে তিন হাত জমি লাফাইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "তুই যে মোছলমান ছুঁয়েছিস্ আগে জামাটা ছাড়্ হতভাগা ছেলে, তার পর আমায় ছুঁবি,—" সরোজ হাসিয়া উঠিল; বলিল "ওকে ছুঁলে জাত যায় না মা, ও পরম ভক্ত, নমাজ করে, পূজো করে—" মা মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন "তবেই আর কি, ঠাকুর হ'য়ে গেছে—" সরোজ বলিল "জানিনে মা, তোমরা ঠাকুর বল কাকে" হঠাৎ তার দৃষ্টি আর এক দিকে পড়িল, সেখানে সুষমার ঘোমটাঢাকা সজলচক্ষে বেশ ক্ষুব্ধ-ভর্ৎসনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া সে চুপ করিয়া গেল।

(৩)

সে দিন মাসকাবার। কণ্ট্রাক্টার আসিয়াছিল, আর সমস্ত কুলীর দল তাহাকে ঘিরিয়া বেতনের জন্য তুমুল বাদবিসম্বাদ বাধাইয়াছিল; চেঁচামিচি গোলমাল শুনিয়া পথের অনেক লোক দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, সরোজও দাঁড়াইয়া বেতন বিলি দেখিতে লাগিল। তাহাদের বাড়ীর কাছে একটা বড় আমগাছে অনেকগুলা আম পাকিয়া লাল হইয়াছিল; কুলীদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হওয়ায়-পড়া আমের লোভে সেই গাছের নীচে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

অন্য সমস্ত গোলমাল থামিয়া গেলে সেই প্রসন্নমুখ নম্রস্বভাবের মিস্ত্রিটি আগাইয়া আসিল। তার মাসিক মাহিনা পঞ্চাশ টাকা গনিয়া দিতে দিতে কণ্ট্রাক্টার হাসিয়া বলিলেন "এক্ষুণি তো এ সব বিলি হ'য়ে যাবে মিস্ত্রি,—এত ও কাণা-ফুটো—সব দানের পাত্তর জোটে তোমার—" মিস্ত্রি হাসিয়া বলিল "আর বাবুসাহেব, আমার আবার দেওয়া,— ও খোদার জিনিষ; খোদার কাজে যায়, আর যদি তাঁর তলব পড়ে ত এ টাকা রোজকারের যন্ত্র আর কি খাড়া থাক্‌বে; কবরে মাটি হ'য়ে যাবে;—" কণ্ট্রাক্টার "-বটে তো ম'রছো তুমি"

"তা হোক্ এ মজুরি যে মালিক ঠিক কাকে পৌঁছে দেন এই আমার বহুত" বলিয়া সে শান্তোজ্জ্বলমুখে পরম তৃপ্তিতে হাসিতে লাগিল। মাহিনা চুকাইয়া নিয়া বাবুকে এক লম্বা সেলাম করিয়া মিস্ত্রী পথে আসিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

সহরের প্রায় বাইরে গুটিচারেক ছোট্ট ছোট্ট ভাড়াটে ঘরের একটির ভিতর একজন টেমাথা বুড়ো তা অন্ধ চক্ষের শূন্যদৃষ্টি মেলিয়া চুপ করিয়া একটা চৌকীর উপর বসিয়াছিল; একটা সাত আট বছরের মেয়ে খড়ের ঝাড়ন হাতে করিয়া ঘর ঝাঁট দিতেছিল; বুড়ো বলিল "এই,—আর একটু তামাক সেজে দিতে পারিস? আছে আর?" মেয়েটি বলিল "আর তো নেই, আজ তিনি মাহিনা পাবেন, কিনে আনবেন।" এই সময় অদূরে মিস্ত্রীকে দেখিয়া তাহারা আনন্দে লাফাইয়া উঠিল।

এই ঘরগুলির অল্প একটু দূরেই গঙ্গা, গঙ্গার তীরে বাঁধানো ঘাটে অনেকগুলি ছেলে, সকালে না হোক বৈকালে বেশ একটা আড্ডা জমাইত, বিশেষ তো গ্রীষ্মের দিনে, সেই দিনেও সে ঘাটটিতে এক দল লোক ছিল, আর তার মধ্যে ছিল নূতন ডাক্তার সরোজ মিত্র, সে এই মিস্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া সেই দিকেই চাহিয়াছিল।

ঘাটে বাবুলোকের ভিড় দেখিয়া মিস্ত্রী আঘাটায় নামিয়া অপরিষ্কার হাত মুখ ধুইতেছিল, সরোজ বলিল "কি মিস্ত্রী এই তোমার বাড়ী না কি?" "না বাবু সাহেব" "তবে এরা কারা?" মিস্ত্রী বলিল "ওরা আমার এ দুনিয়ার ভাই" "এরাও মুসলমান?" "না বাবু সবাই নয়, হিন্দুও আছে।" সরোজ দেখিল যে, এই নীরব সেবকটি তার আশ্রিতদের সঙ্গে নিজের সম্পর্কটুকু জানাইতে চাহে না। তবু সে বলিল "তোমার নিজের ছেলে মেয়ে কেউ নেই?" মিস্ত্রী সহজকণ্ঠেই বলিল "না, আমার পরিবার ছেলেবেলাতেই মারা গেছে।" "তা বেশ, তোমার আপনার বল্‌তে কেউ নেই বল"।

প্রসন্ন-হাসিমুখে বলিল "আপন লোকই বহুত আছে বাবু, পর তো কেউ নেই, দুনিয়া আমার সব নিজের।

সরোজের যৌবনোদ্ধত বন্ধুগুলি পরম কৌতুকে তাহার কথা শুনিয়া অনাবশ্যক চাপল্যে হাসিতেছিল; এ হাসি মিস্ত্রীর চক্ষু এড়াইল না, সে মাথা নামাইয়া বিদায় হইল।

সেদিন সরোজের বন্ধুরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল যে,—তাহাদের অমন প্র্যাক্‌টিক্যাল বন্ধুটিও এই নোংরা মিস্ত্রীটাকে দেখিয়া সেন্টিমেন্টে গলিয়া পড়িবার যোগাড়।

(৪)

বছর প্রায় ঘুরিতে চলিল। তখন বর্ষা নামিয়া গিয়াছে। সরোজ এখন দাতব্য চিকিৎসালয়ের সরকারী ডাক্তার; তা ছাড়া তার আলাদা কলও আছে বটে, কিন্তু কয়দিন হইতে এমনি দুর্য্যোগ পড়িয়াছে, যে বাড়ীর বাহির হইবার উপায় নাই।

নিতান্ত সঙ্কট অবস্থা না হইলে এমন দিনে কেহ ডাক্তার ডাকেও না। চব্বিশ ঘণ্টাই অসংখ্য ছিদ্র ঝাঁঝরার মত আকাশ হইতে অজস্রধারে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিতেছে তার আর বিরামবিশ্রাম নাই, এক প্রহর দিন

থাকিতেই আলো জ্বালিয়া বসিতে হয় এমনি মেঘের ঘটা ; সুষমা ছেলে ঘুম পাড়াইয়া আলোর কাছে বসিয়া বই পড়িতেছিল ; রাত্রি প্রায় আটটা।

সরোজ বেশ করিয়া আলোয়ান জড়াইয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল : দেখিয়া সুষমা হাসিয়া বলিল "আজ আর বন্ধুবান্ধব কেউ আসেন নি বুঝি ?" সরোজ বলিল "না, এমন দিনে সবারি ঘরে ঘরে এই, তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই কোন বাধা নাই ভুবনে" সুষমা হাসিল, বলিল "আহা,—আজকাল তোমার নিতান্তই দুঃখের দশা, কারু একটু অসুখবিসুখ করে না কিছু না"।

রান্নাঘর হইতে খবর আসিল যে—'খিচুড়ি নাবিয়া গিয়াছে' কাজেই ঠাণ্ডার দিনে গরম গরম খিচুড়ি ভোজনান্তে সরোজ শয্যা গ্রহণ করিল। বাহিরে বৃষ্টি আরো চাপিয়া আসিল, আর হুতোম প্যাঁচার গুরুগম্ভীর শব্দ বাড়িয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

অনেক রাত্রে যখন চাকর আসিয়া জানাইল একটা কল' আছে, বাবু যাইবেন কি না ? তখন ঘুমবেগে সরোজ প্রথমটা ফিরাইয়া দিতেছিল, কিন্তু এই দুর্য্যোগের রাত্রের ডাকটা যে কতখানি বিপন্নের তাহা বুঝিয়া আর ফিরাইল না। ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল রাত্রি তিনটা ; তাড়াতাড়ি পোষাক পরিয়া ওয়াটারপ্রুফে গা ঢাকিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

দেখিল তাহাকে যে ডাকিতে আসিয়াছে সে একটী বছর দশেকের বালিকা মাত্র,—মেয়েটির মুখে ভয়ানক ব্যাকুলতা, তার একবার মনে হইল ইহাকে যেন কোথায় দেখিয়াছে, কিন্তু ঠিক্ মনে করিতে পারিল না।

সে যেখানে গিয়া পৌঁছিল সে ঘর একপাল ইতর লোকে পরিপূর্ণ ; মাঝখানে একটি তক্তপোষের উপর একজন মরণাপন্ন রোগী, সে মধ্যে মূর্চ্ছা গিয়াছিল, এখন একটু একটু জ্ঞান হইতেছে ; হেঁট হইয়া রোগীর দেহ পরীক্ষা করিতে গিয়াই সে চিনিল এ সেই মিস্ত্রী।

তার বুক, পিঠ, নাড়ী দেখার উপর একঘর লোকের চক্ষু স্তম্ভিত হইয়াছিল, না জানি সে কি উত্তরই দ্যায়, সরোজ সেই লোকগুলার আগ্রহাকুল মুখপানে চাহিয়া যাহা যথার্থ বলিবার তাহা চাপিয়া গেল।

একদিন সে মিস্ত্রীকে বলিয়াছিল "তোমার আপনার কেউ নেই ;" আজ দেখিল তার আপনার লোক কতগুলি, আর তারা কত আপনার।

সকালে ঔষধ দিবার কথা বলিয়া সে তখনকার মত বিদায় লইল, যদিও নিরুদ্বিগ্ন রোগীর প্রসন্ন মুখের হাসি-টুকু একটুও ম্লান হয় নাই তবু সরোজ বুঝিয়াছিল যে আর তার প্রভাতের প্রতীক্ষা কিছুমাত্রই নাই।

শ্রীনীহারবালা দেবী।

প্রিয়তমা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

—:*:—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ইণ্ডিয়ান হাউসের সেই রহস্যময়ী রূপসীর সম্বন্ধে জুলিয়েনের কৌতূহল ছিলই; কিন্তু অকারণে কাহাকেও প্রশ্ন করিতে না পারিয়া সহিষ্ণুতার সহিত সে ঔৎসুক্য দমন করিয়া থাকিত. আজ স্বইচ্ছায় স্বামী সেই কথার অবতারণা করিয়াছেন দেখিয়া সে অন্তরে অন্তরে—ব্যগ্র-আনন্দে চঞ্চল হইয়াছিল, কিন্তু মুখে কিছু না বলিয়া মনোযোগ দিয়া ব্যারণের কথা শুনিতে লাগিল। রাওয়েল্ বলিতেছিলেন,—

"জান জুলিয়েন্, এ শোন্‌ওয়ার্থে আমরা থাকিতাম না,—এ আমাদের পৈত্রিক বাস নয়. উহার শাসনসংরক্ষণে বাবা ও আমি বরাবরই ছিলাম। এ বাড়ী গিস্‌বার্ট কাকার, এ সমস্তই তাহার নিজের উপার্জ্জনে হইয়াছে।—পরে মৃত্যুকালে উইল করিয়া এই প্রাসাদ এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি আমাকে ও কাকাকে দিয়া যান্।—হাঁ যাহা বলিতেছিলাম,—আমি শোন্‌ওয়ার্থে আসিলে গিস্‌বার্ট কাকা বড় খুসি হইতেন, প্রায় আমায় আনাইয়া কাছে রাখিতেন। সে-বারেও আসিয়া আমি প্রায় একমাস এখানে ছিলাম, হঠাৎ কি খেয়াল হইল আমার—মনে করিলাম, যেমন করিয়াই হোক রোটাস্ লিলিকে একবার দেখিতে হইবে।—আর বল দেখি লিয়েন্, কাকার ভাবভঙ্গি দেখিয়া দেখিয়া, যাহারা লিলির সংসর্গে আসিয়াছে এমন সব স্ত্রীলোকদের নিকট তাহার রূপের আশ্চর্য্য বর্ণনা শুনিয়া শুনিয়া আমার তেমন ইচ্ছা হওয়া কি অস্বাভাবিক ?—"

এইখানে ব্যারণ একটু থামিতে লিয়েন বলিল, "তারপর,—দেখিলে তাহাকে ?" "না, দেখিলাম আর কৈ ?—লুকাইয়া ইণ্ডিয়ান হাউসের বাগানে গিয়া একটা কলাগাছের ঝোঁপের মধ্যে বসিয়াছিলাম, একজন স্ত্রীলোককে দেখিয়াও ছিলাম, কিন্তু মুখ দেখি নাই—লিলি কিনা বুঝিতে পারি নাই। দেখিবার আর সময়ও পাই নাই, কারণ সেইখান দিয়া গিসবার্ট কাকা আসিতেছিলেন, আমি পলাইতে চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই তিনি আমায় দেখিতে পাইলেন।"

ঈষৎ চকিতভাবে জুলিয়েন বলিল, "তিনি কি তাহাতে রাগ করিলেন ?"

"না তখন কিছু বলিলেন না আমায়,—'রাওয়েল্ যে,' বলিয়া একটু হাসিলেন মাত্র।— কিন্তু বাড়ী আসিয়া দেখি গাড়ী প্রস্তুত, তাহার উপর আমার ট্রঙ্ক তোলা হইয়াছে। অর্থাৎ আমি আর শোন্‌ওয়ার্থে বাসের যোগ্য নই, ইহাই তিনি স্থির করিয়াছেন !

জুলিয়েন জিজ্ঞাসা করিল, "এ কতদিনের কথা বলিতেছ

রাওয়েল্ বলিলেন, "বলিয়াছি ত তখন আমার বয়স চৌদ্দবৎসর মাত্র।—এই ঘটনার অল্পদিন পরেই হঠাৎ তাঁর পক্ষাঘাত হয়, বাক্‌শক্তি লুপ্ত অবস্থায় প্রায় ছয়মাস কাল তিনি জীবিত ছিলেন। মৃত্যুকালে আমি ছিলাম না,—পরে এখানে আসি, সেই হইতে এখানেই থাকি।"

"তার পরেও তুমি সে রোটাস্ লিলিকে দেখ নাই ?"

"না,—আর আমি তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি নাই। কিছুদিন সে বিমনা অবস্থায় শয্যাগত ছিল, তাহার পরই কাকার মত পক্ষাঘাতে—একেবারে অচল পঙ্গু হইয়া আজ বারবৎসর ঐ ইণ্ডিয়ান হাউসে পড়িয়া আছে। সে অতি পাপিষ্ঠা লিয়েন, তাহার নাম মুখে আনিতেও ঘৃণা হয়। কাকা যে তাহাকে তত ভালবাসিতেন, তাহারই কি মর্য্যাদা রাখিয়াছে সে ? বিশ্বাসঘাতিনী!—প্রেমের মূল্য সে কি জানিবে ? সাধারণ নর্ত্তকী, তাহার যাহা করিবার সম্ভব তাহাই করিয়াছিল। তাহার দুশ্চরিত্রতার জন্য তদানীং নাকি, সে কাকারও চক্ষুশূল হইয়াছিল। সেই জন্যই ত তাহাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি আমাদের দিয়া যান।"

এমন সময় দেখা গেল, গেব্রিয়েল্‌কে ঘোড়া করিয়া লিয়ো তাহার পিঠে চড়িয়া বসিয়াছে। সে তাহাকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ও লিয়ো মাঝে মাঝে তাহাকে চাবুক মারিতেছে ও হাসিতেছে। দেখিয়া মাইনো ঘৃণা ভরে কহিলেন, "দ্যাখ জুলিয়েন দ্যাখ!—মেষশাবক ভিন্ন অত নীচতা মানুষে সম্ভবে না। মাইনো বংশের রক্তে শীতলতা অতখানি কখনও সম্ভব নয়,—হতভাগা যদি আমার লিয়োকে এখনি ঘাড় হইতে ফেলিয়া দেয় তাহা হইলেও আমি সন্তুষ্ট হই!"

পিতামাতাকে দেখিয়া লিয়ো তাহার বাহনকে পায়ের গুঁতা দিয়া নিকটে আনিল ও "মা, আমার ঘোড়া" বলিয়া হাস্যচীৎকারে ঘর মুখরিত করিয়া তুলিল। লিয়েন মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, কিন্তু মাইনো ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আদেশের স্বরে বলিলেন, "নামিয়া এস লিয়ো,—ছিঃ!—"

তাঁহার বিরক্তিভাব বুঝিয়া লিয়ো গিয়া লিয়েনের ক্রোড়ে চড়িয়া বসিল, তখন গেব্রিয়েলের প্রতি চাহিয়া ব্যারণ বলিলেন, "তুমি দাঁড়াইয়া কি করিতেছ ? যাও নীচে যাও।"

দুর্ভাগ্য ভীরু বালকের মুখ প্রভুর অকারণ বিরক্তিতে বিবর্ণ হইয়া উঠিল, সে ধীরে ধীরে যাইতেছিল তাহাতেও ধমক দিয়া মাইনো বলিলেন, "তুমি কি জোরে পা ফেলিতেও পার না গেব্রিয়েল্ ? একেবারে গরুর বাচ্ছা!"

যেন ধাক্কা খাইয়া সে ঘরের বাহিরে যাইতেই জুলিয়েন ডাকিলেন, "শোন, গেব্রিয়েল ?"

গেব্রিয়েল ফিরিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে লিয়েন বলিল, "আমায় ত তুমি আজ সুপ্রভাত জানাও নাই গেব্রিয়েল ?—" বলিয়া তাহার কুঞ্চিত কেশের উপরে আদরে হাত বুলাইয়া সস্নেহে বলিল, "যাও, এখন নীচে যাও, গুড্‌বাই!"

তখন দুই চোখ ভরা জল লইয়া বালক নতমুখে বাহির হইয়া গেল।—এমন আদর সে জীবনে পায় নাই।—সঙ্গে সঙ্গে লিয়োও লাফাইয়া পড়িয়া তাহার অনুসরণ করিল।—

রাওয়েলের মুখ রক্তবর্ণ গেব্রিয়েল চলিয়া যাইতেই তিনি বলিলেন, "তুমি কাহাকে আদর করিলে জুলিয়েন ? ঐ জারজ, ঐ কলঙ্কিনীর পাপের ফল—"

একটু হাসিয়া স্নিগ্ধস্বরে জুলিয়েন বলিল, "তবু সে তো তোমার কাকারই সন্তান রাওয়েল!—

"বিশ্বাসঘাতিনী কুচরিত্রার পুত্র ও!"

"হাঁ, আমায় ক্ষমা কর—হয় ত অন্যায় বলিতেছি,—কিন্তু মাতার দোষে নিরপরাধী বালকের দণ্ড কেন? উহাকে দেখিলে সত্যই আমার কষ্ট হয়, স্বীকার করিতেছি। একটু ভাবিয়া দ্যাখ আমার উপর রাগ না করিয়া বিবেচনা কর। তুমি যদি উহার প্রতি একটুও দয়া কর—"

"তাহাতে কোন ফল হইবে না। ঐ বালককে সন্ন্যাসী হইতে হইবে—জান?"

"সন্ন্যাসী হইতে হইবে! তুমি কি বল?"

"হাঁ তাহাই হইবে। যদিও এটি আমায় ভাললাগে না, মঠের ঐ সকল ব্যাপার বালকটার পক্ষে ভয়ানক কষ্টের কারণই হইবে, কিন্তু কি করিব উপায় নাই।" স্বামীর স্বর কোমল হইয়াছে দেখিয়া—ব্যগ্রভাবে জুলিয়েন বলিল, "কেন উপায় নাই? তুমি একটু চেষ্টা করিলেই—"

হাসিয়া রাওয়েল বলিলেন, "না তা হয় না, কোন মতে না, কাকার উইল, ও শেষ অনুরোধ যে তাই।—উহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি এই বিধান করেন, তা স্ত্রীলোকটি ত মৃত্যুশয্যায়, তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই ভাবেই হইল। কিন্তু বালকটার বেলায় ত আর কোন আপত্তি থাকিতেছে না;—তাহাকে শীঘ্রই মঠে যাইতে হইবে।"

লিয়েন স্তব্ধ হইয়া থাকিল। রাওয়েলও খানিকক্ষণ নীরবে থাকিয়া তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "সংসারের কোন ঝঞ্ঝাট আমার ভাল লাগে না লিয়েন, বাড়ীতে থাকিলে এমনি হাজার রকম কথা কানে আসে বলিয়াই ত বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া মরি;—যাক্ আর এসকল কথার প্রয়োজন নাই আমাদের, আমি যত শীঘ্র পারি বাহির হইব। তুমি আমার লিয়োর সংবাদ দিবে ত? মাঝে মাঝে এক আধখানা চিঠি?—"

হাসিয়া লিয়েন বলিল, "দিব বৈ কি, তোমার ছেলের সংবাদ তুমি নিশ্চয় পাইবে।"

এবার তাঁহার স্বাভাবিক উৎফুল্ল স্বরে রাওয়েল বলিলেন, "আর এখানের অন্য খবরও দিও, শোন্‌ওয়ার্থের শান্তিময় সুসংবাদের আশাই করি আমি তোমার নিকট।"

পরে আরও পরিহাস-প্রফুল্লভাবে বলিলেন, "ভ্যালেরি কিন্তু অদ্ভুত কাণ্ড করিত। বাড়ীতে কখন কি হইত, কোন্ দাসী তাহার কথার জবাব দিত,—এই সব কথা লইয়া সে চিঠিতে আমার কাছে নালিশ চালাইত। বল দেখি, রুষিয়া বা নরওয়েতে বসিয়া আমি তার কি প্রতিকার করিব?"

লিয়েন একথার উত্তর না দিয়া একটু হাসিল মাত্র। এমন সময় সংবাদ আসিল যে রুডিগার হারমার অপেক্ষা করিতেছেন। জুলিয়েন তাহার শিল্পসামগ্রী লইয়া প্রস্থানোদ্যতা, রাওয়েল বলিলেন, "তুমিও বসিবে না লিয়েন?"

"না, আমার কাজ আছে।" বলিয়া অপর পার্শ্ব দিয়া দিয়া জুলিয়েন বাহির হইয়া গেল।—

* * * * *

দুই বন্ধুতে অনেক কথা হইতেছিল; অবশেষে হারমার বলিলেন, "তারপর,—তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে এখন তুমি কি স্থির করিয়াছ বল।"

হাসিয়া মাইনো বলিলেন, "আমার স্ত্রীর বিষয় আমি কিছুই করি না রুডিগার, সে নিজের যা কিছু তাহা নিজেই স্থির করিয়া লয়।"

সকৌতুকে রুডিগ্যার বলিলেন "কি রকম?"

"হাঁ সে একটু বিশেষ রকম বটে। প্রথম দিন তুমি যাহা দেখিয়া ছিলে, বা আমি যাহা ধারণা করিয়াছিলাম, জুলিয়েন মোটেই তা নয়। তাহার আশ্চর্য্যরকম তেজস্বী স্বভাব,—তাহাকে অহঙ্কারও বলিতে পার কিন্তু কথায় বা আচরণে নম্রতার অভাব নাই। তাহার উপর রাগ করিব কি সন্তুষ্ট হইব—আমি এখনও তাহা বুঝিতে পারি না। তাহাকে বিরক্ত করিতে আমার ভয় হয়। তুমি হাসিতেছ রুডিগার? কিন্তু দুই দিন যদি তাহার সংসর্গে থাক তাহা হইলে আর হাসিতে পারিবে না। ঠাট্টার কথা বলিতেছি না আমি, সত্যই তাহাকে লইয়া আমি বিব্রত হইয়াছি। তাহার কথা শুনিলে হঠাৎ অত্যন্ত রাগ হয়—সে কথা এত তপ্ত! কিন্তু সে বিরক্তি প্রকাশ করিবারও উপায় নাই, তাহাকে শাসন বা দমন দূরে যাক্—তার সে কথা বা ভাবের নিকট মাথা যেন আপনি নত হইয়া পড়ে। তাহাকে আমি ভালবাসি না কিন্তু অবজ্ঞা করিতেও পারি না ত! আরও আশ্চর্য্য দ্যাখ, আমার অত দুষ্ট ছেলেটি, বাঁদরের মত যে চঞ্চল ও দুষ্ট, সেও তাহার এত বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে যে পোষা কুকুরের মত সর্ব্বদাই তাহার কাছে থাকিতে চায়, সে যা বলে তাহাতে তাহার এতটুকু অবাধ্যতা নাই।—"

হাসিয়া হারমার বলিলেন, "সম্ভব তুমিও একদিন অমনি হইবে রায়েল!—"

"পাগল!—পোড়ামাটি ভাঙ্গিলে কি আর জোড়া লাগে? আমার কথা ছাড়িয়া দাও,—কিন্তু তোমায় জিজ্ঞাসা করি,—বল ত রুডিগার, তোমার যদি এমনি স্ত্রী হইত তাহা হইলে তুমি সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট হইতে?"

"থাম বলিতেছি—আমায় একটু ভাবিতে দাও ভাই।" বলিয়া হারমার উর্দ্ধে মুখ তুলিয়া মুদ্রিত চক্ষে চিন্তার ভান করিতেই, রায়েল তাঁহার হাতে ঝাঁকি দিয়া বলিলেন, "আবার ঠাট্টা! তুমি আমার কথা বুঝিতেছ না কেন?"

"তাহার কারণ আমি তোমায় কোন দিনই ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না,—আজও তাই!"

"যাক্ যাক্—আর ভাবিয়া কাজ নাই—ভাললাগে না। তাহার অপেক্ষা কোন খেলা করা যাক্—কি বল?" বলিয়াই বারণ ভৃত্যকে আহ্বান করিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

দি কলিকাতা ফাইন আর্ট কটেজ

নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা